১০০১ মুসলিম আবিষ্কার

মুসলিম সভ্যতার অনন্য গৌরবগাথা

1001 inventions - The Enduring Legacy of Muslim Civilization

প্রধান সম্পাদক : সালিম টি.এস. আল-হাস্‌সানী

অনুবাদ : ইমদাদ হোসেন

1001 inventions - The Enduring Legacy of Muslim Civilization অবলম্বনে

১০০১ মুসলিম আবিষ্কার

মুসলিম সভ্যতার অনন্য গৌরবগাথা

প্রধান সম্পাদক

সালিম টি.এস. আল-হাস্‌সানী

অনুবাদ

ইমদাদ হোসেন

প্রকাশকের কথা

"১০০১ মুসলিম আবিষ্কার: *মুসলিম সভ্যতার অনন্য গৌরবগাথা*" বইটি সাড়া জাগানিয়া গ্রন্থ "*১০০১ ইনভেনশনস*" অবলম্বনে রচিত। এমন একটি বই প্রকাশ করতে পেরে আমি আল্লাহর দরবারে লাখো কোটি শুকরিয়া আদায় করছি। আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন গবেষকদের সম্মিলিত প্রয়াস এই বই। বইয়ের প্রতিটি তথ্য যাচাইকৃত এবং বিভিন্ন নামীদামী জার্নাল ও গবেষণাপত্রে প্রকাশিত। এমন একটি বই প্রকাশের আশা নিয়ে *ইমদাদ হোসেন* ভাই যখন আমার কাছে প্রস্তাব রাখে, তখন আমি দেখেই হ্যাঁ বলে দিই – দ্বিতীয়বার আর ভাবতে হয়নি।

মুসলিম উম্মাহর প্রায় সকল অবদান লিপিবদ্ধ হয়েছে দু' মলাটে। কফির ঘ্রাণ হয়ে সাবান ও শ্যাম্পুর পরশ নিয়ে বিদ্যালয়, বাজার, হাসপাতাল, মহাকাশ, বিশ্বসহ প্রায় একশ'রও বেশি অধ্যায় ঘুরে আপনি এমন অজানা মুসলিম মনীষীদের যাচাইকৃত অবদানের সন্ধান পাবেন, দুঃখজনকভাবে যার শতকরা ৯৫-ভাগই আমাদের অজানা। ইবনে সীনা থেকে শুরু করে যে ক'জন হাতে গোনা মুসলিম মনীষীদের নাম উল্লেখ করে আমরা তৃপ্তির ঢেকুর তুলি, এই বই তাদেরকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখাবে যে, কতটা বেখবর তারা। আমরা নিজেরাই যদি নিজেদের অতীতকে ঠিক মতো না জানি, তবে সামনে এগুবো কী করে। কীভাবে হাতে নেবো সংস্কারের উদ্যোগ। আশা করা যায়, এই বইটি বহু মুসলিম তরুণের মনে নিয়ে আসবে সৃজনশীলতার অদম্য স্বপ্ন – *ইনশাআল্লাহ*।

নানা কারণে বইটি প্রকাশে বিলম্ব হতে থাকে। মূলত প্রকাশনী তো আর এক বা দু'টো বইয়ের উপর চলে না বিধায় নানা বিষয়ের উপর বিভিন্ন বই প্রকাশের পাশাপাশি বইয়ের মানের দিকেও খেয়াল রাখতে হয়। এসব কারণে অন্যান্য বই প্রকাশের ভিড়ে এই বইটি চাপা পড়ে যায়। অন্য দশটি সাধারণ বইয়ের মতো না হওয়ায় এটার অনুবাদ করাটা সহজসাধ্য ছিল না। মনে পড়ে, প্রতি রাতে ইমদাদ ভাইকে ফোন দিয়ে বলতাম, ভাই, আর কতদূর। তিনিও স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে একটা সময় সীমা দিয়ে দিতেন। আর আমিও আমার স্বভাবের বশে দিয়ে দিতাম নানা সম্পাদনার কাজ। এভাবে সময় গড়ায় এবং ২০২২-এর জানুয়ারিতে সব কাজ শেষ হয়, *আল-হামদুলিল্লাহ*।

বইটির প্রকাশে সর্বাত্মক চেষ্টা চালানো হয়েছে। এমন চ্যালেঞ্জিং ও সৃজনশীল কাজকে বাংলাভাষীদের জন্য সহজলভ্য করতে পেরে আমরা আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করছি। ভুলত্রুটিগুলি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার অনুরোধ রইলো। আল্লাহ যেন বইটিকে কবুল করেন, এই দু'আ করি।

মুহাম্মদ মামুন বেপারী
প্রকাশক, মুসলিম ভিলেজ

সূচিপত্র

উল্টো পৃষ্ঠার চিত্র: পারসীয় পাণ্ডুলিপিতে দৃশ্যমান: শ্রেণিকক্ষে নারী ও পুরুষ শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদানে রত আছেন এক বিদ্বান।

কিছু কথা

"১০০১ মুসলিম আবিষ্কার: *মুসলিম সভ্যতার অনন্য গৌরবগাথা*" গ্রন্থটি *1001 Inventions: The Enduring Legacy of Muslim Civilization* অবলম্বনে রচিত। মূল সংকলনটি যাদের শ্রমে ও অধ্যবসায়ে চূড়ান্ত রূপ নিয়েছে, তাদের সকলে নিজ নিজ ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ; এই সংকলনে পেশ করা প্রতিটি তথ্য যাচাইকৃত এবং বিশেষজ্ঞদের দ্বারা মূল্যায়িত (*peer-reviewed*)।

আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন দৃষ্টিনন্দন বইটি বিশ্ব মহলে বেশ সাড়া ফেলে। সাড়া ফেলবেই না কেন, যেখানে ভাবা হয় যে: গ্রিক, রোমান সভ্যতা হয়ে মানব সভ্যতা রেনেসাঁর মাধ্যমে ক্রমশ উন্নতির পথে এগিয়েছে, সেখানে আরবের মরু বেদুইনারা দাঙ্গা-হাঙ্গামা ছাড়া বিশ্বের জন্য উল্লেখযোগ্য কিছুই দিতে পারেনি। হ্যাঁ, যদি কিছু দিয়ে থাকে, তবে তা: *Dark Ages* বা অন্ধকার যুগ। এই মিথকে বইটি একেবারে ভেঙে দিয়েছে এবং প্রমাণ করেছে যে, বাস্তবতা সম্পূর্ণ ভিন্ন। গ্রিক, রোমান, পারস্য ইত্যাদি সভ্যতা হয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞান ইউরোপে এক লাফে আসেনি, বরং তা এক সোনালি যুগ পাড়ি দিয়ে এসেছে, যার কারিগর ছিল তিন মহাদেশে বিস্তৃত বৃহত্তর মুসলিম সভ্যতা।

আজকের জ্ঞান-বিজ্ঞান যে উচ্চতায় আসীন হয়েছে, তার পিছনে গ্রিক, রোমান ও অন্যান্য সভ্যতার যত অবদান, তার চেয়ে বেশি অবদান বৃহত্তর মুসলিম সভ্যতার। এটা কোনো অতিশয় উক্তি নয়, বরং অকাট্য সত্য। দুঃখজনকভাবে এই সত্যটুকুর দশ ভাগের এক ভাগও আমরা মুসলিমরাই জানি না।

আমরা ক'জনে জানি –

- ফাতিমা আল-ফিহরী ফেযে প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।
- বনী মূসার তিন ভাই ছিলেন ট্রিক ডিভাইসের পথিকৃৎ।
- ক'জনে জানি আয-যাহরাবীর কথা, যার উদ্ভাবিত সার্জারী যন্ত্রের ট্রে দেখলে কখনো মনে হবে না যে, এগুলো ১০০০ বছর পূর্বের। দেহের অভ্যন্তরের সেলাই ক্যাটগাটের ব্যবহারের পাশাপাশি আয-যাহরাবী ছিলেন ক্যাপসুল উদ্ভাবনের অগ্রনায়ক।
- ঝেং হো-র কথা ক'জনে জানি, যিনি ফুটবল মাঠের সমান ৬২-টি জাহাজের বহর নিয়ে সমুদ্রে রাজ করেছিলেন? ৪০০ ফুটের অধিক দৈর্ঘ্যের এসব জাহাজের কাছে ভাস্কো দাগামা ও ক্রিস্টোফার কলাম্বাসের জাহাজ তো ডিঙি নৌকার মতো।
- মুসলিম স্পেন তথা আন্দালুসের আব্বাস ইবনে ফিরনাস প্রথম প্যারাস্যুট জাম্প করেছিলেন।
- এক হাজার বছর পূর্বের আব্বাস ইবসে ফিরনাস নামের এক স্বপ্নচারীর সফল উড্ডয়ন হয়ে লাগারী হাসান, আহমাদ চেলেবীর মতো মুসলিমদের উড়বার প্রচেষ্টার ক্রমবিকাশের ধারায় এ বিজ্ঞান লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চিসহ বহু পথ পাড়ি দিয়ে রাইট ব্রাদারদের কাছে পৌঁছে ছিল।
- ভ্যাকসিন নিয়ে বিশ্ব এখন তোলপাড়, কিন্তু এটার আদিতেও রয়েছে মুসলিমদের বিচরণ। আজ থেকে প্রায় ৩০০ বছর পূর্বে ইংল্যান্ডে প্রথম ভ্যাকসিন আনা হয় অটোমান তুর্কিদের থেকে।

- গোটা ইউরোপ জুড়ে যে গথিক ও রোমান স্থাপত্য শৈলী দেখা যায়, আদতে সেটাকে যদি ইসলামী স্থাপত্যের পশ্চিমা সংস্করণ বলা হয়, তবে তা মোটেও অতিরঞ্জন হবে না।
- হাতে থাকা মোবাইল ক্যামেরা নিয়ে প্রতিনিয়ত ছবির পর ছবি তুলছি, সেই ক্যামেরা শব্দই এসেছে আরবী '*কামারা*' থেকে এবং এর সাথে জড়িয়ে আছে ইবনুল হাইছামের নাম, যার দেয়া মূলনীতির উপর দাঁড়িয়ে আছে ক্যামেরার কার্যক্রম।
- চক্রাকার গতিকে সরলরৈখিক গতিতে রূপান্তরকারী এবং পাম্প ও ইঞ্জিনের জন্য মহাগুরুত্বপূর্ণ '*ক্রাংক ও সংযুক্ত রড সিস্টেম*' না হলে শিল্প বিপ্লব একেবারে অসম্ভব ছিল, আর এই একটি অবদানের জন্যই বর্তমান সময়ের হিসেবে আল-জাযারীর একাধিক নোবেল পাওয়ার কথা।
- অরেঞ্জ (*orange*), সুগার (*sugar*), জিরাফ (*giraffe*)-এর ন্যায় এমন বহু শব্দের উৎস আরবী ও ফারসি।

এমন বহু বিস্ময়কর তথ্যে ছেয়ে আছে এই বইয়ের প্রতি পাতা। রীতিমতো অবাক হওয়ার মতো বিষয়। গৃহ, বিদ্যালয়, বাজার, হাসপাতাল, নগর, বিশ্ব ও মহাবিশ্বসহ এই বই মোট ৯-টি বিভাগে বিভক্ত এবং এতে রয়েছে ৮৯-টি অধ্যায়। ৮৯-টি অধ্যায় এবং প্রাসঙ্গিক চিত্র ও মানচিত্র হয়ে আপনি হারিয়ে যাবেন এক রোমাঞ্চকর জগতে, যেখানে সৃজনশীলতা ও কর্মচাঞ্চল্য ছিল প্রধান চালিকাশক্তি। নতুনকে জানার অদম্য বাসনা তাড়িয়ে বেরিয়েছে সে জগতের মানুষদের।

"১০০১ মুসলিম আবিষ্কার" আপনাকে নিয়ে যাবে অজানার এক নতুন জগতে, বলতে গেলেঃ যার কিছুই আমরা তেমন জানি না; অথচ এটার শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে আধুনিক সভ্যতার গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি।

বর্তমানে মুসলিমদের অবস্থা যাই হোক না কেন, অবস্থা পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজন স্বপ্ন দেখা এবং সে স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেয়ার জন্য প্রয়োজন কঠোর শ্রমের। ***"১০০১ মুসলিম আবিষ্কার"*** আপনাকে সে স্বপ্ন দেখাবে। আপনাকে জানিয়ে দেবেঃ আপনার অতীত হতাশার কালো মেঘ নয়, বরং তা অন্য যেকোন সভ্যতার চেয়ে অগ্রগামী।

সৃজনশীল ও স্বপ্নচারী উদ্যমী মুসলিমগণ যেভাবে রচনা করেছিলেন সোনালি মহাকাব্য, সেটা ফিরিয়ে আনা সম্ভব, যদি আমাদের চিন্তাশীল একটা অংশ সে লক্ষ্যে শ্রম দিতে এগিয়ে আসে। এই বইয়ের শেষাংশে এ নিয়ে কিছু পর্যালোচনা থাকবে, আর সেখানেই আবার দেখা হবে – *ইনশাআল্লাহ*।

দেরী না করে চলুন হারিয়ে যাই উদ্যম ও সৃজনশীলতার এক সোনালি
অধ্যায়ে, আর জড়ো করি স্বপ্ন ও এগিয়ে যাওয়ার এক ফালি অভিলাষ।

ইমদাদ হোসেন
অনুবাদক, সম্পাদক ও লেখক
emdadhosien.com

পরিভাষা

বইটিতে বিভিন্ন শাস্ত্রের বহু পরিভাষা ব্যবহৃত হয়েছে। এসব পরিভাষার অনেকগুলোই সাধারণ পাঠকদের কাছে নতুন লাগতে পারে, সেজন্য যখনই কোনো পরিভাষা এসেছে, তখনই চেষ্টা করা হয়েছে ওই পরিভাষার প্রথম ব্যবহারের সাথে সাথে সেটার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরার। পরিভাষা অধ্যায়ে উল্লেখযোগ্য পরিভাষার সংক্ষিপ্ত পরিচিত একত্র করা হলো।

অক্সিডেশন : যে প্রক্রিয়াতে ইলেকট্রনের হ্রাস ঘটে।

অমূলদ : যেসব সংখ্যাকে ভগ্নাংশ আকারে প্রকাশ করা যায় না।

অয়নচলন : সূর্যের বিষুবরেখা অতিক্রমের সময়সীমা প্রতি বছর একটু করে এগিয়ে আসা।

অক্ষাংশ : পৃথিবীর গোলাকৃতি কেন্দ্র দিয়ে উত্তর-দক্ষিণে কল্পিত রেখা।

আন্দালুস : মুসলিম শাসিত স্পেন আন্দালুস নামে পরিচিত।

আস্তর্লাব : গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান নির্ণয়ের জন্য মধ্যযুগীয় যন্ত্রবিশেষ।

ঊর্ধ্বপাতন : যে প্রক্রিয়ায় কঠিন পদার্থকে তাপ দিলে তা সরাসরি বাষ্পে, ঠাণ্ডা করলে তা সরাসরি কঠিনে পরিণত হয়।

একপদী রাশি : যে রাশিতে কেবল একটি পদ থাকে।

করতাল বা মন্দিরা : বিশেষ এক ধরনের বাদ্যযন্ত্র।

কামশ্যাফট : দাঁতযুক্ত সঞ্চালন দণ্ড।

কোয়াডর‍্যান্ট : উচ্চতা মাপার জন্য ব্যবহৃত যন্ত্রবিশেষ।

কেয়ারি : বাগানের ছোট ছোট ডাল ও পাতা সাজানো।

কীলক : গজাল, পেরেক।

কৌনিক ছেদ : কোণকের পৃষ্ঠতলকে সমতল একটি তল দিয়ে ছেদ করলে প্রাপ্ত বক্ররেখা।

ক্র্যাংক : সামনে-পিছনে ঘোরানোর জন্য ইংরেজি 'এল' আকৃতির হাতলবিশেষ।

খিলান : ইট বা পাথরের অর্ধ-গোলাকার গাঁথনি।

গুটিবসন্ত : বিশেষ এক ধরনের রোগ।

গুণনীয়ক (উৎপাদক): একটি সংখ্যা অপর সংখ্যা দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য হলে দ্বিতীয় সংখ্যা প্রথম সংখ্যার গুণনীয়ক।

গোল্ডেন রেশিও : যদি কোনো রেখাকে বিভক্ত করা হয়, তবে বৃহত্তর অংশের তুলনায় ক্ষুদ্রতর অংশের অনুপাত সমগ্র অংশের সাপেক্ষে বৃহত্তর অংশের অনুপাতের সমান হবে এবং সে অনুপাত: ৮:১৩ বা ১.৬১৮।

গাছ কলম বা গ্রাফটিং: কৃত্রিম উপায়ে উদ্ভিদের বংশবৃদ্ধির বিশেষ প্রক্রিয়া, যেখানে এক উদ্ভিদের শাখা কেটে অন্য উদ্ভিদে সংযোজন করা হয়।

গথিক স্থাপত্য শৈলী : ইউরোপের শিল্প ইতিহাসে ত্রয়োদশ শতাব্দির মধ্যভাগ থেকে পঞ্চদশ শতাব্দি পর্যন্ত সময়কে গথিক শিল্পের সময় বলা হয়, স্থাপত্য শৈলী এই শিল্পের একটি অংশ।

গিয়ারিং : যান্ত্রিক যানের চালক অংশের ক্রিয়াকালাপ।

ঘনীভবন : বাষ্পকে শীতল করে তরল বানানোর প্রক্রিয়া।

চৌকাঠ : দরজা-জানালার চারপাশের ফ্রেম, যাতে পাল্লা বসানো হয়।

চিমনি : ধোঁয়া বের হওয়ার নলবিশেষ।

তোরণ : প্রবেশদ্বার, সিংহদ্বার।

ত্রিকোণমিতিক অনুপাত	: ত্রিভুজের তিনটি বাহুর দুটি দুটি করে নিয়ে ৬-টি অনুপাত পাওয়া যায়। এসব অনুপাত প্রকাশের জন্য ৬-টি অনুপাত [সাইন (*sine*), কোসাইন (*cosine*) ও ট্যানজেন্ট (*tangent*), স্যাকেন্ট (*secant*), কোস্যাকেন্ট (*cosecant*) ও কোট্যানজেন্ট (*cotangent*)] ব্যবহার করা হয়।
জ্যা	: বৃত্তের দুটো ভিন্ন বিন্দুর সংযোজক রেখা।
দশমিক পদ্ধতি	: যে সংখ্যা পদ্ধতিতে ০, ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯ কে ব্যবহার করা হয়।
দ্রাঘিমারেখা	: বিষুবরেখাকে ডিগ্রি, মিনিট ও সেকেন্ডে ভাগ করে প্রত্যেক ভাগবিন্দুর উপর দিয়ে উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত কল্পিত সকল রেখা।
নক্ষত্রশালা	: প্রক্ষিপ্ত আলোকবিন্দুর সাহায্যে সূর্য, গ্রহ এবং অন্যান্য মহাকাশীয় বস্তুর গতিবিধি পর্যবেক্ষণ কক্ষ।
পাতন	: তরল মিশ্রণ থেকে বাষ্পীভবন ও ঘনীভবনের মাধ্যমে উক্ত তরলের উপাদানগুলো পৃথক করা।
পরিস্রাবণ	: কঠিন ও তরল পদার্থের মিশ্রণ থেকে কঠিন পদার্থ আলাদা করার প্রক্রিয়া।
পাই	: বৃত্তের পরিধি ও ব্যাসের অনুপাত, যার মানঃ ৩.১৪।
প্রত্যর্থপত্র	: নির্দিষ্ট তারিখে নির্দিষ্ট অঙ্কের অর্থ কোনো বাহককে প্রদানের স্বাক্ষরিত প্রতিশ্রুতি
পাঁচিল	: প্রাচীর, দেয়াল।
প্রিজম	: স্বচ্ছ বস্তু, যার মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় আলো ৭-টি রঙে বিভক্ত হয়।
ফটক	: সদর দরজা, সিংহদ্বার।
বহুপদী রাশি	: যে রাশিতে দুটো পদ আছে।
বীম	: অনুভূমিক কাঠামো, যা ভার বহনে ব্যবহৃত হয়।
বিষুবরেখা	: পৃথিবীর ঠিক মাঝখান দিয়ে কল্পিত এ রেখা পূর্ব ও পশ্চিমে সমগ্র পৃথিবীকে বেষ্টন করে আছে।
বার্বার	: উত্তর আফ্রিকার একটি জাতি।
মানমন্দির	: পৃথিবী ও মহাকাশ পর্যবেক্ষণের জন্য নির্মিত বিশেষ গবেষণাগার।
মূলদ	: যেসব সংখ্যাকে ভগ্নাংশ আকারে প্রকাশ করা যায়।
মৌলিক সংখ্যা	: যেসব সংখ্যার কেবল দুটো উৎপাদক রয়েছে, যথাঃ ১ এবং ওই সংখ্যা নিজে।
মুর	: বার্বার ও স্পেনীয়দের মিশ্র মুসলিম জাতি।
রেনেসাঁ	: পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দিতে ইউরোপে সংঘটিত নবজাগরণ।
রয়েল সোসাইটি	: ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দে লন্ডনে প্রতিষ্ঠিত একটি বৈজ্ঞানিক সংঘ।
শামিয়ানা	: বস্ত্র নির্মিত অস্থায়ী ছাদবিশেষ।
সেক্সট্যান্ট	: সূর্য ও অন্যান্য গ্রহ-নক্ষত্রের উচ্চতা ও কৌণিক ব্যবধান নির্ণায়ক যন্ত্র।
স্ফটিক	: কঠিন পদার্থের এক বিশেষ রূপ, যেখানে পদার্থের কণাগুলো নির্দিষ্ট নিয়মে সজ্জিত থাকে।
সমভাবাপন্ন সংখ্যা	: দুটো ভিন্ন সংখ্যা এতই সম্পর্কযুক্ত যে, তাদের ধনাত্মক গুণনীয়কগুলি যোগ করলে যোগফল একটি সংখ্যার সমান হবে।
স্ক্রুপ	: হাতার মতো এক প্রকার যন্ত্র, যা দিয়ে কোনোকিছু উঠানো বা গর্ত করা হয়।
সরাইখানা	: পান্থশালা, হোটেল।
হুন্ডি	: নির্দিষ্ট দিনে পরিশোধের জন্য ব্যাংককে প্রদত্ত নির্দেশ।

মুসলিম সভ্যতার উল্লেখযোগ্য অবদানের মানচিত্র

সুদূর স্পেনের টলেডো থেকে আরব; ইন্দোনেশিয়া হয়ে চীন; দক্ষিণে একেবারে পূর্ব আফ্রিকা – তিনটি বৃহৎ মহাদেশ জুড়ে ছিল মুসলিম বিশ্ব তথা দারুল ইসলামের সীমানা। আব্বাসী শাসকদের অধীনে মুসলিম সভ্যতা তার চূড়ায় পৌঁছে ছিল। মধ্যপ্রাচ্য এবং স্পেনের শহরগুলি পরিণত হয়েছিল সংস্কৃতি, বাণিজ্য এবং জ্ঞানার্জনের বিশ্বকেন্দ্রে। সেখানের সহনশীলতা ও সৃজনশীলতার পরিবেশ চিকিৎসা, প্রকৌশল, দর্শন, গণিত, জ্যোতিষশাস্ত্র এবং স্থাপত্যশিল্পে যুগান্তকারী অগ্রগতির দুর্বার সূচনা এনেছিল। এই অগ্রগতি কোথায় এবং কখন সংঘটিত হয়েছিল, তা নিম্নের মানচিত্রে দেখুন।

বিশ্ব মানচিত্র
আল-ইদরিসী (১০৯৯-১১৬৬)
সিসিলির নরমান রাজা দ্বিতীয় রজার একটি মানচিত্র প্রস্তুতের জন্য আল-ইদরিসীকে নিযুক্ত করেন। তিনি ৭০-টি মানচিত্র সম্বলিত *কিতাব রুজার* গ্রন্থ রচনা করেন এবং তাতে দেখান যে, পৃথিবী গোলাকৃতির, যা মুসলিম পণ্ডিতদের মাঝে অতীব সাধারণ একটি ধারণা ছিল।

গথিক পাঁজরাকৃতি ছাদ (১০০০)
টলেডো ও কর্ডোবা মসজিদের পাঁজরাকৃতি ছাদ ইউরোপীয় স্থাপত্যবিদ ও তাদের পৃষ্ঠপোষকদের উদ্বুদ্ধ করে রোমান ও গথিক স্থাপত্য রীতিতে সে ধরনের নির্মাণ কৌশল অবলম্বন করতে।

সার্জারির উপকরণ
আয-যাহরাবী (৯৩৬-১০১৩)
অতিশয় উদ্ভাবনী সার্জন আয-যাহরাবী প্রায় দু'শরও অধিক সার্জিকাল যন্ত্রের প্রচলন করেন, যা চিকিৎসা শাস্ত্রে বিপ্লব সৃষ্টি করে। একবিংশ শতাব্দির হাসপাতালগুলোতেও এসব যন্ত্র সেকেলে মনে হয় না।

মস্কো
লন্ডন
প্যারিস
ইস্তাম্বুল
টলেডো
কর্ডোবা
গ্রানাডা
তিউনিস
সিসিলি
দিয়ারবাকি
তানজাহ
ফেয
দামেস্ক
জেরুজালেম
কায়রো
তিমবাকতু

ভ্রমণ
ইবনে বতুতা (১৩০৪-১৩৬৮/৭০)
আধুনিক হিসেবে ৪০-টিরও অধিক দেশে ইবনে বতুতা ২৯ বছরে ৭৫,০০০ মাইলেরও বেশি ভ্রমণ করেন এবং রচনা করেন মধ্যযুগীয় বিশ্বের প্রথা ও রীতিনীতি সম্বলিত অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ।

সমাজবিজ্ঞান ও অর্থনীতির ভিত্তি
ইবনে খালদুন (১৩৩২-১৪০৬)
ইবনে খালদুন মানব সমাজের উত্থান ও পতনের তত্ত্বকথাকে একটি বিজ্ঞান হিসেবে উপস্থাপন করেন। এই তত্ত্বগুলোকে তিনি তার বিখ্যাত *আল-মুকাদ্দিমা* বা বিশ্ব ইতিহাস গ্রন্থের ভূমিকায় লিপিবদ্ধ করেন, যে গ্রন্থটি সমাজবিজ্ঞান ও অর্থনীতির ভিত্তি হিসেবে গণ্য হয়।

নাল আকৃতির খিলান (৭১৫)
ঘোড়ার ক্ষুরের নালের মতো দেখতে এই খিলান সর্বপ্রথম দামেস্কের উমাইয়া মসজিদে ব্যবহৃত হয়। ব্রিটেনে এটা মুর-দের খিলান নামে পরিচিত এবং ভিক্টোরিয়ান যুগে বেশ জনপ্রিয়তা পায়; এ ধরনের ডিজাইন রেলওয়ে স্টেশনের প্রবেশিকাতে সাধারণত ব্যবহৃত হতো।

আন-নূরী হাসপাতাল (১১৫৬)
হাসপাতালগুলি সকলকে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা দিতো। আন-নূরী ছিল সুবিশাল ও অত্যাধুনিক হাসপাতাল, যেখানে ঔষধ বিক্রেতা, নাপিত, অর্থোপিডিক, চক্ষু বিশেষজ্ঞ এবং চিকিৎসকগণের সবাই সর্বোচ্চ মানের সেবা দিচ্ছে কিনা সেটা নিশ্চিতের জন্য 'বাজার পরিদর্শকগণ' তাদের পরিদর্শন করতো।

রক্ত সঞ্চালন
ইবনে আন-নাফীস (১২১০-১২৮৮)
মিশরের ইবনে আন-নাফীসই প্রথম শিরার রক্তের ফুসফুসীয় সঞ্চালনের বর্ণনা দেন, যা নিলয় নামক হৃদপিণ্ডের ফাঁপা অংশের মধ্য দিয়ে হৃদপিণ্ড ও ফুসফুস অতিক্রম করে এবং অক্সিজেনসমৃদ্ধ ও ধমনীবাহিত রক্তে পরিণত হয়। এই আবিষ্কারের স্বীকৃতি অবশেষে ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে তাকে দেয়া হয়।

সূচাগ্র খিলান
(নবম শতাব্দি)
গথিক স্থাপত্য শৈলীর ভিত্তি সূচাগ্র খিলানের ধারণা ইউরোপে প্রবেশ করে সিসিলির আমালফি বণিকদের মাধ্যমে। এটা ছিল মিশরের কায়রো শহরে অবস্থিত চমৎকার ইবনে তুলুন মসজিদের স্থাপত্য শৈলীর অনুকরণ। রোমান খিলানের সমস্যা সমাধানে এটা ইউরোপীয় স্থাপত্যবিদদের সক্ষম করে।

ক্যামেরা অবস্কিউরা
ইবনুল হাইছাম (৯৬৫-১০৩৯)
অন্ধকার কক্ষে (আরবীতে কামারা) ইবনুল হাইছাম লক্ষ্য করেন যে, জানালার শাটারগুলির ছোট ছিদ্র দিয়ে আসা আলো বিপরীত পাশে থাকা দেয়ালের উল্টো ছবি তৈরি করে। সেদিনের এই পিনহোল ক্যামেরাই আজকের ক্যামেরার পথিকৃৎ।

মোখা

দুর্গ (১২শ শতাব্দি)
সিরিয়া ও জেরুজালেমের দুর্গগুলির দুর্ভেদ্য ডিজাইন পশ্চিমা দেশগুলোতে অনুসৃত হয়, যাতে বৃত্তাকার টাওয়ার, তীর নিক্ষেপের সংকীর্ণ ফাঁক, রক্ষণস্তম্ভ, গরম জল বা ভারী পাথর নিক্ষেপের রক্ষণ পাঁচিল, নিরাপত্তা পাঁচিল, তীর চালানোর ছিদ্রবিশিষ্ট প্রাচীর ইত্যাদি বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত ছিল।

পানি-উত্তোলনের যন্ত্র
আল-জাযারী (১৩শ শতাব্দির শুরুর দিক)
আল-জাযারীর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান হচ্ছে: ক্র্যাংক (*crank*) এবং সংযুক্ত রড সিস্টেম, যা চক্রাকার গতিকে সরলরৈখিক গতিতে রূপান্তরিত করে। তার এই যন্ত্র শক্তি প্রয়োগ ছাড়াই বিপুল পরিমাণ পানি উত্তোলনে সক্ষম ছিল।

রসায়ন (৭২২-৮১৫)
এই সময় নানা রাসায়নিক উপকরণ ও প্রক্রিয়ার উদ্ভাবন ও সমৃদ্ধি ঘটে, যার উপর দাঁড়িয়েছে আছে আজকের রসায়ন। জাবির ইবনে হাইয়ান কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ এসিড আবিষ্কার করেন, যেমন: সালফিউরিক, নাইট্রিক ও নাইট্রোমিউরাটিক এসিড। অন্যদিকে আর-রাযী অত্যাধুনিক ল্যাবরেটরি নির্মাণের পাশাপাশি ধাতু গলানো ও পাতন যন্ত্রের ন্যায় ২০-টিরও বেশি যন্ত্রের ডিজাইন তৈরি করেন।

ট্রিক ডিভাইস (৯ম শতাব্দি)
তুখোড় গণিতজ্ঞ বনী মূসার তিন ভাই গ্রিক বৈজ্ঞানিক লেখনীগুলো অনুবাদে আর্থিক সহায়তা প্রদান করেন; এর পাশাপাশি তারা অবিশ্বাস্য রকমের কিছু ট্রিক ডিভাইস উদ্ভাবন করেন, যেগুলো কারো কারো মতে আজকের দিনের দামি খেলনার পূর্বরূপ ছিল।

বায়তুল হিকমা (৮ম – ১৪শ শতাব্দি)
সুবিশাল এই বৈজ্ঞানিক একাডেমি ছিল চার প্রজন্মের খলীফাদের উদ্ভাবন, যারা শ্রেষ্ঠ মুসলিম পণ্ডিতদের একত্র করেছিল। এটা শিল্পকলা, ইতিহাস, দর্শন এবং বিজ্ঞানের এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী শিক্ষাকেন্দ্র ছিল, যেখানে বৈষয়িক জ্ঞানের এক অতুলনীয় সংগ্রহের স্তুপ গড়ে উঠে এবং সমৃদ্ধ হয়।

ক্রিপ্টলজি (সাংকেতিক বার্তা)
আল-কিন্দী (৮০১-৮৭৩)
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ত্রুটি শনাক্তকারীগণ কোড ভাঙার যে পন্থা অবলম্বন করেছিলেন, সে ব্যাপারে বহু শাস্ত্রে পারদর্শী বাগদাদের আল-কিন্দীই প্রথম কলম ধরেছিলেন, যখন তিনি ফ্রিকুয়েন্সি পর্যবেক্ষণের বিবরণ নিয়ে আলোচনা করেন এবং তিনিই ক্রিপ্টগ্রাফির ভিত্তি স্থাপন করেন।

পাতন
জাবির ইবনে হাইয়ান (৭২২-৮১৫)
চোলাই পাতনযন্ত্র ব্যবহার করে জাবির ইবনে হাইয়ান পাতন প্রক্রিয়াকে পূর্ণতা দান করেন, যেটা আজকের দিনেও ব্যবহৃত হয়। মুসলিম বিশ্ব চিকিৎসায় ব্যবহারের জন্য গোলাপজল, গন্ধসার তৈল এবং নিখাঁদ অ্যালকোহল উৎপন্ন করে। প্লাস্টিক থেকে শুরু করে গাড়ির তেল পর্যন্ত বহু পণ্যই আমরা আজকের দিনে পাতনের বদৌলতে পাচ্ছি।

খাওয়ারিযম
কাবুল
বাগদাদ
কুফা
দিল্লি
পাটনা
ক্যান্টন
মোচা

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2-4ac}}{2a}$$

আল-জেবরা (বীজগণিত)
আল-খাওয়ারিযমী (৭৮০-৮৫০)
আল-খাওয়ারিযমীর হাত ধরেই আল-জেবরা তথা বীজগণিতের সূত্রপাত ঘটে। পরবর্তীতে এর আরও বিকাশ ঘটে, যা আজও ব্যবহৃত হয়।

শ্যাম্পু
শেক দীন মুহামেদ (১৮শ শতাব্দি)
ভারতের পাটনার শেক দীন মুহামেদ ব্রিটেনের ব্রিংগটনে প্রথম শ্যাম্পু ব্যবহারের প্রবর্তন করেন, যিনি রাজা চতুর্থ জর্জ এবং রাজা চতুর্থ উইলিয়ামের *'শ্যাম্পু সার্জন'* ছিলেন।

কফি (৮ম শতাব্দি)
ছাগলপালের রাখাল খালিদ লক্ষ্য করে যে, তার অস্থির প্রাণিগুলি লাল বরই খেয়ে নিয়েছে। এখানেই আরবী পানীয় কাহওয়ার সূচনা। পনের'শ শতাব্দিতে মুসলিম বিশ্বে কাহওয়া পানের প্রচলন হয়। তারপর বণিকদের মাধ্যমে ১৬৩৭ খ্রিস্টাব্দে তা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে।

৭ম শতাব্দি থেকে শুরু করে মুসলিম সভ্যতা যেসব ভূমিতে পরিব্যাপ্ত ছিল।

প্রথম অধ্যায়

"সত্যকে মূল্যায়ন করা এবং সত্য যেখান থেকেই আসুক না কেন, তা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে আমাদের লজ্জিত হলে চলবে না, এমনকি তা যদি দূরের কোনো গোষ্ঠী বা আমাদের চেয়ে ভিন্ন কোনো জাতিরও হয়ে থাকে।"

– আল-কিন্দী, ৯ম শতাব্দির মুসলিম পণ্ডিত
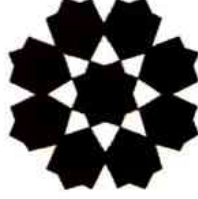
গল্পের সূচনা

সোনালি যুগ – মুসলিম সভ্যতার ক্রমবিকাশের সময়ক্রম

প্রাচীন রোমের পতনের পর কেটে যায় শতাব্দির পর শতাব্দি। পশ্চিম ইউরোপে বৈজ্ঞানিক সমৃদ্ধি তখন একেবারে স্থবির। অন্যদিকে ৭ম শতাব্দি থেকে সতেজভাবে বেড়ে উঠতে থাকে উদ্ভাবনের এক সোনালি যুগ। উদ্ভাবন ও সৃজনশীলতার এ সোনালি সময় চলতে থাকে ১৬শ শতাব্দি পর্যন্ত।

হ্যাঁ – এটা মুসলিম সভ্যতারই কথা।

সৃজনশীলতার এই সময়ে মুসলিম বিশ্বে থাকা নানান বিশ্বাস ও সংস্কৃতির বিদ্বানেরা প্রাচীন মিশর, মেসোপটেমিয়া, পারস্য, চীন, ভারত, গ্রিক ও রোমানদের থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান নতুনভাবে নির্মাণ করতে থাকে এবং একে একে উপহার দিতে থাকে অভূতপূর্ব সব সাফল্য, যা ইউরোপীয় রেনেসাঁর পথ দারুণভাবে মসৃণ করেছিল।

গণিতজ্ঞ, জ্যোতির্বিদ, রসায়নবিদ, চিকিৎসক, স্থাপত্যবিদ, প্রকৌশলী, অর্থনীতিবিদ, সমাজবিজ্ঞানী, শিল্পী, কারিগর, ইতিহাসবিদ, ভূবিজ্ঞানী এবং শিক্ষাবিদ – অতীতের মহান পুরুষ ও নারীগণ সমাজ এবং মানবতার জন্য উপকারী অবদান রেখে নিজেদের ঈমান ও বিশ্বাসের স্বাক্ষর রেখেছিলেন। উদারচিত্তেই তারা এমনটি করেছিলেন এবং বহু ক্ষেত্রেই তারা ভিন্নতর বিশ্বাস, সংস্কৃতি ও পরিবেশের মানুষদের সাথে সহযোগিতা বজায় রেখেছিলেন।

মুসলিম সভ্যতার সোনালি যুগের প্রতিভাধর নারী ও পুরুষদের গল্প এখন আপনি উন্মোচন করতে পারবেন এবং তাদের উদ্ভাবনগুলো কীভাবে আমাদের জীবনযাত্রাকে আজকের রূপ দিয়েছে, তা আবিষ্কার করতে পারবেন।

উল্টো পৃষ্ঠার চিত্র: ১৩শ শতাব্দিতে আল-জাযারী কর্তৃক নির্মিত জলচালিত হাতি-ঘড়ির একটি নতুন সংস্করণ।

সোনালি যুগ

গ্রন্থটি মুসলিম সভ্যতার বৈজ্ঞানিক ঐতিহ্য – তত্ত্ব, উদ্ভাবন, ডিভাইস, কলা-কৌশল এবং প্রথম উদ্ভূত চিন্তা থেকে শুরু করে মুসলিম জ্ঞান-বিজ্ঞান ও মনীষার যুগে গৃহীত, সমৃদ্ধ এবং সর্বত্র ছড়িয়ে পড়া আবিষ্কারসমূহের দিকে দৃষ্টিপাত করেছে।

গৃহ, বিদ্যালয়, হাসপাতাল, বাজার, শহর, বিশ্ব এবং মহাবিশ্ব – সাত বিভাগে বিভক্ত এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য হচ্ছে: বিজ্ঞানের সাংস্কৃতিক শেকড় উন্মোচন করা, যেন আমাদের আজকের বিশ্বে বুদ্ধিবৃত্তিক সম্মান এবং মূল্যায়নের রীতিকে আরও বিকশিত করা যায়।

■ গৃহ

গৃহ অধ্যায়ে আপনি হাজার বছরের পুরোনো উদ্ভাবনের সাথে পরিচিত হবেন, যেগুলো আজও আমাদের দৈনন্দিন জীবনকে রূপ দিয়ে যাচ্ছে। দাবা থেকে ক্যামেরা, আমাদের আজকের গৃহগুলো এমনসব জিনিসে ঠাসা রয়েছে, খোঁজ করলে যার মূল পাওয়া যাবে মুসলিম সভ্যতাতে।

দাবা মূলত ৯ম শতাব্দিতে ভারত হয়ে পারস্যের রাজদরবার থেকে উদ্ভূত হয় এবং তা মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। এমনকি আজকের দিনের দাবা প্রতিযোগিতায় খেলার শেষ বোঝাতে 'চেকমেট' নামে যে শব্দটি ব্যবহৃত হয়, সেটাও পারস্যের *শাহমাত* শব্দ থেকে আগত, যার অর্থ: 'রাজা পরাস্ত হয়েছে।'

তিন বেলা খাবারগ্রহণের এই নয়া প্রবণতার অন্যতম একটি উৎস হচ্ছে মুসলিম স্পেন। মুসলিম সভ্যতার অন্যান্য নতুন ভাবনার মধ্যে রয়েছে: চড়া দামের কার্পেট এবং ফাউন্টেন পেনের মতো উদ্ভাবনকুশলী জিনিস। ১৩শ শতাব্দির প্রকৌশলী আল-জাযারী কর্তৃক উদ্ভাবিত বিস্ময়কর যান্ত্রিক ঘড়ি তার উদ্ভাবিত বহু আবিষ্কারের একটি।

১৪শ শতাব্দির শুরুর দিকে বিপুল পরিমাণ মসলা মিশর এবং সিরিয়া থেকে ইউরোপে আমদানি হয়। ১৭শ শতাব্দিতে বাণিজ্যের মাধ্যমে ইউরোপে আসার বহু আগেই বছরের পর বছর মুসলিম বিশ্বের আনাচে-কানাচে কফি পানের রীতি ছড়িয়ে পড়ে।

■ বিদ্যালয়

জ্ঞানের সমৃদ্ধি ও বিস্তৃতিতে মুসলিম সভ্যতার যে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রয়েছে, বিদ্যালয় নামের এই অধ্যায় তারই কাহিনী। গণিত, বিজ্ঞান, শিল্প, ভাষা ... যে বিষয়েই আপনি সবচেয়ে বেশি আগ্রহবোধ করেন না কেন, সেটার সাথেই আপনি সুদূর অতীত ও সেকালের মানুষের সম্পর্ক খুঁজে পাবেন, যেমন: ৯ম শতাব্দির বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পৃষ্ঠপোষক ফাতিমা আল-ফিহরী এবং ৮ম শতাব্দির শেষ দিকের রসায়নবিদ জাবির ইবনে হাইয়ান, যার উদ্ভাবন আজও সজীব হয়ে আছে।

৮ম ও ৯ম শতাব্দির রসায়নবিদগণ উদ্ভিদ ও ফুল থেকে সুগন্ধি তৈরি করতেন, যে প্রক্রিয়াটি রসায়নের আরও অনেক সমৃদ্ধির সাথে সাথে ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। গণিতের পণ্ডিতগণ শূন্যের ধারণা এবং দশমিক পদ্ধতির গাণিতিক নিয়ম চালু করেন, যা আজকের দিনেও আমরা ব্যবহার করছি। তারা ফুল এবং ঝিনুকের কারুকার্যে জটিল জ্যামিতিক নকশা চিহ্নিত করেন, পরবর্তীতে যা স্থাপত্যশিল্প এবং শোভাবর্ধন শিল্পের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ নকশাতে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে।

বায়তুল হিকমার মতো মর্যাদাপূর্ণ একাডেমি এবং লাইব্রেরির গোড়াপত্তন প্রায় একহাজার বছর আগে বাগদাদে হয়েছিল। সেখানে মুসলিম, খ্রিস্টান এবং ইহুদি পণ্ডিতগণ জ্ঞানভাণ্ডারের অনুবাদ এবং বৈজ্ঞানিক বিতর্ক ও আবিষ্কারকে

উৎসাহিত করার ক্ষেত্রে একে অপরকে সহযোগিতা করেন।

কায়রো থেকে তিমবাকতুর শহর-নগরগুলোতে বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা রাতারাতিভাবে বেড়ে যায় এবং ফাতিমা আল-ফিহরী নামের এক মহীয়সী নারী তার নিজ সম্প্রদায়ের জন্য সম্পূর্ণ নিজের খরচে মরক্কোর ফেয শহরে একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। বিশ্বের প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে পরিচিত আল-কায়রাওয়ান আজও ছাত্রদেরকে ডিগ্রি দিয়ে যাচ্ছে।

■ বাজার

মুসলিম সভ্যতা থেকে যেসব প্রভাবশালী ধারণা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে, বাজার নামক এই অধ্যায় তারই পর্যবেক্ষণ করবে। শক্তি, খাদ্য উৎপাদন এবং আজকের দিনের পরিচিত বহু পণ্য উৎপাদনের নানা অভিনব ভাবনা ও চিন্তার সৃজনশীল আদান-প্রদানকে উৎসাহিত করে মুসলিম বিশ্বে ৮ম শতাব্দি থেকে বাণিজ্য ও পর্যটনের এক গুঞ্জরিত নেটওয়ার্ক গড়ে উঠেছিল এবং বিকশিত হয়েছিল।

বাণিজ্য সম্প্রসারণের সাথে সাথে জ্ঞান ও সমৃদ্ধিরও সম্প্রসারণ ঘটে। আফ্রিকা, এশিয়া এবং ইউরোপের বণিক, শাসক এবং হজ্জযাত্রীগণ নিজেদের সাথে করে ধন-সম্পদ ও নতুন সব ধারণা নিয়ে যেত। সিল্ক রোড মধ্যপ্রাচ্য ও ইউরোপের সাথে চীনকে সংযুক্ত করে প্রায় হাজার মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

মালাগা ও আলেকজান্দ্রিয়ার সমৃদ্ধ বন্দরগুলোর মাধ্যমে সমুদ্র বাণিজ্য চলতো। ব্যস্ত এই বাজারগুলিতে বণিকগণ হেরাত থেকে রেশমি কাপড়, দামেস্ক থেকে কার্পেট এবং স্পেন থেকে ফলের সমাহার ঘটাতো। বণিক, শাসক, হজ্জযাত্রীগণ আফ্রিকা, এশিয়া ও ইউরোপের নানা শহরের বিভিন্ন জনপ্রিয় স্থানের কাফেলা বা সরাইখানাগুলোতে বিশ্রাম নিতো। বিনামূল্যে আশ্রয়, খাবার এবং কখনো কখনো বিনোদন প্রদানের মাধ্যমে এসব মুসলিম দাতব্য সংস্থা বাণিজ্যের প্রসারে ব্যাপক ভূমিকা পালন করেছিল।

১০ম শতাব্দির ভূবিজ্ঞানী, পর্যটক ও ঐতিহাসিক আল-মাসউদী প্রাথমিক সময়ের মুসলিম সভ্যতাতে খাদ্য উৎপাদনে ব্যাপক সমৃদ্ধি লক্ষ্য করেন। সে সময়ে বিভিন্ন শস্য এবং এগুলো উৎপাদনের জ্ঞান সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে – এমনকি স্পেনে পীচ ফল, বেগুন ও কমলার ফলন পর্যন্ত হতো। গাছ কলম এবং পালাক্রমিক ফলন কৃষি ক্ষেত্রে উৎপাদন এবং বৈচিত্র যোগ করে। অন্যদিকে ১৬শ শতাব্দির উছমানী (অটোমান) প্রকৌশলী তাকিউদ্দীন ইবনে মারুফের উদ্ভাবিত পানির পাম্পের সাহায্যে সেচকাজ বেশ সহজ হয়ে উঠে।

■ হাসপাতাল

হাসপাতাল শীর্ষক অধ্যায়ে আপনি বিভিন্নভাবে দেখবেন যে, মুসলিম সভ্যতার চিকিৎসা জ্ঞান ও চিকিৎসা সেবা আমাদের আজকের চিকিৎসা ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করেছে। প্রাচীন জ্ঞান ও নতুন অনুসন্ধান থেকে তৈরি বৈচিত্রময় ঔষধ ও পথ্যের এক ক্রমবর্ধমান সরবরাহ দিয়েছিল প্রাথমিক দিকের এই মুসলিম সভ্যতা, যেখানে গড়ে উঠেছিল উন্নত স্বাস্থ্য সেবা, সার্জারি ও হাসপাতাল।

প্রাথমিক দিকের মুসলিম সমাজে রোগীরা হয়ত বড়ি, চুষে খাওয়ার বড়ি, সিরাপ, পাউডার ইত্যাদি ব্যবহার করে থাকতে পারেন; সার্জারির অভিজ্ঞতা লাভ, এমনকি তাদের চোখের ছানি পর্যন্ত দূর করা হয়ে থাকতে পারে। মুসলিম সহকর্মীদের নজরে সম্মানিত নেস্তোরিয়ান খ্রিস্টান হুনাইন ইবনে ইসহাকের মতো পণ্ডিতগণ ৯ম শতাব্দিতে চোখের বিস্তারিত বিবরণ সম্বলিত ডায়াগ্রাম প্রস্তুত করেন। ১১শ শতাব্দিতে এই জ্ঞান ইবনুল হাইছামের হাত ধরে উচ্চতার চূড়ায় আরোহণ করে। তিনি আলোক-বিজ্ঞানের তত্ত্বসমূহের সুদৃঢ় ভিত্তি দাঁড় করান।

> "যে জাতির অধিকাংশ লোক যাযাবর, সে জাতি গম ও ভুট্টা বপন করা ছাড়া আর কোনো কৃষি পদ্ধতি জানতো, এটা স্বীকার করা বেশ কঠিন ... তবে আমরা যদি প্রাচীন পাণ্ডুলিপিগুলো উল্টানো ও পর্যালোচনার কষ্টটুকু করি, [নিশ্চিতভাবে] আমাদের অসংখ্য ধারণাই বদলে যাবে।"
>
> – অগাস্ট শারবোনো, অনুবাদক

১০ম শতাব্দির সার্জন আয-যাহরাবী সার্জারির বহু উপকরণ প্রস্তুত করেন, যা আজও আমরা ব্যবহার করি। অন্যদিকে ১১শ শতাব্দির চিকিৎসক ও দার্শনিক ইবনে সীনা একাধারে চিকিৎসা, দর্শন ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের শিক্ষক ছিলেন। ভাঙা অস্থি চিকিৎসার পদ্ধতিসমূহ তিনি উদ্ভাবন করেন, যা চিকিৎসকেরা আজও মেনে চলে। এসব পণ্ডিত এবং মুসলিম সভ্যতার অন্যসব পণ্ডিতের লেখা চিকিৎসাশাস্ত্রীয় গ্রন্থগুলো শতাব্দিকাল ধরে ইউরোপীয় চিকিৎসা বিদ্যাকে প্রভাবিত করে রেখেছিল।

■ নগর

স্থাপত্য শিল্পের ক্ষেত্রে মুসলিম সভ্যতা ও আধুনিক বিশ্বের মধ্যে যে মিল পাওয়া যায়, নগর নামক এই অধ্যায় সেটারই অনুসন্ধান করবে। গম্বুজ, ধনুকাকৃতি ছাদ, খিলান এবং টাওয়ার বা সুউচ্চ দালান – এসব ক্ষেত্রে মুসলিম স্থাপত্য শিল্প ব্যাপকভাবে যে সকল নতুন ধারণার প্রদর্শন করেছিল, সেগুলোর অধিকাংশই গোটা বিশ্ব জুড়ে পুনঃব্যবহৃত হয়েছে। পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে স্থাপত্য ও শোভাবর্ধক ধারণা ও তত্ত্বসমূহের মধ্যে শত শত বছরের বেশি সময় ধরে যে আদান-প্রদানের দীর্ঘস্থায়ী ঐতিহ্য রয়েছে, সেটা একেবারে স্পষ্ট।

দক্ষ স্থপতি সিনান ১৬শ শতাব্দিতে ইস্তাম্বুলে ভূমিকম্প প্রতিরোধক গম্বুজবিশিষ্ট সুলেমানিয়া মসজিদ নির্মাণ করেন এবং বহির্গত বাতাস থেকে ধোঁয়াকে পরিষ্কার করার জন্য পরিশোধন কক্ষ এবং কালি বানানোর জন্য ধোঁয়া থেকে কালির গুঁড়া সংগ্রহের সুবিধাসহ মসজিদের অভ্যন্তরীণ নকশা করেন।

হাজার বছর আগের নগরগুলোর কেন্দ্রে থাকতো মসজিদ, বাজার ও গণ-হাম্মামখানা; এগুলো আবাসিক এলাকা দ্বারা বেষ্টিত হতো। ইট বা পাথরে আবৃত রাস্তা, আবর্জনা রাখার পাত্র (ডাস্টবিন), ঢাকা পয়ঃপ্রণালী এবং কোনো কোনো স্থানে আলোকসমৃদ্ধ রাস্তা ... ইত্যাদি সুবিধাসহ বিস্ময়করভাবে মুসলিম সভ্যতার নগরগুলো কতটা অগ্রগামী ও উন্নত ছিল, তা একবার ভেবে দেখুন এবং নিজের চোখে আবিষ্কার করুন।

■ বিশ্ব

মুসলিম সভ্যতার ভূবিজ্ঞানী, নাবিক, পর্যটক এবং পণ্ডিতগণ মানচিত্র তৈরি থেকে শুরু করে যেভাবে আমরা আজকের দুনিয়াকে দেখি, সেটাকে পর্যন্ত তারা কীভাবে প্রভাবিত করেছিল, তা আপনি এই অধ্যায়ে আবিষ্কার করবেন। রংধনু, পৃথিবীর পরিধি পরিমাপ এবং কীভাবে পাহাড় গঠিত হয়, এগুলোর ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের প্রচেষ্টা দ্বারা হাজার বছর আগে মুসলিম পণ্ডিতগণ পৃথিবীকে বোঝার ক্ষেত্রে নিজেদের পর্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধানে অন্তর্জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টির এক উজ্জ্বল স্বাক্ষর রাখেন।

অসাধারণ প্রতিভাধর পর্যটকগণ আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের ওই যুগের একটা সৌরভ এনে দেয়, যেমন: ইবনে বতুতা, যিনি মক্কাতে হজ্জ পালনের জন্য ১৩২৫ খ্রিস্টাব্দে গৃহ ত্যাগ করেন এবং মুসলিম বিশ্বের শেষ সীমা পর্যন্ত ভ্রমণ করে প্রায় তিন যুগ পরে আপন গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন; অথবা যেং হো-র মতো চীনা মুসলিম নৌ-সেনাপতি, যিনি ১৫শ শতাব্দিতে বিশাল কাঠের জাহাজে অজানিতের সন্ধানে সাতটি সমুদ্রযাত্রার নেতৃত্ব দেন।

ওই যুগের অগ্রনায়কদের রেখে যাওয়া মানচিত্রগুলোও আমরা পর্যবেক্ষণ করতে পারি, যেমন: মরক্কোর পণ্ডিত আল-ইদরিসীর আঁকা বিশ্ব মানচিত্র, যিনি মার্কো পোলো কিংবা কলাম্বাসের শতবর্ষ আগেই এটা প্রস্তুত করেন; এবং ১৬শ শতাব্দির তুর্কি নৌ-সেনাপতি পিরি রেইসের আঁকা সর্বপ্রাচীন বিস্তারিত মানচিত্র, যেখানে আমেরিকাকে দেখানো হয়েছে।

■ মহাবিশ্ব

সবশেষে, মুসলিম জ্যোতির্বিদ, প্রকৃতি দার্শনিক এবং যন্ত্র কারিগরগণ কীভাবে আমাদের মহাবিশ্ব সম্পর্কিত জ্ঞানকে সম্প্রসারিত করেছিলেন, মহাবিশ্ব নামক এই অধ্যায় সেটাই পর্যালোচনা করবে। মারইয়াম আল-ই'জলিয়ার মতো কারিগরগণ জ্যোতিষশাস্ত্রীয় যন্ত্রাদি নির্মাণ ও পুনর্নির্মাণ করতেন, যিনি ১০ম শতাব্দিতে উত্তর সিরিয়ার আলেপ্পোর শাসকের জন্য আস্তর্লাব নির্মাণ করেন। ১৬শ শতাব্দিতে জ্যোতির্বিদ তাকিউদ্দীন পরিমাপের নির্ভুলতা বৃদ্ধির জন্য কোয়াডর‍্যান্ট ও সেক্সট্যান্টের মতো বৃহদাকৃতির নক্ষত্র পর্যবেক্ষণ যন্ত্র ব্যবহার করতেন।

মুসলিম বিশ্বে প্রথমবারের মতো বিশালাকার মানমন্দির ১১শ শতাব্দির শেষের দিকে ইস্পাহানের সুলতান মালিক শাহ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৩শ শতাব্দির ইরানের প্রভাবশালী মারাগা মানমন্দির ছিল একটি বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান, যেখানে জ্যোতির্বিদগণ মহাবিশ্ব সম্পর্কে পূর্বের জ্যোতির্বিদদের প্রাপ্ত জ্ঞানসমূহ যাচাই করতেন এবং নিত্য-নতুন গাণিতিক মডেল তৈরি করতেন, যেগুলোর উপর রেনেসাঁ যুগের পণ্ডিতগণ নির্ভর করতো।

পূর্বের জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে এবং সেটাতে নতুন পর্যবেক্ষণ ও অন্তর্দৃষ্টি সংযোজনের মাধ্যমে জ্যোতির্বিজ্ঞানে মুসলিম পণ্ডিতগণ আমাদের জন্য পূর্ব ও পশ্চিমের এক যৌথ ঐতিহ্য রেখে গেছেন, যা আজও তারকা ও নক্ষত্রপুঞ্জের গ্রিক ও আরবী নামসমূহে বারবার উচ্চারিত হয়।

■ মুসলিম সভ্যতা: কোথায় এবং কখন ?

৬৩২ খ্রিস্টাব্দে নবী মুহাম্মদ (ﷺ)-এর ইন্তেকালের পর খলীফাগণ আসেন এবং তারা নবী (ﷺ)-এর পর এমন এক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন, যা উত্তর আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্য হয়ে দক্ষিণ স্পেন থেকে শুরু করে ভারত এবং চীন পর্যন্ত বিস্তৃত এবং ১৫শ শতাব্দিতে তা ইন্দোনেশিয়া ও পূর্ব ইউরোপের সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। মুসলিম সাম্রাজগুলো সাধারণত অন্যসব ধর্ম ও বিশ্বাসের প্রতি সহনশীল ছিল। এখানকার অধিবাসীগণ এটা প্রত্যক্ষ করে যে, মুসলিম খলীফাগণ তাদের শাসিত অঞ্চলে জ্ঞান ও সমৃদ্ধির বিস্ময়কর সম্প্রসারণকে ব্যাপকভাবে সহায়তা ও তদারকি করেন।

বাণিজ্য সম্প্রসারিত হওয়ার সাথে সাথে জ্ঞান ও নতুন নতুন ধারণা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান, রসায়ন, চিকিৎসা এবং প্রকৌশল বিজ্ঞানে বিতর্ক ও সমৃদ্ধিকে সম্ভবপর করার জন্য ব্রহ্মগুপ্ত, এরিস্টটল, ইউক্লিড, টলেমি এবং হিপোক্রেটাসের মতো প্রাচীন চিন্তাবিদগণের লেখনীগুলোকে আরবীতে অনুবাদের জন্য পণ্ডিতগণ কাজ করেন। এটা চিন্তা, সমৃদ্ধি এবং সম্পদ তৈরির এক সোনালি যুগ ছিল।

কীভাবে এমন আলোকিত এক যুগের সমাপ্তি ঘটলো? অনেকেই এ প্রশ্নের জবাব দেয়ার চেষ্টা করেছেন এবং এই প্রশ্নের জবাব দেয়া এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য না হলেও, সংক্ষেপে বলা যায় যে, ১৫শ শতাব্দির শুরুর দিকে মুসলিম সভ্যতা স্পেন, তুরস্ক ও ফিলিস্তিনে ক্রুসেডাদের আগ্রাসন এবং পারস্য, ইরাক ও সিরিয়াতে মঙ্গোল আক্রমণের শিকার হয়। মুসলিম বিশ্বের বিখ্যাত গ্রন্থাগার ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো দ্বন্দ্ব সংঘাতের এই সময়গুলোতে ভয়াবহ হুমকির সম্মুখীন হয়। ১২৫৮ খ্রিস্টাব্দে বাগদাদ যখন আক্রান্ত হয়, তখন আক্রমণকারী মঙ্গোলরা অগণিত পাণ্ডুলিপি ধ্বংস করে; অন্যদিকে ক্রুসেডের আগ্রাসনকারীদের দ্বারা কর্ডোবা শহরের ৬০০,০০০ ইসলামী গ্রন্থ বিনষ্ট হয়।

স্পেন (আন্দালুস) ও সিসিলি হারানোর পর মুসলিম বিশ্ব তৈমুর লঙ্গের আগ্রাসনের কবলে পড়ে। এসব আক্রমণ সামগ্রিকভাবে ইসলামী সভ্যতার পতনের সূচনা করে এবং শেষমেশ ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের এই আলোকময় ধ্রুপদী যুগের চূড়ান্ত পতন নিয়ে আসে। এরসাথে যোগ হয় নতুন বিশ্ব তথা আমেরিকার সন্ধান (যা ইউরোপকে সম্পদশালী করে), পশ্চিমা সভ্যতার উত্থান, সিল্ক রোডের চূড়ান্ত পতন এবং এর পাশাপাশি বিভিন্ন সভ্যতা থেকে জ্ঞান প্রবাহের ধারাগুলোর বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া – এগুলো মুসলিম সভ্যতার পতনে অন্যতম ভূমিকা পালন করে।

একই সময়ে মুসলিম বিশ্ব নয়া অন্তর্মুখী চিন্তাধারার আবির্ভাব দ্বারা দুর্বল হয়ে পড়ে। এই অন্তর্মুখী চিন্তাধারা দর্শন, যুক্তিবিদ্যা এবং সমাজের কল্যাণে ঈমানকে কর্মে পরিণত করা থেকে মুসলিম সভ্যতার দৃষ্টি ও মনোযোগ সরিয়ে দেয়। যার ফলশ্রুতিতে মুসলিম সভ্যতা অসংখ্য স্বাধীন জাতিরাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে পড়ে। যেগুলোর অধিকাংশ রাষ্ট্রই পরবর্তীতে উপনিবেশিকতার শিকার হয়, আর না হয় একে অপরে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে, এমনকি স্বাধীনতা লাভের পরেও তারা পরস্পরে যুদ্ধে লিপ্ত থাকে। না এসব রাষ্ট্রের শাসক, আর না এদের উপনিবেশিক শাসকরা শিক্ষা ও আর্থসামাজিক সংস্কারের ব্যাপারে উপযুক্ত নজর দিয়েছে; উল্টো তারা দ্রুত এগিয়ে চলা আধুনিক বিশ্বে এসব জাতিরাষ্ট্রকে স্বকীয়তা এবং টিকে থাকার দীর্ঘ সংগ্রামে অসহায়ভাবে ছেড়ে দিয়েছে।

কিন্তু গ্রন্থটি আমাদেরকে এটা দেখাবে যে, মুসলিম সভ্যতার এসব পণ্ডিতের জ্ঞান হারিয়ে যাওয়া থেকে বহু দূরে। আরবী ভাষায় লিখিত অতীতের এসব হাজারো মহামূল্যবান নথি দ্বারা ব্রিটিশ লাইব্রেরি, বার্লিনের *Staatsbibliothek*, প্যারিসের *Bibliotheque Nationale* এবং অন্যান্য জায়গার আর্কাইভগুলো পূর্ণ হয়ে আছে। টলেডোর প্রধান গির্জার আর্কাইভে আজও আপনি প্রায় ২৫০০ এর মতো টিকে থাকা পাণ্ডুলিপি দেখতে পাবেন, যেগুলো পণ্ডিতেরা আরবী থেকে লাতিন ভাষায় অনুবাদ করেছিল। এই লাতিন অনুবাদগুলোই ১৬শ শতাব্দির দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক বিপ্লবকে প্রাণ জুগিয়েছিল এবং জ্ঞানের শিখাকে জ্বালিয়ে রেখেছিল।

রবার্ট বয়েল, এডমন্ড হ্যালি, জন ওয়ালিস এবং ইয়োহান হেভিলিয়াসের মতো বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক মানসগুলো রয়েল সোসাইটির প্রথম দিককার অগ্রনায়ক ছিল, যারা আরবী পাণ্ডুলিপি অনুবাদ ও অধ্যয়নে ব্যাপক আগ্রহ প্রদর্শন করেছিল। সাম্প্রতিক সময়ে রয়েল সোসাইটির ৩৫০-তম বার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত '*Arabick Roots*' শীর্ষক প্রদর্শনীতে এটা উল্লেখ করা হয় যে, রাজা প্রথম চার্লস লেভান্ট কোম্পানিকে প্রাচ্য থেকে ইংল্যান্ডগামী প্রতিটি জাহাজে আরবী পাণ্ডুলিপি পাঠানোর জন্য অনুরোধ করেন।

চিকিৎসা ও জ্যোতির্বিদ্যা, স্থাপত্য ও প্রকৌশল, গণিত ও রসায়ন, ইতিহাস ও ভূগোল এবং একইসাথে আজকের সামাজিক রীতি, ফ্যাশন ও রুচিসমূহের উপর যে হাজার বছরের মুসলিম সভ্যতার প্রভাব রয়েছে, সেটা আজ সুস্পষ্ট। এই গ্রন্থের মাধ্যমে এখন আপনি নিজে মুসলিম ঐতিহ্যের এই জগতে ঘুরে বেড়াতে পারবেন।
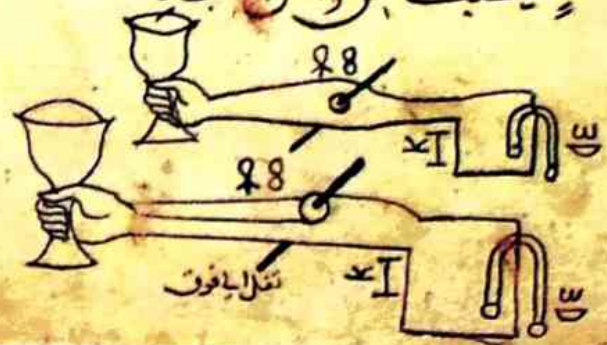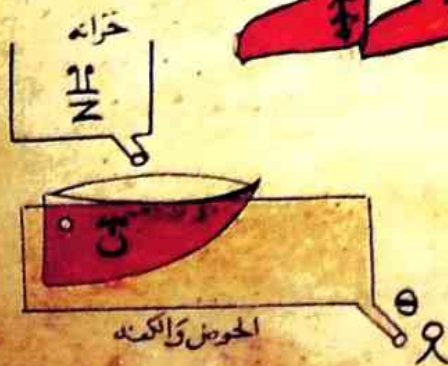
আল-জাযারী রচিত কিতাব ফী মারিফাতিল হিয়াল আল-হানদাসা (সুনিপুণ যান্ত্রিক ডিভাইস) গ্রন্থের একটি চিত্রে রোবটকে খাবার পরিবেশন করতে দেখা যাচ্ছে। এই ডিভাইস বা যন্ত্র কীভাবে কাজ করে, ডান পাশে রয়েছে তার বিবরণ।

৬৩২-১৭৯৬

৭ম শতাব্দি থেকে শুরু করে হাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে মুসলিম বিশ্ব ছিল দক্ষিণ স্পেন থেকে সুদূর চীন পর্যন্ত বিস্তৃত। এই সময়ে বিভিন্ন বিশ্বাসের নারী ও পুরুষ বিদ্বানেরা প্রাচীন জ্ঞানের উপর নয়া ইমারত দাঁড় করাতে এবং সেটাকে আরও সমৃদ্ধ করতে সহযোগিতামূলক কাজ করে গেছেন। তারা অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করেন, যা জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রগতির এক অবিশ্বাস্য বিস্তৃতি এনে দেয় – এনে দেয় সভ্যতার এক সোনালি যুগ।

মুসলিম সভ্যতা গণিত, বিজ্ঞান, স্থাপত্য, পর্যটন, শিক্ষা এবং চিকিৎসাশাস্ত্রে যে ধরনের সমৃদ্ধি অর্জন করেছিল, নিচের সময়ক্রমে তারই প্রতিচ্ছবি তুলে ধরা হয়েছে। এটাও দেখবেন যে, কীভাবে রেনেসাঁর পথ সুগম করতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা প্রাচ্য থেকে ইউরোপে ভ্রমণ করেছে।

৬৩৭
ইসলাম ছড়িয়ে পড়ে পারস্য, ফিলিস্তিন, সিরিয়া, লেবানন, ইরাক এবং পরবর্তীতে মিশরে।

৬৩৫ (আনুমানিক)
ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা উমর (রা.) আশ-শিফাকে মদীনা শহর এবং পরবর্তীতে বসরা শহরের প্রথম নারী স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা মন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দেন।

৬৫৪
ইসলাম গোটা উত্তর আফ্রিকায় ছড়িয়ে পড়ে।

কুব্বাত আস-সাখরা (ডোম অফ রক) মসজিদ

৬৯১
জেরুজালেমে কুব্বাত আস-সাখরা (ডোম অফ রক) মসজিদের নির্মাণ কার্য শুরু হয়।

৬২৫ ৬৫০ ৬৭৫ ৭০০

৬৩২
নবী মুহাম্মদ (ﷺ) ইন্তেকাল করেন এবং আবু বকর (রা.) প্রথম খলীফা বা মুসলিম শাসক মনোনীত হন।

৬৪৪
যাঁতাকলকে ঘোরাতে সক্ষম একটি বায়ুকল (উইন্ডমিল) পারস্যে নির্মিত হয়।

৬৬১
দামেস্ক থেকে উমাইয়া রাজবংশ খিলাফত পরিচালনা শুরু করে।

৭৭১
ইসলাম স্পেনে পৌঁছায়।

একটি মধ্যযুগীয় বায়ুকল

"বই ছাড়া শিক্ষা লাভ করা যায় না।"
আরবী প্রবাদ
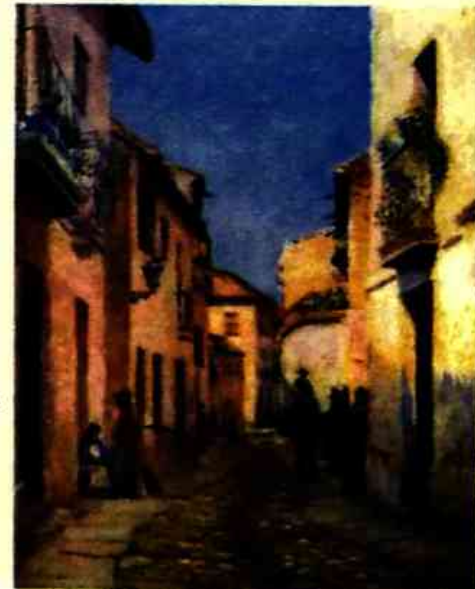
কর্ডোবার পুরাতন রাস্তা, স্পেন

■ মুসলিম ঘটনাবলি
■ ইউরোপীয় ঘটনাবলি

পাতন

আস্তর্লাব (গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান নির্ণয়ের মধ্যযুগীয় যন্ত্রবিশেষ)

ম্যানকাস স্বর্ণ মুদ্রা

৭৮৭
কর্ডোবার বিখ্যাত মসজিদের নির্মাণ কাজ শুরু হয়।

৭৮৬
বাগদাদে খলীফা হারুন উর-রশিদ বায়তুল হিকমা প্রতিষ্ঠা করেন।

৭৮৫
খলীফা আল-মানসূরের স্বর্ণ দিনারের অনুকরণে রাজা অফ্‌ফা একটি ম্যানকাস স্বর্ণ মুদ্রা তৈরি করেন।

৭২২ (*আনুমানিক*)
জাবির ইবনে হাইয়ান জন্মগ্রহণ করেন। তিনি 'রসায়ন শাস্ত্রের জনক' হিসেবে খ্যাত।

৭৭৭ (*আনুমানিক*)
আস্তর্লাব নির্মাতা এবং জ্যোতির্বিদ আল-ফারাজী মৃত্যুবরণ করেন।

৮১৩
খলীফা আল-মামুন বায়তুল হিকমা সম্প্রসারিত করেন; এই পর্যায়ে অনুবাদ কার্যক্রম বেগবান হয়।

৭৫০ ৭৭৫ ৮০০ ৮২৫

৭৫০
আব্বাসীরা উমাইয়াদের উৎখাত করে এবং ৭৬২ খ্রিস্টাব্দে বাগদাদে নতুন রাজধানীর গোড়াপত্তন করে। ওদিকে স্পেন শাসিত হতে থাকে উমাইয়া বংশোদ্ভূতদের দ্বারা।

৭৮০
গণিতজ্ঞ আল-খাওয়ারিযমী জন্মগ্রহণ করেন। তার গ্রন্থ *আল-জাবর ওয়াল মুকাবালা* আধুনিক বীজগণিতের সূচনা ঘটায়।

৭৯৫
বাগদাদে প্রথম কাগজকলের উল্লেখ পাওয়া যায়।

৮০০
খলীফা হারুন উর-রশিদ রাজা শার্লামেইনকে একটি ঘড়ি উপহার দেন, যা প্রতি ঘন্টায় বেজে উঠতো।

৮০১
আল-কিন্দী জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন একাধারে গণিতজ্ঞ, দার্শনিক, চিকিৎসক, রসায়নবিদ এবং সঙ্গীতজ্ঞ।

৮২৮
আবু মানসূর বাগদাদের নিকটে আশ-শামসিয়া নামের এক মানমন্দির চালু করেন।

"শিক্ষক যদি জ্ঞানী হন, তবে তিনি তোমাকে তার প্রজ্ঞার নীড়ে প্রবেশের আমন্ত্রণ জানাবেন না, বরং তিনি তোমাকে তোমার মনের প্রবেশদ্বারে ধাবিত করবেন।"

খালীল জিবরান, 'দ্য প্রফেট'

আল-কিন্দী

আর-রাযী, 'আরবদের হিপোক্রেটাস' নামে পরিচিত

আব্বাস ইবনে ফিরনাসের উড্ডয়ন

৮৫০
বনী মূসার তিন ভাই তাদের *কিতাবুল হিয়াল* (*উদ্ভাবনকুশলী ডিভাইস*) গ্রন্থটি প্রকাশ করেন।

৮৬৪
আর-রাযী জন্মগ্রহণ করেন। একাধারে তিনি ছিলেন রসায়নবিদ, চিকিৎসক এবং চিকিৎসাশাস্ত্রের শিক্ষক। তাকে 'রোগব্যাধি ও গবেষণামূলক চিকিৎসার জনক' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। পরবর্তীতে তার লেখাগুলো লাতিন ভাষায় অনূদিত হয়।

৮৮৭
শক্তিচালিত নয় এমন উড্ডয়নের অগ্রদূত আব্বাস ইবনে ফিরনাস কর্ডোবাতে মৃত্যুবরণ করেন।

৮৮০
চিকিৎসক ও বাগদাদ হাসপাতালের পরিদর্শক সিনান ইবনে সাবিত ইবনে কুর্‌রা জন্মগ্রহণ করেন। গ্রাম ও বেদুইন এলাকাগুলোতে তিনি ভ্রাম্যমান স্বাস্থ্য সেবা চালু করেন।

৯১৩
আব্বাসী খলীফা আল-মুকতাদির সর্বপ্রথম চিকিৎসকদের লাইসেন্সের বিধান প্রবর্তন করেন। বাগদাদের বাব-আশ-শামে তিনি আল-মুকতাদিরী হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন; বাগদাদের সূক ইয়াহইয়াতে প্রতিষ্ঠা করেন আস-সায়্যিদা হাসপাতাল।

৮৫০ — ৮৭৫ — ৯০০ — ৯২৫

৮৫৮
জ্যোতির্বিদ আল-বাত্তানী জন্মগ্রহণ করেন। জ্যোতির্বিজ্ঞানের বিভিন্ন মাপকাঠি তিনি নির্ভুলভাবে হিসেব করেন।

৮৫৯
ফাতিমা আল-ফিহরী ফেয-এ আল-কায়রাওয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্মাণ সমাপ্ত করেন।

৮৭২
মিশরের আব্বাসী গভর্নর আহমাদ ইবনে তুলুন কায়রোতে একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন, যেখানে প্রথমবারের মতো মানসিক ব্যাধি চিকিৎসার জন্য আলাদা বিভাগ অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

আল-কায়রাওয়ান বিশ্ববিদ্যালয়

৮৯৫
ইবনে আজ-জায্যার আল-কায়রাওয়ানী জন্মগ্রহণ করেন। তিনিই সর্বপ্রথম *রিসালা ফী সিয়াসাত আস-সিবইয়ান ওয়া তাদবীরিহিম* নামে শিশু চিকিৎসা এবং সামাজিক শিশু চিকিৎসার উপর স্বতন্ত্র পুস্তক রচনা করেন।

৯০০
ফাতিমীরা মিশর ও উত্তর আফ্রিকা শাসন শুরু করে এবং এর ৯ বছর পর তারা সিসিলি শাসন করে।

৯৩৬
সার্জন আয-যাহরাবী কর্ডোবাতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সার্জারি বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধন করেন। ডজন খানেকেরও বেশি সার্জারির উপকরণ উদ্ভাবনের পাশাপাশি তিনিই সর্বপ্রথম সচিত্র সার্জারি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।
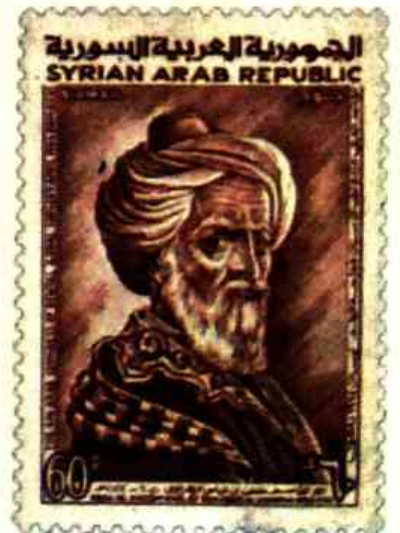
আয-যাহরাবী

রাবাবাহ, বেহালার আদি সংস্করণ

আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়

"দুনিয়া একটি গ্রন্থ, যারা দুনিয়া ভ্রমণ করে না, তারা কেবল গ্রন্থের একটি পাতাই পড়ে।"

– সেন্ট অগাস্টিন, খ্রিস্টান দার্শনিক

৯৭৩
আল-বিরুনী জন্মগ্রহণ করেন। জ্যোতির্বিদ, গণিতজ্ঞ ও ভূগোলসহ বহু বিদ্যায় পারদর্শী এ মনীষী পৃথিবীর পরিসীমা নির্ণয় করেন।

৯৭২
ফাতিমীরা কায়রোতে আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে।

৯৭০
কর্ডোবার উমাইয়া খলীফা আল-হাকিম তার ব্যক্তিগত সচিব হিসেবে লাবনা নামের গণিতবিদ ও বিজ্ঞানীকে নিয়োগ দেন।
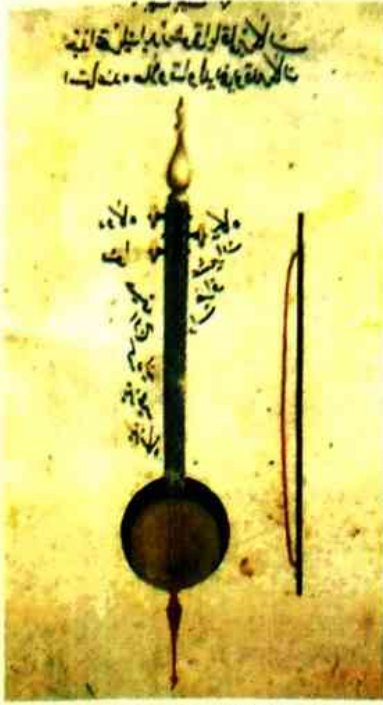
৯৫০
বাগদাদের আল-ফারাবী ইন্তেকাল করেন। তিনি একাধারে দার্শনিক ও সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। বেহালার আদি সংস্করণ তারই উদ্ভাবন।

১০০৯
জ্যোতির্বিদ ইবনে ইউনূস কায়রোতে ইন্তেকাল করেন এবং রেখে যান হাজারেরও বেশি নির্ভুল নথি, যাতে ৪০-টি গ্রহসংযোগ এবং ৩০-টি চন্দ্রগ্রহণের বিবরণ রয়েছে।

সূর্যের অবস্থান নির্ণয়

৯৭৫ ১০০০ ১০২৫ ১০৫০

৯৫৭
মানচিত্রকার এবং লেখক আল-মাসউদী তার বাকু তেলক্ষেত্রগুলোর ভ্রমণ বৃত্তান্ত বর্ণনা করেন।

৯৬৫
চিকিৎসক ইবনুল হাইছাম জন্মগ্রহণ করেন। তার আবিষ্কার ও তত্ত্বগুলো আলোকবিজ্ঞানে বিপ্লব সাধন করে।

ইবনে সীনার আল-কানুন

৯৮০
চিকিৎসকদের যুবরাজ ইবনে সীনা জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আলোড়ন সৃষ্টিকারী *আল-কানুন ফীত-তীব* রচনা করেন।

৯৮৭
গণিতজ্ঞ এবং আদালতের বিজ্ঞ আইনবিদ সুতাইতা আল-মাহামলী বাগদাদে ইন্তেকাল করেন।

৯৯৯
টলেডোতে বাব মারদূম মসজিদের নির্মাণ শুরু হয়, এতে বিশেষ ধরনের পাঁজরাকৃতি ছাদ ব্যবহৃত হয়।

বাব মারদূম মসজিদ

"দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত জ্ঞানার্জন করো।"
মুসলিম প্রবাদ

১০৫০
কন্সট্যান্টিন দ্য আফ্রিকান, তিউনিস থেকে সালেরনোতে চলে আসেন। সেই সাথে শুরু হয় ইউরোপে ইসলামী চিকিৎসাবিদ্যার স্থানান্তর।

কন্সট্যান্টিন দ্য আফ্রিকান

হাই ইবনে ইয়াকযান-এর গল্প

আল-খাওয়ারিযমী

১০৬৬
নরম্যানদের ইংল্যান্ড বিজয় ওই দেশে মুসলিম শিল্পকর্ম এবং সেটার সাথে জড়িত ধারণাগুলোর বিস্তৃতি ঘটায়।

১০৮৫
খ্রিস্টানরা টলেডো দখল করে এবং টলেডোতে আরবী গ্রন্থগুলো লাতিন ভাষায় অনুবাদের জন্য একটি কেন্দ্র গড়ে তোলে।

ইবনে বাস্সালের *দিওয়ান আল-ফিলাহা* কৃষি ক্ষেত্রে বিপ্লব এনে দেয়। তিনি ছিলেন স্পেনের টলেডোর বাসিন্দা।

১১১০
হাই ইবনে ইয়াকযান-এর রচয়িতা ইবনে তুফায়েল জন্মগ্রহণ করেন।

১১৪৩
চেস্টার-এর রবার্ট পবিত্র কুরআন এবং আল-খাওয়ারিযমীর গ্রন্থসমূহ অনুবাদ করেন।

১১৪০
গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যা শেখার জন্য মর্লি-র ড্যানিয়েল কর্ডোবায় যান এবং ফিরে এসে অক্সফোর্ডে শিক্ষা দেন।

১০৭৫ | ১১০০ | ১১২৫ | ১১৫০

১০৬৫
বাগদাদের প্রথম বিদ্যালয় নিজামিয়া মাদ্রাসা সেলজুক মন্ত্রী নিজামুল মুলক কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়, যিনি প্রখ্যাত দার্শনিক ও ধর্মতত্ত্ববিদ আল-গাযালীকে অধ্যক্ষ হিসেবে নিয়োগ দেন।

১০৯১
আবু মারওয়ান ইবনে যুহর জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন গবেষণামূলক সার্জারির অগ্রনায়ক। ইবনে রুশদের সাথে সহ-লেখক হিসেবে তিনি বিশ্বকোষ আকারের চিকিৎসা পাঠ্যপুস্তক রচনা করেন। তার দুই কন্যাও চিকিৎসক ছিল।

১০৯৬
প্রথম ক্রুসেড আরম্ভ হয়।

১০৯৯
আল-ইদরিসী জন্মগ্রহণ করেন। সিসিলির নরম্যান রাজা দ্বিতীয় রজারের জন্য তিনি একটি বিশ্ব মানচিত্র প্রস্তুত করেন।

১১২৬
ইবনে রুশদ জন্মগ্রহণ করেন। দর্শনের উপর তিনি ব্যাপক লেখনীর স্তূপ তৈরি করেন, যেখানে তিনি জ্ঞানতত্ত্ব, প্রাকৃতিক দর্শন ও অধিবিদ্যার উপর উল্লেখ্যযোগ্য তত্ত্বের অবতারণা করেন। দক্ষ চিকিৎসক হিসেবে তিনি তার বিখ্যাত গবেষণাগ্রন্থ *আল-কুল্লিয়াত ফীত-তীব* রচনা করেন, যা লাতিন ভাষায় *Colliget* নামে পরিচিত।

১১৪৫
জাবির ইবনে আফলাহ একটি পর্যবেক্ষণ যন্ত্র উদ্ভাবন করেন, যা *টরকুয়েটাম* নামে পরিচিত। এই যন্ত্র মহাকাশীয় স্থানাংক নির্ণয় করে।

১১৫৪
নূরুদ্দীন যঙ্গি দামেস্কে চিকিৎসাবিদ্যা শেখানোর ব্যবস্থা সম্বলিত বিশালাকার আন-নূরী হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন।

> ***"চিকিৎসা জ্ঞান ছাড়া কেউ যদি কারো চিকিৎসা করে, তবে (এর জন্য সে) দায়ী হবে।"***
> – নবী মুহাম্মদ (ﷺ), বুখারী ও মুসলিম সূত্রে বর্ণিত

আল-ইদরিসীর বিশ্ব মানচিত্র

ইবনুল বাইতারের উদ্ভিদ প্রজাতি

ঐতিহ্যবাহী কার্পেট

১১৯৭
উদ্ভিদতত্ত্ববিদ ইবনুল বাইতার মালাগাতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঔষধ প্রস্তুত প্রণালি ও ব্যবহারের বিবরণ সম্বলিত *আল-জামিউল মুফরাদাত আল-আদবিয়াত ওয়াল আগযিয়াত* নামের বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করেন।

১১৮৭
সালাউদ্দীন আইয়ুবী জেরুজালেম পুনরুদ্ধার করেন। তিনি কায়রোতে আন-নাসিরী হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন।

১১৮৬
রাণী দাইফা খাতুন সিরিয়ার আলেপ্পোতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সালাউদ্দীনের পুত্রবধূ ছিলেন এবং ছিলেন জ্ঞানার্জন ও বিজ্ঞানের একজন পৃষ্ঠপোষক।

১১৮৫
জেরুজালেমের কুব্বাত আস-সাখরার অনুসরণে লন্ডনে টেম্পলাররা টেম্পল চার্চ নির্মাণ করে।

১২৩৩
ইবনুল কুফ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন খ্রিস্টান সার্জন ও লেখক ছিলেন। সার্জারিকে চিকিৎসার একটি বিশেষ শাখা হিসেবে প্রতিষ্ঠার কাজে তিনি আয-যাহরাবীর প্রচেষ্টাকে সম্প্রসারিত করেন। তিনি *কিতাবুল উমদা ফীল-জিরাহাহ* (সার্জারির মূলনীতি) নামক গ্রন্থ রচনা করেন।

১২৫৫
রাজা প্রথম এডওয়ার্ডের কাস্তালীয় নববধূ রাণী এলিনর নিজের বিয়ের যৌতুক হিসেবে আন্দালুসের কার্পেট ইংল্যান্ডে আনেন।

১২৫৪
রাজা আলফোনসো এল সাবিও সেভিলে লাতিন ও আরবী কলেজ স্থাপন করেন এবং আরবী গ্রন্থগুলোর অনুবাদ কর্মসূচি হাতে নেন।

১২৬০
রজার বেকন *Secrets of art and nature* প্রকাশ করেন, যাতে তিনি মুসলিম পণ্ডিতদের প্রভাবশীল ভূমিকার প্রশংসা করেন।

১২০০ — ১২২৫ — ১২৫০ — ১২৭৫

১২০২
ফিবোনাচ্চি নামে পরিচিত পিসার লিওনার্দো তার *Libar Abaci* গ্রন্থে আরবী সংখ্যা ও গণিতকে ইউরোপীয়দের নিকট উপস্থাপন করেন।

১২০৬
আল-জাযারী তার *কিতাব ফী মারিফাতিল হিয়াল আল-হানদাসা* (সুনিপুণ যান্ত্রিক ডিভাইস) গ্রন্থটি রচনা সম্পন্ন করেন।

১২১০
ইবনে আন-নাফীস জন্মগ্রহণ করেন। একাধারে আইন বিশেষজ্ঞ ও চিকিৎসক এই ব্যক্তি সর্বপ্রথম (রক্তের) ফুসফুসীয় সঞ্চালন আবিষ্কার করেন। হাই ইবনে ইয়াকযানে বিবৃত অস্তিত্বের এককত্বের ধারণাকে প্রত্যাখ্যানের জন্য তিনি *আস-সিরাহ আল-কামিলিয়া* নামে পুস্তিকা লেখেন।

১২২৯
কর্ডোবায় শিক্ষাপ্রাপ্ত রবার্ট গ্রসেটেস্ট অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম চান্সেলর পদে আসীন হন। তিনি ১২৫৩ খ্রিস্টাব্দে লিংকনের বিশপ মনোনীত হন।

মামলুক লাস্টারওয়্যের (এক প্রকার ধাতব গ্লাসযুক্ত পাত্র)

১২৫০
আইয়ুবীদের পরে মামলুক রাজবংশ মিশর শাসন করে এবং পরবর্তীতে তারা মঙ্গোলদের পরাস্ত করে।

১২৫৬
চক্ষু রোগের উপর ইবনে আবি আল-মাহাসিন আল-হালাবী তার পাণ্ডিত্যসুলভ ভঙ্গিতে রচনা করেন সচিত্র গ্রন্থ "আল-কাফী ফীল-কুহল"। গ্রন্থটি বিস্তৃত আলোচনায় সমৃদ্ধ।

১২৫৮
মঙ্গোলরা সবকিছু তছনছ করে দেয়; তারা বাগদাদ শাসন করে এবং সিরিয়া জয় করে।

> **"এবং বৃক্ষের পাতায় রয়েছে আরোগ্য এবং জাতির পুনর্নির্মাণ।"**
> পবিত্র বাইবেল, প্রত্যাদেশ, ২২:২
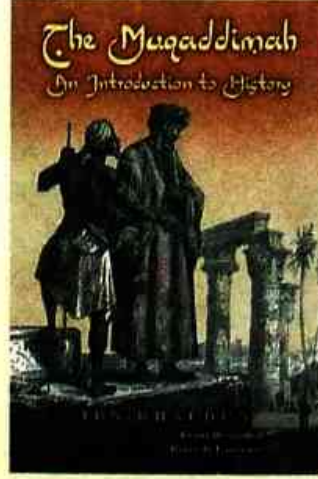
"শৈলী, ঐকতান, সাবলীল
এবং উপভোগ্য তালের সৌন্দ
নির্ভর করে সরলতার উপর।"
প্লেটো, গ্রিক দার্শনিক

ইবনে বতুতা

ইবনে খালদূনের
আল-মুকাদ্দিমা

১৩৮৫
সেরাফেদ্দীন সাবুনচুগলু জন্মগ্রহণ করেন। উছমানী এই সার্জন সার্জারি বিষয়ে মৌলিক গ্রন্থ রচনা করে আয-যাহরাবী ও ইবনুল কুফ-এর কর্মকে এগিয়ে নিয়ে যান।

১৩৮৩
রসায়নবিদ মারইয়াম আল-যানাতিয়া তিউনিসের কায়রাওয়ানে জন্মগ্রহণ করেন।

১২৯৩
মুসলিম স্পেনের বাহিরে ইউরোপের বলোনিয়াতে সর্বপ্রথম কাগজ কল স্থাপিত হয়।

১৩২৫
ইবনে বতুতা তার ২৯ বছরের সফরের উদ্দেশ্যে তানজাহ ত্যাগ করেন।

১৩৩২
সমাজবিজ্ঞানের জনক ইবনে খালদূন জন্মগ্রহণ করেন।

১৩০০ ১৩২৫ ১৩৫০ ১৩৭৫

১২৬৭
মার্কো পোলো তার ২৪ বছরের ভ্রমণ শুরু করেন।

১২৮৪
১১ মাসের নির্মাণ কাজের পর কায়রোতে আল-মানসূরী হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৩১১
ভেনিসের সার্বজনীন খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ প্যারিস, অক্সফোর্ড, বলোনিয়া এবং সালামানকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজের অনুষদ প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেয়।

১৩৩০
জোত্তোর *Madonna and child* চিত্রকর্ম *তিরাজ* ও আরবী নকশি কর্মের ফিতা ব্যবহার করে, যা মুসলিম বিশ্বের রাজকীয় পোশাক ও অন্যান্য বস্ত্রশিল্পের পরিচয় বহন করে।

১৩৪৭
ইউরোপ থেকে কালো মৃত্যুর মহামারী আলেকজান্দ্রিয়া ও কায়রোতে পৌঁছায়।

১৩৫৪
আমির পঞ্চম মুহাম্মদ আল-হামরাতে জলচালিত ঘড়ি সিংহ ফোয়ারা তৈরি করেন।

১৪০৫
যেং হো চীন থেকে তার মহাকাব্যি সমুদ্রযাত্রা শুরু করেন। চীনকে ভারত মহাসাগরে পরাশক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি তৎকালের সর্ববৃহৎ কাঠের জাহাজগুলো করে তিনি জিরাফের মতো ভিনদেশী প্রজাতি ও বিভিন্ন জাতি থেকে আনুগত্যের নমুনা হিসেবে খাজনা আদায় করে আসেন।

সিংহ ফোয়ারা

যেং হো-এর ভাস্কর্য

উলুগ বেগ মানমন্দির

পিরি রেইসের বিস্তারিত মানচিত্র

১৪৩৭
উলুগ বেগ তার তারকাপঞ্জি প্রকাশ করেন।

১৪৩২
আরবে ইবনে মাজিদ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন অভিজ্ঞ নাবিক ছিলেন এবং বলা হয় যে, ভাস্কো দ্য গামা-কে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতে পথ দেখিয়ে আনেন।
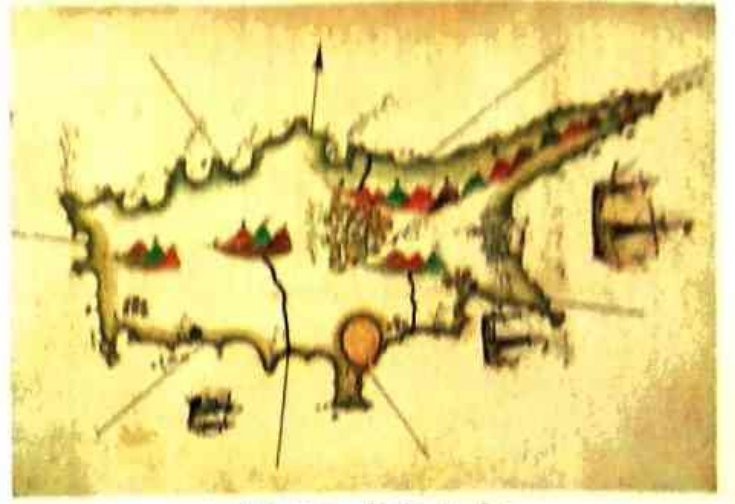
১৪৯২
ক্রিস্টোফার কলাম্বাস নতুন বিশ্বে পা রাখেন।

১৪৮৯
খাজা মা'মার সিনান জন্মগ্রহণ করেন। স্বনামধন্য এই স্থপতি তুরস্কের সালিমিয়া এবং সুলেমানিয়া মসজিদসহ বহু স্থাপনা নির্মাণ করেন।

১৫১৩
পিরি রেইসের সবচেয়ে প্রাচীন মানচিত্রে আমেরিকাকে দেখানো হয়েছে।

১৪৫০ ১৪৭৫ ১৫০০ ১৫২৫

১৪৫২
লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি জন্মগ্রহণ করেন। রেনেসাঁর মূলভিত্তি স্থাপনে তিনি ছিলেন অন্যতম প্রধান অগ্রনায়ক।

১৪৯৭
আয-যাহরাবীর *আত-তাসরীফ* গ্রন্থের অনুবাদ ভেনিসে প্রকাশিত হয়। বাসেল ও অক্সফোর্ডও সে পথ অনুসরণ করে তা প্রকাশ করে।

১৫৪৩
নাসিরউদ্দীন আত-তুসী এবং ইবনে আশ-শাতিরের কর্মের উপর ভিত্তি করে নিকোলাস কপার্নিকাস *De Revolutionibus* গ্রন্থ প্রকাশ করেন।

"দুনিয়া সুন্দর স্ত্রীর মতো, যার রূপ-লাবণ্য বর্ধিত করার জন্য মানব সৃষ্ট কোনো রত্নালংকারের দরকার পড়ে না।"
খালীল জিবরান, লেবাননীয় লেখক

লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি
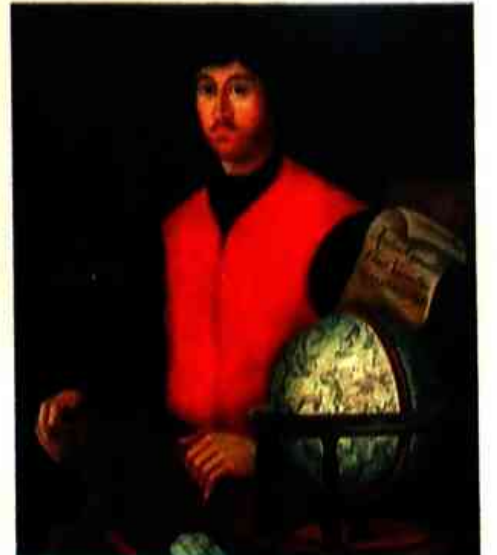
নিকোলাস কপার্নিকাস

"কেউ যদি বের হয় জ্ঞান অন্বেষণের সফরে, তবে আল্লাহ তাকে জান্নাত অভিমুখী যেকোন একটি রাস্তা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।"

– নবী মুহাম্মদ (ﷺ) থেকে আবু দারদা সূত্রে বর্ণিত।

আল-কানুনের লাতিন অনুবাদ

১৫৫০ — ১৫৭৫ — ১৬০০ — ১৬২৫

১৫৫৮
প্রথম জার্মান এবং সম্ভবত প্রথম ইউরোপীয় মানমন্দির জার্মানির কাসেলে স্থাপিত হয়।

১৫৬৪
গ্যালিলিও গ্যালিলি জন্মগ্রহণ করেন।

১৫৭১
ইয়োহান কেপলার জন্মগ্রহণ করেন। ইবনুল হাইছামের কর্মের উপর ভিত্তি করে তিনি আলোকবিজ্ঞানের উপর গ্রন্থ রচনা করেন।

১৫৭৭
ইস্তাম্বুলে তাকিউদ্দীনের মানমন্দির তৈরি হয়। কয়েক বছর পরে ১৫৮০ খ্রিস্টাব্দে এটা বন্ধ হয়ে যায়।

তাকিউদ্দীনের মানমন্দির

১৫৯৩
ইবনে সীনার *আল-কানুন* রোমে প্রকাশিত হয়। আর-রাযীর *আল-হাবী*-র সাথে একত্রে তা ইউরোপীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রামাণিক পাঠ্যপুস্তকে পরিণত হয়।

১৬০৪
এডওয়ার্ড পোকক জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আরবী ভাষা শেখার জন্য সিরিয়ার আলেপ্পোতে ৫ বছর কাটান। *হাই ইবনে ইয়াকযানের* অনুবাদও তিনি করেন, যাকে অবলম্বন করে রবিনসন ক্রুসো উপন্যাসটি রচিত হয়।

১৬০৬
এডমন্ড ক্যাস্টেল জন্মগ্রহণ করেন। ইবনে সীনার চিকিৎসাবিদ্যাকে উপযোগী করার মানসে তিনি শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতেন। প্রায় ১৮ বছরেরও বেশি সময় নিয়ে তিনি ৭-টি এশীয় ভাষার অভিধান সংকলন করেন।

১৬১১
পোল্যান্ডের জ্যোতির্বিদ ইয়োহান হেভিলিয়াস জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তার *Selenographia* (গদানঙ্ক, ১৬৪৭) গ্রন্থের প্রচ্ছদপটে ইবনুল হাইছামকে যুক্তিলব্ধ জ্ঞান এবং গ্যালিলিও গ্যালিলিকে ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানের প্রতীক হিসেবে চিত্রিত করেন।

১৬১৬
জন ওয়ালিস জন্মগ্রহণ করেন। স্বনামধন্য গণিতজ্ঞ এবং লন্ডনের রয়েল সোসাইটির সদস্য এই ব্যক্তি আরবী গণিত গ্রন্থাদি অনুবাদ করতেন এবং এ বিষয়ে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতেন। তিনি তার *Opera Mathematica* গ্রন্থে আত-তুসীর কর্মকে অন্তর্ভুক্ত করেন।

১৬২৭
ইংল্যান্ডের সবচেয়ে বিখ্যাত রসায়নবিদ রবার্ট বয়েল জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আরবী পাণ্ডুলিপিগুলো খোঁজ করতেন এবং সেগুলোর অনুবাদ করাতেন।

লাগারী হাসান চেলেবীর রকেট উৎক্ষেপণ

'*The Cow-Pock*' জেমস গিলরে-র চিত্রকর্ম

১৬৩৪
লেভান্ট কোম্পানিকে ইংল্যান্ড ফেরতগামী প্রতিটি জাহাজে আরবী পাণ্ডুলিপি পাঠানোর জন্য রাজা প্রথম চার্লস অনুরোধ করেন।

১৬৩৩
বসফরাসের উপর প্রথম মানুষবাহী রকেট উৎক্ষেপণ করেন লাগারী হাসান চেলেবী।

১৬৬৪
হেভিলিয়াসের অনুরোধে রয়েল সোসাইটি উলুগ বেগের ফার্সি ভাষায় লিখিত জ্যোতিষশাস্ত্রীয় পাণ্ডুলিপির পুরোটা লাতিন ভাষায় অনুবাদে সম্মত হয়।

১৬৫৬
বিজ্ঞানী ও জ্যোতির্বিদ এডমন্ড হ্যালি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি গ্রিক গণিতের আরবী সংস্করণগুলোর অনুবাদ করেন এবং আল-বাত্তানীর পর্যবেক্ষণসমূহ নিয়ে গবেষণা চালান।

১৬৮২
লন্ডনে মরক্কোর রাষ্ট্রদূত মুহাম্মদ ইবনে হাদ্দু লন্ডনের রয়েল সোসাইটির সদস্য মনোনীত হন।

১৭২৯
ত্রিপলির রাষ্ট্রদূত কাসেম আগা গুটিবসন্ত প্রতিরোধে উত্তর আফ্রিকার বহুল প্রচলিত ভ্যাকসিন প্রথা নিয়ে লেখেন এবং তিনি লন্ডনের রয়েল সোসাইটির সদস্য মনোনীত হন।

১৭৯৬
গো-বসন্তের ভ্যাকসিন নিয়ে এডওয়ার্ড জেনার পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান।

১৬৭৫ ১৭০০ ১৭২৫ ১৭৫০

১৬৪২
আইজাক নিউটন জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তার গ্রন্থাগারে ইবনুল হাইছামের *কিতাবুল মানাযির*-এর লাতিন অনুবাদের একটি কপি সংগ্রহে রাখেন।

১৬৫০
তুর্কি বণিকেরা যুক্তরাজ্যে কফি নিয়ে আসে।

১৬৭৮
জন গ্রিভ্‌স রয়েল সোসাইটির *Philosophical Transactions* (দার্শনিক আদান-প্রদান) সাময়িকীতে বৃহদাকার চুল্লিতে একসাথে হাজারেরও বেশি মুরগির ডিম ফোটানোর মিশরীয় পদ্ধতির উপর প্রবন্ধ প্রকাশ করেন।

১৭২১
গুটিবসন্ত প্রতিরোধে তুরস্কে ভ্যাকসিন প্রদানের চর্চা দেখে লেডি মেরি মন্টাগু ব্রিটেনে সেটা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান।

১৭২৫
লন্ডনে মরক্কোর রাষ্ট্রদূত মুহাম্মদ বিন আলী আবগালী লন্ডনের রয়েল সোসাইটির সদস্য মনোনীত হন।
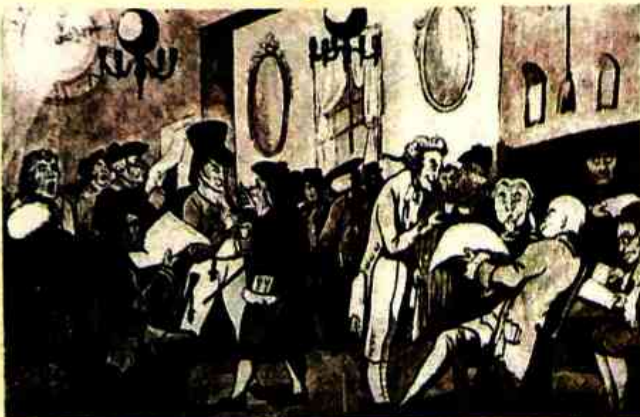
লেডি মেরি ওয়ার্টলি মন্টাগু

এডওয়ার্ড লয়েড কফি হাউজ, লন্ডন

"কেউ যদি ভালো চিকিৎসক হতে চায়, তাকে অবশ্যই ইবনে সীনার অনুসারী হতে হবে।"
প্রাচীন ইউরোপীয় প্রবাদ
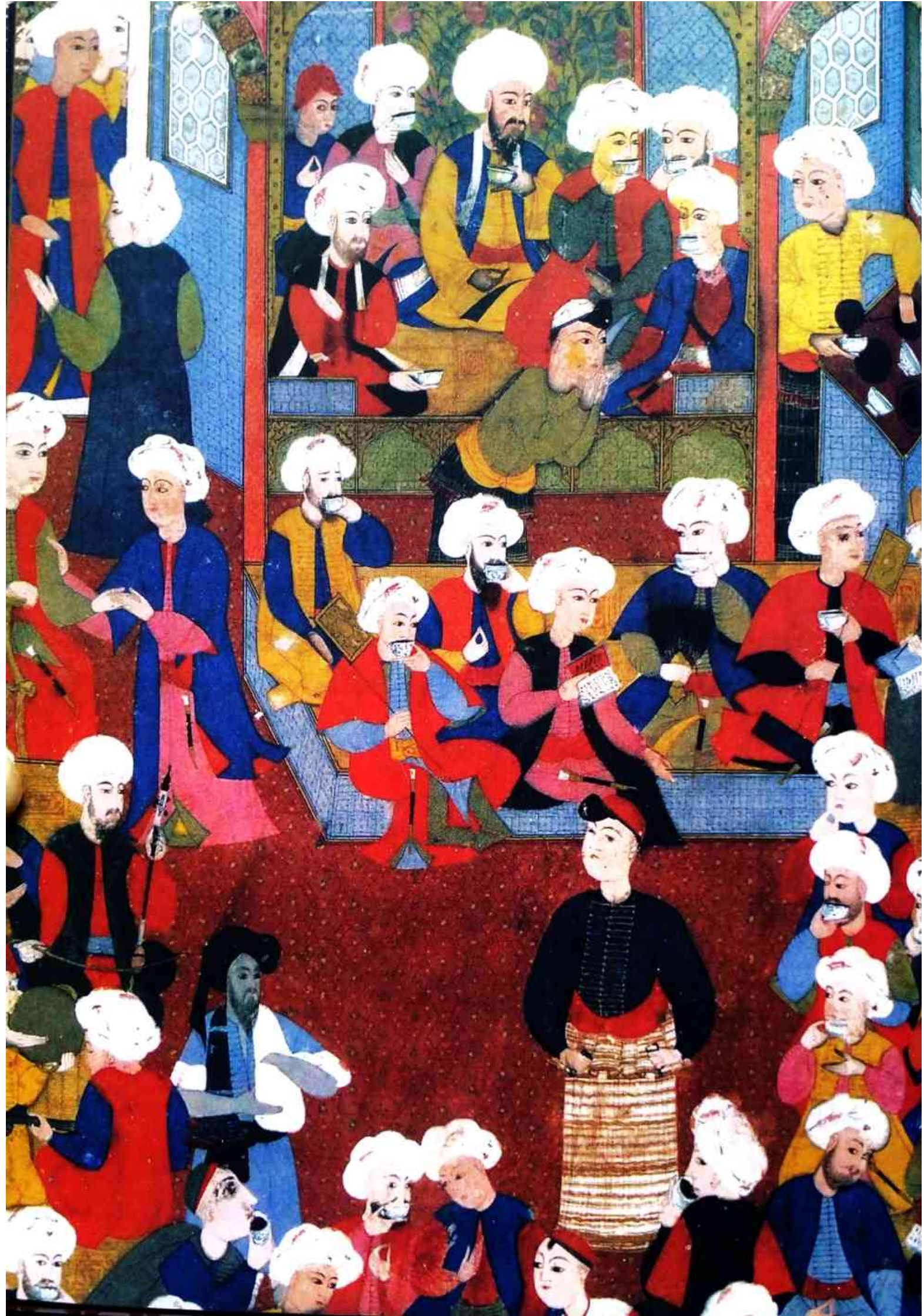
দ্বিতীয় অধ্যায়

"কী রাজা কী প্রজা, সে-ই তো সবচেয়ে সুখী,
যে নিজ গৃহে পায় শান্তির ছোঁয়া।"
– ইয়োহান উলফগ্যাং ফন গ্যেটে, জার্মান লেখক

গৃহ

**কফি পানের দীর্ঘযাত্রা • অনন্য ভোজনরীতি • তিন বেলা খাবারগ্রহণ
ঘড়ি • দাবা • সঙ্গীত • পরিচ্ছন্নতা • ট্রিক ডিভাইস
দৃষ্টিশক্তি এবং ক্যামেরা • ফ্যাশন এবং স্টাইল • কার্পেট**

আপনার গৃহ আপনার একান্ত রাজ্য, যেখানে আপনি আপনার ইচ্ছামাফিক মানুষটি হতে পারেন, যেখানে আপনার দরজার সামনে থমকে দাঁড়ায় এই বড় দুনিয়া। আপনার গৃহই বলে দেয় আপনি কে; আপনার ভাষায় কথা বলে আপনার গৃহ। রান্নাঘরে হয়তো কেটলির পাশেই আছে আপনার প্রিয় কফির পাত্র, ঘড়ির নিচে রয়েছে গত বছর ছুটির সময় তোলা অবকাশকালীন ছবি। গোসলখানা থেকে সাবানের সুবাস বইছে এবং বাতাসে প্রসাধনীর খুশবু ভাসছে; অন্যদিকে বিলাশবহুল কার্পেটে মোড়া সিড়ি সঙ্গীতের সুরের তালে মুখরিত।

পড়তে থাকুন এবং এটা আবিষ্কার করে আপনি আশ্চর্যান্বিত হবেন যে, উপরে উল্লিখিত জিনিসগুলোর সূত্রপাত কিংবা বিকাশ ঘটেছিল আজ থেকে প্রায় এক সহস্রাব্দ আগের নিরলস পরিশ্রমী মুসলিমদের হাত ধরে, যারা চেয়েছিল তাদের দুনিয়াতে বৃহত্তর পরিসরে আয়েশ ও স্বাচ্ছন্দ নিয়ে আসতে।

আপনার নির্ভরযোগ্য ক্যামেরার বিনম্র শেকড়টি ১১শ শতাব্দির মিশরের এক অন্ধকার কক্ষের সাথে জড়িত, আর আপনি যদি দেরী করে থাকেন এবং তাড়াহুড়ো করে নিজের ঘড়ির দিকে তাকান, তবে ১৩শ শতাব্দির তুরস্কে অত্যাধুনিক নির্মাণ প্রযুক্তি ব্যবহার করে নকশাকৃত ৭ মিটার (২৩ ফুট) উঁচু ঘড়ির কথা ভাবুন। ৮ম শতাব্দিতে বাগদাদ থেকে মুসলিম স্পেনে আসা 'কালোপাখি' ডাকনামের এক ব্যক্তি সাথে করে নিয়ে আসে তিন-বেলা আহার গ্রহণ এবং মৌসুমি পোশাক পরিধানের সংস্কৃতি। অন্যদিকে রসায়নবিদগণ সুগন্ধিতে নিয়ে আসে ভিন্ন মাত্রা, আর যুদ্ধবাজি খেলা থেকে দাবা পরিণত হয় গৃহ বিনোদনে।

উল্টো পৃষ্ঠার চিত্র: ঐতিহ্যবাহী মুসলিম কফিহাউজের চিত্র সম্বলিত ১৬শ শতাব্দির একটি পাণ্ডুলিপি।

০১ কফি পানের দীর্ঘযাত্রা

দুনিয়াজুড়ে প্রতিদিন ১৫ বিলিয়ন কাপেরও বেশি কফি পান করা হয় – যা প্রায় অলিম্পিক আকৃতির ৩০০-টি সুইমিং পুল পূর্ণ করতে যথেষ্ট। আপনার রান্নাঘরে যদি কফির কোনো পাত্র না থাকে, তবে আপনি সংখ্যালঘিষ্ঠদের একজন। কফি এখন এক বৈশ্বিক ইন্ডাস্ট্রি এবং প্রাকৃতিক দ্রব্য নির্ভর পণ্যের মাঝে ২য় বৃহত্তম, যেটাকে কেবল তেলই টেক্কা দেয়।

১২০০ বছরেরও আগের কর্মঠ লোকেরা এই উত্তেজক ছাড়া রাত জাগতে বেশ কষ্টের মুখোমুখি হতো এবং তাদের এ বিড়ম্বনার সমাপ্তি ঘটে কৌতূহলী ছাগলপাল এবং তাদের প্রহরারত খালিদ নামের এক আরব রাখালের হাত ধরে। এই রাখালের বদৌলতে আবিষ্কৃত হয় নিত্য প্রয়োজনীয় ও জীবন বদলে দেয়া বস্তুটি। ইথিওপিয়ার ঢালু এলাকায় খালিদের ছাগলগুলো চরানো ছিল এবং সে খেয়াল করে যে, বিশেষ এক ধরনের বিচি খাওয়ার পর ছাগলগুলো বেশ প্রাণবন্ত ও উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছে। বিচিগুলো খাওয়ার বদলে লোকেরা এগুলো সেদ্ধ করে তৈরি করে *আল-কাহওয়া* [কফি]।

আজ আমরা যে কারণে কফি পান করি, ইয়ামেনের সূফীগণও ঠিক একই কারণে *আল-কাহওয়া* পান করতো অর্থাৎ জেগে থাকার জন্য। এটা তাদেরকে শেষ রাতের *ইবাদত* এবং *যিকিরে* মনোনিবেশ করতে সহায়তা করেছিল। পর্যটক, হজ্জযাত্রী এবং বণিকদের দ্বারা কফি মুসলিম বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। ১৫শ শতাব্দির শেষের দিকে এটা মক্কা ও তুরস্কে পৌঁছায় এবং ১৬শ শতাব্দিতে কায়রোতে পৌঁছায়।

পাসকুয়া রোসি নামের এক তুর্কি বণিক ১৬৫০ খ্রিস্টাব্দে সর্বপ্রথম ইংল্যান্ডে কফি নিয়ে আসেন এবং লন্ডনের লোম্বার্ট স্ট্রিটের জর্জ ইয়ার্ডে অবস্থিত এক কফিহাউজে তা বিক্রি করেন। আট বছর পরে, কর্নহিলে *Sultaness Head* নামে আরেকটি কফিহাউজ চালু হয়। আজকের বিখ্যাত বীমা কোম্পানি *Lloyd's of London* মূলত *Edward Lloyd's Coffee House* নামের একটি কফির দোকান ছিল। ১৭০০ খ্রিস্টাব্দের দিকে লন্ডনে প্রায় ৫০০-টি কফিহাউজ ছিল এবং গোটা ইংল্যান্ডজুড়ে ৩০০০-টির মতো কফিহাউজ ছিল। এগুলো *Penny Universities* (সস্তা বিশ্ববিদ্যালয়) নামে পরিচিত ছিল, কেননা আপনি এককাপ কফির বিনিময়ে যুগের শ্রেষ্ঠ বিচক্ষণ লোকদের সাথে কথা বলতে ও তাদের কথা শুনতে পারতেন।
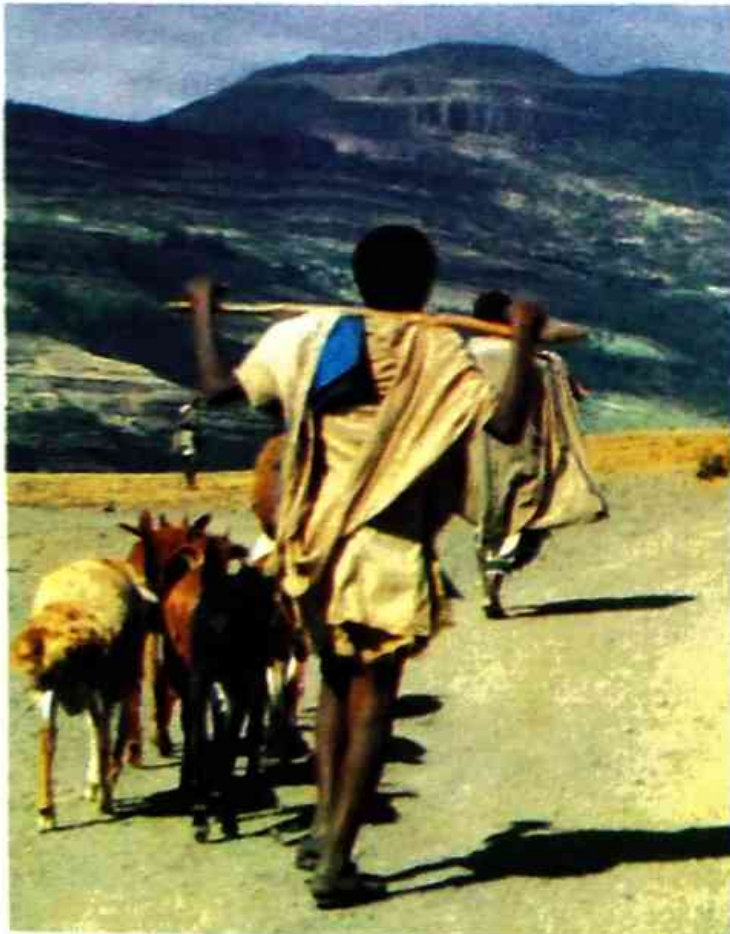
ইউরোপে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ঐতিহ্যবাহী মুসলিম প্রস্তুতপ্রণালীর উপর ভিত্তি করেই এই পানীয় পান করা হতো। এই প্রস্তুতপ্রণালীতে কফির গুঁড়া, চিনি ও পানি একত্র করে সেদ্ধ করা হতো এবং এতে করে কাপের মাঝে কফির একটা অবশিষ্টাংশ পড়ে থাকতো, যেহেতু এই প্রক্রিয়াতে ছাকন করা হতো না। যাহোক ১৬৮৩ খ্রিস্টাব্দে কফি বানানো ও পানের এক নতুন পদ্ধতির আবিষ্কার ঘটে এবং তা কফিহাউজের পছন্দে পরিণত হয়।

ইথিওপিয়ার এক রাখাল ও তার ছাগলপাল। ১২০০ বছর পূর্বে ইথিওপিয়ার এক রাখাল খেয়াল করে যে, তার ছাগলগুলো লাল বরই বিচি খাওয়ার পর বেশ প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। পরবর্তীতে এই বিচিগুলো সেদ্ধ করে মানুষ কফি পান শুরু করে।

কাপুচিনো কফির সূত্রপাত ঘটে কাপুচিন সন্ন্যাসী তরিকার ধর্মযাজক মার্কো দাভিয়ানো থেকে, যিনি ১৬৮৩ খ্রিস্টাব্দে তুর্কি সেনাদের ভিয়েনা অবরোধের বিরুদ্ধে লড়াই করে যাচ্ছিলেন। তুর্কিদের পিছু হটার ফলে ভিয়েনাবাসীরা তুর্কিদের পরিত্যক্ত কফির বস্তা থেকে কফি নিয়ে বানাতো। এটার স্বাদ বেশ তীব্র হওয়ায় এটার সাথে তারা মাখন ও মধু যোগ করে। এটা কফির রঙ-কে বাদামি বর্ণে রূপান্তরিত করে, যা কাপুচিনো ধর্মযাজকদের আলখাল্লার অনুরূপ। এভাবে ভিয়েনাবাসীরা মার্কো দাভিয়ানোর তরিকার সম্মানে এটার নাম রাখে কাপুচিনো। তখন থেকেই উপভোগ্য ও কোমল স্বাদের জন্য কাপুচিনো কফি পান করা হতে থাকে।

"কফি হচ্ছে সাধারণ মানুষের স্বর্ণ। ঠিক স্বর্ণের মতো করেই এটা প্রত্যেকের জন্য বিলাস ও আভিজাত্যের অনুভূতি নিয়ে আসে।"
– শাইখ আবদুল কাদীর
১৫৮৮ খ্রিস্টাব্দে কফির ইতিহাসের উপর তিনি প্রথম পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন করেন।

কফি হাউজের উৎপত্তি

১৭শ শতাব্দিতে প্রতিষ্ঠিত Edward Lloyd's Coffee House-এর একটি ছবি

উত্তর আফ্রিকা ও মিশরের সাথে বাণিজ্যের সূত্রধরে ইউরোপে কফির আগমনের পর ১৬৪৫ খ্রিস্টাব্দে ভেনিসে ইউরোপের প্রথম কফিহাউজ দৃশ্যমান হয়। ১৭শ শতাব্দির শেষের দিকে লন্ডনে *Edward Lloyd's Coffee House*-টি প্রতিষ্ঠিত হয়, যা বণিক ও জাহাজ মালিকদের সভাস্থল ছিল। কফিহাউজগুলো আজকের দিনের পানশালার অগ্রদূতে পরিণত হয়। কফিহাউজগুলোতে জনসাধারণ রাজনৈতিক ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করতো; উপরন্তু এই স্থানগুলো লিবারেল মুভমেন্টগুলোরও জন্ম দিয়েছিল।

০২ অনন্য ভোজনরীতি

স্ফটিকে তৈরি ফাতিমী আমলের একটি জগ [সময়কাল: ১০ম বা ১১শ শতাব্দি]।

ইউরোপে তিন বেলা আহার গ্রহণের রীতি চালুর জন্য আমরা ৯ম শতাব্দির 'কালোপাখি' ডাকনামের একজন ব্যক্তিকে ধন্যবাদ দিতে পারি। ৯ম শতাব্দিতে যিরইয়াব যখন আন্দালুসে পৌঁছায়, ভোজনরীতি তখন পুরোপুরি বদলে যায় এবং বলা হয় যে, স্যুপের মাধ্যমে ভোজপর্ব শুরু হতো, এরপর ভোজের প্রধান অংশে থাকতো মাছ, মাংস কিংবা পাখির মাংস এবং ফলমূল ও বাদাম দ্বারা ভোজপর্ব শেষ হতো।

অনেকের মতো মধ্যযুগীয় মুসলিমগণ মৌসুমি রীতি অনুসারে খেতেন। সাধারণ শীতকালীন ভোজগুলোতে পাতাকপি, বিট, ফুলকপি, শালগম, হলুদাভ শেকড় জাতীয় সবজি, গাজর, শাক, মটর, শিম, মসুর ডাল, ছোলা, জলপাই, শক্ত গম ও বাদামের মতো শাক-সবজি থাকতো। এগুলো সাধারণত মাংসজাতীয় খাবারের সাথে খাওয়া হতো। ভোজন শেষে পরিবেশিত ফলফলাদি সচরাচর শুকনো ফল, যেমনঃ ডুমুর, খেজুর, কিসমিস, গবা (আলুবোখারা) হতো। ফলগুলোর সাথে থাকতো ভায়োলেট (সুগন্ধি পুষ্প), জুঁই, ঘৃতকুমারী, ভেষজ মসলার সিরাপ, ফলের ছোট ছোট বড়ি এবং হালুয়া।

অন্যদিকে, তাদের গ্রীষ্মকালীন খাদ্যরীতি ১১ ধরনের শিম, মুলা, লেটুস, চিকরি, বেগুন, গাজর, শশা, ক্ষীরা, শালুক, সবজির শাঁস, ধুন্দুল ও ভাত দ্বারা গঠিত ছিল। এসবের সাথে সাধারণত হাঁস-মুরগি, উটপাখি ও গরুর মাংস থাকতো। ভোজন শেষে পরিবেশিত ফলফলাদিতে অন্তর্ভুক্ত থাকতো লেবু, লাইম (বিশেষ ধরনের লেবু), নাশপতি জাতের ফল, পিচফল, তুঁতফল, চেরি, বরই, কমলা জাতের ফল, আঙ্গুর, ডালিম, তরমুজ, নাশপতি, আপেল ও মিষ্টি জাতীয় তরমুজ। ফলের ছোট ছোট বড়ি, লেবু, গোলাপ, জুঁই, আদা ও ফেনেল (হলুদ বর্ণের বিশেষ সবজির) মোরব্বা ও সিরাপ থেকে শরবত প্রস্তুত করা হতো।

খাবারের এই বিশাল আয়োজন টেবিলের চাদরের উপর বিছিয়ে রাখার রীতিটি যিরইয়াবের হাত ধরে আন্দালুসে ছড়িয়ে পড়ে। এছাড়াও কর্ডোবার রাজ দরবারের খাবার টেবিলে ব্যবহৃত ভারী ধাতব পানপাত্র ও স্বর্ণের পেয়ালাগুলো তিনি হালকা স্ফটিক পাত্রে বদলে দেন।

অধিকাংশ ইউরোপীয় অভিজাত পরিমণ্ডলে এশীয় রেসেপি ও মসলার চাহিদা ক্রমবর্ধমান হারে বেড়ে যায়। ১৪শ শতাব্দিতে আভিনয়নে দেয়া পোপের ধারাবিবরণীর উৎসগুলো আমাদের জানাচ্ছে যে, বৈরুত থেকে আসা জাহাজগুলো জ্যাম, মোরব্বা, চাল, কেক বানানোর বিশেষ ময়দা এবং সেইসাথে ক্ষতিনাশক রেচক নিয়ে আসতো। ডেনমার্কের রাণী ক্রিস্টিনা মুসলিমদের খাদ্যরীতি অনুসরণে বেশ সচেতন ছিলেন এবং তিনি তাদের পণ্য ও ফলফলাদি আমদানি করতেন। ডেনমার্ক যেহেতু বড়জোর আপেল ও রাইয়ের সরবরাহ করতে পারতো, সেহেতু ডেনিশ পেস্ট্রির উৎপত্তির বিষয়টি গভীরভাবে খতিয়ে দেখা প্রয়োজন।

৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণকারী আরেক মুসলিম আব্বাস ইবনে ফিরনাসের উদ্ভাবনকুশলের কারণে আন্দালুসে স্ফটিকের বিকাশ ঘটে। পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে তিনি বালি ও পাথর থেকে কাচ উৎপন্ন করেন এবং পাথরের আকরিকসমৃদ্ধ বাদাজোসের উত্তরে তিনি একটি স্ফটিক ইন্ডাস্ট্রি প্রতিষ্ঠা করেন। আন্দালুসের অধিকাংশ প্রাকৃতিক স্ফটিক টুকরো, যেগুলো আজও টিকে আছে, সেগুলো ইউরোপীয় গির্জা ও আশ্রমগুলোতে পাওয়া যায়।

> "কফি আমাদেরকে গুরু-গম্ভীর ও দার্শনিক বানায়।"
> – জোনাথান সুইফট, আইরিশ লেখক

এসব প্রাকৃতিক স্ফটিক টুকরোগুলোর মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ টুকরোটি বর্তমানে স্পেনের আস্তোরগা গির্জার গোলাকার বোতলে রয়েছে। এটা পত্রপল্লবের নকশা ও কুফি খোদাইকার্য সম্বলিত, যেগুলো প্রাকৃতিক স্ফটিক টুকরোর উপর করা সাধারণ শোভাবর্ধক উপাদান।

পানি পানের গ্লাসে স্ফটিকের ব্যবহার চালুর সাথে সাথে আব্বাস ইবনে ফিরনাস নামের এই ব্যক্তি চমকপ্রদ উদ্ভাবন শৈলীর মাধ্যমে কাচ দিয়ে তৈরি করেন নক্ষত্রশালা এবং এর সাথে সংযুক্ত করেন কৃত্রিম মেঘমালা, বজ্র ও বিজলি। স্বাভাবিকভাবেই এটা ৯ম শতাব্দির মানুষদের বেশ অবাক করে দিয়েছিল।

মুসলিম মৃৎশিল্পীগণ এরপর বিভিন্ন ধরনের সিরামিক ও মিহি স্বচ্ছ প্রলেপের জৌলুশবিশিষ্ট তৈজসপত্রের সূত্রপাত ঘটায়। মালাগা ও ভ্যালেন্সিয়া ছিল এই ইন্ডাস্ট্রির দুটো প্রধান কেন্দ্র, আর এদিকে মুসলিমগণ তাদের দীপ্তিময় মিহি স্বচ্ছ প্রলেপ শৈলী ব্যবহার করে মৃৎশিল্পের উৎপাদন ও শোভাবর্ধনে আমূল পরিবর্তন নিয়ে আসে। দীপ্তিময় মিহি স্বচ্ছ প্রলেপ শৈলীর বিষয়টি সম্পর্কে বাজার বিভাগের মৃৎশিল্প অধ্যায়ে আপনি আরও তথ্য পাবেন।

মালাগা ও ভ্যালেন্সিয়া উভয় এলাকার মৃৎশিল্পীগণ তাদের বানানো পণ্যসামগ্রী খ্রিস্টান লোকবহুল এলাকাগুলোতে রপ্তানি করতো, যেমনঃ উত্তর স্পেন, দক্ষিণ ফ্রান্স এবং একেবারে পূর্বের দিকে ইতালি। ধারণা করা হয় যে, মালাগাবাসী মৃৎশিল্পীগণ বিখ্যাত মাজ্যোলিকা পণ্যসামগ্রীর ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেছিল, যেটা ইতালীয় সিরামিক ইন্ডাস্ট্রিকে মাতিয়ে রেখেছিল।

পরেরবার যখন আপনি খেতে বসবেন, তখন সিরামিক ও পানপাত্রগুলোর দিকে খেয়াল করবেন। মাটির উপাদান থেকে তৈরি এসব বাসন কি মূল্যবান ধাতুর মতো মনে হয়?

গেলিবোলুলু মুস্তফা আলীর "নুসরাতনামা" গ্রন্থের ১৬শ শতাব্দির একটি পাণ্ডুলিপি, যেখানে দেখা যাচ্ছে যে, ইয়মিতের সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থ ব্যক্তিবর্গ নিয়ে সেনাপতি লালা মুস্তফা পাশা কর্তৃক আয়োজিত ভোজ সভায় তিনি টেবিলের একেবারে সামনে বসে আছেন। সেনাপতির উভয় পাশে সামরিক অভিযানে অংশ নেয়া অফিসারগণ বসে আছেন। সেনাগণ বিভিন্ন ধরনের উপাদেয় খাদ্য খাচ্ছে, আর চাকরগণ গোলাপজলের জগ নিয়ে তাদের মাঝে পরিবেশন করছে। কাঁটাচামচ ও ন্যাপকিন (ঠোঁট মোছার কাপড়) প্রত্যেক আহারকারীর কোলকে আবৃত করে আছে।

যিরইয়াব (কালোপাখি)

আবুল হাসান আলী ইবনে নাফি'র ডাকনাম ছিল যিরইয়াব তথা 'কালোপাখি', কেননা তার কণ্ঠ ছিল সুরেলা এবং তিনি ছিলেন কালো বর্ণের। সঙ্গীতজ্ঞ ও ফ্যাশন ডিজাইনার এই ব্যক্তি ৯ম শতাব্দিতে ইরাক থেকে মুসলিম সভ্যতার অন্যতম নেতৃত্বস্থানীয় সাংস্কৃতিক কেন্দ্র আন্দালুসের কর্ডোবাতে আসেন। এখানে তিনি ভোজন, শিষ্টাচার, পোশাক-পরিচ্ছদ ও সঙ্গীতের নয়া ফ্যাশন চালু করেন, যা আজও টিকে আছে। তার প্রভাবশালী অবদানের কারণে এই অধ্যায়ের বহু জায়গাতে আপনি তার বিষয়ে নানা তথ্য পাবেন।

যিরইয়াব ছিলেন ওই সময়ের প্রধানতম ধারা সৃষ্টিকারী। প্রতিভা বদৌলতে তিনি মুরদের স্পেনে আমন্ত্রণ পান, যেখানে তিনি ২০০ স্বর্ণ দিনার বেতনের পাশাপাশি আরও অনেক সুবিধা লাভ করতেন। তিনি তার সাথে করে মার্জিত শিষ্টাচার, রান্না কৌশল, ফ্যাশন এমনকি টুথপেস্ট বা দাঁতের মাজন পর্যন্ত নিয়ে আসেন।

০৩ তিনবেলা খাবার গ্রহণ

চার্লস পেরি অনুদিত ১৩শ শতাব্দির নামবিহীন এক আন্দালুসীয় রান্না বিষয়ক গ্রন্থের কিছু অংশ।

সূচনা: বাঁধাকপির সাথে মাংসের স্যুপ

মাংস নেন এবং সেটাকে যতটা সম্ভব সুন্দরভাবে কেটে নেন। আপনার সাধ্য মতো টাটকা পনির নেন, এটাকে কাটুন এবং এর উপর ধনেপাতার সাথে থেতলানো পিঁয়াজ নিক্ষেপ করুন। বাঁধাকপির সাথে সংযুক্ত চোখের মতো অংশটি নেন, সেদ্ধ করুন, এরপর মসলা বাটার কাঠের যন্ত্রে সবকিছু গুঁড়ো করুন এবং একবার কিংবা দু'বার সেদ্ধ করার পর সেগুলো একটি পাত্রে ঢালুন। কিছু মুরী (এক প্রকার চাটনি), সামান্য ভিনেগার এবং কিছু মরিচ ও কেওড়া মিশ্রিত করুন। মাখা ময়দার দলা অথবা লবণমিশ্রিত মাখা ময়দার দলা এবং ডিম দিয়ে পাত্রের উপাদানগুলো ঢেকে দেন।

খাবারের প্রধান অংশ: টাটকা পনিরের সাথে মিরকাস

কিছু মাংস নেন, পূর্বের বর্ণনা মোতাবেক সতর্কতার সাথে কাটুন। এদিক ওদিকে ছড়াবে না, খুব নরম নয়, এমন কিছু টাটকা পনির নেন এবং ছোট ছোট করে কাটা মাংসের অর্ধেক কেটে মাংসের সাথে মেশান এবং কয়েকটা ডিম যোগ করুন। এরসাথে মরিচ, লবঙ্গ এবং শুকনো ধনেপাতা মেশান। এগুলোর উপর কিছু পরিমাণ পুদিনা ও ধনেপাতার রস ঢালুন। মাখতে থাকুন যাতে করে মাংসের ভেতরের অংশ তথা মাংসের আঁশের সাথে আটকানো উপাদানের সাথে মসলাগুলো ঠেসে যায়। এরপর তেলে ভাজুন। ভাজা শেষে সস বা চাটনি দিয়ে কিংবা আপনার ইচ্ছে মতো খেতে থাকুন।

খাবারের প্রধান অংশ: তাজিনে পাকানো রোস্ট

কম বয়সী হৃষ্টপুষ্ট বকরীর পুরো একটি অংশ নেন এবং সেটাকে একটি বড় *তাজিনে* (ঢাকনাযুক্ত রান্নার মাটির পাত্র, যা উত্তর আফ্রিকায় এখনো ব্যবহৃত হয়) স্থাপন করুন। এটা চুল্লিতে রাখুন এবং যতক্ষণ না বাদামী বর্ণ ধারণ করছে, ততক্ষণ এটা সেখানে রেখে দেন। এটা নামিয়ে নেন, উল্টে দেন এবং দ্বিতীয়বারের জন্য চুল্লিতে রাখুন, যতক্ষণ না উভয় অংশ বাদামী বর্ণ ধারণ করছে। এরপর এটা নামিয়ে নেন এবং এতে লবণ, গোল মরিচ ও দারুচিনি ছিটিয়ে দেন। এটা খুবই স্বাস্থ্যকর ও উল্লেখ করার মতো একটি রোস্ট। কেননা চর্বি ও আর্দ্রতা পাত্রেই থেকে যায় এবং আগুনে মাংসের কিছুই নষ্ট হয় না, যেমনটি শিক কিংবা তাননুর (মাটির চুল্লিতে) পাকানো রোস্টে হয়ে থাকে।

খাবারের প্রধান অংশ: মাছের *সারিদ*

একটি বড় মাছ টুকরো টুকরো করুন, ডিমের সাদা অংশ, মরিচ, দারুচিনি, দরকারি সব ধরনের মসলা এবং সামান্য কিছু গাঁজানো খামির মেশান। ভালোমতো মিশ্রিত হওয়া পর্যন্ত মাখাতে থাকুন। একটি পাত্র নেন এবং তাতে এক চামচ ভিনেগার, দু' চামচ ধনিয়ার রস, দেড় চামচ পিঁয়াজের রস, এক চামচ *মুরী নাক্বী* (গমের ময়দা), মসলা, স্বাদ বাড়ানোর মসলা, পাইন বাদাম, ছয় চামচ তেল, প্রয়োজনীয় পরিমাণ পানি ও লবণ যোগ করে মোটামুটি উত্তাপের আগুনে রাখুন। এগুলো যখন কিছু সময় ধরে সেদ্ধ হবে, তখন টুকরো টুকরো করা মাছগুলোকে মাছের আকৃতিতে রেখে তার ভেতরে একটি বা দুটো সেদ্ধ ডিম প্রবেশ করান। সেদ্ধ হতে থাকা ঝোলের মাঝে সতর্কতার সাথে এগুলো ছেড়ে দেন। বাদবাকি অংশকে বড় মাংসল বলের মতো করে কাটুন এবং এগুলোর সাথে সেদ্ধ ডিমের কুসুম লেপ্টে দেন। পাত্রের সবকিছু ভালোমতো পাকাতে থাকুন এবং পাকানো শেষ হলে মাছ ও মাছের সাথে লেপ্টে থাকা কুসুমের অংশগুলো

তুলে নেন। এরপর এগুলো তেলে ভাজুন, যতক্ষণ না বাদামী বর্ণ ধারণ করছে। অতঃপর পাত্রের উপদানগুলোর সাথে ছয়টি ডিম, থেতলানো কাজুবাদাম, পাউরুটির ভেতরের অংশ এবং কুসুম রেখে দেন।

খাবারের প্রধান অংশ: মুরগির রোস্ট

কম বয়সী মোটাতাজা কয়েকটি মুরগি নেন, পরিষ্কার করে সেগুলো পানি, লবণ ও মসলাসহ সেদ্ধ করুন। এরপর এগুলো পাত্র থেকে নামিয়ে নেন এবং মাংসের চর্বিসহ একটি থালাতে ঝোল ঢালুন এবং কয়লাতে রোস্ট করার ব্যাপারে যা বলা হয়েছে, সেগুলো এর সাথে মেশান। সেদ্ধ মুরগির মাংসের সাথে সেগুলো মাখাতে থাকুন এবং এরপর মাংসের অংশগুলো শিকে স্থাপন করে মাঝারি উত্তাপের আগুনে রেখে বারবার এদিক ওদিক নাড়াতে থাকুন, যতক্ষণ না বাদামী বর্ণ ধারণ করছে। এরপর অবশিষ্ট থাকা ঝোল ছিটিয়ে দেন এবং পরিবেশন করুন। এটা পশুর মাংস থেকে সুস্বাদু। অন্যান্য পাখির রোস্টও একই পদ্ধতিতে রান্না করা যাবে।

মিষ্টি: আল-আমীরের সারদা

সাদা ময়দাকে পানি, সামান্য তেল এবং গাঁজানো খামির দ্বারা ভালোমতো দলা পাকান এবং চারটি চিকন *রাগিফাতুন* (এক ধরনের রুটি – পিঠার চেয়ে পাতলা করে বেলে চ্যাপ্টা করা, অনেকটা পাতলা ডিমের বড়ার মতো) তৈরি করুন। তেল দিয়ে কড়াইয়ে ভাজুন, যতক্ষণ না হালকা বাদামী হচ্ছে। এরপর তেল থেকে এগুলো উঠিয়ে নেন এবং ভালোভাবে পিষুন। দলা থেকে এরপর *মুজাবানা* (পনিরের পাইয়ের) আকৃতির মতো দলা বানান এবং এগুলোর উপরের আবরণটিকে শক্ত রাখুন। তেলে এগুলোকে ভাজুন এবং এগুলো যেন সাদা থাকে, আর বাদামী না হয়, তা নিশ্চিত করুন, পাশাপাশি উপরের শক্ত আবরণটি ভাজতে থাকুন। এরপর খোসা ছাড়ানো পেস্তা বাদাম, কাজুবাদাম, পর্যাপ্ত চিনি নেন; বেশ ভালোভাবে এগুলো মেশাতে থাকুন, মসলা মাখুন, এরপর কড়া গোলাপজল ঢালুন এবং এগুলোর সাথে গোল *রাগিফাতুন* যোগ করে ভালোমতো মিশে যাওয়ার আগ পর্যন্ত নাড়তে থাকুন। ইতোপূর্বে যে ফাঁপা পুডিং জাতীয় দলাটি পাকানো হয়েছে, তা এই মিশ্রন দিয়ে পূর্ণ করুন। এরপর ঢাকনা দিয়ে ঢেকে আবদ্ধ করে পাকাতে থাকুন, তবে অতিরিক্ত পাকানো যেন না হয়। এগুলো থালায় পরিবেশন করে তার উপর কড়া গোলাপজল, পর্যাপ্ত চিনি ছিটিয়ে পরিবেশন করুন। যদি ঘনীভূত সিরাপ, মধু মেশানো গোলাপজলের সিরাপ থাকে, তা ফোঁটায় ফোঁটায় ঢেলে দিন, এতে এটার স্বাদ বহুগুণে বেড়ে যাবে, *ইনশাআল্লাহ*।

শরবত: ডালিমের সিরাপ

এক রাতল (প্রায় ৫০০ গ্রামের মতো) ওজনের টক ডালিম এবং সেই পরিমাণ মিষ্টি ডালিম নেন, এই দুটোকে একসাথে পিষে শরবত বানান এবং দুই রাতল চিনি মেশান এবং এগুলো পাকাতে থাকুন, যতক্ষণ না তা সিরাপের মতো হচ্ছে। অসুখ নিরাময়, পিপাসা নিবারণ, পিত্তের ব্যাধি উপশমে এটা বেশ কার্যকর এবং এটা দেহকে মৃদুভাবে হালকা করে।

০৪ ঘড়ি

ইচ্ছা, আশা, স্বপ্ন দেখা কিংবা ভয়, যা-ই করি না কেন, আমাদের সাথে নিয়ে কিংবা আমাদের ছাড়াই সময় তার আপন গতিতে বয়ে চলে। ভয় পাইয়ে দেয়া পরীক্ষা (*Exam*), গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষাৎকার কিংবা জন্মদিন যাই হোক না কেন, প্রতিটি কাজেরই শুরু ও শেষ হওয়ার একটি সময় রয়েছে।
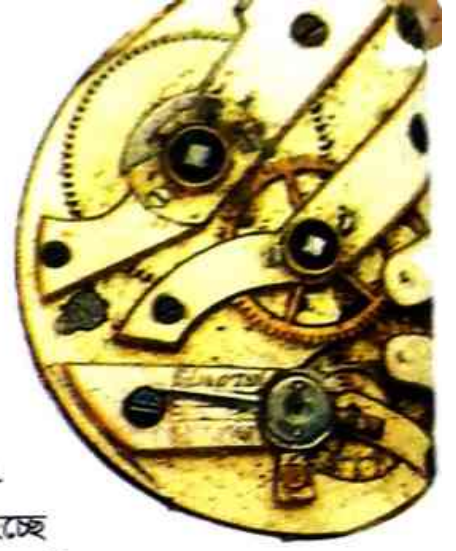
প্রথম সূর্যঘড়ি থেকেই মানুষ সময় মাপতে চাইতো। এখন আমাদের রয়েছে নীরব-ডিজিটাল ঘড়ি এবং সেইসাথে আধুনিক টিকটিক শব্দ করা ঘড়ি। এগুলোর পূর্বপুরুষ হচ্ছে ধপধপ শব্দ করা ক্লেপসিডরা (জলচালিত সময় গণনার যন্ত্র) ও জলচালিত ঘড়িসমূহ। ক্লেপসিডরা ঘড়িতে সময় মাপার জন্য বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত সাধারণ একটি পাত্র থাকে, যা ঘড়ির তলে থাকা নল দিয়ে গড়িয়ে নামা পানির প্রবাহ মাপে। এই ঘড়ি খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০-এর দিকে মিশরে ব্যবহৃত হতো।

আরেকটি প্রাচীন জলচালিত সময় গণনার যন্ত্র এসেছে ভারত থেকে, যা *ঘটিকা ইয়ান্ত্রা* নামে পরিচিত। যন্ত্রটি (তামা বা নারিকেলের তৈরি) ছোট অর্ধমণ্ডল আকৃতির পাত্রবিশিষ্ট, যার নিচের প্রান্তে সরু একটি ছিদ্র রয়েছে। প্রবাহিত পানি ধারণের জন্য নিচে একটি পাত্র থাকে এবং তা ধীরে ধীরে পানিতে পূর্ণ হতে থাকে। উপরে থাকা পাত্রের পানি যখন একেবারে খালি হওয়ার ধারপ্রান্তে পৌঁছে, তখন শ্রুতিগোচর একটি ধপ শব্দ হয়, যা সময় গণনাকারীকে সতর্ক করে দেয় এবং তিনি এই প্রক্রিয়া পুনরায় চালুর ব্যবস্থা করেন। ঘড়িটি বৌদ্ধ ও হিন্দু মন্দিরগুলোতে বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং পরবর্তীতে ভারতীয় মুসলিম মসজিদগুলোতে ব্যাপকহারে ব্যবহৃত হতে শুরু করে।

আমাদের গল্পের সূচনা ১৩শ শতাব্দির জলচালিত ঘড়ি এবং দক্ষিণ-পূর্ব তুরস্কের দিয়ারবাকির অঞ্চলের উদ্ভাবনকুশলী আল-জাযারী নামের এক ব্যক্তির হাত ধরে। ধার্মিক এই মুসলিম ছিলেন উচ্চতর দক্ষতাবিশিষ্ট একজন প্রকৌশলী, যিনি স্বয়ংক্রিয় মেশিনের ধারণার জন্ম দেন। তিনি তার পূর্ব পুরুষদের মেশিন ও প্রযুক্তির ইতিহাস, বিশেষ করে প্রাচীন গ্রিক ও ভারতীয়দের বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনের ইতিহাস দ্বারা অনুপ্রাণিত ছিলেন।

উপর থেকে: যান্ত্রিক ঘড়ির ইতিহাস ১৩শ শতাব্দি থেকে মুসলিম বিশ্বের ধারণাপ্রসূত সময় গণনার যন্ত্রগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে। নিচ থেকে বামে [পরের পৃষ্ঠা পর্যন্ত]: সময় গণনার বিবর্তনের ছবি – সূর্যঘড়ি, ক্লেপসিডরা ও জলচালিত সময় গণনার যন্ত্র থেকে ভারনির্ভর বিশাল আকৃতির ঘড়ি এবং আজকের যুগের ডিজিটাল হাতঘড়ি।

"সময় এই সাক্ষ্য দিচ্ছে যে: নিশ্চয় মানবজাতি ক্ষতির মাঝে আছে, কেবল তারা ছাড়া – যারা ঈমান আনে, সৎ কর্ম করে এবং একে অপরকে সত্য ও ধৈর্যের উপদেশ দেয়।"

– কুরআন (আল-আসর, ১০৩)

১২০৬ খ্রিস্টাব্দের দিকে, দিয়ারবাকিরের আরটুক বংশের রাজাদের জন্য কাজ করার সুবাদে আল-জাযারী সব ধরনের আকৃতি ও মাপের অসংখ্য ঘড়ি তৈরি করেছিলেন। তৎকালীন রাজা নাসিরুদ্দীন তাকে বলেন, "আপনি অতুলনীয় সব ডিভাইস তৈরি করেছেন এবং এগুলো আপনার ইন্দ্রিয় থেকে মূর্তমান বাস্তবে রূপ নিয়েছে, তাই নিজেকে আপনি যেসব কাজে পরিশ্রান্ত করেছেন এবং চমৎকারভাবে যা তৈরি করেছেন, তা নষ্ট করবেন না। আমি চাচ্ছি আপনি আমার জন্য এমন একটি গ্রন্থ রচনা করবেন, যাতে আপনার স্বতন্ত্র সৃষ্টিগুলোর বিবরণ এবং নির্বাচিত যন্ত্রগুলোর সচিত্র বিবরণ একত্রে থাকবে।"

রাজকীয় এই দাবীর ফল হিসেবে প্রকৌশলবিদ্যার উপর রচিত হয় *"কিতাব ফী মারিফাতিল হিয়াল আল-হানদাসা"* (সুনিপুণ যান্ত্রিক ডিভাইস) নামের এক অতুলনীয় গ্রন্থ। বিভিন্ন প্রকৌশল অভিজ্ঞতাসম্পন্ন লোকদের জন্য গ্রন্থটি এক অমূল্য সম্পদে পরিণত হয়, যেহেতু জলচালিত সময় গণনার যন্ত্রসহ এই গ্রন্থ ছয়টি বিভাগে ৫০-টি যান্ত্রিক ডিভাইসের বিবরণ নিয়ে আলোচনা করেছে।

আজ যেমনিভাবে সময় জানা প্রয়োজন, তেমনিভাবে ৭০০ বছর আগের মুসলিমদের বেলায়ও সময় জানা গুরুত্বপূর্ণ ছিল, আর আল-জাযারী ঘড়ি বানানোর এই মুসলিম সংস্কৃতিকে সযত্নে লালন করেছিলেন। মুসলিমরা জানতো সময় আটকানো যায় না, প্রতিনিয়ত আমরা এটা হারিয়ে ফেলছি এবং সময়কে ভালো কাজে ব্যয় করার জন্য সময় জানা আবশ্যক। প্রতিদিনের সালাত ঠিক সময়ে আদায়ের জন্য সঠিক ওয়াক্ত জানা মুসলিমদের জন্য প্রয়োজনীয়। মসজিদগুলোর জন্য ওয়াক্তের সময় জানাটা জরুরী ছিল, কেননা তাদেরকে প্রতিদিন সালাতের জন্য আযান দিতে হতো। অন্যদিকে গুরুত্বপূর্ণ বার্ষিক অনুষ্ঠান, যেমন: রমযানের রোযা শুরুর সময়, ঈদ উদ্‌যাপনের সময় অথবা মক্কাতে হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে সফর করার মতো বিষয়াদি আগে থেকে নির্ধারণ করতে হয়।

'অতুলনীয় সব ডিভাইস' যেটার দিকে রাজা নাসিরুদ্দীন ইশারা করেছিলেন, তাতে বড় হাতি-ঘড়িটি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সময় বলে দেয়ার পাশাপাশি বড় আকৃতির এই ঘড়ি ছিল প্রতিপত্তি, আড়ম্বর ও ধন-সম্পদের প্রতীক। সময় বলে দেয়ার প্রথম রোবটিক যন্ত্রগুলোর মাঝে এই হাতি-ঘড়িকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

ছিদ্রযুক্ত পাত্রের নিয়ন্ত্রিত নিমজ্জন

ভারতীয় ঘটিকা ইয়ান্ত্রা – পাত্রটি পানি দ্বারা পূর্ণ হলে তা পূর্ব নির্ধারিত সময় পর পর ট্যাংকে নিমজ্জিত হয়। পাত্রের এই নিমজ্জন নির্ভর করে পাত্রের আয়তন, ওজন এবং পাত্রের তলদেশে থাকা ছিদ্রের আকারের উপর। পাত্রটি যখন ট্যাংকের তলদেশে আঘাত করে, তখন ধপ করে একটা শব্দ হয়, যা সময় গণনাকারীকে সতর্ক করে দেয় এবং সে এই প্রক্রিয়া পুনরায় চালু করে।

হাতি-ঘড়ি

আল-জাযারীর যান্ত্রিক বিস্ময়

বহু সাংস্কৃতিক তাৎপর্যমণ্ডিত জলচালিত ঘড়ি

উল্লেখযোগ্য পরম্পরা: আল-জাযারীর উল্লেখযোগ্য অবদান – পাম্প ও ইঞ্জিনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ 'ক্র্যাংক ও সংযুক্ত রড সিস্টেম'

স্থান: দিয়ারবাকির, আধুনিককালের তুরস্ক
তারিখ: ১৩শ শতাব্দির শুরুর দিক
আবিষ্কারক: আল-জাযারী, প্রকৌশলী

আজকের দিনের নির্ভুল ডিজিটাল ও যান্ত্রিক ঘড়িসমূহ ছাড়া আধুনিক জীবনের গতি দৃশ্যত অসম্ভব। কিন্তু ৮০০ বছরেরও বেশি সময় আগেকার আবিষ্কারকগণ সালাতের ওয়াক্ত নির্ধারণ, রোযা ও ঈদ উদ্‌যাপনের সময় অথবা হজ্জ পালনের দিনক্ষণ নির্ধারণের জন্য ইতোমধ্যেই সময় গণনার নানা অত্যাধুনিক ডিভাইস তৈরি করেছিল।

হাতি-ঘড়িটি এমনই এক অনবদ্য সৃষ্টি, যা মানবজাতির বৈচিত্র্যকে উদ্‌যাপন করে। ভারতীয় জলচালিত সময় গণনার যন্ত্র দ্বারা অনুপ্রাণিত এই হাতি-ঘড়ির চলমান অংশগুলো স্বয়ংক্রিয় ছিল। এর সাথে রয়েছে মিশরীয় ফিনিক্স (বিশেষ ধরনের পৌরাণিক পাখি), গ্রিক হাইড্রলিক (জলশক্তিচালিত) প্রযুক্তি, চীনা ড্রাগন, ভারতীয় হাতি এবং আরবের পোশাক পরিহিত যান্ত্রিক মানবমূর্তি। স্পেন থেকে চীন পর্যন্ত বিস্তৃত বৈশ্বিক প্রযুক্তি ও সাংস্কৃতিক প্রভাবকে অত্যন্ত সুনিপুণভাবে তুলে ধরেছে এই ঘড়ি।

দক্ষিণ-পূর্ব তুরস্কের প্রখ্যাত প্রকৌশলী আল-জাযারী হলেন এই ঘড়ির আবিষ্কারক। তিনি সব ধরনের আকৃতি ও মাপের অসংখ্য যন্ত্র তৈরি করেছিলেন এবং ১২০৬ খ্রিস্টাব্দে রচনা করেন *"কিতাব ফী মারিফাতিল হিয়াল আল-হানদাসা"* নামের এক অতুলনীয় গ্রন্থ। তার উল্লেখযোগ্য অবদান হচ্ছে: পাম্প, ইঞ্জিন এবং অন্যান্য বহু যন্ত্রের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ক্র্যাংক [crank – সামনে পিছনে কোনো যন্ত্রকে ঘোরাতে ইংরেজি 'এল' আকৃতির হাতলবিশেষ] বা ঘূর্ণায়মান চাকা, সংযুক্ত রড ও পিস্টন সিস্টেমের সমন্বয়, যা চক্রাকার গতিকে সরলরৈখিক গতিতে সঞ্চারিত করে। তিনি সব ধরনের যান্ত্রিক গঠনশৈলী দ্বারা প্রবলভাবে আকর্ষিত ছিলেন, এমনকি তার গ্রন্থে স্বয়ংক্রিয় হাত-ধোয়ার যন্ত্র এবং একটি কামশাফ্‌ট (দাঁতযুক্ত সঞ্চালন দণ্ড) দ্বারা চালিত যান্ত্রিক বাদ্যযন্ত্রের বিবরণ পর্যন্ত আছে।

হাতি-ঘড়িটি সময় গণনার জন্য একটি পাত্র ব্যবহার করতো, যা লুকানো ট্যাংকে নিমজ্জিত হতো। এটা এসেছে ভারতীয় ঘটিকার গঠনশৈলী থেকে। মিশর থেকে গ্রিক, আগেরকার বহু সভ্যতাই জলচালিত ঘড়ি ব্যবহার করেছে, যেখানে পাত্রে পানির প্রবাহ বা পাত্র থেকে পানি বেরিয়ে যাওয়ার উপর ভিত্তি করে সময় হিসেবে করা হতো। তাদের ডিভাইসগুলোকে ক্লেপসিডরা বলা হতো, যার মানে: 'পানি চোর'।

প্রতি অর্ধ ঘন্টা পর পর সময় নির্দেশকটি অভিনব কিছু আওয়াজ ও নাড়াচাড়া করতো। ঘড়ির চূড়া থেকে একটি বল ঘুরতে শুরু করতো এবং একটি ঘন্টা-ডায়ালকে চালু করতো। অন্যদিকে একজন লিপিকার ও তার কলম চক্রাকারে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ঘুরে কত মিনিট অতিবাহিত হয়েছে, তা প্রদর্শন করতো। বলটি যখন নিচে পতিত হতো, তখন তা হাতি চালকের হাতে থাকা কাঠের ছোট হাতুড়িকে করতাল বা মন্দিরাকে আঘাত করার জন্য সবেগে নিক্ষেপ করতো।

■ *১৩শ শতাব্দির প্রকৌশলী আল-জাযারী তার এই হাতি-ঘড়ি নির্মাণ করেন, যাতে তিনি মুসলিম সভ্যতার বিভিন্ন জাতি ও কৃষ্টি-কালচারের প্রভাবকে ফুটিয়ে তুলেছেন।*

বাজপাখি ও তার পিছনে বলের
ঘূর্ণন প্রদর্শনের জন্য সুলতান
পাশের দিকে সরে যায়।
কলটি একটি পাখাকে আঘাত
করে সূর্যোদয়ের পর কত ঘণ্টা
অতিবাহিত হয়েছে, তা প্রদর্শনের
জন্য রুপার ডায়াল ও কালো
ায়ালের চারপাশ প্রদক্ষিণ করে।
চীনা ড্রাগন বলকে ধরে এবং
বলসহ নিচে নেমে আসে।
ড্রাগনটি ক্ষুদ্র কীলককে কেন্দ্র
রে উঠানামা করে।
ঘণ্টা পরপর
পানিপূর্ণ পাত্রটি খালি
একেবারে চূড়ার দুর্গে থাকা
বলটিকে নিচে নিক্ষেপ
করে। এতে আওয়াজ
হয় এবং ফিনিক্স পাখিও
নড়েচড়ে উঠে।
সবশেষে, বলটি একটি পাত্রে
পতিত হয়, যা হাতি চালকের
হাতে থাকা কাঠের হাতুড়িকে
সবেগে নিক্ষেপ করে, যেন তা
করতাল বা মন্দিরাকে আঘাত
করে। একইসাথে এটা পাত্রকে
কাত করে পুরো চক্রকে পুনরায়
ক করে।
পাত্রটি যখন ধীরে ধীরে
ডুবে যায়, তখন তা দড়িতে
টান দেয়। এতে করে
লিপিকার ও তার কলম কত
মিনিট পার হয়েছে, তা
প্রদর্শন করে।
হাতির বিশাল দেহটি
পানির ট্যাংক লুকিয়ে
রাখে। এতে একটি পাত্র
আছে, যার তলদেশে
ছোট ছিদ্র রয়েছে।
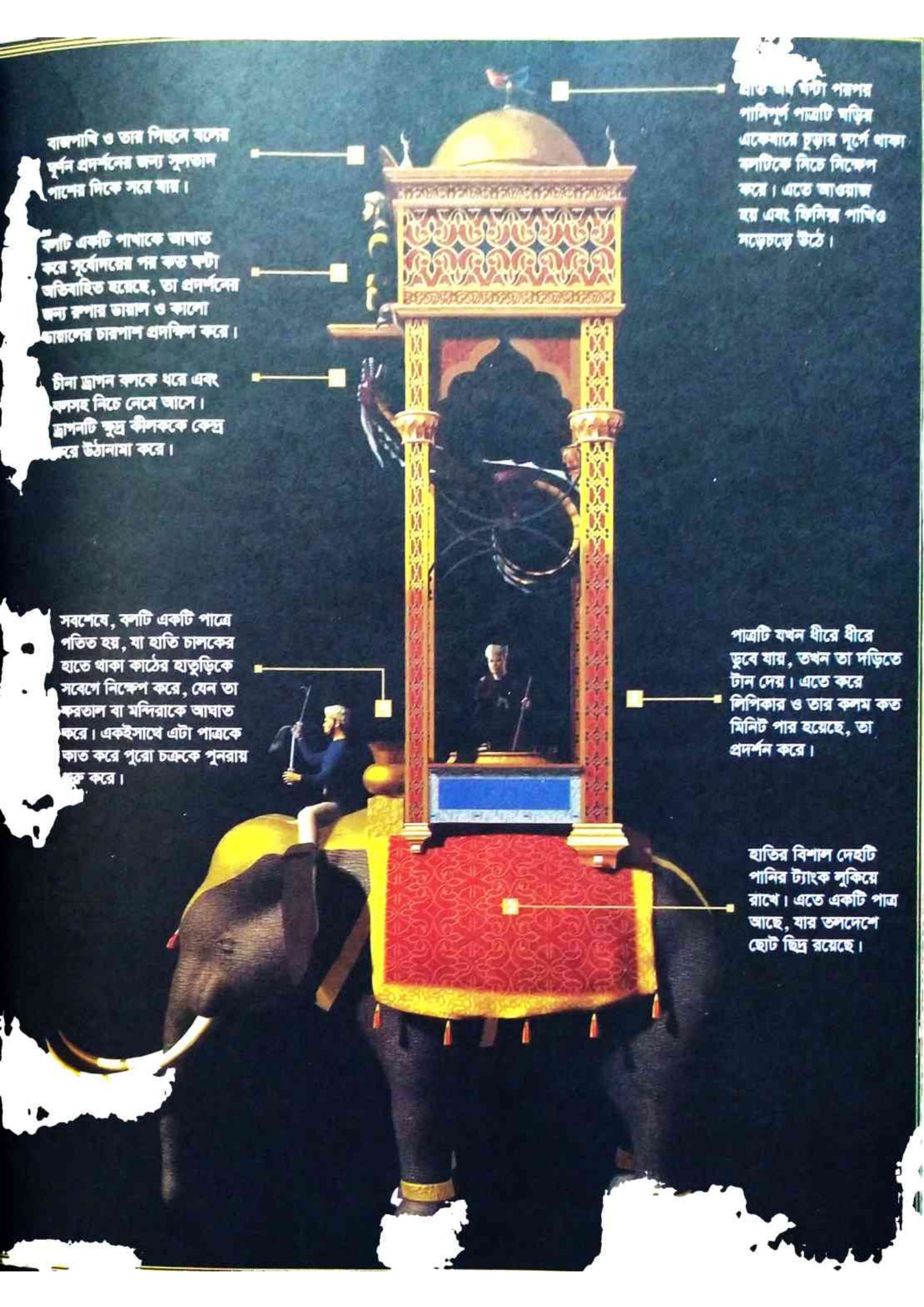
০৫ দাবা

বুদাপেস্টের স্নানাগারের বহিরঙ্গনের উষ্ম জলাশয় থেকে বাষ্প উড়ছে, আর ওদিকে মার্বেলের দাবা-বোর্ডের উপর গুটিসুটি হয়ে লোকজন জটলা পাকিয়ে আছে। চীনে পার্কের মাঝে দাবা-বোর্ডগুলো বিছানো থাকে, যেমনিভাবে বিছানো আছে নিউইয়র্কের সেন্ট্রাল পার্কে। ৬৪ বর্গ একক ও ৩২-টি গুটি সম্বলিত মানস-যুদ্ধের এই খেলা প্রায় সব জাতিগোষ্ঠীর লোকেরাই খেলেছে। সাদামাটা আকার ও ধরন সত্ত্বেও এটাতে খেলা যাবে, এমন সম্ভাব্য প্রতিযোগিতার সংখ্যা গণনার বাহিরে।

দাবাকে ঘিরে যত ধরনের গল্প-কাহিনী, উপমা ও ব্যক্তিত্ব আছে, তা এটাকে এক রহস্যময় মাত্রা দিয়েছে এবং এই খেলার সুনির্দিষ্ট উৎস আজও অজানা। হয় এটা ভারত থেকে এসেছে, নতুবা পারস্য থেকে। ১৪শ শতাব্দিতে ইবনে খালদূন দাবাকে সাসা ইবনে দাহির নামের প্রখ্যাত এক ভারতীয় বিদ্বানের সাথে সম্পৃক্ত করেন।

প্রাচীন ভারতে চতুরঙ্গ নামে একটি খেলা ছিল, যার অর্থ: 'চার অঙ্গ বা বাহুর সমাহার'। সম্ভবত এটা ভারতীয় সেনাবাহিনীর চারটি শাখাকে বোঝাচ্ছে, অর্থাৎ হাতি, অশ্বারোহী, রথ এবং পদাতিক সৈন্য। চতুরঙ্গ ঠিক দাবা না হলেও এটাকে আজকের দিনের দাবার পূর্বপুরুষ বলা যায়।

১৪শ শতাব্দির পারসীয় এক পাণ্ডুলিপি আমাদের জানাচ্ছে যে, কীভাবে ভারতীয় এক দূত পারস্যের দরবারে দাবা নিয়ে উপস্থিত হয়, যেখান থেকে মধ্যযুগীয় স্পেনে ভ্রমণকালে আরবদের দ্বারা এটা ইউরোপে পৌঁছায়।

ইউরোপে পৌঁছানোর পূর্বে পারসীয়রা নিজেদের যুদ্ধবাজি ক্রিয়া ব্যবহার করে এই খেলাকে *ছাতরঞ্জে* বদলে দেয়। আরবরা পারস্যে এসে দাবা বা তৎকালীন সুবিদিত শতরঞ্জের সংস্পর্শে আসে এবং এটাকে তারা নিজেদের সংস্কৃতিতে আত্মীভূত করে নেয়।

ওই সময় খেলার গুটিগুলো ছিল: *শাহ* – রাজা; *ফিরযান* – সেনাপতি, আধুনিক সময়ে এসে যা রাণী; *ফীল* – হাতি, আজ যা বিশপ; ফারাস – ঘোড়া; রুখ – রথ, যা এখন ক্যাসল বা নৌকা; এবং *বাইদাক* – পদাতিক সৈন্য বা বোড়ে।

সাধারণ জনগণের পাশাপাশি অভিজাত লোকদের মাঝেও খেলাটি ভীষণ জনপ্রিয়তা লাভ করে, আর বিশেষভাবে আব্বাসীরা এটাকে লুফে নেয়। আস-সূলী, আর-রাযী, আল-আদানী এবং ইবনে নাদিম ছিলেন ভীষণ পারদর্শী দাবাড়ু। বিশ্ব শতাব্দির মাঝামাঝিতে রুশ গ্র্যান্ড মাস্টার ইউরি আভেরবাক তার এক চ্যাম্পিয়নশিপ খেলায় এক আশ্চর্যজনক চাল চেলে বিজয়ী হন। অনেকেই এটাকে এক নতুন উদ্ভাবনচতুর চাল মনে করেন। কিন্তু এক হাজার বছরের বেশি সময় আগে আস-সূলী এই চাল কল্পনা করে গেছেন।

আরব গ্র্যান্ড মাস্টারগণ দাবা, এটার নিয়ম-কানুন ও কৌশল নিয়ে ব্যাপক লিখেছেন, যা মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে।

রাজা দশম আলফোনসোর ১৩শ শতাব্দির Libros de Ajedrez গ্রন্থের এই চিত্রকর্ম দেখাচ্ছে: তাঁবুতে একজন মুসলিম ও একজন খ্রিস্টান দাবা খেলছে।
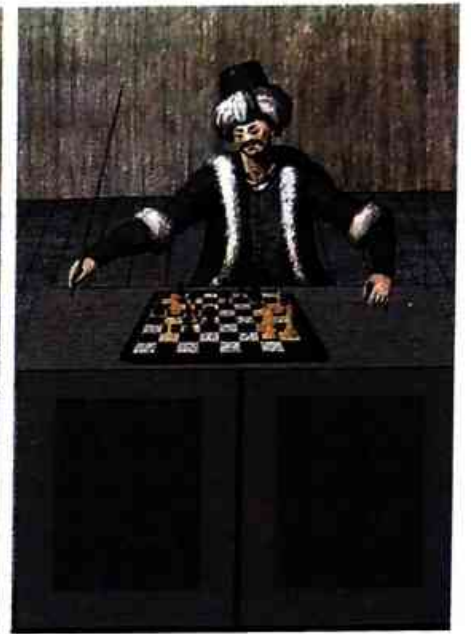
বায়েঃ আবু বকর আস-সুলীর "মুনতাখাব কিতাব আশ-শাতরঞ্জ" গ্রন্থটি ১০ম শতাব্দির শুরুর দিকের দাবা-টেবিলের একটি ছোট মডেল অঙ্কন করেছে। আরবীতে লেখা রয়েছে, 'কালো জিতে যাচ্ছে এবং এবার তার পালা'। ধারাবিবরণীসহ এটা একটি খেলা, নাকি খেলার প্রক্রিয়া নির্দেশক ম্যানুয়েল, সে ব্যাপারে পণ্ডিতগণ নিশ্চিত নন। মাঝে এবং ডানেঃ ১৭৬৯ খ্রিস্টাব্দের কেম্পেলেন নির্মিত লৌহ মুসলিম 'রোবট', যেটার আলমারির মধ্যখানে একজন চৌকস দাবাড়ু লুকিয়ে থাকতো। ওই দাবাড়ু অত্যন্ত দক্ষতার সাথে ওই সময়ের অন্য পারদর্শী দাবাড়ুদের পরাস্ত করতো।

দাবার ইতিহাস, খেলার সূচনা, সমাপ্তি এবং সমস্যা নিয়ে বহু গ্রন্থ লেখা হয়েছে। আনুমানিক ১৩৭০ খ্রিস্টাব্দের দিকে রচিত *"দাবা খেলার রণকৌশলের উদাহরণ"* নামের গ্রন্থটি প্রথমবারের মতো 'কানা সন্ন্যাসিনী ও তার তপস্বিনী'-এর মতো দাবা খেলার সূচনা ঘটায়।

সংস্কৃতির প্রবল বায়ু বয়ে আনা বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ ও ধারা সৃষ্টিকারী যিরইয়াব ৯ম শতাব্দির শুরুর দিকে আন্দালুসে দাবা নিয়ে আসেন। 'চেকমেট' শব্দটি পারস্য ভাষা থেকে উদ্ভূত, যা '*শাহমাত*' শব্দের বিকৃতরূপ। *শাহমাত* শব্দের অর্থঃ 'রাজা পরাস্ত হয়েছে'।

আন্দালুস থেকে স্পেনবাসী খ্রিস্টান, মোজারাব এবং উত্তর স্পেনের পিরিনীয় পর্বতমালা অতিক্রম করে একেবারে দক্ষিণ ফ্রান্সের পার্বত্য অঞ্চল পর্যন্ত দাবা পৌঁছে যায়। ইউরোপীয়দের দ্বারা প্রথম দাবার উল্লেখ পাওয়া যায় ১০৫৮ খ্রিস্টাব্দের দিকে, যখন বার্সেলোনার এরমেসিন্ডের স্ত্রীর উইল অনুসারে তিনি তার স্ফটিকে তৈরি দাবার গুটিগুলো নাইমে অবস্থিত সেন্ট জাইলস আশ্রমে দান করে দেন। কয়েক বছর পরে অস্তিয়ার কার্ডিনাল দামিসি পোপ পঞ্চম গ্রেগরির কাছে এই আর্জি জানিয়ে পত্র লেখেন যে, তিনি যেন যাজকদের মাঝে 'ধর্মদ্রোহীদের খেলা' ছড়িয়ে পড়া প্রতিরোধকল্পে দাবার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন।

বাণিজ্য পথ ধরে মধ্য এশিয়া থেকে শুরুর দিকের রাশিয়ার দক্ষিণাঞ্চলের শুষ্ক প্রান্তর পর্যন্ত দাবা ছড়িয়ে পড়ে: ৭ম ও ৮ম শতাব্দির পারসীয় দাবা-গুটি সমরকন্দ ও ফারগানাতে পাওয়া গেছে। ১০০০ খ্রিস্টাব্দের দিকে ভাইকিং বাণিজ্য পথ ধরে দাবা আরও দূরে ছড়িয়ে পড়ে, যেহেতু ভাইকিংরা এটা স্ক্যান্ডেনেভিয়া পর্যন্ত নিয়ে যায়। ওইসব বাণিজ্য পথ ধরে ১১শ শতাব্দির দিকে দাবা আইসল্যান্ড পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে এবং ১১৫৫ খ্রিস্টাব্দে লেখা আইসল্যান্ডীয় বীরত্বগাথায় ডেনিশ রাজা কুন্ট দ্য গ্রেট-এর কথা আলোচিত হয়, যেখানে ১০২৭ খ্রিস্টাব্দে রাজার দাবা খেলার বিষয়টি আলোচিত হয়েছে।

১৪শ শতাব্দির দিকে দাবা ইউরোপে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং 'বিচক্ষণ' নামে পরিচিত রাজা দশম আলফোনসো ১৩শ শতাব্দিতে *Book of Chess and Other Games* (দাবা এবং অন্যান্য খেলা) শীর্ষক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। গত ৮-শতাব্দি ধরে দাবার ইতিহাস কেবল সমৃদ্ধি হয়নি, বরং এটা নানা হাস্যরসাত্মক ঘটনারও জন্ম দিয়েছে, যেমন: ১৭৬৯ খ্রিস্টাব্দের রোবটিক দাবাড়ু।

হাঙ্গেরীয় ওলফাংগ ডি কেম্পেলেন তার অন্ধ দাবাপ্রেমী রাণী, সম্রাজ্ঞী মারিয়া থেরেসাকে একটি উপহার দেয়ার কথা ভাবলেন এবং তিনি রাণীকে 'লৌহ মুসলিম' নামের একটি দাবার রোবট মেশিন উপহার দেন, পরবর্তীতে যেটার নাম 'তুর্কি উছমানী' (অটোমান তুর্ক) রাখা হয়। এই রোবট এতটাই দক্ষতার সাথে দাবা খেলতো যে, ওই সময়ের বাঘা বাঘা দাবাড়ুকে পর্যন্ত হারিয়ে দিতো। এটার নিচে থাকা আলমারির কামরার মাঝে এক দাবাড়ু জড়ো হয়ে বসে থাকতো। মানুষজন এই পাগড়ি পরিহিত রোবটের কেরামতি দেখার জন্য মাইলের পর মাইল পাড়ি দিতো। প্রকৃতপক্ষে, ১৫ জন স্বতন্ত্র দাবাড়ু ৮৫ বছর ধরে অটোমান 'রোবটিক' তুর্ক ছদ্মবেশে এই রোবটকে অধিকারে রেখেছিল।
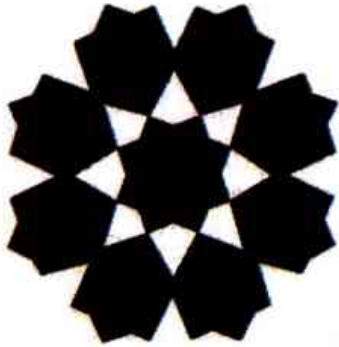
০৬ সঙ্গীত

সঙ্গীত ছাপিয়ে গেছে মহাদেশ, সভ্যতা-সংস্কৃতি, মানুষ ও প্রকৃতির গণ্ডি। ভাষার মতো এটাও আমাদের যোগাযোগে সহায়তা করে। কিন্তু বিংশ ও একবিংশ শতাব্দির শিল্পী ও গায়কেরা কি এটা জানে, তাদের অধিকাংশ বাদ্যযন্ত্রই এসেছে ৯ম শতাব্দির মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিমদের হাত ধরে? এই মুসলিম শিল্পীগণ, বিশেষ করে আল-কিন্দী সঙ্গীতের স্বরলিপি তথা সঙ্গীতের লিখিত রূপ ব্যবহার করতেন। পাশাপাশি মুসলিমরা সঙ্গীতের স্বরগ্রামের নোট বা স্বরলিপির সুর সংকেত অক্ষরের পরিবর্তে বর্ণ দিয়ে নামকরণ করে, যাকে *Solmization* বলে। এই বর্ণমালাই আজকের সঙ্গীতের মৌলিক স্বরগ্রাম। আমাদের সকলেই দো, রে, মি, ফা, সো, লা, তি (বাংলায় সারে, গা, মা, পা, দা নি, সা)-এর সাথে পরিচিত। এই নোটগুলোর জন্য ব্যবহৃত আরবী বর্ণ – দাল, রা, মিম, ফা, সোয়াদ, লাম, সিন। আজকের স্কেল বা স্বরগ্রামের সাথে ৯ম শতাব্দিতে ব্যবহৃত আরবী বর্ণমালার উচ্চারণগত সাদৃশ্য দারুণভাবে লক্ষণীয়।

আল-কিন্দীর প্রায় ৭০ বছর পরে আল-ফারাবী ভায়োলিন পরিবাবের আদিপুরুষ *রাবাবাহ* ও টেবিল *যিথার* (বহুতারের) বাদ্যযন্ত্র তৈরি করেন। তিনি সঙ্গীতের উপর পাঁচটি গ্রন্থ লেখেন, যার মধ্যে সঙ্গীত তত্ত্বের উপর রচিত "*কিতাব মুউসিকি আল-কাবীর*" (সঙ্গীতশাস্ত্রীয় বড় পুস্তক) হচ্ছে তার অনন্যকীর্তি। ১২শ শতাব্দিতে, গ্রন্থটি হিব্রু ভাষায় অনুদিত হয় এবং পরবর্তীতে লাতিন ভাষায়। আল-ফারাবী ও তার গ্রন্থের প্রভাব ১৬শ শতাব্দি পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।

ভ্রাম্যমান শিল্পী, বণিক এবং পর্যটকগণ আরবী সঙ্গীতকে ইউরোপে দোরগোড়ায় পৌঁছানোর ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে এবং ৮০০ বছর ধরে মুসলিম শাসনাধীন স্পেন ও পর্তুগালের সাংস্কৃতিক ও শৈল্পিক রূচিবোধের ধারা গড়ে উঠার ক্ষেত্রে এটা যথেষ্ট ভূমিকা পালন করেছিল। এর একটি আদি নমুনা পাওয়া যাবে *Cantigas de Santa Maria* সংকলনটিতে। কাস্টিলা ও আরাগনের রাজা দশম আলফোনসো এল সাবিয়োর নির্দেশে ১২৫২ খ্রিস্টাব্দের দিকে এটা রচিত হয়। এই সংকলনে কুমারী মরিয়ামের উপর প্রায় ৪১৫-টি ধর্মীয় সঙ্গীত অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

> "৮ম শতাব্দির শুরুর দিকে আরবরা যখন ইউরোপে আসে, তখন তারা ছিল সঙ্গীতের বিকাশে ... বাদ্যযন্ত্র নির্মাণে ইউরোপীয় জাতিগোষ্ঠীর চেয়ে অত্যন্ত অগ্রসর, আর এভাবেই তাদের সাঙ্গীতিক প্রভাবের যথাযথ স্বীকৃতি প্রদান করা সম্ভব হবে।"
>
> – কার্ল এঙ্গেল, বিংশ শতাব্দির একজন সঙ্গীত-ইতিহাসবেত্তা।

ইউরোপে এই নতুন সঙ্গীত ছড়িয়ে দেয়ার ক্ষেত্রে বহু ব্যক্তির অবদান রয়েছে। উল্লেখ করার মতো প্রভাবকের ক্ষেত্রে কেবল একজনের নামই উঠে আসে, তিনি 'কালোপাখি' ডাকনামে পরিচিত যিরইয়াব। মূলত তার সুরেলা কণ্ঠ ও কালো গাত্রবর্ণের কারণে তার এ ডাকনাম। সহজাত প্রতিভার অধিকারী এই ব্যক্তি বাগদাদের এক প্রখ্যাত সঙ্গীত শিল্পীর শিক্ষার্থী ছিলেন।

উপরে: কামানী খিযির আগা রচিত গীতি কবিতা ও ছন্দ বিষয়ক গ্রন্থ "তাফহীম আল-মাক্বামাত"-এর ১৮শ শতাব্দির পাণ্ডুলিপিতে চিত্রিত একটি কিতারা বা গিটার। নিচে: মরক্কোর ঐতিহ্যবাহী সঙ্গীত শিল্পীরা সঙ্গীত পরিবেশন করছে।

দশম আলফোনসোর Cantigas de Santa Maria সংকলনে দুজন সঙ্গীত শিল্পীর চিত্র চিত্রিত হয়েছে।

কিন্তু সঙ্গীতে তার প্রতিভা ও শ্রেষ্ঠত্ব ধীরে ধীরে তার সঙ্গীতগুরুকে পিছনে ফেলে দেয়। আর তাই উমাইয়া খলীফা তাকে আন্দালুসে আমন্ত্রণ জানায়।

৮২২ খ্রিস্টাব্দে উমাইয়া খলীফা দ্বিতীয় আবদুর রহমানের শাসনাধীন কর্ডোবার দরবারে যিরইয়াব স্থায়ী হন। এখানে যিরইয়াব সমৃদ্ধি ও তার শিল্পের সমাদর লাভ করেন এবং মাসিক ২০০ স্বর্ণ দিনার পারিশ্রমিক ও সেইসাথে আরও সুযোগ-সুবিধা পাওয়া একজন দরবারী বিনোদন শিল্পীতে পরিণত হন।

তার বহু অর্জনের মাঝে রয়েছে: কর্ডোবাতে দুনিয়ার প্রথম সঙ্গীত শিক্ষাদান কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা, যেখানে ঐকতান ও গীতি কবিতা শেখানো হতো; আরব বীণা (আল-উ'দ) ইউরোপে নিয়ে আসা এবং তাতে পঞ্চম আরেকটি তার যোগ করা, কাঠের মিজরাব (তার টানার জন্য অঙ্গলিসংলগ্ন ছোট ধাতুবিশেষ)-কে শকুনের বড়ো পালক দিয়ে তৈরি মিজরাব দ্বারা বদলে দেয়া এবং ছন্দোবদ্ধ ও তালের প্যারামিটার বা স্থিতিমাপকগুলোকে নিয়মের অধীন না রেখে সঙ্গীত তত্ত্বকে সম্পূর্ণ নতুনভাবে বিন্যাস করা।

বিংশ শতাব্দির ফরাসি ঐতিহাসিক হেনরি টোরেস বলেন, "প্রাচ্যের এই লোক (অর্থাৎ যিরইয়াবের) আগমনের পরপরই কর্ডোবা জুড়ে আমোদ-প্রমোদ ও বিলাসী জীবনের বাতাস বয়ে যায়। যিরইয়াবকে ঘিরে থাকতো কবিতা ও অপরূপ আনন্দে ঘেরা পরিবেশ। দু'জন ক্রীতদাসের সহচর্যে রাত্রি বেলায় তিনি তার গান রচনা করতেন এবং এরা তার জন্য বীণা বাজিয়ে দিতো। তিনি তার শিল্পকে নজিরবিহীন উচ্চতায় অধিষ্ঠিত করেছিলেন।"

সামরিক বাদকদল

অটোমান সাম্রাজ্য ছিল প্রথম ইউরো-এশীয় সাম্রাজ্য, যাদের স্থায়ী সামরিক বাদকদল ছিল। ১২৯৯ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত বিখ্যাত মেহতারহান সামরিক বাদকদল সুলতানের অভিযানসমূহে অংশ নিতো। যোদ্ধাদের মনোবল চাঙ্গা করতে এবং শত্রুদের ভয় পাইয়ে দিতে বাদকদলটি যুদ্ধের মাঝে বাজনা শুরু করে দিতো। অভিজাত সেনাদল, জানেসারিরও ৬ থেকে ৯ সদস্যের বাদকদল ছিল, যারা ড্রাম (ঝুরনা), শিঙ্গা, ত্রিকোণ বাদ্যযন্ত্র, মন্দিরা (ঝিল) এবং কেটলি জাতীয় যুদ্ধের ড্রাম (কাস এবং নাক্কারা) বাজাতো। এসব বাদ্যযন্ত্র উটের পিঠে বহন করে আনা হতো।

শান্তি স্থাপন ও যুদ্ধ উভয়ক্ষেত্রে ইউরোপীয়রা জানেসারি বাদকদলের মুখোমুখি হতো। রাষ্ট্রদূতদের দেয়া বিভিন্ন অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানে অটোমান-তুর্কি বাদযন্ত্রের ব্যবহার ইউরোপে একটা ফ্যাশনে পরিণত হয়, যা 'তুরকিউরি' ফ্যাশন নামে পরিচিত ছিল। ১৬৮৩ খ্রিস্টাব্দে ভিয়েনার দ্বারপ্রান্তে জানেসারি সেনাদল পরাজিত হয় এবং তারা তাদের বাদ্যযন্ত্র ফেলে যায়। এই ঘটনা ইউরোপীয় সামরিক বাদকদলের উৎপত্তির পথ দেখায়। এমনকি নেপোলিয়ান বোনাপার্টের ফরাসি সামরিক বাদকদল পর্যন্ত অটোমান বাদ্যযন্ত্র, যেমন: মন্দিরা এবং কেটলি জাতীয় যুদ্ধের ড্রাম দ্বারা সজ্জিত ছিল। বলা হয় যে, অস্ট্রারলিটসের যুদ্ধে (১৮০৫) নেপোলিয়ানের সাফল্যের পিছনে বিউগলের ঝঙ্কার মানসিক প্রভাবে অন্যতম ভূমিকা রেখেছিল।

অটোমান সাম্রাজ্যের একটি জানেসারি বাদকদল।

০৭ পরিচ্ছন্নতা

মধ্যযুগ কথাটা আসলেই আমাদের চোখের সামনে দুর্গন্ধময়, অন্ধকার, এলোমেলো ও অপরিচ্ছন্ন পরিবেশের চিত্র ভেসে আসে। কিন্তু এমনটি যদি মুসলিম বিশ্বের জন্য ভেবে থাকেন, তবে আপনি বড় ধরনের ভুল করবেন। বরং ১০ম শতাব্দিতে ইসলামী বিশ্ব যেভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা চর্চা করতো এবং তাদের গোসলখানায় যে ধরনের ব্যবহার্য সামগ্রী ছিল, সেগুলো আজ আমাদের যা আছে, তার সাথে পাল্লা দেয়ার সামর্থ্য রাখে।

পরিচ্ছন্নতা ইসলামে অপরিহার্য এবং প্রতিটি সালাতের আগে ওজু করতে হয়। ১৩শ শতাব্দির বিশিষ্ট যন্ত্র প্রকৌশলী আল-জাযারী রচিত *"কিতাব ফী মারিফাতিল হিয়াল আল-হানদাসা"* গ্রন্থে রোবটিক ওজু মেশিনেরও বিবরণ রয়েছে। ময়ূরের মতো দেখতে সুবিন্যস্ত মেশিনটি প্রত্যেক অতিথির কাছে আনা হতো, যিনি পানি প্রবাহের জন্য ময়ূরের মাথায় চাপ দিতেন এবং এতে করে ওজু করার জন্য পর্যাপ্ত পানি আটবারে অল্প অল্প করে প্রবাহিত হতো। কিছু মেশিন আপনাকে তোয়ালে পর্যন্ত দিতে সক্ষম ছিল।

তেল (সাধারণত জলপাই তেলের) সাথে আল-ক্বালী (লবণ জাতীয় পদার্থ) মিশিয়ে মুসলিমগণ সাবান প্রস্তুত করতো। পাণ্ডুলিপি অনুসারে সঠিক ঘনত্ব পেতে এই মিশ্রণ সেদ্ধ করা হতো এবং শক্ত হওয়ার জন্য রেখে দেয়া হতো। এরপর এই সাবানগুলো স্নানাগারে ব্যবহার করা হতো।

> "আল্লাহ সুন্দর (জামীল) এবং তিনি সৌন্দর্য ভালোবাসেন।"
> – নবী মুহাম্মদ (ﷺ) [*সহীহ মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত*]

মধ্যযুগীয় মুসলিমগণ তাদের বেশভূষার ব্যাপারে অনেক দূর এগিয়ে যায়। বিখ্যাত চিকিৎসক ও সার্জন আয-যাহরাবী ছিলেন এমনই এক দক্ষ কারিগর, যার সম্পর্কে হাসপাতাল বিভাগে আপনি আরও জানতে পারবেন। তিনি তার চিকিৎসা গ্রন্থ *"আত-তাসরীফ"*-এ *'সৌন্দর্যের নানা ঔষধ'* শিরোনামে স্বতন্ত্র অধ্যায়ে কসমেটিক (প্রসাধনী) নিয়ে পূর্ণ আলোচনা করেছেন।

ইসলামের গণ্ডির ভেতরে থেকে তিনি চুল ও ত্বকের যত্ন, সৌন্দর্যবর্ধন, দাঁতের শুভ্রতা বৃদ্ধি এবং দাঁতের মাড়ি শক্ত করা নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি তার গ্রন্থে নাকের স্প্রে, মুখ ধৌত করার তরল (মাউথওয়াশ) এবং হাতের ক্রিম নিয়েও আলোচনা করেছেন। এমনকি তিনি সুগন্ধি লাঠি নিয়েও আলোচনা এনেছেন, যা স্থির থেকে গড়িয়ে চলতো ও বিশেষ ছাঁচে চাপ দিয়ে বসানো থাকতো, অনেকটা আজকের দিনের রোল-অন দুর্গন্ধনাশকগুলোর (*roll-on deodorant*) মতো। এছাড়াও তিনি চুল উঠানোর কাঠি, চুলের রঙ – যা স্বর্ণকেশী চুল কালো করে, এবড়োথেবড়ো বা কোঁকড়ানো চুল সোজা করার লোশন ইত্যাদি ঔষধ মেশানো প্রসাধনীরও বিবরণ দেন। সানট্যান লোশন (সূর্যরশ্মি থেকে ত্বকের সুরক্ষার লোশন) ও তার উপাদানগুলোর উপকারিতা নিয়েও মুসলিম বিশ্বে আলোচনা হয়েছে এবং এই জিনিসগুলোর সবই প্রায় এক হাজার বছর আগেকার, আর তা ভাবতেই রীতিমতো অবাক হতে হয়।

পাণ্ডুলিপিতে আল-জাযারীর ওজু মেশিন

"যখন তোমরা সালাতের জন্যে উঠো, তখন স্বীয় মুখমণ্ডল ও হাত দুটো কনুই পর্যন্ত ধৌত করো, মাথা মাসেহ করো এবং পদযুগল গিটসহ।"

– কুরআন (সূরা আল-মায়িদা: ৬)

বর্তমান ইরাকের কুফাতে জন্ম নেয়া আল-কিন্দী সুগন্ধির উপর *"কিতাব কিমিয়া আল-ই'তরি ওয়া তাসয়িদাত"* (*সুগন্ধি ও পাতনের রসায়ন*) নামে একটি গ্রন্থ লেখেন। তার গ্রন্থে সুগন্ধি তেল, মলম, ঝাঁঝালো পানি এবং দামি ঔষধের নকল প্রস্তুতের উপর ১০০'রও বেশি রেসিপির বিবরণ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। প্রথমদিকে সমাজের অধিকতর বিত্তবানরা এগুলো ব্যবহার করতো, পরবর্তীতে এগুলো সবার জন্য সহজলভ্য হয়ে যায়।

মুসলিম রসায়নবিদগণ উদ্ভিদ ও ফুলকে পাতন করে সুগন্ধি এবং রোগনিরাময়ক ঔষধের প্রধান উপাদানগুলো প্রস্তুত করতেন।

এ সকল প্রক্রিয়া ও ধারণা বণিক, পর্যটক ও ক্রুসেডারদের বদৌলতে ইউরোপে অনুপ্রবেশ করে। বিবিসি প্রামাণ্যচিত্র *What the Ancients Did for Us: The Islamic World* উদ্ধৃত করে যে, মুসলিমদের এই জ্ঞান দক্ষিণ ফ্রান্সের হটি প্রোভেন্স পর্যন্ত পৌঁছে যায়, যেখানে সুগন্ধি ইন্ডাস্ট্রির জন্য উপযোগী আবহাওয়া ও উপযুক্ত ধরনের মাটি রয়েছে এবং ৭০০ বছর পার হওয়ার পরও যা আজও সক্রিয়।

ইসলামের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রসাধনী হচ্ছে: হেন্না [মেহেদি], যা এর সৌন্দর্য এবং দক্ষ হাতের জটিল কারুকার্যের জন্য পরিচিত। ইসলামের বিস্তৃতির সাথে সাথে দুনিয়ার বিভিন্ন অংশে হেন্না ছড়িয়ে পড়ে এবং পরিণত হয় অপরিহার্য প্রসাধনী উপকরণে।

নবী মুহাম্মদ (ﷺ) এবং তার সাহাবীগণ তাদের দাড়ি রঙ করতেন, নারীরা তাদের হাত ও পা সজ্জিত করতো এবং আজকের নারীদের মতো তারাও তাদের চুল রঙ করতো। আধুনিক বিজ্ঞানীদের অনুসন্ধান মোতাবেক হেন্না ব্যাকটেরিয়া, ফাংগাস (পচন) এবং রক্তক্ষরণ প্রতিরোধ করে। এথলেট বা ক্রীড়াবিদদের পা, ত্বকে ফাংগাসের সংক্রমণ ও প্রদাহ উপশমে এটা বেশ কার্যকর। এদের পাতা ও বীজ ঔষধি গুণাগুণ বহন করে এবং উভয়ে দেহ ও মাথাকে ঠাণ্ডা করার অনুঘটক হিসেবে কাজ করে। এছাড়াও হেন্নাতে নানা প্রাকৃতিক উপাদান রয়েছে, যা চুলের পুষ্টির জন্য ব্যবহার করা হয়।

শেক দীন মুহামেদ

১৭৭০ ও ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দের দিকে ইল্যান্ডের ব্রিংগটন ছিল ফুলের সমারোহে ঘেরা এক সমুদ্র রিসোর্ট এবং ঠিক এই মনোরোম দৃশ্যেই শেক (শেখ, উচ্চারণভঙ্গির কারণে এটা শেক-এ বদলে যায়) দীন মুহামেদ এখানে পা রাখেন।

শেক দীন মুহামেদ ভারতের পাটনার এক মুসলিম পরিবার থেকে আসেন। ১৭৫৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি ব্রিংগটন সমুদ্র বেলাভূমি, যেখানে বর্তমানে কুইন্স হোটেল রয়েছে, সেখানে মুহামেদের ভারতীয় বাষ্পস্নান নামে একটি স্নানাগার স্থাপন করেন। এখানের গোসল প্রক্রিয়া তুর্কি গোসলের মতোই ছিল, তবে সেবা গ্রহণকারী মক্কেলকে একটি ফ্লানেলে তাঁবুতে শোয়ানো হতো এবং তাকে ভারতীয় ছাম্পি (শ্যাম্পু) নামের এক বিশেষ সেবা বা থেরাপি মালিশ দেয়া হতো। এই অনন্যসাধারণ 'বাষ্পস্নান' ও শ্যাম্পু-স্নান তাকে চূড়ান্ত খেতাব এনে দেয় এবং তিনি পঞ্চম জর্জ ও পঞ্চম উইলিয়াম উভয়ের 'শ্যাম্পু সার্জন' হিসেবে নিযুক্ত হন।

০৮ ট্রিক ডিভাইস

যখন আপনি রুবিক্স কিউব নিয়ে নাড়াচাড়া করছেন, তখন হয়তো আপনার কানে ভেসে আসতে পারে তারের উপর ঝুলতে থাকা ধাতব বলের ক্লিক-ক্লিক আওয়াজ, যেহেতু এই ধাতব বলগুলো ছন্দের তালে তালে একে অপরকে ধাক্কা দিচ্ছে। ব্যবসার জন্যই হোক আর বিনোদনের জন্যই হোক – গেমস্ ও পাজেল্ অনেকের কাছে এগুলো মুগ্ধতার খোরাক।

মানুষের আনন্দ উপভোগের এই অনুভূতিকে করায়ত্ত করেছিল ৯ম শতাব্দির তিন ভাই। মুহাম্মদ ইবনে মূসা ইবনে শাকির, আহমাদ ইবনে মূসা ইবনে শাকির এবং আল-হাসান ইবনে মূসা ইবনে শাকির – এই তিন ভাই বনী মূসা ভ্রাতা নামেই সমধিক পরিচিত। তারা ৯ম শতাব্দির বাগদাদের বিখ্যাত বুদ্ধিবৃত্তিক একাডেমি বায়তুল হিকমার সদস্য ছিল, এ সম্পর্কে বিদ্যালয় বিভাগে আপনি আরও তথ্য পাবেন। গণিতজ্ঞ ও গ্রিক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধগুলোর অনুবাদক হওয়ার পাশাপাশি তারা অবিশ্বাস্য ধরনের এমনসব ট্রিক ডিভাইস নির্মাণ করেছিল, যেগুলোকে অনেকে বর্তমানের দামী খেলনার পূর্বপুরুষ আখ্যায়িত করেন। এই ভাইয়েরা নানা ধরনের ট্রিক ডিভাইস ডিজাইন ও উদ্ভাবন করে তাদের সহকর্মীদের মোহাচ্ছন্নতাকে ব্যাপকভাবে উসকে দিতো এবং তাদের *"কিতাবুল হিয়াল"* *(উদ্ভাবনকুশলী ডিভাইস)* গ্রন্থে একশতেরও বেশি ট্রিক ডিভাইসের তালিকা রয়েছে। বস্তুত এগুলোই ছিল যান্ত্রিক প্রযুক্তির সূচনা। আজকের দিনের খেলনার মতো এগুলোর ব্যবহারিক কার্যক্রম খুব সামান্য হলেও ১১০০ বছর আগের পুরানো এসব যান্ত্রিক নির্মাণ কৌশল সত্যিকার অর্থে বিস্ময়কর কারিগরি নৈপুণ্য ও জ্ঞানের চূড়ান্ত উৎকর্ষের বহিঃপ্রকাশ ছিল।

এসব নির্মাণ কৌশলের অধিকাংশই পানি, নকল পশুপাখি ও আওয়াজ তৈরিকে ঘিরে আবর্তিত হতো। উদাহরণস্বরূপ, পানি পানরত ষাঁড়ের পানি পান শেষ হলে সে তৃপ্তির ঢেকুর তুলতো। অনেকগুলো প্রকোষ্ঠ, ভাসান (ভাসমান ফাঁপা বস্তু), ভ্যাকুম (বায়ুশূন্য বস্তু) এবং প্লাগ (বা ছিপির) সিরিজ পানিপূর্ণ করে এমনটি করা হতো।

নিম্নের ডায়াগ্রাম খেয়াল করুন এবং দেখুন তো আপনি বনী মূসা ভাইদের চিন্তা অনুসরণ করতে পারেন কিনা:

প্রাথমিক ট্যাপ (পিপার ছিপি) দিয়ে পানি কম্পার্টমেন্ট–এ তে প্রবেশ করে এবং এরপর ট্যাপ বন্ধ হয়ে যায়। এরপর বাটি পানি পূর্ণ হয়। এতে করে ভাসান–এম (বিপরীত ডায়াগ্রামের দেখা যাবে) পানির স্তর পর্যন্ত উঠে আসে এবং কপাটিকার বাহির থেকে প্লাগকে টেনে ধরে। পানি নালাপথ ধরে কম্পার্টমেন্ট–এ থেকে কম্পার্টমেন্ট–বি তে প্রবাহিত হয়। পানির বৃদ্ধির সাথে সাথে ভাসান–বি উপরে উঠতে থাকে এবং পানি ভাসান–বি কে উপরে ঠেলতে থাকে, এতে করে দুটো কম্পার্টমেন্টের মধ্যে পানি প্রবাহ নিশ্চিত হয়। কম্পার্টমেন্ট–বি যখন একেবারে বায়ুশূন্য হয়ে পড়ে, তখন কম্পার্টমেন্ট–এ তে একটি বায়ুশূন্য অবস্থার সৃষ্টি হয়, যেহেতু এটাতে বাতাস প্রবেশের কোনো পথ খোলা নেই। ঠিক তখনই বাটি থেকে পানি পাইপের মাধ্যমে টানা শুরু হয় এবং তা কম্পার্টমেন্ট–এ তে প্রবেশ করতে শুরু করে। বাটি থেকে যখন সবটুকু পানি শেষ হয়, তখন বাতাস শোষণ করা হতে থাকে, তাই এটা মনে হতে থাকে যে, ষাঁড়টি তৃপ্তির ঢেকুর তুলছে।

৯ম শতাব্দির বনী মূসা ভাইদের 'পানি পানরত ষাঁড়' রোবটকে ব্যাখ্যাকারী ডায়াগ্রাম।

বাটিতে আর কোনো পানি নেই, যা ভাসমান প্লাগটিকে ধরে রাখবে, তাই ওই নির্দিষ্ট প্লাগ বন্ধ হয়ে যায় এবং কম্পার্টমেন্ট-এ কে খালি করার জন্য কেবল প্লাগ-বি খোলা থাকে। কম্পার্টমেন্ট-বি খালি হয় বি ও সি-এর মধ্যবর্তী ছোট ছিদ্র দ্বারা। কম্পার্টমেন্ট-সি-এর একটি পাশ থেকে মুক্তভাবে বাতাস প্রবাহের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

মেধা ও মননকে নাড়িয়ে দেয়া এই ডিভাইস লোকদের ঘন্টার পর ঘন্টা বিমোহিত রেখেছিল, সেটা হলফ করে বলা যায়।

বনী মূসা ভাইদের আরেকটি ট্রিক ডিভাইস ছিল দুই নলা ফ্লাস্ক। প্রতিটি নলে আলাদা রঙের তরল পদার্থ ঢালা হতো, কিন্তু ঢালার সময় 'ভুল' নল দিয়ে 'ভুল' তরল বেরিয়ে আসতো। অনেকটা জাদুকরের মতো যে কিনা নিজের কনুই থেকে কমলার শরবত বানাতে পারেন, কিন্তু এই ভাইদের জামার আস্তিনে এর থেকেও উন্নত ও সাদামাটা, কিন্তু জটিল নির্মাণ কৌশল লুকানো থাকতো।

আসলে তারা জগটিকে সম্পূর্ণভাবে আলাদা দুটো উলম্ব ভাগে বিভক্ত করেছিল। ডান পাশের ফানেল দিয়ে ডান পাশে তরল যেত এবং বাম পাশের ফানেল দিয়ে বাম পাশে তরল যেত, কিন্তু তরল পদার্থকে এভাবে বের হতে দেয়া যাবে না। এজন্য নির্গমনের জন্য আরেকটি পাইপ লাগানো হতো। দর্শক হিসেবে আসা লোকজন অবশ্যই এগুলোর কিছুই দেখতো না এবং যদিও এটা বেশ সাদামাটা ছিল, তথাপি এই চালাকি তাদেরকে প্রভাবিত ও মুগ্ধ করতো। এই ভাইদের মজা করার ভাবনা তাদেরকে ফোয়ারা ডিজাইনের দিকে ধাবিত করে। আরও জানতে চাইলে নগর বিভাগের ঝরনা অধ্যায়ে একটু চোখ বুলিয়ে আসতে পারেন।

> "কৌতুক কোনো জিনিস নয়, বরং এটা এক প্রক্রিয়া, এক চালাকি – যা আপনি শ্রোতার মনের উপর চালেন। আপনি তার সাথে একটি যুক্তিসঙ্গত উদ্দেশ্য দিয়ে শুরু করেন এবং এরপর হঠাৎ এক মোচড় দিয়ে আপনি তাকে আদৌ কোনো স্থানে রাখেন না কিংবা তাকে এমন এক ময়দানে ফেলে আসেন, যেখানে যাওয়ার প্রত্যাশা সে করেনি।"
>
> – ম্যাক্স ইস্টম্যান, মার্কিন লেখক
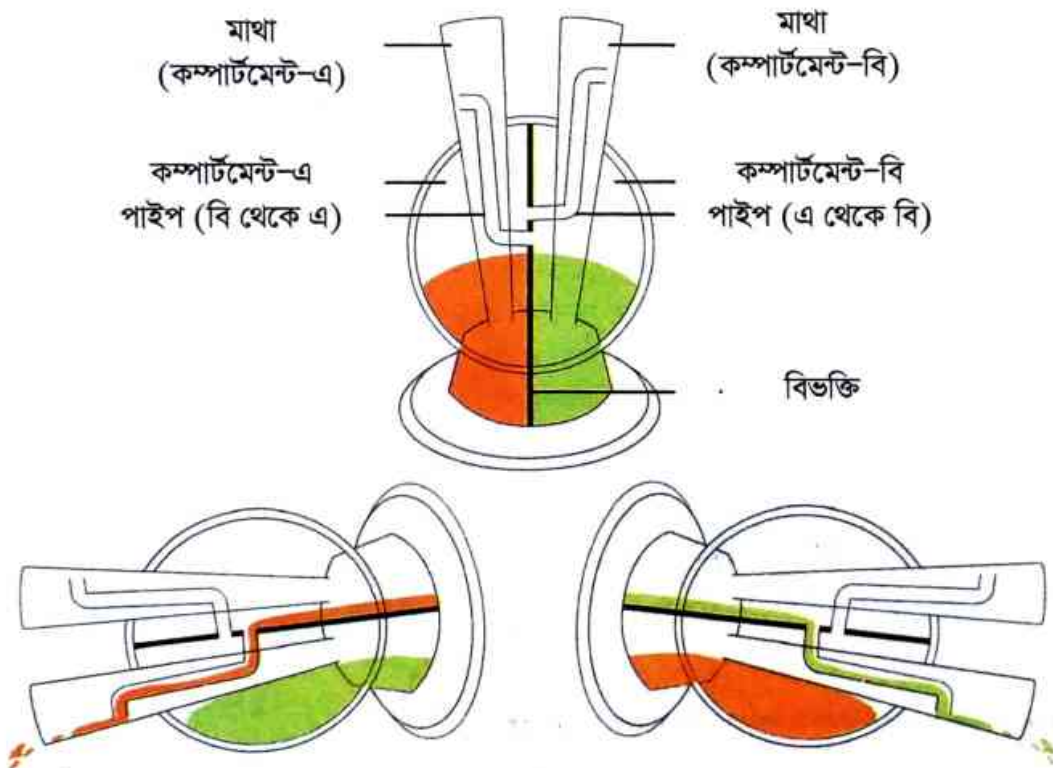
বনী মূসা ভাইদের গেমস 'দুই নলা ফ্লাস্ক'-এর অভ্যন্তরের একটি চিত্র।
উদ্ভাবনকুশলী এই ভাইদের নির্মিত এই ডিভাইস দর্শকদের বিমোহিত করতো।

০৯ দৃষ্টিশক্তি এবং ক্যামেরা

আমরা কীভাবে দেখি, এটা ভেবে শিশু বয়সে কখনো কি অবাক হয়েছেন? কিংবা কখনো কি ভেবেছিলেন যে, নিজের চোখ বন্ধ করলেই না আপনি সকলের থেকে আড়াল হয়ে যাবেন, না তারা আপনাকে দেখবে, আর না আপনি তাদের দেখবেন? দৃষ্টিশক্তির ব্যাপারে গ্রিক বিদ্বানদের ধারণা গতানুগতিক ধারণার চেয়ে কিছুটা পিছিয়ে ছিল এবং সে সময় আলোকবিজ্ঞানের প্রথম উপলব্ধি দুটো প্রধান তত্ত্ব (থিওরি) দ্বারা গঠিত ছিল।

প্রথম তত্ত্ব মতে, আমাদের চোখ থেকে আলো বেরিয়ে আসে, অনেকটা আজকের লেজার প্রযুক্তির মতো এবং আমাদের দৃষ্টি সীমাতে কোনো বস্তুর আগমন দ্বারা এই রশ্মিগুলো বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তাই চোখ থেকে কোনো বস্তুর উপর আলোর বিচ্ছুরণের কারণেই দর্শন ক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

দ্বিতীয় ধারণা মতে, আমরা কোনো বস্তু দেখি, কারণ ওই বস্তুর প্রতিনিধিত্বকারী কিছু একটা আমাদের চোখে প্রবেশ করে। এরিস্টটল, গ্যালেন ও তাদের অনুসারীগণ এই তত্ত্বে বিশ্বাস করতেন, কিন্তু এই তত্ত্ব অনুমান এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা সমর্থিত নয়।

দৃষ্টিশক্তির ব্যাপারে গ্রিক তত্ত্বগুলোকে প্রশ্নবিদ্ধ করে ৯ম শতাব্দির বহু শাস্ত্রে পারদর্শী আল-কিন্দী আধুনিক আলোকবিজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপন করেন। তিনি বলেন, আমরা তথা আমাদের অক্ষিকোটর বিচ্ছিন্ন আলোকরশ্মি দ্বারা দেখে না, যেমনটি ইউক্লিড বলেছেন। বরং আলোকরশ্মির ধারাবাহিক বিচ্ছুরণের ফলে ত্রিমাত্রিক আয়তন হিসেবে কোনো বস্তুর আবির্ভাব হলে আমরা ওই বস্তু দেখি।

১৬শ শতাব্দির ইতালীয় চিকিৎসক ও গণিতজ্ঞ জেরোনিমো কারদানো বলেন, "ইতিহাসের ১২ জন অনন্য সাধারণ মেধার একজন হলেন" আল-কিন্দী। কেননা আয়নাসহ ও আয়না ছাড়া দৃষ্টিশক্তি, কীভাবে আলোকরশ্মি সরল রেখায় চলাচল করে এবং দৃষ্টিশক্তির উপর দূরত্ব ও কোণের প্রভাব, একইসাথে দৃষ্টিভ্রমের মতো বিষয় নিয়েও তিনি আলোচনা করেছেন। রশ্মিবিজ্ঞান ও তাত্ত্বিক আলোকবিজ্ঞানের উপর আল-কিন্দী দুটো প্রবন্ধ লেখেন, যা ১৩শ শতাব্দিতে ইংরেজ বিদ্বান রজার বেকন ও জার্মান পদার্থবিদ উইটেলো ব্যবহার করেন। বিংশ শতাব্দির ডেনিশ বিদ্বান সেব্যাস্তিয়ান ভোজেলের মতে, "রজার বেকন আল-কিন্দীকে কেবল পার্সপেকটিভ বা বস্তুর উচ্চতা, দৈর্ঘ্য, গভীরতা, আয়তন ও দূরত্ব অনুযায়ী চিত্রাঙ্কন বিদ্যার একজন মহাগুরুই বিবেচনা করতেন না, বরং তিনি নিজের *Perspectiva* গ্রন্থে এবং তার এই শাখার অন্য পণ্ডিতরাও বারবার আল-কিন্দীর

ইবনুল হাইছামের তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে ১৩শ শতাব্দিতে কামালুদ্দীন আল-ফারিসীর আঁকা চোখের ব্যবচ্ছেদ। চোখের রেটিনায় প্রাপ্ত প্রতিচ্ছবির বিশ্লেষণে মস্তিষ্ক যে ভূমিকা পালন করে, আরবী লেখা তা-ই ব্যাখ্যা করছে।

রচিত আলোকবিজ্ঞান বিষয়ক লেখাগুলোর উদ্ধৃতি নকল করতেন।"

আল-কিন্দীর হাত ধরে মৌলিক প্রশ্নের সূচনা ঘটে, যার উপর ১০ম শতাব্দিতে আল-হাসান ইবনুল হাইছাম সৌধ নির্মাণ করেন এবং অবশেষে তিনিই ব্যাখ্যা করেন যে, আলোকরশ্মির প্রতিসরণের কারণেই দৃষ্টিশক্তি সম্ভবপর হয়েছে। বিংশ শতাব্দির প্রখ্যাত বিজ্ঞান বিষয়ক ইতিহাসবেত্তা জর্জ সারটন বলেন, আলোকবিজ্ঞান যেভাবে প্রভূত সমৃদ্ধি করেছে, তা ইবনুল হাইছামের কর্মের কারণেই সম্ভবপর হয়েছে এবং আলোকবিজ্ঞান সম্পর্কে আজ আমরা যা জানি, তার অধিকাংশই তিনি বৈজ্ঞানিকভাবে ব্যাখ্যা করে গেছেন।

প্রকৃতপক্ষে, ইবনুল হাইছামের আগেই ১০ম শতাব্দির পদার্থ বিজ্ঞানী বাগদাদের ইবনে সাহ্‌ল লেন্সের মাধ্যমে আলোর প্রতিসরণ নিয়ে কাজ করেন, যদিও আমরা এ ব্যাপারে নিশ্চিত নই যে, ইবনে সাহ্‌লের কাজের ব্যাপারে ইবনুল হাইছাম জানতেন কিনা। আল-হাসান ইবনুল হাইছাম সচরাচর যিনি ইবনুল হাইছাম নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ এবং পাশ্চাত্যে যিনি আলহাজেন নামে পরিচিত, তিনি এক হাজার বছর পূর্বেই এক নিখুঁত পরীক্ষা চালান, যার মাধ্যমে তিনি এই বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্রদান করতে সক্ষম হন যে, কোনো বস্তুতে আলো প্রতিফলিত হয়ে তা যদি চোখে প্রবেশ করে, তবেই আমাদের পক্ষে ওই বস্তু দেখা সম্ভব। ইবনুল হাইছামই প্রথম ব্যক্তি, যিনি গ্রিক তত্ত্বগুলোকে সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করেন।

প্রচ্ছদটি আলহাজেনের "কিতাব আল-মানাযির" গ্রন্থের ১৫৭২ খ্রিস্টাব্দের লাতিন সংস্করণ থেকে নেয়া, আল-হাসান ইবনুল হাইছাম পশ্চিমা জগতে আলহাজেন নামে প্রসিদ্ধ।

> "ইবনুল হাইছাম ছিলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মুসলিম পদার্থ বিজ্ঞানী এবং আলোকবিজ্ঞানের একজন শিক্ষার্থী। ইংল্যান্ড কিংবা সুদূর পারস্য, যেটাই হোক না কেন, সকলে একই ফোয়ারা থেকে পান করেছেন। কী বেকন কী কেপলার, বস্তুত তিনি ইউরোপের (প্রধান পণ্ডিতদের) উপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করেছিলেন।"
>
> – জর্জ সারটন তার *History of Science* গ্রন্থে

ইরাকের বসরাতে জন্ম নেয়া ইবনুল হাইছামের কাছে মিশরের সম্রাট নীলনদের বন্যার প্রভাব হ্রাস করার সাহায্য চেয়ে তাকে আমন্ত্রণ জানালে তিনি মিশরে আসেন। ইউক্লিড ও টলেমির 'গাণিতিক' পন্থা এবং প্রাকৃতিক দার্শনিকদের সমর্থিত 'প্রাকৃতিক' মূলনীতির মাঝে তিনিই সর্বপ্রথম সমন্বয় সাধন করেন। ইবনুল হাইছাম বলেন, "আলোকবিদ্যার জ্ঞানের চাহিদাই হচ্ছে প্রাকৃতিক ও গাণিতিক গবেষণার মাঝে সমন্বয় সাধন।"

তিনি একইসাথে গণিতজ্ঞ, জ্যোতির্বিদ, চিকিৎসক ও রসায়নবিদ ছিলেন, কিন্তু তার লেখা *"কিতাব আল-মানাযির"* গ্রন্থটি আলোকবিজ্ঞানের ভিত্তিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করেছে। গ্রন্থটি এ বিষয়ে মহাগ্রন্থ (*Magnum Opus*) হিসেবে পরিচিত, যাতে আলোর প্রকৃতি, বৃত্তান্ত, দর্শনক্রিয়ার কৌশল, চোখের গঠন ও ব্যবচ্ছেদ, প্রতিফলন ও প্রতিসরণ এবং ক্যাটপ্ট্রিক (আয়নাতে আলোর প্রতিফলন ও প্রতিসরণ ইত্যাদি) বিষয়াদির আলোচনা রয়েছে।

ইবনুল হাইছাম লেন্স নিয়েও গবেষণা করেন এবং তিনি বিভিন্ন ধরনের দর্পণ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান, যেমন: সমতল, গোলাকার, অধিবৃত্ত, নলাকার, অবতল ও উত্তল দর্পণ। চোখের উপর প্রতিসরণের জ্যামিতি প্রয়োগের মাধ্যমে চোখকে তিনি ডাইয়প্ট্রিক ব্যবস্থা হিসেবে বিবেচনা করতেন (ডাইয়প্টার – *লেন্সের ক্ষমতার একক*)। তিনি অত্যন্ত মেধার সাথে বায়ুমণ্ডলীয় প্রতিসরণের উপর অনুসন্ধান চালান এবং বায়ুমণ্ডলের সীমা ১৬ কিলোমিটার (১০ মাইল) হিসেব করেন। এটা বায়ুমণ্ডলের সর্বনিম্ন স্তর ট্রপস্ফিয়ারের সীমার আধুনিক হিসেব ১১ কিলোমিটার (৭ মাইলের) সাথে ভালোভাবেই সামঞ্জস্যপূর্ণ।

ইবনুল হাইছাম তার তত্ত্ব বা থিউরিগুলো যাচাইয়ের জন্য পরীক্ষালব্ধ প্রমাণ ব্যবহার করতেন। এটা তার সময়ে বেশ উদ্ভট বিষয় ছিল, যেহেতু ওই সময় পর্যন্ত পদার্থবিজ্ঞান অনেকটা দর্শনের মতোই ছিল এবং সেখানে পরীক্ষা-নিরীক্ষার বালা ছিল না। কোনো তত্ত্ব গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য পরীক্ষালব্ধ প্রমাণ একটি শর্ত, এই ধারণা তিনিই সর্বপ্রথম চালু করেন এবং তার গ্রন্থ *"কিতাব আল-মানাযির"* মূলত টলেমির *Almagest* গ্রন্থের সমালোচনা। এক হাজার বছর পর আজও এ গ্রন্থ অধ্যাপকদের দ্বারা উদ্ধৃত হয়। তিনি তার গবেষক শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের সময় তথ্যনির্ভর হতে বলেন। কিছু বৈজ্ঞানিক ঐতিহাসিক বিশ্বাস করেন যে, আলোকবিজ্ঞানে স্নেলের সূত্র প্রকৃতপক্ষে ইবনে সাহ্‌লের গবেষণা কর্ম থেকে উদ্ভূত।

الواجب على الناظر في كتب العلوم، إذا كان غرضه معرفة الحقائق، أن يجعل نفسه خصماً لكلِّ ما ينظر فيه.

"সত্য জানাটাই যদি গবেষকের মূল্য লক্ষ্য হয়, তবে তার জন্য আবশ্যক তার পড়া সবকিছুকে তার শত্রুতে পরিণত করা।"

– ইবনুল হাইছাম

ক্যামেরা অবস্কিউরা

দৃষ্টিশক্তির নতুন ধারণা

এক ব্যক্তির কারাবাস আবিষ্কার করে – কীভাবে আমরা দেখি, তার কার্যকালাপ

উল্লেখযোগ্য পরম্পরা: আমাদের চোখ থেকে নির্গত রশ্মিই কোনো বস্তুকে দৃশ্যমান করে, এই প্রাচীন ধারণা ইবনুল হাইছাম সমূলে উৎপাটন করেন।

স্থান: কায়রো, মিশর
তারিখ: ১১শ শতাব্দি
প্রধান ব্যক্তিত্ব: ইবনুল হাইছাম

আমরা কীভাবে দেখি? এই প্রশ্নের সমাধানে প্রাচীন গ্রিক পণ্ডিতদের মাঝে শতাব্দির পর শতাব্দি ধরে তর্ক-বিতর্ক লেগেই ছিল। কেউ বলেন, আমাদের চোখ থেকে রশ্মিগুচ্ছ বেরিয়ে আসে, আবার কেউ মনে করেন, কোনো বস্তুকে দৃশ্যমান করার জন্য কিছু একটা আমাদের চোখে প্রবেশ করে।

ইবনুল হাইছাম ইরাকের বসরাতে ৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তার জীবদ্দশাতে আলোকরশ্মি ও দৃষ্টিশক্তির ব্যাপারে আমাদের জানা সবকিছুকেই সম্পূর্ণরূপে বদলে দেন – যদিও তার এই বৈজ্ঞানিক সততার জন্য তাকে চরম মূল্য চুকাতে হয়েছে।

ঘটনাটি ছিল এরূপ: নীলনদের পূর্বাভাসহীন বন্যা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কায়রোর তৎকালীন খলীফা ইবনুল হাইছামকে ডেকে পাঠান এবং তিনি এটার কোনো সুরাহা করতে পারবেন কিনা, তা জানাতে বলেন। নিজের সামর্থ্যের উপর আস্থাবান ইবনুল হাইছাম দম্ভ সহকারে ভাবেন যে, বাঁধ ও কৃত্রিম জলাধার নির্মাণ করে এই বিশাল নদীকে শাসন করা যাবে। কিন্তু যখন তিনি তার নেয়া চ্যালেঞ্জের মাত্রা উপলব্ধি করেন, তখন বুঝে যান যে, এটা অসম্ভব একটা কাজ।

তার এই ব্যর্থতার জন্য খলীফার আক্রোশ থেকে পরিত্রাণ পেতে তিনি পাগলের ভান করার সিদ্ধান্ত নেন, আর তার সুরক্ষার জন্য খলীফা তাকে গৃহবন্দি করেন। এই কারাবাসের সময়ই ইবনুল হাইছাম ওই আবিষ্কার করে ফেলেন, যার জন্য তাকে সবচেয়ে বেশি স্মরণ করা হয়।

একদিন তিনি দেখেন, তার অন্ধকার কক্ষে একটি ছোট ফুটো (পিনহোল) দিয়ে আলো জ্বলজ্বল করছে এবং বিপরীত দেয়ালে বাহিরের দুনিয়ার ছবি বিচ্ছুরণ বা প্রতিচ্ছবি ফেলছে। আমাদের চোখ অদৃশ্য আলো পাঠায়, যার কারণে আমরা দেখতে সক্ষম হই, ওই সময়কার মানুষ এই প্রাচীন ধারণা বিশ্বাস করতো। কিন্তু ইবনুল হাইছাম উপলব্ধি করেন যে, প্রকৃতপক্ষে দৃশ্যমান কোনো বস্তু থেকে আলোকরশ্মি নিসৃত হয়ে আমাদের চোখে প্রবেশ করলেই আমরা ওই বস্তু দেখতে সক্ষম হই।

একটি কালো কামরা 'ক্যামেরা অবস্কিউরা'-তে পরীক্ষার মাধ্যমে তিনি দেখান যে, আলোকরশ্মি আমাদের চোখে জ্যামিতিক কোণক আকৃতির বিম্ব হিসেবে প্রবেশ করে। তিনি নানা ধরনের লেন্স ও দর্পণ নিয়েও পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান। ১০১১ থেকে ১০২১ খ্রিস্টাব্দের মাঝে লিখিত *"কিতাব আল-মানাযির"* গ্রন্থে তিনি তার এই নতুন তত্ত্বগুলোকে লিপিবদ্ধ করেন।

ইবনুল হাইছাম উপলব্ধি করেন যে, মানুষ মাত্রই ভুলপ্রবণ। তাই তিনি তার দেখা প্রাকৃতিক ঘটনাবলি সম্পর্কে সত্য উন্মোচনের জন্য সত্যায়ন, মূল্যায়ন ও পরীক্ষণের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। চাঁদ যখন আকাশের দিগন্তে থাকে, তখন তাকে বেশ বড়ো দেখায়, বিষয়টি অতীত ও বর্তমানের বহু মানুষের মতো ইবনুল হাইছামকেও অবাক করতো। পূর্বের বিদ্বানগণ এটাকে বায়ুমণ্ডলের প্রভাবে সৃষ্ট বলে বিশ্বাস করতেন। কিন্তু ইবনুল হাইছাম প্রথমবারের মতো অত্যন্ত নির্ভুলভাবে বলেন যে, এটা দৃষ্টিভ্রম – তথাপি কেন এমনটি ঘটে সে ব্যাপারে বিজ্ঞানীরা আজও নিশ্চিত নয়।

ইবনুল হাইছাম আলোকনির্ভর ডিভাইসের মূলভিত্তি স্থাপন করেন, যেমন: বিংশ শতাব্দির মাঝামাঝি সময়ের এই ডিভাইস।

পরবর্তীতে ১২৬০ খ্রিস্টাব্দের দিকে জন্ম নেয়া পারসীয় গণিতবিদ কামালুদ্দীন আল-ফারিসী ইবনুল হাইছামের রেখে যাওয়া তত্ত্ব উপাত্তের উপর কাজ করেন। রংধনুর রঙসমূহের ব্যাখ্যা করার প্রচেষ্টায় আল-ফারিসী বৃষ্টির ফোঁটার মডেল হিসেবে পানিপূর্ণ একটি গোলক আকৃতির দর্পণ নেন এটা দেখাতে যে, সূর্যের আলো পানির ফোঁটার মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় দু'বার বেঁকে যায়। ইবনুল হাইছামের প্রমাণ অনুসন্ধান পরবর্তী বিদ্বানদের পরীক্ষামূলক বিজ্ঞান এবং যুক্তিনির্ভর পন্থার বিকাশের দৃশ্যপট তৈরি করে দেয়।

> "আলোকরশ্মি দ্বারা আলোকিত যে কারো (এবং অবশ্যই স্বআলোকিত বস্তুর ক্ষেত্রেও) আলো বিপরীত দিকে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। এই কারণে চোখ যখন কোনো দৃশ্যমান বস্তুর বিপরীতে থাকে এবং ওই বস্তু কোনো না কোনোভাবে আলো দ্বারা আলোকিত হয়, তখন দৃশ্যমান বস্তুর আলোকবিম্ব থেকে আলো চোখের উপরিতলে প্রবেশ করে।"
>
> – ১১শ শতাব্দির ইবনুল হাইছামের "কিতাব আল-মানাযির" গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত
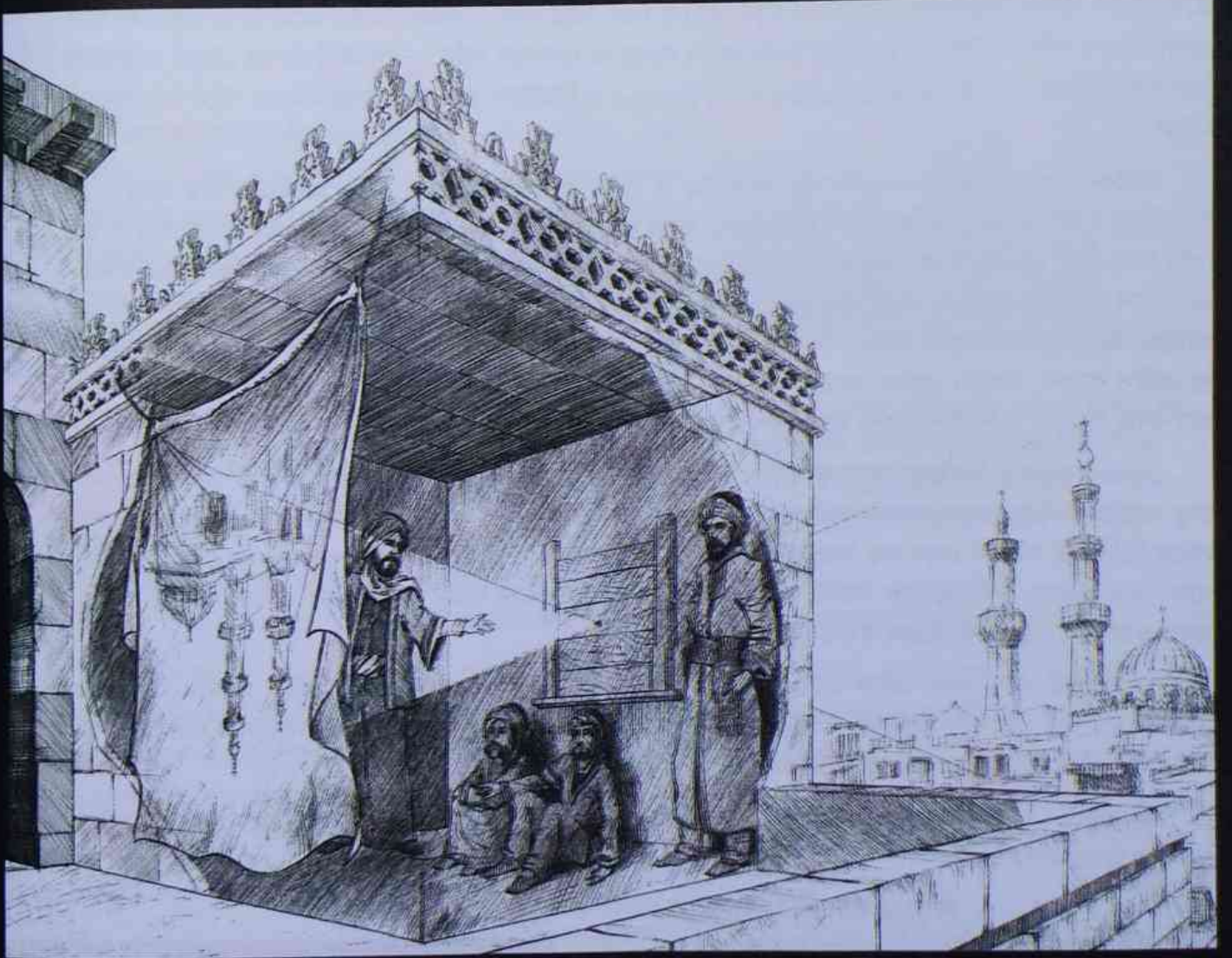
শিল্পীর তুলিতে ইবনুল হাইছামের ক্যামেরা অবস্কিউরা তথা অন্ধকারাচ্ছন্ন একটি কক্ষে ছোট ছিদ্র ভেদ করা আলোকরশ্মি বিপরীত দেয়ালে বিস্তৃত হয়ে ছবি তৈরি করার পরীক্ষার পুনর্নির্মাণ।

"কিতাব আল-মানাযির"-সহ ইবনুল হাইছামের বহু কর্ম লাতিন ভাষায় অনূদিত হয় এবং তার কর্ম ও পদ্ধতি দ্বারা যারা প্রভাবিত হয়েছেন, তাদের মাঝে রয়েছেন: রজার বেকন, লিওনার্দো দা ভিঞ্চি ও ইয়োহান কেপলার। বর্তমানে অনেক আধুনিক আবিষ্কারই রশ্মি ও দৃষ্টির নির্ভুল উপলব্ধির উপর নির্ভর করে, যার মূলভিত্তিগুলো এক হাজার বছর আগে ইবনুল হাইছাম প্রতিষ্ঠিত করে গিয়েছিলেন।

১০ ফ্যাশন এবং স্টাইল

ফ্যাশন আসে আর যায়, কিন্তু সুন্দর ও মার্জিত রুচি কখনো ফ্যাশনহীন হয় না। আর তাই বর্তমান সময়ের স্ব ইউরোপীয় স্টাইল ও সাজ-সজ্জার জন্ম ১২০০ বছর আগেকার ইসলামী বিশ্বের অঙ্গীভূত স্পেনে হয়েছিল, এটা জেনে অবাক হওয়ার মতো কিছুই নেই।

সঙ্গীতজ্ঞ ও শিষ্টাচার গুরু যিরইয়াব ছিলেন ৯ম শতাব্দির স্পেনের কর্ডোবার একজন ধারা প্রবর্তক ও স্টাইলের উজ্জ্বল কিংবদন্তী [আইকন]। "তিনি তার সাথে করে ফ্যাশন নিয়ে আসেন। ওই সময় বাগদাদ ছিল আজকের যুগের প্যারিস বা নিউইয়র্ক ... বাগদাদ থেকে স্পেন পর্যন্ত চিন্তা ও ভাবনার এক অন্তঃপ্রবাহ ছিল, যার বদৌলতে তিনি তার সাথে করে দাঁতের মাজন, গন্ধনাশক ও ছোট করে চুল কাটার ধরন নিয়ে যান ... (ওই সময়ে) কর্ডোবাতে রাস্তাগুলো রাত্রি বেলায় আলোকসজ্জিত ছিল, আরও ছিল পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা ও প্রবহমান পানি" – যেমনটি লেখক জেসন ওয়েবস্টার বিবিসি নির্মিত প্রামাণ্যচিত্র *An Islamic History of Europe*-এ যিরইয়াব সম্পর্কে রাগেহ উমরের সাথে আলাপকালে বলেন।

ইরাকের বাগদাদ ছিল মুসলিম বিশ্বের সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক কেন্দ্র, যেখান থেকে যিরইয়াব সঙ্গে করে আরও নিয়ে গিয়েছিলেন খাবার টেবিলের নতুন থালাবাসন, নতুন জৌলুসময় ফ্যাশন, এমনকি তিনি দাবা ও পোলো (ঘোড়ার পিঠে চড়ে দীর্ঘ মুগুরসদৃশ লাঠিযোগে বল খেলা) পর্যন্ত সাথে করে নিয়ে যান। তিনি ছিলেন মার্জিত রুচির একজন খ্যাতিমান সারগ্রাহী ব্যক্তি – যিনি নানা চিন্তা ও ভাবধারা থেকে কল্যাণকর জিনিস আহরণ করেন; এবং তার নাম আভিজাত্যের সাথে একসূত্রে গাঁথা। তিনি তার পরিমার্জিত ও বিলাসী পন্থা দ্বারা খলীফার দরবারকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করেন, যেখানে সাধারণ কর্ডোবাবাসী তার চুল ছোট রাখার নতুন স্টাইল অনুসরণ করতো এবং স্পেনে তার বয়ে আনা চামড়ার আসবাবপত্রগুলো তারা বেশ উপভোগ করতো।

১২০০ বছর পরে যিরইয়াব সম্পর্কে ফরাসি ঐতিহাসিক হেনরি টেরাস বলেন, "তিনি শীত ও গ্রীষ্মকালীন পোশাক চালু করেছিলেন এবং এসব পোশাক পরিধানের নির্দিষ্ট দিনক্ষণও তিনি ঠিক করে দিয়েছিলেন। দুই মৌসুমের মধ্যবর্তী সময়ে তিনি অর্ধ মৌসুমি পোশাকও অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। তার মাধ্যমে পূর্বের বিলাসী পোশাকগুলো স্পেনে পরিচিতি পায়। তার প্রভাবে একটি ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রির গোড়াপত্তন হয়েছিল, যেখানে রঙিন ছাপযুক্ত বস্ত্র ও স্বচ্ছ বুননের জ্যাকেট প্রস্তুত করা হতো, যেগুলো আজও বর্তমান মরক্কোতে পাওয়া যায়।"

যিরইয়াবের এসব অর্জন তাকে এনে দেয় পরবর্তী প্রজন্মের সম্মান, আজকের দিন পর্যন্ত। মুসলিম বিশ্বে এমন কোনো দেশ নেই, যেখানে যিরইয়াবের নামে কোনো রাস্তা, হোটেল, ক্লাব কিংবা ক্যাফের নামকরণ হয়নি। পশ্চিমা বিদ্বান ও সঙ্গীত শিল্পীরা আজও তার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে।

মুসলিমগণ বিশেষত আন্দালুসের মুসলিমগণ জীবনযাত্রার এক অত্যাধুনিক ঢং বেছে নিয়েছিল, যা মৌসুমি প্রভাবের উপর নির্ভরশীল ছিল।

কাপড়ের থানগুলো বিভিন্ন রঙের প্রদর্শনী দেখাচ্ছে (পরের পৃষ্ঠা পর্যন্ত)।

বিশেষ ধরনের খাবার বেছে নেয়া এবং নির্দিষ্ট ধরনের পোশাক ও ধাতু ব্যবহার করাটা আরাম-আয়েশ ও সুখ-সমৃদ্ধি বয়ে আনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল। শীতকালের পোশাক অপরিহার্যভাবে উষ্ণ তুলা কিংবা পশমি উপাদান দিয়ে বানানো হতো এবং এগুলোর রঙ সাধারণত কালো হতো। গ্রীষ্মের পোশাক হালকা উপাদান – যেমন: তুলা, রেশম ও শন – দিয়ে তৈরি হতো এবং সেগুলো বেশ উজ্জ্বল রঙের হতো।

কালান্দার পাশার রচিত প্রথম সুলতান আহমেদের অ্যালবাম নামের ১৭শ শতাব্দির শুরুর দিকে একটি পাণ্ডুলিপিতে ওই সময়কার প্রচলিত পোশাক-পরিচ্ছদের নমুনা অঙ্কিত হয়েছে।

> "শৈলী, ঐকতান, সাবলীলতা এবং উপভোগ্য তালের সৌন্দর্য নির্ভর করে সরলতার উপর।"
>
> – প্লেটো, গ্রিক দার্শনিক

আন্দালুসের মুসলিমগণ গ্রিকদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ওক কাষ্ঠনির্ভর কিছু ইন্ডাস্ট্রি এবং সেইসাথে পাতলা ছালের তলাবিশিষ্ট জুতার প্রস্তুতপ্রণালীও উত্তরাধিকার হিসেবে লাভ করেছিল। তারা উৎপাদন কৌশলকে আরও গতিশীল ও বৈচিত্রময় করে তোলে এবং পাতলা ছালের তলাবিশিষ্ট জুতা দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে এবং এটা তাদের প্রধান রপ্তানি পণ্যে পরিণত হয়। এই জুতাকে *কুর্‌ক* বলে [বহুবচন *আকরাক*], যা পরবর্তীতে কাস্টালিয়াতে এসে *আলকোরকে* (*Alcorque*) পরিণত হয়। এই পণ্যের কারিগরদের *কার্‌রাক* বলা হতো। এমনই এক কারিগর ছিলেন সেভিলের চটিজুতা প্রস্তুতকারী সূফী আবদুল্লাহ, যেমনটি মুহিউদ্দীন ইবনে আরাবী উল্লেখ করেছেন। এই ব্যবসা পণ্যের কারিগরগণ গ্রানাডার যে এলাকায় বসবাস করতেন, সেটাকে *কার্‌রাকীন* বলা হতো, বর্তমানে এটা কারাকুইন হিসেবে পরিচিত।

আল-সাক্বাতী ও ইবনে আবদূন নামের দু'জন মধ্যযুগীয় মুসলিম লেখক পাতলা ছালের তলাবিশিষ্ট জুতার প্রস্তুতপ্রণালীর বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখ করেন এবং তাতে লক্ষণীয় যে, জুতার তলায় ব্যবহৃত চামড়া পরিমাণে অপর্যাপ্ত হতে পারবে না; চামড়ার সাথে চামড়া সেলাই করতে হবে এবং মাঝে কিছু দিয়ে ভরাট করা যাবে না। কিছু জুতা প্রস্তুতকারীরা জুতার হিল বা গোড়ালীকে উঁচু করার জন্য হিলের নিচে বালু প্রবেশ করাতো, তবে জুতা জীর্ণ হয়ে গেলে তা আবার ভেঙে যেত। ইউরোপীয় খ্রিস্টানদের দ্বারা আন্দালুসের পতনের পর তারা আরও উন্নত স্টাইল ও প্রস্তুতপ্রণালী চালু করে।

তাই এরপর থেকে যখনই আপনি জাঁকজমকপূর্ণ নকশাকার দোকানে সর্বশেষ ফ্যাশন সামগ্রী কিনতে যাবেন, তখন এর হাজার বছর আগেকার হাই-হিল (উঁচু গোড়ালিবিশিষ্ট) জুতার কথা স্মরণ করবেন। যখনই আপনি পরার জন্য গ্রীষ্মকালীন পাতলা ট্রাউজার জোড়া বা অন্যকোনো পোশাক নেবেন, তখন ১২০০ বছর আগের 'কালোপাখি' যিরইয়াবের কথা মনে করবেন। কেননা ওই সময় এ ধরনের চিন্তা-ভাবনাগুলো মুসলিম স্পেন, সিসিলি এবং মধ্যপ্রাচ্য থেকে খ্রিস্টান ইউরোপে পাড়ি জমাচ্ছিল।

১১ কার্পেট

ইসলামের বহু আগেই আরব, পারস্য ও আনাতোলিয়ার বেদুইন সম্প্রদায়েরা প্রথম কার্পেট প্রস্তুত করে। এই বেদুইনরা তাঁবু হিসেবে, বালির ঝড় থেকে নিজেদের নিরাপদ রাখতে; ঘরের লোকদের আয়েশের জন্য মেঝে ঢেকে দিতে; একান্ত পরিবেশ বজায় রাখার জন্য দেয়াল পর্দা হিসেবে কার্পেট ব্যবহার করতো। এর পাশাপাশি বিভিন্ন জিনিসপত্র, যেমন: কম্বল, থলে ও উট বা ঘোড়ার পিঠে পাতা জিন হিসেবেও তারা কার্পেট ব্যবহার করতো।

মুসলিমদের জন্য কার্পেট ছিল বেশ উচ্চ মর্যাদার এবং জান্নাতের উপকরণ বলে তারা এটার বেশ কদর করতো। এর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে এবং চামড়া পাকানো ও বয়নের নতুন আমেজ দ্বারা চালিত হয়ে তারা নকশা ও বুনন কৌশলকে নিয়ে যায় সমৃদ্ধির চূড়ায় এবং এতে করে তাদের কার্পেটগুলো চমৎকার সব রঙে রঞ্জিত হয়। ১১শ শতাব্দির ইবনে বাদিস নামের এক তিউনিসীয় বিজ্ঞানী কালি, রঞ্জক ও বিভিন্ন মিশ্রণের রঙ নিয়ে রচনা করেন "*উমদাতুল কিতাব ওয়া উদ্দাতু যুল আলবাব*" (গ্রন্থের ভিত্তি এবং প্রজ্ঞাবানদের হাতিয়ার) শীর্ষক অতুলনীয় গ্রন্থ।

রঙিন হওয়ার পাশাপাশি মুসলিম কার্পেটগুলো তাদের গুণগত মান ও নকশার জন্য বিখ্যাত ছিল। একটি বড় গোল নকশা কেন্দ্রে অবস্থান করতো, আর তার চারপাশে সাজানো থাকতো তারকা, অষ্টভুজ, ত্রিভুজ ও শোভাবর্ধক গোলাপাকৃতির ব্যাজের চমৎকার সব জ্যামিতিক নকশা। ডালপালা, পাতা, সর্পিল বঙ্কর কারুকার্যময় আরবীয় নকশা ও লতাগুল্মের সাজ এসব জ্যামিতিক অবয়বের চারপাশ ঘিরে থাকতো; মনে হতো ঐক্যের এক অনুভূতি নিয়ে সবাই সবাইকে কাছে টানছে।

ইউরোপে কার্পেট খুব দ্রুতই নজর কাড়ে এবং তা মর্যাদা ও প্রতিপত্তির প্রতীকে পরিণত হয়। ইংল্যান্ডের রাজা অষ্টম হেনরির (শাসনকাল ১৫০৯-১৫৪৭ খ্রি:) মালিকানায় জানামতে ৪০০'রও বেশি মুসলিম কার্পেট ছিল এবং ১৫৩৭ খ্রিস্টাব্দে আঁকা তার একটি প্রতিকৃতিতে দেখা যায় যে, তিনি উসাক তারকা সম্বলিত এক তুর্কি কার্পেটে দাঁড়িয়ে আছেন এবং তার আলখাল্লা ও পর্দাগুলোতেও মুসলিম নকশা শোভা পাচ্ছে।

১২শ শতাব্দিতে ক্লুনির আশ্রমে বাস করা দিগ্বিজয়ী উইলিয়ামের নাতি যখন একটি ইংলিশ গির্জাতে কার্পেট দান করে কেবল তখনই ইংরেজরা প্রথম মুসলিম কার্পেটের সংস্পর্শে এসেছিল। ঠিক ওই সময়ে, মুসলিম ভূবিজ্ঞানী ও দার্শনিক আল-ইদরিসীর বক্তব্য মোতাবেক, বর্তমান স্পেনের অন্তর্গত চিনচিলা ও মুর্সিয়াতে পশমী কার্পেট প্রস্তুত করা হতো এবং গোটা বিশ্বে তা রপ্তানি করা হতো।

লম্বা সফরগুলোতে চালকের আরামের জন্য উটের পিঠে কিছুটা নিচের দিকে ঝুলে থাকা কার্পেট বিছিয়ে দেয়া হতো। এই কার্পেটগুলোতে খাবার সামগ্রী সংরক্ষণের জন্য জিন-থলে হিসেবে ব্যবহৃত হতো।

মুসলিম কার্পেটগুলো তাদের উন্নত রঙ এবং জ্যামিতিক নকশার জন্য সুপরিচিত ছিল।

মধ্যযুগের শেষ দিকে আঁকা চিত্রকর্মগুলো এটা প্রদর্শন করে যে, কীভাবে এবং কোথায় কার্পেটগুলো ব্যবহৃত হতো; এবং লোকেরা এগুলো সম্পর্কে কী ধারণা পোষণ করতো। ১৪শ ও ১৫শ শতাব্দির ইউরোপে খ্রিস্টানদের ধর্মীয় চিত্রকর্মগুলোতে প্রথম এগুলোর ব্যবহার দেখা যায়। ১৭শ শতাব্দিতে টেবিলের উপরিতল ও নিম্নাংশকে আবৃত করতে কার্পেটের ব্যবহার দেখা গেছে। হাড়ি-পাতিল রাখার আলমারি ও জানালার কার্পেটগুলোও এ সময় দৃশ্যমান হতো।

বেলজিয়ামের চিত্রকরেরাও এতে বেশ উদ্বুদ্ধ হয়। ব্রুজেসে ১৪৩৬ খ্রিস্টাব্দে ভ্যান আইকের আঁকা "*কুমারী ও পুত্র; সাথে সেন্ট দোনাটিয়ান, সেন্ট জর্জ ও কেনন ভান ডার পায়ল*" চিত্রকর্মে কুমারী মরিয়ম জ্যামিতিক নকশাদার কার্পেটে বসে আছে; সূঁচালো আট তারকার পুনরাবৃত্তি ও হীরকাকার বিষমকোণী চতুর্ভুজের সাথে মিলিত শোভাবর্ধক গোলাপাকৃতির ব্যাজের চারপাশে আঁকা জ্যামিতিক নকশাগুলো প্রধানত বৃত্তাকার।

মুসলিম কার্পেটগুলো এতটাই উচ্চ মূল্যের ছিল যে, ভিক্টোরিয়া ও আলবার্ট জাদুঘর প্রকাশনা ১৬শ শতাব্দির হাকলুতের সফরনামার একটি অধ্যায়ের উদ্ধৃতি পেশ করে, যেখানে পারসীয় কার্পেট প্রস্তুতকারীদেরকে ইংল্যান্ডে আনার পরিকল্পনা আলোচিত হয়েছে। এটাতে বলা রয়েছে, "পারস্যে তুমি নিশ্চিতভাবে আলগা সুতার পশমী কার্পেট পাবে, যেগুলো দুনিয়ার সেরা এবং চমৎকার রঙে রঙিন। ওইসব শহর ও নগর মেরামত করা তোমার জন্য আবশ্যক; আলগা পশমগুলো কীভাবে রঙ করা হয়, তার পুরো প্রক্রিয়া জানার জন্য সকল উপায় অবলম্বন করবে। কেননা এগুলো এমনভাবে রঞ্জিত থাকে যে, না বৃষ্টি আর না ভিনেগার সে রঙ বদলাতে সক্ষম ...। তোমার প্রত্যাবর্তনের আগে তুমি যদি তুর্কি কার্পেট বানাতে পারদর্শী একজন প্রস্তুতকারক তৈরি করতে পারো, তবে তোমার উচিত হবে ওই শিল্প তোমার আয়ত্তে নিয়ে আসা, তবেই তুমি তোমার কোম্পানির কাজকে বৃদ্ধি করতে পারবে।"

অটোমান/তুর্কি কার্পেট ছাড়া আর কোনো কার্পেটই পারসীয় কার্পেটের জনপ্রিয়তার ধারে কাছে পৌঁছাতে পারেনি। মূলত পারসীয় কার্পেট সাফাভী আমলে রাষ্ট্রীয় শিল্পোদ্যোগে পরিণত হয়। সাফাভী সম্রাট প্রথম শাহ আব্বাসের অধীনে স্থানীয় শাসকগণ ইউরোপের সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ককে মজবুত করে এবং এগুলোর রপ্তানি ও রেশম বাণিজ্য সাফাভী সাম্রাজ্যের সম্পদ ও প্রধান আয়ের উৎসে পরিণত হয়।

ইউরোপে কার্পেট উৎপাদন ছিল বড় ধরনের ইন্ডাস্ট্রি; প্রস্তুতকারীরা গোটা ইউরোপ থেকে ফরমাশ (অর্ডার) লাভ করতো। তাবরীজ, কাশান, ইস্পাহান ও কিরমানের পারসীয় কারিগরি শিল্পীরা চোখ ধাঁধানো ও সম্মোহন জাগানো নকশা প্রস্তুত করতো। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দির দিকে কার্পেট ইন্ডাস্ট্রির জৌলুস হারাতে থাকে। মূলত ঐতিহাসিক ঘটনাপ্রবাহ ও সংঘাত পারস্যকে অস্থিতিশীল করে তোলে, যেটা এর পিছনে আংশিকভাবে দায়ী। এদিকে ১৮শ শতাব্দির দিকে ইউরোপীয়রা নিজেদের কার্পেট নিজেরাই প্রস্তুত করতে শুরু করে, যা পারসীয় কার্পেট ইন্ডাস্টির জৌলুস হারানোর আরেকটি কারণ।

নকল মুসলিম কার্পেটগুলোর প্রথম উৎপাদন ইউরোপে ইংরেজ পৃষ্ঠপোষকদের অধীনে ছিল। *রয়াল সোসাইটি অব আর্টস* ভর্তুকি ও পুরস্কারের মাধ্যমে 'তুর্কি কার্পেটের প্রস্তুতপ্রণালী' অনুসারে সফল কার্পেট উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে উৎসাহিত করতো। ১৭৫৭ ও ১৭৫৯ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে এই সোসাইটি সেরা তুর্কি কাপের্টের 'নকল'-কে ১৫০ পাউন্ড পুরস্কার প্রদান করেছিল।

বর্তমানে সিনেমা ও গল্প-কাহিনীতে আলাদীনের উড়ন্ত গালিচার খ্যাতি অব্যাহত আছে এবং উত্তর আফ্রিকার বার্বার কার্পেট আবারও জনপ্রিয়তার তুঙ্গে পৌঁছাচ্ছে।

তৃতীয় অধ্যায়

"যৌবনে যা শেখা হয়, তাই পাথরে খোদাই হয়ে থাকে।"

– আরবী প্রবাদ

বিদ্যালয়

বিদ্যালয় • বিশ্ববিদ্যালয় • বায়তুল হিকমা • গ্রন্থাগার ও বই বিপণন
জ্ঞানের অনুবাদ • গণিত • ত্রিকোণমিতি • রসায়ন • বাণিজ্যিক রসায়ন • জ্যামিতি
শিল্প এবং সর্পিল বস্তুর কারুকার্য • লিপিকার • কথা ক্ষমতা

যে বিষয় সকল সভ্যতাকে মহান করে, এই বিভাগ সেটাই উন্মোচন করবে অর্থাৎ শিক্ষা, জ্ঞান ও বাস্তব ফল পাওয়ার জন্য জ্ঞানের প্রয়োগ, যেমন: সমাজের উন্নয়ন। বিদ্যালয় আমাদের শিক্ষা গ্রহণের অন্যতম একটি প্রতিষ্ঠান। প্রাথমিক পর্যায়ের মসজিদভিত্তিক বিদ্যালয় থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষার ক্ষেত্রে মধ্যযুগীয় মুসলিমগণ অন্য সবাইকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল, আর এক্ষেত্রে ৯ম শতাব্দির বাগদাদের বর্ণাঢ্য বুদ্ধিবৃত্তিক একাডেমি *বায়তুল হিকমা* ছিল আপন মহিমায় ভাস্বর।

শেখার সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য এমন এক কালচার ছিল, যেখানে অনুসন্ধানী মন চুলচেরা বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ও পরীক্ষণের ভিত্তিতে সত্যের অনুসন্ধান করতো। সেখানে অযোগ্য শিক্ষার্থীদের মতো ধারণা আর অনুমান কোনো জায়গাই পেত না। মধ্যযুগে ইসলামের অঙ্গীভূত শেখার এই পদ্ধতি ওই ভিত্তি দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল, যা থেকে বেরিয়ে আসে অসাধারণ সব আবিষ্কার ও উদ্ভাবন।

এখানে আপনি আবিষ্কার করবেন যে, কীভাবে এক হাজার বছরের পুরানো রাসায়নিক প্রক্রিয়া আজকের বহু বৈশ্বিক ইন্ডাস্ট্রির গোড়াপত্তনে সহায়তা করেছিল; কোথা থেকে '*chairperson* (চেয়ারপার্সন)' শব্দটির উদ্ভব হয়েছে; *admiral* (এডমিরাল), *tabby* (ট্যাবি), *sofa* (সোফা) শব্দের উৎস; একইসাথে জেনে আশ্চর্য হবেন যে, ১৮শ শতাব্দির উপন্যাস রবিনসন ক্রুসো দ্বীপে আটকে পড়া ব্যক্তির উপর লিখিত প্রথম উপাখ্যান নয়।

উল্টো পৃষ্ঠার চিত্র: ১৫শ শতাব্দির এক পারস্য পাণ্ডুলিপিতে ধ্রুপদী ইসলামী প্রেম-কাহিনীর চরিত্র লায়লা ও মাজনু প্রদর্শিত হয়েছে।

০১ বিদ্যালয়

বিদ্যালয়ের দিনগুলো পার করার পর কেউ পরিণত হন আমাদের সবচেয়ে প্রিয় শিক্ষককে, আবার কারো কাছে কোনো একটি বিষয় নিয়ে আসে বিরক্তির শেষ সীমা। খেলার দিন থেকে শুরু করে কঠিনতম পরীক্ষা – আমাদের ঝুলিতে মজুদ হয় স্মৃতি আর স্মৃতি। মাথা ভর্তি জ্ঞান নিয়ে বের হওয়ার আগ পর্যন্ত আমাদের জীবন থাকে সময়সূচির ছাঁচে আবদ্ধ।

মুসলিম দেশগুলোতে এক হাজার বছর পূর্বে মসজিদই ছিল বিদ্যালয়। ধর্ম ও জ্ঞানের মাঝে খুব সামান্যই পার্থক্য টানা হতো, যেহেতু মসজিদই ছিল সালাত আদায় ও বিদ্যা শিক্ষার স্থান। বিদ্যালয়ে পড়ানো বিষয়গুলোতে বিজ্ঞান অন্তর্ভুক্ত থাকতো, যা থেকে সহজেই অনুমিত হয় যে, ধর্ম ও বিজ্ঞান নির্বিঘ্নে পাশাপাশি অবস্থান করতো, যে চিত্র বিশ্বের অন্যসব অঞ্চলে দেখা যেত না। ডেনিশ ঐতিহাসিক ইয়োহান পেডারসনের মতে, বিদ্যা শিক্ষা "ধর্মের সাথে অন্তরঙ্গ বা ঘনিষ্ঠ বন্ধনে আবদ্ধ ... নিজেকে উভয় বিষয়ে নিয়োজিত করলে (তা এনে দেয়) সামর্থ্য ... আত্মিক প্রশান্তি ... স্রষ্টার খিদমত বিদ্বান ব্যক্তিবর্গকে কেবল বিয়োগব্যথা মেনে নিতে শেখায় না, বরং এটা অন্যের সেবায় নিজেকে বিলিয়ে দিতে উদ্বুদ্ধ করে।"

নবী মুহাম্মদ (ﷺ) মসজিদকে পরিণত করেন বিদ্যা শিক্ষার প্রধান স্থানে এবং এগুলোর মাঝে যাতায়াত করে তিনি শিক্ষা কার্যক্রম পরিদর্শন করতেন। যেখানেই মসজিদ স্থাপিত হতো, সেখানেই প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হতো। তিনি আরব গোত্রগুলোতে কুরআনের শিক্ষকদের পাঠাতেন, যারা *আহলে ইলম* বা 'জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গ' হিসেবে পরিচিত ছিল। এর মানে দাঁড়াচ্ছে শিক্ষা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে এবং ভ্রমণরত এই শিক্ষকগণ বেশ পরিতৃপ্তির জীবনযাপন করতেন। পালেরমোতে ১০ম শতাব্দির ভূবিজ্ঞানী ইবনে হাওক্বাল দাবী করেন যে, তিনি এমন ৩০০ জন প্রাথমিক শিক্ষাদানকারী শিক্ষকের দেখা পেয়েছেন।

থাইল্যান্ডের লায়েম ফো-তে কিশোর শিক্ষার্থীরা প্রাথমিক ইসলামী বিদ্যালয়ে উপস্থিত হয়েছে।

৭ম শতাব্দিতে নবী মুহাম্মদ (ﷺ)-এর সময়ে মদীনাতে ৯-টি মসজিদ ছিল। ৬২২ খ্রিস্টাব্দে এখানে প্রথম বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং শিক্ষার ধারণা চারদিক ছড়িয়ে পড়ে। এভাবে ৭৪৪ খ্রিস্টাব্দে সিরিয়ার দামেস্কে বিকশিত হয় আরেকটি বিদ্যালয়। ৮ম শতাব্দির স্পেনের কর্ডোবাতে বহু বিদ্যালয় ছিল এবং ৯ম শতাব্দির শেষের দিকে প্রায় প্রতিটি মসজিদেই বালক ও বালিকাদের জন্য ছিল প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা।

> "তোমার শিক্ষকের জন্য (শ্রদ্ধাবশত) দাঁড়িয়ে যাও এবং সম্মানের সাথে তার প্রশংসা করো। কেননা তিনি বার্তাবাহকের ন্যায়। তুমি কি তার থেকে অন্য কাউকে সম্মানিত ও মহান দেখো, যে সৃষ্টি করে, লালন করে এবং সমৃদ্ধ করে ব্যক্তিত্ব ও মেধাকে।"
>
> – আহমাদ শাওকীর কবিতার একটি ছত্র

ছয় বছর বয়সেই প্রায় সকল বালক (ধনী পরিবারের বালকেরা ছাড়া, যেহেতু তাদের গৃহ শিক্ষক থাকতো) এবং কিছু বালিকা প্রাথমিক শিক্ষা শুরু করতো। শিক্ষা সাধারণত বিনামূল্যেই প্রদান করা হতো অথবা তা এতটাই স্বল্প মূল্যের ছিল যে, তা সবার জন্য সহজলভ্য ছিল। লেখার প্রথম দরস (পাঠ) ছিল: কীভাবে আল্লাহর ৯৯-টি আসমাউল হুসনা (সুন্দরতম নাম) এবং কুরআনের সহজ কিছু আয়াত লিখতে হয়, তা শেখা। এর পরবর্তীতে থাকতো কুরআনের আদ্যন্ত অধ্যয়ন এবং পাটিগণিতের শিক্ষা।

১০ম শতাব্দির দিকে শিক্ষাদান মসজিদ থেকে স্থানান্তরিত হতে থাকে এবং তা শিক্ষকগণের গৃহে বাসা বাঁধতে শুরু করে, অর্থাৎ ক্রমান্বয়ে বিদ্যালয় বিকশিত হতে থাকে। পারস্যে এটা প্রথম ঘটে। এরপর ১০৬৬ খ্রিস্টাব্দে সেলজুকগণ নিজামিয়া মাদ্রাসা স্থাপন করে। এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা বাগদাদের উজীর নিজামুল মুলকের নামে এর নামকরণ করা হয়। এটাই ছিল প্রথম পূর্ণাঙ্গ বিদ্যালয়, যার আলাদা শিক্ষা-ভবন ছিল। ইসলামের প্রথম দিকের বহু বিদ্যালয়ের গোড়াপত্তন হতে থাকে এবং শিক্ষকদের জন্য সেগুলোতে বেতনেরও বন্দোবস্ত ছিল।

বহু মুসলিম স্থাপত্য ভবনের মতো বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও পয়সার কোনো কার্পণ্য করা হতো না এবং এর পাশাপাশি সৌন্দর্যের বিষয়টিও বিশেষ বিবেচনায় থাকতো।

শিক্ষার চারটি স্তর

বিদ্যালয়ের বেড়ে উঠার সাথে সাথে সেগুলোতে কী শেখানো হচ্ছে এবং কোন স্তরে শেখানো হচ্ছে, তার উপর ভিত্তি করে বিদ্যালয়কে চারটি ভাগে ভাগ করা যায়: প্রাত্যহিক পাঠশালা, উচ্চ বিদ্যালয় বা পাঠক পাঠশালা, হাদীছের পাঠশালা এবং চিকিৎসা পাঠশালা।

প্রাত্যহিক পাঠশালাগুলো সাধারণ বিষয়সমূহ শিক্ষা দিতো এবং এগুলো প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সমতুল্য ছিল। পাঠ শেষে শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক সনদপত্র (সার্টিফিকেট) প্রদান করা হতো, যাতে তারা উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রবেশ করতে পারে। প্রাত্যহিক বিদ্যালয়গুলো বেশ সাধারণ ছিল এবং প্রতিটি গ্রামেই এমন বিদ্যালয়ের দেখা মিলতো।

দারুল কুরা বা পাঠক পাঠশালাগুলোতে আরবী ভাষা, কুরআন তিলাওয়াত ও কিরাতের পারদর্শিতা শেখানো হতো।

দারুল হাদীছ বা হাদীছের পাঠশালাগুলো নবী মুহাম্মদ (ﷺ)-এর হাদীছ গবেষণা ও শিক্ষার বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান ছিল। এখান থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের বিশ্ববিদ্যালয় সমতুল্য ডিগ্রি প্রদান করা হতো, যাতে তারা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে কাজ করতে পারে।

চিকিৎসার জন্য পূর্ণভাবে নিবেদিত প্রথম বিদ্যালয় ১২৩১ খ্রিস্টাব্দে দামেস্কে প্রতিষ্ঠিত হয়। এর আগে চিকিৎসাশাস্ত্রীয় শিক্ষা হাসপাতাল এবং শিক্ষানবিশির মাধ্যমে চর্চা করা হতো। মহামতি অটোমান সুলতান সুলায়মানের শাসনকাল ১৬শ শতাব্দির আগ পর্যন্ত চিকিৎসা বিদ্যালয় তেমনভাবে বিকশিত হয়নি।

ইরাকের বাগদাদের একটি বিদ্যালয়, ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দ।

প্রতিটি বিদ্যালয়ের উঠানের সাথে একটি, দুটি, তিনটি অথবা চারটি *আয়ওয়ান* (উঠানের দিকে সরাসরি উন্মুক্ত বিশালাকার খিলানাকৃতির হলঘর) থাকতো, যা পাঠদান এবং একইসাথে সালাত আদায়, থাকার কক্ষ এবং ওজুখানা হিসেবে ব্যবহৃত হতো। রাষ্ট্র অথবা খলীফা শিক্ষাদানের ব্যাপারে তদারকি করতেন এবং শিক্ষাদানের পূর্বে শিক্ষকদের নিকট অনুমতি থাকতে হতো।

১৪শ শতাব্দির মুসলিম শিক্ষাবিদ ইবনুল হাজ্জের এক্ষেত্রে অনেক কিছু বলার আছে, তিনি বলেন, "বিদ্যালয়কে অবশ্যই বাজার অথবা ব্যস্ত সড়কের পাশে হতে হবে এবং তা কোনো জনবিচ্ছিন্ন এলাকায় হতে পারবে না ... এটা শিক্ষাদানের স্থান। শ্রেণিকক্ষ পাঠের উপযুক্ত করা, দর্শনার্থীদের আসনের ব্যবস্থা করা, ঘুমন্ত ছাত্রদের জাগানো, করণীয় ও বর্জনীয় ব্যাপারে সতর্ক করা এবং শিক্ষকের পাঠদান শ্রবণ নিশ্চিত করতে শিক্ষকের একজন প্রতিনিধি থাকা প্রয়োজন। শ্রেণিকক্ষে কথা-বার্তা বলা, হাসাহাসি করা এবং কৌতুক বলা নিষিদ্ধ।"

১৫শ শতাব্দিতে অটোমানগণ তুরস্কের ইস্তাম্বুল ও এডিরনের মতো শহরে শিক্ষা কমপ্লেক্স-ভবন স্থাপনের মাধ্যমে বিদ্যালয়গুলোতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন নিয়ে আসে। তাদের বিদ্যালয় ব্যবস্থাকে *কুল্লিয়া* বলা হতো এবং ওই শিক্ষা ক্যাম্পাসে সাধারণত মসজিদ, হাসপাতাল, বিদ্যালয়, গণ রান্নাঘর ও খাবার ঘর পর্যন্ত থাকতো। এগুলো বিনামূল্যে খাবার পরিবেশন, চিকিৎসা সেবা প্রদান এবং কখনো কখনো থাকার ব্যবস্থা প্রদানসহ শিক্ষাকে জনগণের মাঝে আরও বিস্তৃত পরিসরে ছড়িয়ে দেয়ার ক্ষেত্রে অগ্রগণ্য ভূমিকা রেখেছিল। ইস্তাম্বুলের *ফাতেহ কুল্লিয়া* এমনই একটি কমপ্লেক্স ভবন ছিল, যেখানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষা দেয়ার জন্য ১৬-টি বিদ্যালয় ছিল।

এসব প্রতিষ্ঠানের জন্য অর্থ কোথা থেকে আসতো? ট্যাক্স থেকে তেমন একটা আসতো না, বরং তা ফাউন্ডেশনের আদলে বিভিন্ন দান থেকে সংগৃহীত সরকারি অনুদান থেকে আসতো, যা *ওয়াক্ফ* নামে পরিচিত। ফাউন্ডেশনের দলিলপত্রের আওতায় ইসলামে বিশ্বাসী যে কেউ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে পারতো। ব্যবস্থাপনা, শিক্ষকদের বেতন, আবাসন, শিক্ষার্থীদের খাবার এবং যাদের প্রয়োজন, তাদের জন্য বৃত্তির সুবিধা ওই *ওয়াক্ফের* অর্থ দ্বারা বহন করা হতো।

শিক্ষাকে এতটা সম্মান দেয়ায় দু'হাত ভরে মুসলিম জনসাধারণ দান করতো এবং যার ফলে মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র শিক্ষার ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটে। ১৪শ শতাব্দির মুসলিম পর্যটক, ইবনে বতুতা শতভাগ দানে চলা শিক্ষার্থীদের ব্যাপারে বলেন: "কেউ যদি বিদ্যা শিক্ষার একটি কোর্সে ভর্তি হতে চাইতো কিংবা নিজেকে ধর্মীয় জীবনযাত্রায় নিয়োজিত করতে চাইতো, তবে সে তার এই উদ্দেশ্য পূরণের জন্য সব ধরনের সহায়তা লাভ করতো।"

> "বিদ্যালয়ে মানুষকে শিক্ষিত করার ক্ষেত্রে মুসলিমগণ যে পরিমাণ উদারতার স্বাক্ষর রেখেছে, মূলত তা ছিল তাদের সভ্যতার বুদ্ধিবৃত্তিক উৎকর্ষ লাভ ও দ্রুত বিকাশের অন্যতম প্রধান কারণ। শিক্ষা ওই সভ্যতাতে এতটাই বৈশ্বিকভাবে বিস্তৃত ছিল যে, এটা বলা হতো যে, (ওই সময়) লিখতে ও পড়তে জানে না, এমন মুসলিম খুঁজে পাওয়া বেশ দুষ্কর ছিল।"
>
> –শিক্ষাবিদ, ই. এইচ. ওয়াইল্ডস

তুরস্কের এডিরনের দ্বিতীয় বায়েজিদ কুল্লিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কমপ্লেক্স একটি মসজিদ, মাদ্রাসা এবং হাসপাতাল নিয়ে গঠিত।

একবিংশ শতাব্দির প্রায় সকল শিক্ষার্থী এমন বিনামূল্যে শিক্ষা লাভ করতে ব্যাকুল হয়ে উঠবে, যদিও ১৪শ শতাব্দি বেশ দূরের বলে মনে হয়, তথাপি বর্তমানের খুব কম প্রতিষ্ঠানই এ ধরনের শিক্ষা পদ্ধতি এবং আনুষাঙ্গিক সহায়তা প্রদান করে থাকে।

মেহমেদ ইবনে আমিরশাহের ১৭'শ শতাব্দির একটি তুর্কি প্রতিকৃতি,
যাতে ইস্তাম্বুলের গাজানফার আগা মাদ্রাসা দেখা যাচ্ছে।

০২ বিশ্ববিদ্যালয়

আজ যেকোন সময়ের চেয়ে বেশি লোক বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার জন্য আবেদন করে। জ্ঞানের প্রতি এই তৃষ্ণাটাই ছিল মধ্যযুগীয় মুসলিমদের হৃদয় মনি, যেহেতু কুরআন তাদেরকে জ্ঞানার্জন, নিরীক্ষণ এবং অনুধাবনের প্রতি জোর তাগিদ দিয়েছে। অর্থাৎ গোটা মুসলিম বিশ্বের মসজিদ, বিদ্যালয়, হাসপাতাল, মানমন্দির এবং শিক্ষকদের গৃহগুলোতে উচ্চতর বিষয়সমূহ কেবল পড়ানোই হতো না, বরং জ্ঞান ও শেখার এই সংস্কৃতি অবশেষে ইউরোপে পা রাখে।

বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার মাঝে কিছুটা যুগপৎ সাদৃশ্য রয়েছে। মূলত উভয় শিক্ষাই মসজিদে শুরু হতো। 'বিশ্ববিদ্যালয়' শব্দটির আরবী *জামেয়া*, যা মসজিদের জন্য ব্যবহৃত আরবী *জামি'* শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ। দৃশ্যত আরবীতে ধর্ম চর্চার স্থান এবং উচ্চতর জ্ঞানার্জনের স্থান যুগপৎভাবে সংযুক্ত, যার নিকটতম কোনো নজির অন্য কোনো সভ্যতা বা ভাষায় নেই। বস্তুত, ইসলামের কিছু মসজিদই ছিল দুনিয়ার সবচেয়ে প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়।

বিখ্যাত মসজিদভিত্তিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঝে রয়েছে আল-আযহার, যা ১০৩০ বছর ধরে আজও বিদ্যমান। মিশরে উচ্চশিক্ষার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে এটা বহু শ্রেষ্ঠ বিদ্বানকে আকৃষ্ট করেছে। আল-আযহার তার বয়স এবং তার প্রাক্তন কৃতী ছাত্রদের জন্যও বেশ পরিচিত: পরীক্ষালব্ধ আলোকবিজ্ঞানের জনক ইবনুল হাইছাম এখানে দীর্ঘ একটা সময় কাটিয়েছেন এবং ১৪শ শতাব্দির শীর্ষস্থানীয় সমাজবিজ্ঞানী ইবনে খালদূন এখানে শিক্ষকতা করেছেন।

আরেকটি সুবিশাল মসজিদভিত্তিক কলেজ কমপ্লেক্স ছিল মরক্কোর ফেয নগরীতে অবস্থিত আল-কায়রাওয়ান। এই বিশ্ববিদ্যালয় মূলত ইদরিসীদের শাসনামলে ফাতিমা আল-ফিহরী নামের এক ধার্মিক ও পুণ্যবতী যুবতী নারী কর্তৃক ৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে মসজিদ হিসেবে নির্মিত হয়। তিনি অত্যন্ত বিদুষী ছিলেন এবং সফল ব্যবসায়ী পিতা থেকে বিপুল পরিমাণ সম্পত্তি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়ে এই প্রতিজ্ঞা করেন যে, নিজ শহর ফেযের জনগোষ্ঠীর কল্যাণার্থে তিনি তার পুরো সম্পত্তি দিয়ে একটি মসজিদভিত্তিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করবেন।

বাম থেকে: আল-কায়রাওয়ানের উঠানের ঝরনার পিছনে মেহরাব রয়েছে; গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় এই উঠানে নামাজ আদায় করা হতো। ডান থেকে: আল-কায়রাওয়ানের সময় নির্ণায়ক কক্ষ, যেখানে পুরোদমে সচল জলঘড়ি (যাতে একসারি পিতলের পাত্র রয়েছে) এবং দিন ও মাস গণনার জন্য রয়েছে আস্তর্লাব। সাদা দেয়ালে ঝুলে আছে ইউরোপের অন্যতম সর্বপ্রাচীন ও বিশালাকার ঘড়ি। মেঝেতে বিছানা পাতা রয়েছে, যাতে সময় গণনাকারী ঘুমায়।
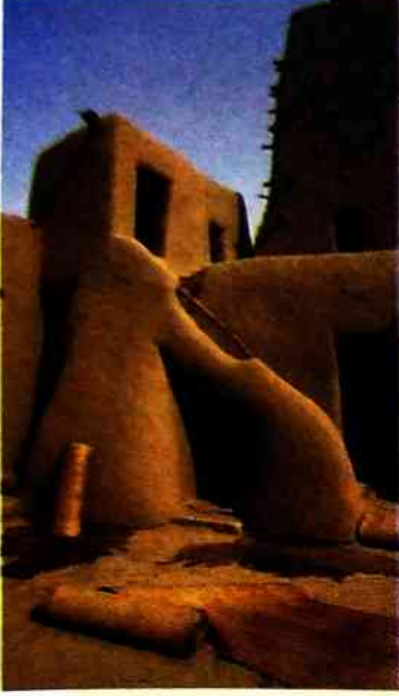
সানকুরি বিশ্ববিদ্যালয়

সালাত আদায়ের চাটাই পড়ে আছে মালিতে অবস্থিত তিমবাকতুর সানকুরি মসজিদে।

মুসলিম ভূমির একেবারে দক্ষিণে ছিল তিমবাকতুর সানকুরি বিশ্ববিদ্যালয় এবং এটা ছিল মালি, ঘানা ও সঙ্গাইয়ের বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিষ্ঠান।

৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে তিমবাকতুর বিদ্বান প্রধান বিচারপতি আল-কাদী আকলিব মাহমুদ ইবনে উমর দ্বারা সানকুরি মসজিদে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের গোড়াপত্তন ঘটে। মসজিদের অভ্যন্তরীণ দরবার মক্কার কাবাঘরের আয়তনের একদম অনুরূপ ছিল। একজন বিত্তবান মানদিকা নারী সানকুরি বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থায়ন করেন এবং এটাকে জ্ঞান ও শিক্ষার শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেন। এটা ক্রমশ উন্নতি করতে থাকে এবং ১২শ শতাব্দিতে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২৫,০০০-এ পৌঁছায়, যা ১০০,০০০ অধিবাসীর শহরের সাপেক্ষে বেশ বড় সংখ্যা।

বিশ্ববিদ্যালয়টির একাধিক স্বাধীন কলেজ ছিল এবং প্রতিটি কলেজ একজন শিক্ষক দ্বারা পরিচালিত হতো। সেখানে পড়ানো বিষয়গুলোর মাঝে কুরআন, ইসলামী শিক্ষা, আইন, সাহিত্য, চিকিৎসা, সার্জারি, জ্যোতির্বিদ্যা, গণিত, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, দর্শন, ভাষা ও ভাষাতত্ত্ব, ভূগোল, ইতিহাস এবং শিল্পকলা উল্লেখযোগ্য ছিল।

এই প্রতিষ্ঠান কেবল মেধা ও মনন বিকাশের তাত্ত্বিক কেন্দ্র ছিল না, বরং শিক্ষার্থীরা এখানে ব্যবসা-বাণিজ্য, ব্যবসার নিয়ম-কানুন ও নীতি-নৈতিকতা শেখার কাজেও সময় ব্যয় করতো। এই কারিগরি প্রতিষ্ঠানগুলি ব্যবসা, কাঠমিস্ত্রি, কৃষি, মৎস, নির্মাণ, জুতা প্রস্তুত, দর্জিগিরি ও নৌযান চালনা শিক্ষা দিতো।

পিএইচডি ডিগ্রির সমতুল্য 'উচ্চতর' ডিগ্রি লাভ করতে প্রায় ১০ বছর সময় লাগতো এবং এর মাধ্যমে বিশ্ব সেরা পণ্ডিত বেরিয়ে আসতো, যারা তাদের প্রকাশনা ও তাদের পাণ্ডিত্য দ্বারা স্বীকৃত ছিল। পিএইচডি থিসিসকে *রিসালা* বলা হতো এবং যারা এই ডিগ্রি নিয়ে শিক্ষা সমাপ্ত করতো, তাদেরকে *আয়াতুল্লাহ* বলা হতো। ইরানের কুম ও ইরাকের নাজাফের শীয়া ধর্মীয় শিক্ষাঙ্গনগুলোতে আজও এই পরিভাষা ব্যবহৃত হয়।

তিনি ভবনের নকশার ক্ষেত্রে এই শর্ত আরোপ করে দেন যে, ভবন নির্মাণের পুরো উপকরণ একই এলাকার হতে হবে। এই নির্মাণ প্রকল্প শুরু হওয়ার দিন থেকে ক্যাম্পাসের নিমার্ণ কাজ শেষ হওয়ার দিন পর্যন্ত তিনি প্রতিদিন রোযা রেখেছিলেন।

সুবিশাল মসজিদগুলোর মতো *আল-কায়রাওয়ান* শীঘ্রই ধর্মীয় শিক্ষা ও রাজনৈতিক আলোচনার কেন্দ্র বিন্দুতে পরিণত হয়, ক্রমান্বয়ে এখানে সব ধরনের বিষয় অন্তর্ভুক্ত হতে থাকে, বিশেষ করে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিষয়গুলো নিয়ে প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে এটা নিজের নাম ইতিহাসে পাকাপোক্ত করে। বিশ্ববিদ্যালয়টি সুসজ্জিত ও প্রয়োজনীয় উপকরণ বিশেষভাবে জ্যোতিষশাস্ত্রীয় যন্ত্রপাতি দ্বারা সমৃদ্ধ ছিল। 'সময় নির্ণায়ক কক্ষ'-টি আস্তুর্লাব, বালির ঘড়ি এবং সময় গণনার অন্যান্য যন্ত্রপাতি দ্বারা সমৃদ্ধ ছিল। জ্যোতির্বিদ্যার পাশাপাশি কুরআন, ইলমে কালাম (ধর্মতত্ত্ব), আইন, অলংকার শাস্ত্র, গদ্য, কবিতার চরণ রচনা, যুক্তিবিদ্যা, পাটিগণিত, ভূগোল এবং চিকিৎসাবিদ্যাও পড়ানো হতো। এছাড়াও এখানে আরবী ব্যাকরণ, মুসলিম ইতিহাস, রসায়ন ও গণিতের সাথে সম্পৃক্ত কিছু কোর্সও পড়ানো হতো। বৈচিত্রময় বিষয়াদি এবং শিক্ষার উচ্চমানের কারণে এই বিশ্ববিদ্যালয় মুসলিম বিশ্বের দূর-দূরান্তের বিদ্বান ও শিক্ষার্থীদের আকর্ষণ করতে সফল হয়েছিল।

মসজিদভিত্তিক 'বিশ্ববিদ্যালয়'-গুলিতে স্থানীয় শিক্ষার্থীরাই শুধু ভর্তি হতো না, বরং প্রতিবেশী অঞ্চলের শিক্ষার্থীরাও এখানে ভর্তি হতো। এর ফলে আব্বাসী খিলাফতের সময় ইরাকের বাগদাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে চিকিৎসা, ঔষধ বিজ্ঞান, প্রকৌশল, জ্যোতির্বিদ্যাসহ বহু বিষয় সিরিয়া, পারস্য ও ভারত থেকে আগত শিক্ষার্থীদের পড়ানো হতো।

কায়রোর আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে কায়রোর বাহিরের এলাকার মিশরীয় শিক্ষার্থী ছাড়াও বিপুল সংখ্যক ভিনদেশী শিক্ষার্থী পড়াশুনা করতো।

> "(বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে) বই উপহার দেয়া হতো এবং বহু বিদ্বান ব্যক্তি তার নিজস্ব গ্রন্থাগার নিজ শহরের মসজিদের নামে উইল করে দিতেন, যাতে তার গ্রন্থাগারের গ্রন্থগুলো সংরক্ষিত হয় এবং প্রতিনিয়ত যারা বইপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করে, সেসব বিদ্বানের নিকট সেগুলো সহজলভ্য হয়। এভাবেই বেড়ে উঠে কর্ডোবা ও টলেডোর বিখ্যাত সব বিশ্ববিদ্যালয়, যেখানে গোটা বিশ্ব থেকে খ্রিস্টান ও মুসলিমগণ ভিড় জমাতেন।"
>
> – আর. এস. ম্যাককেনসেন, মুসলিম গ্রন্থাগার বিষয়ের একজন ইউরোপীয় ঐতিহাসিক

তিউনিসিয়ার যাইতুনা মসজিদে ব্যাকরণ, যুক্তিবিদ্যা, নথি সংরক্ষণ, গবেষণার নিয়ম-নীতি, সৃষ্টিতত্ত্ব, পাটিগণিত, জ্যামিতি, খনিজবিজ্ঞান ও কারিগরি প্রশিক্ষণের উপর পাণ্ডুলিপি ছিল। তিউনিসিয়ার কায়রাওয়ানের আতিকা গ্রন্থাগারে ৪২০ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে সেন্ট জেরোমের লেখা *History of Ancient Nations*-এর আরবী অনুবাদের কপি ছিল।

কোর্সগুলো কঠিন ছিল এবং বিশেষভাবে চিকিৎসাবিদ্যা বেশ শ্রমের ছিল, যেমনটি আজকের দিনের বিশ্ববিদ্যালয়-গুলোতে চিকিৎসা অনুষদে বেশ দুরূহ ও দীর্ঘ সময়ব্যাপী পরীক্ষণ চলতে থাকে। পাস নম্বরের চেয়ে কম যেকোন কিছুর মানে হচ্ছে: ওই ব্যক্তি চিকিৎসা শাস্ত্র চর্চা করতে পারবে না।

আইনের শিক্ষার্থীরা স্নাতক পর্যায়ের প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে যেত এবং তারা যদি সফলভাবে এই ধাপ অতিক্রম করতো, তবে তারা তাদের শিক্ষকদের গবেষণা সহকর্মী হিসেবে মনোনীত হতো। কেবল তখনই তারা বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষাতে অধ্যয়নের সুযোগ পেত, যা অনির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত চলতো। নিজেদের পেশাগত আসন অধিকারের আগ পর্যন্ত এই প্রশিক্ষণ প্রায় ২০ বছর পর্যন্তও হতো। আইন পেশা চর্চার আগে আইনের শিক্ষার্থীদের নিকট আইনে পারদর্শীতার প্রাধিকারদানের সনদপত্র এবং লাইসেন্স থাকতে হতো।

এই সনদপত্রগুলো *ইজাযা* নামে পরিচিত এবং সম্ভবত তা '*baccalareus*' (*বাকালারিয়াস* – ব্যাচেলর ডিগ্রি) শব্দের উৎস হয়ে থাকবে, যা দ্বারা নিম্নতর বিশ্ববিদ্যালয় ডিগ্রিকে বোঝায়। ১২৩১ খ্রিস্টাব্দে পোপ নবম গ্রেগরি দ্বারা প্রবর্তিত প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি ব্যবস্থাতে সর্বপ্রথম এই পরিভাষার ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। এটা সম্ভবত সনদপত্র দেয়ার ক্ষেত্রে মুসলিমদের ব্যবহৃত আরবী বাক্যের পশ্চিমা সংস্করণ। '*বি-হাক্কির রিয়াওয়াহ*' দ্বারা: *অন্যের আজ্ঞাবলে শিক্ষাদানের অধিকার* লাভকে বোঝায় এবং এই বাক্য সনদপত্রে ব্যবহৃত হতো। যখন কোনো শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা সমাপ্ত করতো, তখন তাকে এই লাইসেন্স দেয়া হতো এবং এই বাক্যের আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে: তার এখন 'শিক্ষাদানের অধিকার' রয়েছে।

অধ্যাপকের আসন

একজন অধ্যাপককে 'আসন' দেয়া কিংবা কোনো সভার নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় থাকা ব্যক্তিকে 'সভাপতি' (*chair*) বলে সম্বোধনের এই সংস্কৃতি কীভাবে গড়ে উঠলো?

বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এক হাজারের বেশি সময় আগে, পাঠচক্র বা *হালাক্বায়ে ইলম* বা *হালাক্বাহ*-তে আপনি উচ্চাসনে বসা অধ্যাপককে ঘিরে শিক্ষার্থীদের জড়ো হয়ে বসে থাকতে দেখবেন। এভাবে বসার কারণে অধ্যাপক সবার নিকট দৃশ্যমান ও শ্রুতিগোচর হতেন। এই অধ্যাপক হয় খলীফা কিংবা আলিমদের কমিটি দ্বারা নির্বাচিত হতেন এবং খলীফা কর্তৃক যখন কোনো অধ্যাপক কোনো একটি জামে মসজিদে নিয়োগ পেতেন, তখন তিনি আমৃত্যু ওই আসন অলংকৃত করে রাখতেন। আসন এভাবে অলংকৃত করে রাখার বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে, যেমন: আলী আল-কাত্তানী ১০৬১ খ্রিস্টাব্দে ইন্তেকালের আগ পর্যন্ত দীর্ঘ ৫০ বছর তার আসন অলংকৃত করে রেখেছিলেন।

মসজিদে খুতবা দেয়ার সময় খতিব আসনে বসে আছেন।

১৪শ শতাব্দির একটি পাণ্ডুলিপিতে ফ্রান্সের মন্টেপেলিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা অনুষদে ব্যবচ্ছেদের উপর পাঠ দেয়ার দৃশ্য চিত্রায়িত হয়েছে।

বর্তমানে বিশ্বের যেকোন বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতর ডিগ্রি লাভের জন্য নিজেকে যোগ্য করে তোলার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের জন্য *International Baccalaureate* (ব্যাচেলর/স্নাতক সম্পন্ন করাকে) ন্যূনতম যোগ্যতা হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

মুসলিমগণ উচ্চশিক্ষাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছিল। সেখানে ছিল প্রবেশিকা পরীক্ষা, চূড়ান্ত পরীক্ষার চ্যালেঞ্জ, ডিগ্রির সনদপত্র, পাঠচক্র, আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী এবং বৃত্তি। প্রকৃতপক্ষে, মধ্যযুগীয় 'বিশ্ববিদ্যালয়' এবং আজকের দিনের শিক্ষা ব্যবস্থার মাঝে লক্ষণীয় সাদৃশ্য রয়েছে। এমনকি তাদের কলেজ কোর্স এবং পাণ্ডিত্যে বুৎপত্তির জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা পর্যন্ত ছিল।

মুসলিম শিক্ষা পদ্ধতি ১২শ শতাব্দিতে মধ্যযুগীয় ইউরোপকে নাড়া দেয়। পূর্ববর্তী ৫০০ বছরের আরবী কাজগুলোর মধ্যযুগীয় লাতিন অনুবাদের এক হিড়িক শুরু হয়। যাতে করে পরীক্ষালব্ধ এসব যুক্তিনির্ভর ধারণা ও তত্ত্ব নতুন পাঠক সমাজের কাছে সহজলভ্য হয়। চমৎকার তথ্যসমৃদ্ধ উপকরণাদি ইউরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষাকে পদাঘাত করতে শুরু করে এবং ধর্ম ও বিজ্ঞানের মাঝে সংঘাত থাকার ধারণাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে তোলে। চার্ট্রেসের গির্জার বিদ্যালয়ে ১১৪০ খ্রিস্টাব্দের দিকে থিয়েরি অব চার্ট্রেস (*Thierry of Chartres*) শিক্ষা দিতে শুরু করেন যে, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বাইবেলে বর্ণিত সৃষ্টিতত্ত্বের সাথে সংগতিপূর্ণ, যা রেনেসাঁর পথ প্রশস্ত করে।

পশ্চিম ইউরোপের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় ছিল ইতালির সালেরনোতে, যা ১১শ শতাব্দির শেষের দিকে কন্সট্যান্টিন দ্য আফ্রিকানের আগমনের পর প্রাণ ফিরে পায়। ফ্রান্সের মন্টেপেলিয়ার শহরটি সালেরনোরই উপশহর এবং তা ছিল মুসলিম চিকিৎসা ও জ্যোতিষশাস্ত্র চর্চার প্রধান কেন্দ্র। বিপুল সংখ্যক মুসলিম-ইহুদি অধিবাসী নিয়ে এই শহর মুসলিম স্পেনের কাছাকাছি ছিল।

১২শ শতাব্দির শুরুর দিকে পশ্চিমা বিশ্বের বুদ্ধিবৃত্তিক পাওয়ার হাউজ স্থানান্তরিত হয় 'শিক্ষকদের শহর' হিসেবে পরিচিত প্যারিসে, যেহেতু সদা ভ্রমণরত শিক্ষকদের বদৌলতে আরবী গ্রন্থগুলোর জ্ঞানের বিস্তৃতি চতুর্দিকে অব্যাহত থাকে। প্রকৃতপক্ষে আজকের অনেক ঐতিহাসিকই বলেন যে, অক্সফোর্ডের মতো প্রথম দিকের ইংরেজি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কাঠামো এসব ভ্রমণরত, উদারমনা বিদ্বান এবং ক্রুসেড অভিযান ফেরত ব্যক্তিবর্গের হাত ধরেই রচিত হয়। ক্রুসেডাররা কর্ডোবার মতো স্থানে মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ পরিদর্শনের পাশাপাশি ফেরার পথে ধর্মীয় চিন্তায় সীমাবদ্ধ গ্রন্থাবলীর পরিবর্তে যুক্তিনির্ভর তত্ত্বের উপর রচিত আরবী গ্রন্থগুলোর অনুবাদ সাথে করে নিয়ে আসে।

০৩ বায়তুল হিকমা

বাগদাদের সোনালি দিন ছিল ১২০০ বছর পূর্বে, তখন এটা ছিল ইসলামী বিশ্বের সমৃদ্ধ রাজধানী। প্রায় ৫০০ বছর ধরে শহরটি সংস্কৃতি ও বিদ্বানদের শ্রেষ্ঠ অংশ নিয়ে গর্ব করেছে। শহরটি খলীফা হারুন উর-রশিদ, আল-মামুন, আল-মুতাদীদ ও আল-মুক্তাফীর শাসনামলে খ্যাতির শীর্ষে পৌঁছায়।

বাগদাদ নগরীর এই জৌলুসের চূড়ায় পৌঁছা এবং তা ধরে রাখার পিছনে ওইসব খলীফার অবদান অগ্রগণ্য ছিল, যারা বৈশ্বিক ও যুগান্তকারী বৈজ্ঞানিক গ্রন্থাদি সংগ্রহের বিষয়কে তাদের ব্যক্তিগত আগ্রহে পরিণত করেছিলেন। গ্রন্থের পাশাপাশি তারা *বায়তুল হিকমা* নামের অন্যতম ইতিহাস শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিবৃত্তিক একাডেমি প্রতিষ্ঠার জন্য মুসলিম বিদ্বানদের একত্র করেছিলেন। এই বুদ্ধিবৃত্তিক পাওয়ার-হাউজ বাগদাদের শক্তিকে দ্বিগুণ করে দেয়, অর্থাৎ এই নগরী ছিল শিল্পকলা, বিজ্ঞান এবং জ্ঞানী-গুণীজনের সদর দপ্তর। শিল্পকলা ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের বিকাশ ও বিস্তৃতিতে এই নগরী যে ভূমিকা রেখেছিল, তা ছিল সত্যই অভূতপূর্ব।

বায়তুল হিকমার বিকাশের পর্যায় অনুসারে এটা দুটো নামে পরিচিত। খলীফা হারুন উর-রশিদের সময় এক কক্ষবিশিষ্ট অবস্থায় এটা *খিযানাতুল হিকমা* (প্রজ্ঞার সংগ্রহশালা) নামে পরিচিত ছিল। পরবর্তীতে খলীফা আল-মামুনের সময় যখন এটা বৃহৎ গ্রন্থাগারে পরিণত হয়, তখন এটা *বায়তুল হিকমা* (প্রজ্ঞার নীড়) নামে পরিচিতি লাভ করে। এটাতে বেশ বড় গ্রন্থাগার ছিল, যেখানে বিভিন্ন ভাষায় বিজ্ঞানের নানা শাখা-প্রশাখা নিয়ে লেখা গ্রন্থের এক বিশাল সংগ্রহশালা ছিল; আর এভাবেই তা পরিণত হয় বৈজ্ঞানিক একাডেমিতে।

খলীফা মুহাম্মদ আল-মাহদী তার সমর অভিযানে প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপিসমূহ সংগ্রহের প্রথম উদ্যোগ হাতে নেন। তার পুত্র খলীফা আল-হাদী এই ধারা অব্যাহত রাখেন এবং পরবর্তীতে ৭৮৬ থেকে ৮০৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত শাসন কার্য পরিচালনাকারী তার পুত্র খলীফা হারুন উর-রশিদ বৈজ্ঞানিক সংগ্রহশালা ও বিজ্ঞান একাডেমি প্রতিষ্ঠা করেন। ৮১৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে ২০ বছর শাসন চালানো খলীফা আল-মামুন *বায়তুল হিকমা*-কে সম্প্রসারিত করেন এবং বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখার জন্য পৃথক পৃথক বিভাগ চালু করেন। যার ফলে স্থানটি আলিম, শিল্পকলার পণ্ডিত, বিখ্যাত অনুবাদক, লেখক, জ্ঞানীগুণী, কবি এবং বিভিন্ন শিল্প ও কলাকৌশলের বিজ্ঞ ব্যক্তিদের সমাগমে টইটম্বুর হয়ে পড়ে।

মধ্যযুগীয় এই মেধাগুলো অনুবাদ, পাঠচক্র, লেখা ও আলোচনার কাজ চালিয়ে নেয়ার জন্য প্রতিদিনই একত্র হতেন। এই স্থান ছিল বিশ্বজনীন তারকার এক মিলন মেলা। লিঙ্গুয়া ফ্রাংকা বা যোগাযোগের সাধারণ ভাষা হিসেবে আরবী ব্যবহারের পাশাপাশি এখানে ব্যবহৃত হতো: ফারসি, হিব্রু, সিরিয়াক, আরামায়িক, গ্রিক, লাতিন এবং সংস্কৃত – যা প্রাচীন ভারতীয় গণিতের পাণ্ডুলিপিসমূহ অনুবাদে ব্যবহৃত হতো।

বিখ্যাত অনুবাদকদের মাঝে ছিলেন ইউহান্না ইবনুল বিতরকী আত-তুরজুমান, বাংলায় যার অর্থ দাঁড়ায়: 'বিশপের পুত্র, অনুবাদক ইউহান্না'। চিকিৎসাশাস্ত্রের চেয়ে তিনি দর্শন গ্রন্থ অনুবাদে স্বাচ্ছন্দবোধ করতেন। তিনি ১৯ অধ্যায়ে বিন্যস্ত এরিস্টটলের *The Book of Animals* গ্রন্থটি লাতিন থেকে আরবীতে ভাষান্তর করেন। গ্রিক চিকিৎসক হিপোক্রেটাস ও গ্যালেন রচিত গ্রন্থগুলোর আরেক বিখ্যাত অনুবাদক ছিলেন হুনাইন ইবনে ইসহাক।

উপর থেকে: এরিস্টটলের গ্রন্থগুলোর অনুবাদক, বায়তুল হিকমা-র শীর্ষস্থানীয় বিদ্বান, আল-কিন্দীর প্রতিকৃতি সম্বলিত ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দে জারিকৃত সিরিয়ার একটি স্ট্যাম্প। নিচ থেকে: ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের বাগদাদের একটি রক্ষিত ছবি। ১১শ বছর পূর্বে এই শহরটি ছিল বায়তুল হিকমা-র দর্শন-স্কুল।

বলা হয় যে, সিসিলির রাজার কাছে খলীফা আল-মামুন দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক গ্রন্থে সমৃদ্ধ সিসিলি গ্রন্থাগারের পুরো ক্যাটালগ চেয়ে পত্র লেখেন। সিসিলির রাজা সিসিলি গ্রন্থাগার থেকে গ্রন্থের কপি পাঠিয়ে পত্রের ইতিবাচক জবাব দেন।

গ্রন্থ পরিবহনে নানা পন্থা অবলম্বন করা হতো। আধুনিক বিমানের ব্যবস্থা না থাকায়, আল-মামুন হস্তে লেখা গ্রন্থ ও পাণ্ডুলিপিসমূহ খোরাসান থেকে বাগদাদে বহন করে আনার জন্য শত উটের পাল ব্যবহার করেছিলেন।

খলীফা আল-মামুন বাইযান্টিন সম্রাটেরও দারস্থ হয়েছিলেন। কেননা খলীফা আল-মামুন চেয়েছিলেন তার বৈজ্ঞানিকদের দিয়ে বাইযান্টিন সম্রাটের অধীনে থাকা গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থসমূহ অনুবাদ করাতে। সম্রাট তাতে রাজি হলে বৈজ্ঞানিকগণ সেখানে যায়; এবং এর পাশাপাশি তাদেরকে গ্রিক বিদ্বানদের যেকোন গ্রন্থ সাথে করে নিয়ে আসার দায়িত্ব দিয়ে দেয়া হয়।

বায়তুল হিকমা প্রতিষ্ঠানকে খলীফা আল-মামুন কেবল সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার হালই ধরেননি, বরং একইসাথে তিনি বৈজ্ঞানিক ও বিদ্বানদের আলোচনাতেও অংশ নিতেন। *মারসাদ আল-ফালাক্বী* নামে তিনি একটি জ্যোতির্বিদ্যা কেন্দ্র গড়ে তুলেছিলেন। সানাদ ইবনে আলী আল-ইয়াহুদী নামের এক ইহুদি এবং ইয়াহইয়া ইবনে আবী মানসূর নামের এক মুসলিম জ্যোতির্বিদ খলীফার এই জ্যোতির্বিদ্যা কেন্দ্র পরিচালনা করতো। এরা উভয়েই আল-মামুনের ব্যক্তিগত জ্যোতির্বিদ ছিল।

আল-মামুন তার পিতার মতো বহু উচ্চতর গবেষণা প্রতিষ্ঠান, মানমন্দির ও টেক্সটাইল বা বস্ত্র ইন্ডাস্ট্রির গোড়াপত্তন করেছিলেন। বলা হয় যে, তার শাসনামলে প্রতিষ্ঠিত উচ্চতর গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৩৩২ পর্যন্ত পৌঁছেছিল।

তিনি বিজ্ঞ পণ্ডিতগণের একটি শ্রেণিকে তার জন্য বিশ্ব মানচিত্র প্রস্তুত করতে বলেছিলেন এবং তারা তা সম্পন্ন করেছিল। ওই মানচিত্র 'আল-মামুনের মানচিত্র' (*আস-সুরাহ আল-মামুনিয়াহ*) নামে পরিচিত। মানচিত্রটি টলেমি ও অন্যান্য গ্রিক ভূগোলবিদদের জীবদ্দশায় প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রস্তুত করা হয়।

বায়তুল হিকমার শ্রেষ্ঠ প্রতিভাবানদের মাঝে ছিলেন বনী মূসার তিন ভাই – মুহাম্মদ, আহমাদ ও আল-হাসান, যারা গণিতজ্ঞ ও ট্রিক ডিভাইসের আবিষ্কারক হিসেবে পরিচিত; আল-খাওয়ারিযমী – বীজগণিতের 'জনক'; আল-কিন্দী – ক্রিপ্টোলজি (সাংকেতিক বার্তার পাঠোদ্ধার) ও সঙ্গীত তত্ত্বের উদ্ভাবক; সাইদ ইবনে হারুন আল-কাতিব – অনুলেখক; হুনাইন ইবনে ইসহাক আল-ইবাদী – চিকিৎসক ও অনুবাদক এবং তার পুত্র ইসহাক। এই নামগুলো আমাদের এই গ্রন্থে বারবার আসতে থাকবে। কেননা এই ব্যক্তিরাই বাস্তব পরীক্ষণের ভিত্তিতে গবেষণা, উদ্ভাবন এবং জ্ঞানের সুবিশাল ইমারত নির্মাণে নিয়োজিত ছিলেন। আজ আমরা যা জানি, তার অধিকাংশই তাদের নির্মিত ইমারতের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে।

অবশ্য আমাদেরকে উপরে বর্ণিত আব্বাসী *বায়তুল হিকমা*-কে ১০০৮ খ্রিস্টাব্দে খলীফা আল-হাকিম কর্তৃক কায়রোতে প্রতিষ্ঠিত ফাতিমী *দারুল হিকমা* থেকে আলাদা করতে হবে, যা ১৬৫ বছর পর্যন্ত টিকে ছিল। ইসলামী বিশ্বের প্রাচ্যের শহরগুলোতে ৯ম ও ১০ম শতাব্দিতে বাগদাদের বায়তুল হিকমাকে ছাড়িয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে বহু *দারুল ইলম* বা বিজ্ঞানাগার, আরও ভালোভাবে বললে জ্ঞানগৃহ প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে।

অপ্রতিদ্বন্দ্বি জ্ঞানচর্চা কেন্দ্র

২০০৪ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বরে প্রকাশিত যুক্তরাজ্যের গার্ডিয়ান পত্রিকায় ব্রায়ান হুইটেকার লিখেন:

"গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসা, রসায়ন, প্রাণিবিদ্যা, ভূগোলসহ মানবিক ও বিজ্ঞানের বিষয়াদি অধ্যয়নের জন্য বায়তুল হিকমা ছিল অপ্রতিদ্বন্দ্বি এক কেন্দ্র। পারসীয়, ভারতীয় এবং গ্রিক গ্রন্থাদি – এরিস্টটল, প্লেটো, হিপোক্রেটাস, ইউক্লিড, পিথাগোরাস এবং অন্যান্য মনীষীদের – জ্ঞান ভাণ্ডার থেকে আহরণ করে বায়তুল হিকমার বিদ্বানগণ গড়ে তোলে দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ জ্ঞান সংগ্রহশালা এবং এর উপর ভিত্তি করে তারা এগিয়ে নেয় নিজেদের আবিষ্কারের অগ্রযাত্রাকে।"

বায়তুল হিকমা

বুদ্ধিবৃত্তিক পাওয়ার হাউজ

বাগদাদের বিশ্বমানের একাডেমি, যা দূর-দূরান্তের বিদ্বানদের আকৃষ্ট করেছিল

উল্লেখযোগ্য পরম্পরা: বীজগণিতে বিশেষ অবদান; চিকিৎসা, দর্শন ও গণিত শাস্ত্রের গ্রন্থাদির অনুবাদ।

স্থান: বাগদাদ, ইরাক
তারিখ: ৯ম শতাব্দির গোড়ার দিকে প্রতিষ্ঠিত
প্রধান ব্যক্তিত্ব: খলীফা আল-মামুন, যিনি তার পিতার গড়া প্রতিষ্ঠানকে সমৃদ্ধির চূড়ায় নিয়ে যান

এক হাজার বছর আগে বাগদাদ ছিল দুনিয়ার সবচেয়ে বড় ও ধনী শহরগুলোর একটি। কিন্তু এর সম্পদ অর্থের সীমাকে ছাড়িয়ে যায়। দুই শতাব্দিরও বেশী সময় ধরে এটা ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞানের আবাসস্থল: এটা ছিল দুনিয়ার দূর-দূরান্তের বিদ্বানদের আকর্ষণকারী এক প্রতিষ্ঠান। গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা থেকে শুরু করে প্রাণিবিদ্যা – এই প্রতিষ্ঠান ছিল মুসলিম সভ্যতার গবেষণা, চিন্তা এবং বিতর্কের প্রধান কেন্দ্র – এক কথায় তৎকালীন বুদ্ধিবৃত্তিক পাওয়ার হাউজ।

এই একাডেমিতে পণ্ডিতগণ বিজ্ঞান, চিকিৎসা ও দর্শন শাস্ত্রের বিশাল সংগ্রহশালার গ্রন্থাদি থেকে সহায়তা নিতে পারতেন। যেই খলীফাগণ এই জ্ঞানগৃহ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তারা এখানে বিশ্বমানের এক গ্রন্থাগারের গোড়াপত্তন করেন, যেখানে বহু প্রাচীন সভ্যতার লিখিত পাণ্ডুলিপি পর্যন্ত অন্তর্ভুক্ত ছিল। ৭৮৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে শাসন করা খলীফা হারুন উর-রশিদ তার পিতা ও দাদার সংগৃহিত পাণ্ডুলিপিগুলো দিয়ে এই গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেন। তিন যুগ অতিবাহিত হতে না হতেই সংগ্রহশালাটি এতটাই বিস্তৃতি লাভ করে যে, তার পুত্র খলীফা আল-মামুন জ্ঞানের বিভিন্ন শাখার জন্য এই গৃহকে সম্প্রসারিত করেন। পরবর্তীতে তিনি আরও অসংখ্য গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করেন, যেন আরও অধিক সংখ্যক পণ্ডিতগণ তাদের গবেষণা চালিয়ে যেতে পারেন। ৮২৯ খ্রিস্টাব্দের দিকে তিনি একটি মানমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।

বায়তুল হিকমাতে আরবী, ফারসি, আরামায়িক, গ্রিকসহ নানা ভাষা বলা ও পড়া হতো। দক্ষ পণ্ডিতগণ প্রাচীন লেখাগুলো আরবীতে অনুবাদের জন্য কাজ করে যেতেন, যেন বিদ্বানগণ সেগুলো উপলব্ধি ও সমালোচনার পাশাপাশি সেগুলোর উপর নিজেদের বুদ্ধিবৃত্তিক সৌধ নির্মাণ করতে পারে। একাডেমির শীর্ষস্থানীয় জ্যোতির মাঝে আল-কিন্দী একজন, যিনি এরিস্টটলের অনুবাদে নিযুক্ত ছিলেন, অন্যদিকে হুনাইন ইবনে ইসহাক হিপোক্রেটাসের অনুবাদে নিয়োজিত ছিলেন। বায়তুল হিকমার গ্রন্থাগারকে সমৃদ্ধ করতে খলীফা আল-মামুন অনুবাদক ও পণ্ডিতদের উৎসাহিত করতেন এবং এমনটি বলতে শোনা যায় যে, প্রতিটি পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ গ্রন্থের জন্য তিনি ওই গ্রন্থের ওজনের সমপরিমাণ স্বর্ণ দিয়ে তাদের মূল্য পরিশোধ করতেন।

জ্ঞানের এই সফল স্থানান্তর পরবর্তীতে ১২শ শতাব্দির স্পেনে প্রতিফলিত হয়। ওই সময় টলেডো ছিল আরেকটি বিশাল অনুবাদ প্রচেষ্টার প্রধান কেন্দ্র – কিন্তু এই সময় ছিল আরবী থেকে লাতিন ভাষায় অনুবাদের কাল। আরবী গ্রন্থাদি এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রাচীন গ্রিক লেখনীগুলো সবার সম্মুখে আসে এবং খ্রিস্টান, ইহুদি ও মুসলিম পণ্ডিতগণ শহরটিতে ঝাঁকে ঝাঁকে সমাবেত হতে থাকেন। একত্রে তারা প্রাচীন গ্রিসের লেখনীগুলো ও

মূল আরবী প্রবন্ধগুলো লাতিন ভাষায়, অতঃপর লাতিন থেকে অন্যান্য ইউরোপীয় ভাষায় অনুবাদ করেন। এখানে এবং দক্ষিণ ইউরোপের অন্যত্র এরিস্টটলের কিছু গ্রন্থ মাইকেল স্কট কর্তৃক আরবী থেকে লাতিন ভাষায় অনূদিত হয়। ক্রিমোনার জেরার্ড আয-যাহরাবীর চিকিৎসা বিশ্বকোষ এবং আর-রাযীর রসায়ন বিষয়ক লেখাগুলোর অনুবাদ করেন।

বায়তুল হিকমার পণ্ডিতগণ যে সমৃদ্ধি অর্জন করেছিলেন, বর্তমান যুগে এসেও তার প্রভাব সদা বিদ্যমান। 'আলজেবরা' (বীজগণিত) শব্দটি এসেছে পণ্ডিত আল-খাওয়ারিযমী রচিত *"আল-জাবর ওয়াল মুকাবালা"* গ্রন্থের শিরোনাম থেকে। ৯ম শতাব্দির শুরুর দিকে বায়তুল হিকমাতে কাজ করার বদৌলতে তিনি বীজগণিতকে একটি শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড় করান। আল-খাওয়ারিযমীর উত্তরসূরি আল-কারাজী এই তত্ত্বগুলোর পরিমার্জন ও সমৃদ্ধি সাধন করেন এবং এর মাধ্যমে তিনি বীজগণিত চর্চার নতুন এক ধারার সূচনা করেন, যা শত শত বছর ধরে সমৃদ্ধ হতে থাকে। এই পণ্ডিতগণ এবং অন্যরা তাত্ত্বিক গাণিতিক ধারণার ভিত্তি স্থাপন করেন, যার উপর আধুনিককালের হিসাব-নিকাশ নির্ভর করে।

খলীফা আল-মামুনের দূরদৃষ্টি ও তার বুদ্ধিবৃত্তিক অবদান সুস্পষ্ট। *Almanon* (আলমানন) নামে চাঁদের একটি গর্তের নামকরণের মাধ্যমে তার নাম আজও বেঁচে আছে।
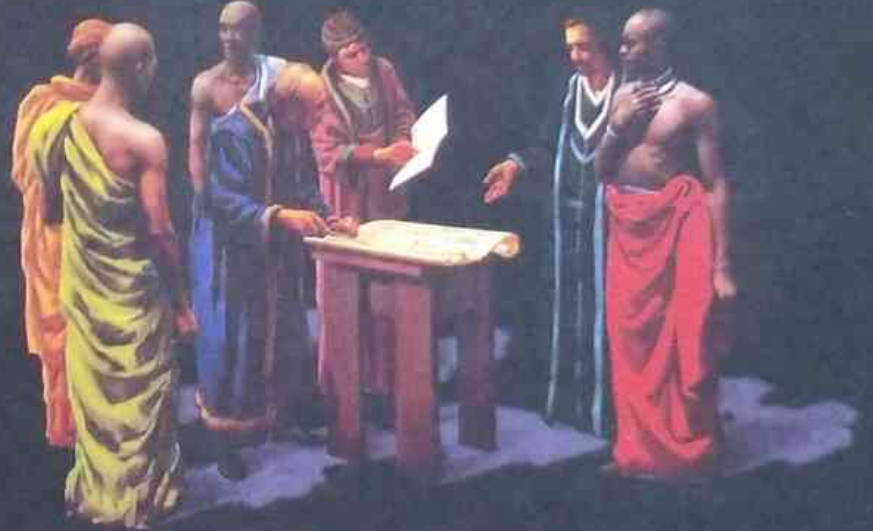
উল্টো পৃষ্ঠা এবং এই পৃষ্ঠা: ৯ম শতাব্দির বাগদাদের বুদ্ধিবৃত্তিক পাওয়ার হাউজ বায়তুল হিকমাতে গোটা মুসলিম বিশ্ব হতে ঝাঁকে ঝাঁকে মানুষ সমবেত হয়েছে। নানা বিশ্বাসের নারী ও পুরুষ বিদ্বানগণ পৃথিবীর দূর-দূরান্ত থেকে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা অধ্যয়ন করতে একত্র হয়েছে – এমন চিত্রই এখানে ফুটে উঠেছে।

০৪ গ্রন্থাগার এবং বই বিপণন

বলা হয় যে, আব্বাসী খলীফা আল-মামুন গ্রিক থেকে আরবী ভাষায় অনুবাদ করা প্রতিটি গ্রন্থের জন্য ওই গ্রন্থের ওজনের সমপরিমাণ স্বর্ণ অনুবাদকদের পারিশ্রমিক হিসেবে দান করতেন। এ ধরনের ঔদার্য বইয়ের বিপুল সরবরাহের পথ প্রশস্ত করে, যা মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে পরবর্তী প্রজন্মের সবার নজর এবং সম্মান আদায় করে। আব্বাসী খিলাফতকালে শত শত গ্রন্থাগার গড়ে উঠে, যার অধিকাংশই ছিল ব্যক্তি মালিকাধীন, আর এভাবেই শত-হাজার গ্রন্থ পাঠকদের নিকট সহজলভ্য হয়ে পড়ে।

জ্ঞানের এসব শাখায় এত পুস্তকের বিস্তৃতির পূর্বে ৭ম শতাব্দিতে মুসলিমদের নিকট কেবল একটি গ্রন্থই ছিল – কুরআন। কুরআনের ওহী নবী মুহাম্মদ (ﷺ)-এর নিকট আয়াত হিসেবে নাযিল হয়। নাযিলকৃত এই আয়াতগুলো তাৎক্ষণিকভাবে বহু সাহাবা মুখস্ত করে ফেলতেন এবং ওহী লেখকগণ সহজলভ্য লেখনী উপাদান, যেমন: পাতা, বস্ত্র, হাড় ও পাথরে ওই আয়াতগুলো লিখে রাখতেন। পরবর্তীতে ওহী নাযিলের ধারা সমাপ্ত হলে আল্লাহর নির্দেশনা মোতাবেক গোটা কুরআন তার চূড়ান্ত রূপ লাভ করে। কুরআনের বিন্যাসে ভূমিকা রাখার পাশাপাশি নবী (ﷺ) এটার সংরক্ষণে কোনো ঘাটতি রাখেননি। কুরআন মুখস্ত করা এবং অন্যদের তা শেখানোর এক জীবন্ত কালচার তিনি তার অনুসারীদের মাঝে জন্ম দিতে সফল হয়েছিলেন, যাতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সকলেই অংশ নিয়েছিল। প্রত্যেকে নিজ নিজ সামর্থ্য মোতাবেক কুরআন মুখস্তে নেমে পড়ে – কেউ পুরো কুরআন, কেউ অর্ধেক, কেউ এক তৃতীয়াংশ। এভাবে প্রজন্মের পর প্রজন্ম স্থানান্তরিত হতে থাকে মৌখিক কুরআন, ইসলামী পরিভাষায় যা *কিরাতে আম্মা*। এজন্যই কুরআন লিখিত কোনো পাণ্ডুলিপির মুখাপেক্ষী নয়, বরং লিখিত কুরআন *কিরাতে আম্মা* বা সর্বসাধারণের কিরাতের মুখাপেক্ষী। এ যেন বর্তমান সময়ের *অডিও বুক* (*Audio Book*)-এর মানবীয় সংস্করণ, যা বয়ে বেড়াচ্ছে হাজারো থেকে লাখো হাফিজ। সংরক্ষণের এ প্রক্রিয়া সত্যই অভূতপূর্ব।

পরবর্তীতে ইসলামের তৃতীয় খলীফা উছমান ইবনে আফফান (রা.) প্রস্তুত করেন কুরআনের একটি আদর্শ নুসখা। তার এই কাজের ফলশ্রুতিতে আরবী ভাষার পঠন ও লেখনীতে প্রমিতকরণের পথ প্রশস্ত হয় এবং এর মাধ্যমে কুরআনের বিস্তৃতি বেশ সহজ হয়ে উঠে। দুনিয়ার বড় বড় গ্রন্থাগারে আজও প্রায় ১৪০০ বছরের পুরানো উছমান (রা.)-এর সময়কালের পাণ্ডুলিপির নকল পাওয়া যায়।

গ্রন্থ ও পুস্তকাদির সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলার স্বাভাবিক মানে দাঁড়াচ্ছে: মুসলিমগণ বই-পুস্তক সংগ্রহ এবং গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার কাজকেও ভালোবাসে। বিস্তৃত নেটওয়ার্কের সুবিধাসম্পন্ন এসব সরকারি ও বেসরকারি গ্রন্থাগার এবং সেইসাথে বহু স্বনামধন্য ব্যক্তিগত সংগ্রহশালা মুসলিম বিশ্বের দূর-দূরান্তের পণ্ডিতদের আকর্ষণ করেছিল। এসব গ্রন্থাগারে উন্নতমানের কাগজের উভয় পৃষ্ঠায় লেখাসমৃদ্ধ এবং চামড়ায় বাঁধানো বিভিন্ন আকারের বই ও পাণ্ডুলিপি ছিল।
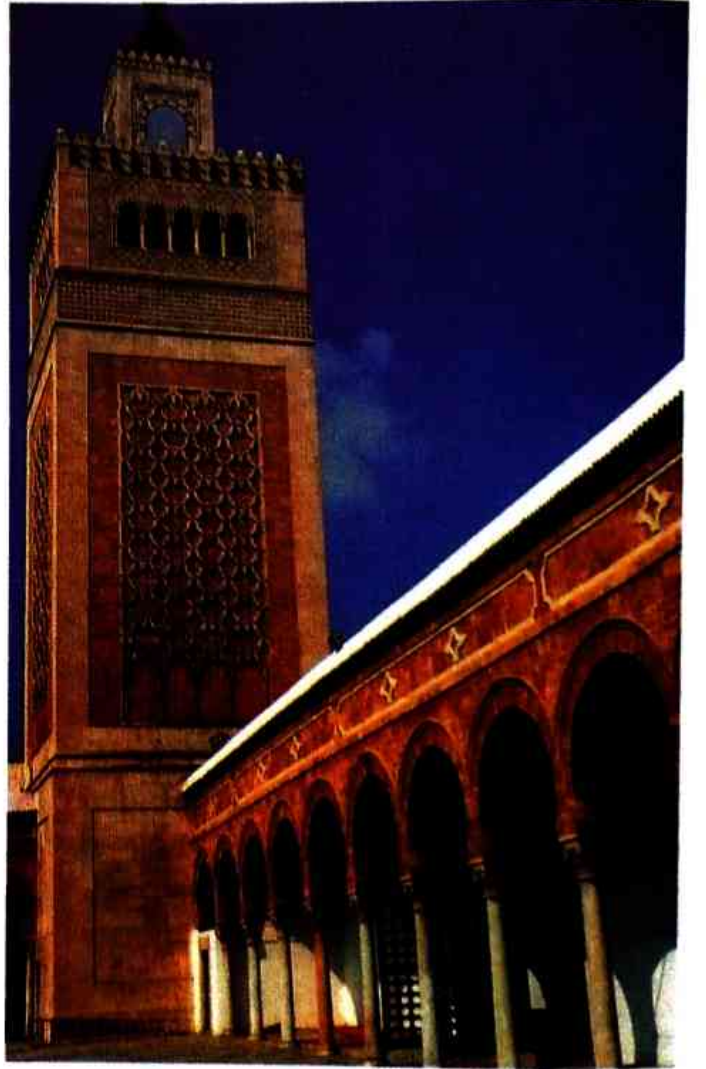
৭৩২ খ্রিস্টাব্দে তিউনিসিয়ার তিউনিসে যাইতুনা মসজিদভিত্তিক কলেজ কমপ্লেক্সটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৩শ শতাব্দিতে এই গ্রন্থাগারে পুস্তকের সংখ্যা ১০০,০০০ ছাড়িয়ে যায়।

> "যতক্ষণ আপনার নীরবতা প্রয়োজন, বই ততক্ষণ নীরব থাকে; যখন আলোচনায় মশগুল হতে চান, তখন তা সরব হয়ে উঠে। বই কখনো আপনার ব্যস্ততাতে বিঘ্ন ঘটায় না; কিন্তু যখনি আপনি নিঃসঙ্গতা অনুভব করেন, তখন বই হয়ে উঠে আপনার সব থেকে ভালো সঙ্গী। বইয়ের মতো বন্ধু না কখনো প্রতারণা বা তোষামোদের পথ বেছে নেয়, আর না কখনো আপনার ব্যাপারে ক্লান্ত হয়ে পড়ে।"
>
> – আজ-জাহিয, ৮ম শতাব্দির ইরাকের বসরার মুসলিম দার্শনিক ও বিদ্বান

বইয়ের সরকারি সংগ্রহশালাগুলো এতটাই বিস্তৃত ছিল যে, এমন একটি মসজিদ, শিক্ষালয় খুঁজে পাওয়া দুষ্কর ছিল, যেখানে বইয়ের কোনো সংগ্রহশালা ছিল না। ১২৫৮ খ্রিস্টাব্দে মোঙ্গলদের দ্বারা বাগদাদের পতনের আগ পর্যন্ত এই নগরীতে ৩৬-টি গ্রন্থাগার এবং কয়েক শ'য়ের উপর গ্রন্থ ব্যবসায়ী ছিল, যাদের অনেকেই ছিল প্রকাশক এবং যাদের অধীনে অনুলিপিকারদের দল কাজ করতো। কায়রো, আলেপ্পো, ইরানের বৃহৎ শহরগুলো, মধ্য এশিয়া এবং মেসোপটেমিয়াতে এ ধরনের বহু গ্রন্থাগার ছিল।

মসজিদভিত্তিক গ্রন্থাগারগুলোকে *দারুল কুতুব* বলা হতো এবং এগুলো ছিল বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মকাণ্ডের প্রাণকেন্দ্র। লেখক ও বিদ্বানগণ এখানে তাদের গবেষণার ফলাফল যুবক, পণ্ডিত ও সাধারণ শ্রোতাদের মিশ্র সমাবেশে তুলে ধরতেন। এ ধরনের আলোচনা সভায় যেকেউ অংশ নিতে পারতো। পেশাদার *ওর্‌রাক্ব* (*নুস্‌সাখ*) বা অনুলিপিকারগণ অতঃপর আলোচনার বিষয়বস্তুকে নকল করে গ্রন্থ বানিয়ে ফেলতেন। এমনকি সরকারিভাবে যখন গ্রন্থ লেখার দায়িত্ব দেয়া হতো, তখনও তা এভাবে প্রকাশিত হতো।

সিরিয়ার আলেপ্পো নগরেই সম্ভবত সবচেয়ে প্রাচীন ও সর্ববৃহৎ মসজিদভিত্তিক গ্রন্থাগার ছিল। দশ হাজারেরও অধিক পুস্তকে সমৃদ্ধ *সায়ফিয়া* নামে সুবিদিত এই গ্রন্থাগার সুবিশাল উমাইয়া মসজিদে অবস্থিত ছিল। ঐতিহাসিক বর্ণনা মোতাবেক এই গ্রন্থগুলো শহরের বিখ্যাত শাসক সাইফুদ্দোলা উইল করে দান করেন।

সায়ফিয়া যেমন ছিল সবচেয়ে প্রাচীন ও সর্ববৃহৎ, তেমনিভাবে তিউনিসের যাইতুনা মসজিদ কমপ্লেক্স ছিল সম্ভবত সবচেয়ে সমৃদ্ধ। এতে লাখের কাছাকাছি পুস্তক ছিল এবং বলা হয় যে, হাবশী সাম্রাজ্যের অধিকাংশ শাসক এই গ্রন্থাগার রক্ষণাবেক্ষণ ও সমৃদ্ধকরণকে মর্যাদার ইস্যুতে পরিণত করেন এবং এ ব্যাপারে তারা একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতা করতো। এক পর্যায়ে এই গ্রন্থাগারের সংগ্রহ ১০০,০০০-কেও ছাড়িয়ে যায়।

৮ম শতাব্দির মুসলিম দার্শনিক ও বিদ্বান আল-জাহিয ৫০ বছরের অধিক সময় অধ্যয়ন এবং ২০০-এরও অধিক গ্রন্থ রচনায় অতিবাহিত করার পর বাগদাদ থেকে নিজ বাড়ি বসরাতে প্রত্যাবর্তন করেন। তার এই বিস্তৃত লেখনীর মাঝে "*কিতাবুল হাইওয়ান*" (প্রাণিজগৎ) উল্লেখযোগ্য, যেখানে তিনি পিঁপড়াদের সামাজিক ব্যবস্থা, পশুপাখির মাঝে পারস্পরিক যোগাযোগ এবং খাদ্যচক্র ও পরিবেশের প্রভাব পর্যবেক্ষণ নিয়ে আলোচনা তুলে ধরেছেন। তার অন্যান্য গ্রন্থের মাঝে রয়েছে "*আল-বয়ান ওয়াত তাবইয়ীন*" (অলংকার ও বক্তব্য উপস্থাপন) এবং "*কিতাবুল বুখালা*" (কৃপণতা)। বস্তুত তিনি যথাযথ মৃত্যুই বরণ করেন; ৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে ৯২ বছর বয়সে নিজের ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারে অধ্যয়নকালে এক স্তুপ বই তার উপর পড়লে তিনি সেখানেই মারা যান।

গ্রন্থপ্রেমীদের মাঝে একটা সংস্কৃতি গড়ে উঠে। মারা যাওয়ার পূর্বে তারা তাদের সংগৃহিত পাণ্ডুলিপিগুলো – যে সংখ্যা কখনো হাজারও ছাড়িয়ে যেত – মসজিদভিত্তিক গ্রন্থাগারগুলোতে দান করে দিতেন, যেন সবাই তার সংগ্রহশালা থেকে উপকৃত হতে পারে। ঐতিহাসিক আল-জাবুরী বলেন, তুর্কি বংশোদ্ভূত নায়লা খাতুন নামের এক বিত্তশালী বিধবা নারী তার পরলোকগত স্বামী মুরাদ এফেন্দির নামে একটি মসজিদ গড়ে তোলেন, যার সাথে একটি বিদ্যালয় ও গ্রন্থাগার সংযুক্ত ছিল। ভ্রমণরত বিদ্বানদের কাছ থেকে গ্রন্থের আরেকটি সরবরাহ আসতো, বস্তুত মসজিদ কর্তৃক আয়োজিত

উমাইয়া গ্রন্থাগার

স্পেনের উমাইয়া শাসকদের অধীন কর্ডোবা গ্রন্থাগারে ৬০০,০০০-এরও অধিক পুস্তক ছিল। ৯৬১ থেকে ৯৭৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত স্পেন শাসন করা খলীফা দ্বিতীয় আল-হাকিমের জন্য পুস্তকের সান্নিধ্য এতটাই প্রিয় ছিল যে, বলা হয়, "সিংহাসনের চেয়ে পুস্তকের সান্নিধ্যই তাকে বেশি বিভোর করে রাখতো।"

বিনামূল্যে থাকা-খাওয়া ও মনিহারী দ্রব্যের সরবরাহের কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তারা মসজিদে গ্রন্থ ও পুস্তকাদি দান করে দিতেন।

গ্রন্থাগারগুলোও বিশাল আয়োজনসমৃদ্ধ হতো। ১০ম শতাব্দির ইরানের শিরাজে অবস্থিত এসব কমপ্লেক্সের বিবরণ ঐতিহাসিক আল-মুকাদ্দিসী এভাবে দেন, "হ্রদ ও পানির নালাসহ ভবনগুলো বাগান দ্বারা বেষ্টিত ... সুউচ্চ গম্বুজ, উপর ও নিচ তলাসহ ... মোট ৩৬০-টি কামরা ... প্রতিটি ডিপার্টমেন্টে ক্যাটালগ (গ্রন্থ তালিকা) তাকের উপর সাজানো ... কক্ষগুলো গালিচা দ্বারা সুসজ্জিত।"

শিরাজ, কর্ডোবা ও কায়রোর গ্রন্থাগারগুলোর মতো কিছু কিছু গ্রন্থাগার মসজিদ ভবন থেকে পৃথক ছিল। ভবনগুলো বেশ প্রশস্ত এবং বই-পুস্তকাদি জমা করে রাখার সুসজ্জিত গ্যালারি, পাঠকক্ষ, পাণ্ডুলিপি থেকে অনুলিপি তৈরির কামরা ও সম্মেলন কক্ষসহ নানা উদ্দেশ্যে এই ভবনগুলো ব্যবহৃত হতো। গালিচা, মাদুর ও বসার গদিসহ এ সমস্ত কামরা পর্যাপ্ত আলোকসজ্জিত ও আরামদায়ক হতো।

আজকের দিনের গ্রন্থাগারগুলোর মতোই এক হাজার বছর আগের সরকারি ও বেসরকারি গ্রন্থাগারগুলোতে পাঠকদের সুবিধার্থে পুস্তকের শ্রেণিবিন্যাস ও নির্ভুল ক্যাটালগিং ব্যবস্থাসহ বেশ উচ্চমানের বিন্যাস ব্যবস্থা ছিল। বই-পুস্তকাদি ও নথিপত্রের সংখ্যা ও গুণগত মানের উপর লাইব্রেরিয়ান বা গ্রন্থাগারিকের নিয়ন্ত্রণ থাকতো।

১০৫০ খ্রিস্টাব্দের দিকে কায়রোর আল-আযহার গ্রন্থাগারের পুস্তক সংগ্রহের সংখ্যা ১২০,০০০-কেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল এবং সেগুলোর ক্যাটালগই ছিল ৬০ খণ্ডে প্রায় ৩,৫০০ পৃষ্ঠার মতো। বলা হয়, স্পেনের আল-হাকিম গ্রন্থাগারের ক্যাটালগ প্রায় ৪৪ খণ্ডের ছিল।

গ্রন্থাগার দেখভালের জন্য গ্রন্থাগারিক নিয়োগ দেয়া হতো, যা খুবই সম্মানজনক পদ ছিল এবং এই পদ শুধু শ্রেষ্ঠ বিদ্বানদের জন্যই নির্দিষ্ট ছিল। যারা 'অসামান্য কৃতিত্বের স্বাক্ষর' রাখতেন কেবল তারাই গ্রন্থাগার ও জ্ঞানের জিম্মাদার (রক্ষক) ও তত্ত্বধায়ক হিসেবে বিবেচিত হতেন। ১২শ ও ১৩শ শতাব্দির দিকে উত্তর আফ্রিকার আলমোহাদ রাজত্বকালে সর্বাধিক প্রাধিকারযুক্ত রাষ্ট্রীয় পদগুলোর মাঝে গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা অন্যতম ছিল।

এ সকল গ্রন্থাগার ছিল অপরিহার্য জ্ঞান ও বিজ্ঞানের ধারক, যেমনটি ১৯শ শতাব্দির মার্কিন লেখক রাল্‌ফ ওয়ালদো এমারসন বলেন, "বাছাই করা সবচেয়ে ছোট একটি গ্রন্থাগারে আপনি কী পাবেন, তা একবার চিন্তা করুন। (এখানে আপনি) সকল সভ্য দেশের হাজার বছরের সবচেয়ে বিজ্ঞ ও বিদগ্ধজনের সান্নিধ্য (বইয়ের মাঝে) পাবেন এবং তাদের শিক্ষা ও প্রজ্ঞার প্রাপ্তিসমূহকে সবচেয়ে সুবিন্যস্ত আকারে পাবেন ... আমাদের ন্যায় ভিন্ন সময় ও কালের মানুষজনের নিকট (তাদের এসব কীর্তি) বোধগম্য ভাষায় লিখিত আছে।"

জ্ঞানের বিকাশে বই বিপণীর বিশেষ অবদান ছিল। ১০ম শতাব্দির গ্রন্থানুরাগী ও বই বিক্রেতা ইবনে নাদিমের প্রসিদ্ধ বই বিপণীটি বৃহদাকার ভবনের উপর তলায় অবস্থিত ছিল, যেখানে খরিদদারগণ পাণ্ডুলিপি পরীক্ষা-নিরীক্ষা, বিশ্রাম নেয়া এবং ভাবের আদান-প্রদানের জন্য একত্র হতেন। এক হাজার বছর পূর্বে মুসলিম বিশ্বে সরকারি ও ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারের পাশাপাশি শতাধিক শিরোনামের পুস্তকসমৃদ্ধ বইয়ের দোকানেরও কমতি ছিল না।

আরবী *ওয়ারাক্ব* বা কাগজ শব্দটি আসলে *ওয়াররাক্ব* পেশা থেকে এসেছে। এই *ওয়াররাক্ব* উপাধি কাগজ বিক্রেতা, লেখক, অনুবাদক, অনুলিপিকার, বই বিক্রেতা, গ্রন্থাগারিক এবং সমাজের আলোকবর্তিকা হিসেবে বিবেচিত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতো। চীন থেকে মুসলিম বিশ্বে কাগজ তৈরির শিল্পের সূচনার পরপরই *ওয়াররাক্বীন* পেশাটির সূচনা হয়েছে বলে সাধারণভাবে ধারণা করা হয়। বাগদাদই সম্ভবত প্রথম বড় শহর, যেখানে প্রথমবারের মতো *ওয়াররাক্বী* বই বিপণন চালু হয় এবং কাগজ উৎপাদনের বিস্তৃতির সাথে সাথে বইয়ের দোকানের সংখ্যা মুসলিম বিশ্বে নাটকীয় হারে বৃদ্ধি পায়।

১২শ শতাব্দির মরক্কোর মারাকেশের একটি প্রদেশে যেসব বই বাঁধাইকারী বা বইয়ের সওদাগর নিজেদের বই বিপণী ও গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি লেখক ও অনুলিপিকারদের নিয়োগ দিতেন, তাদের বোঝানোর জন্য মরক্কোতে *কুতুবিয়্যুন* নামটি ব্যবহৃত হতো। এই প্রদেশে রাস্তার দুপাশে ৫০টি করে মোট ১০০-টি বই বিপণী ও গ্রন্থাগার ছিল। এ ধরনের কর্মকাণ্ড ইয়াকুব আল-মানসূরের শাসনামলে একেবারে চূড়ায় আরোহণ করে, যিনি বই বাঁধাই শিল্পের বিকাশে পৃষ্ঠপোষকতা এবং বই-পুস্তক পাঠের মনোবৃত্তিতে বেশ উৎসাহ জুগিয়েছেন।
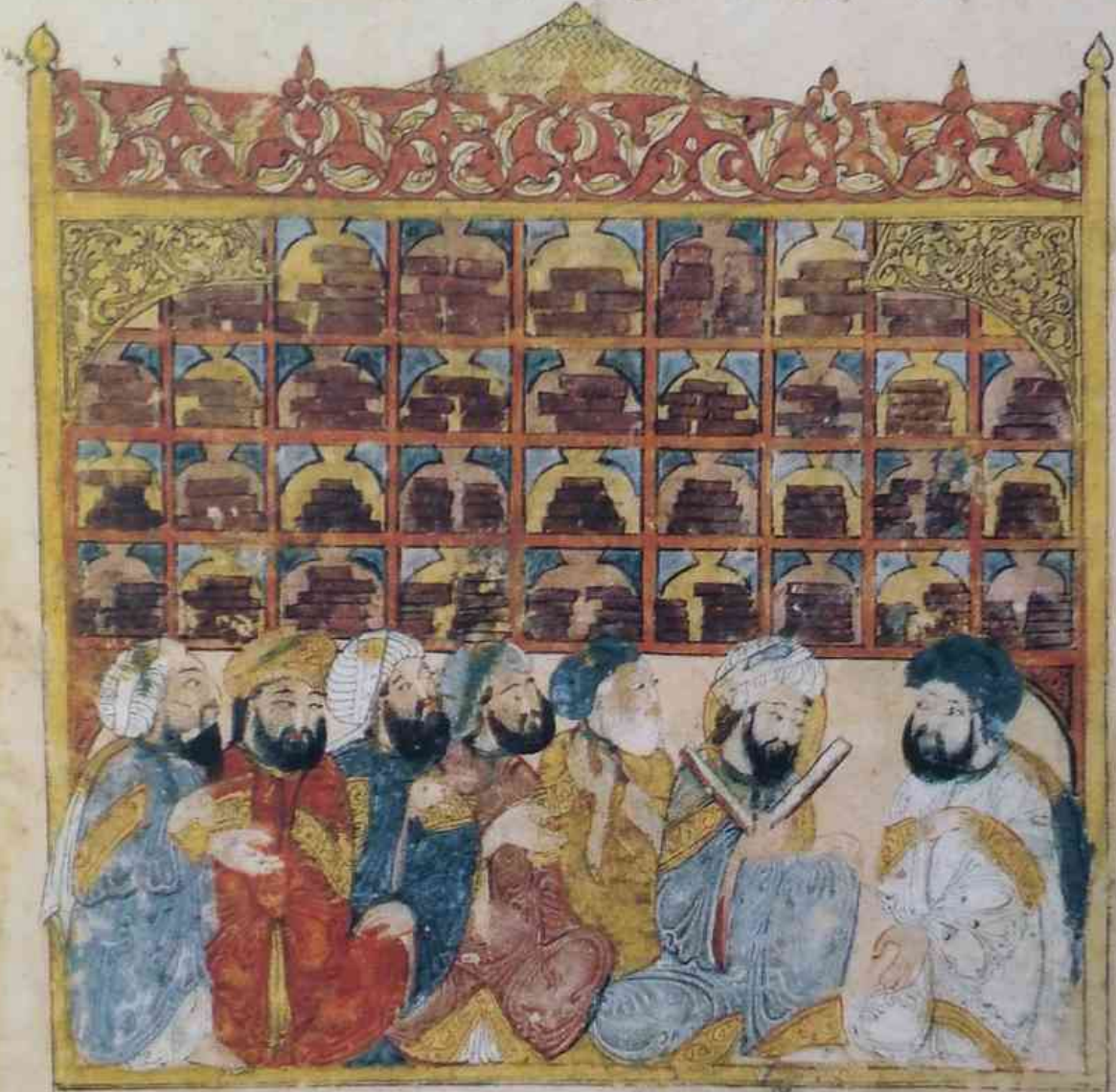
মাকামাতে হারিরীর ১৩শ শতাব্দির একটি পাণ্ডুলিপি,
যাতে বাগদাদের হুলওয়ান সরকারি গ্রন্থাগারের চিত্র প্রদর্শিত হয়েছে।

০৫ জ্ঞানের অনুবাদ

ইউরোপ তখন অন্ধকারে – অন্যদিকে মুসলিম বিজ্ঞানী ও বিদ্বানদের আবিষ্কার, নব উদ্ভাবন, গবেষণা ও লেখনীর লক্ষণীয় দিক হচ্ছে, জ্ঞানের জন্য তাদের ছিল অনিবারণযোগ্য তৃষ্ণা। আর সেটা কেবল জ্ঞানের স্বার্থে জ্ঞান শেখা নয়, বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা ছিল ব্যবহারিক প্রয়োজন এবং মানুষের জীবনযাত্রার গুণগত মানোন্নয়নের জন্য নিবেদিত।

জ্ঞানের প্রতি এই অদম্য স্পৃহার পিছনে রয়েছে নবী মুহাম্মদ (ﷺ)-এর আধ্যাত্মিক প্রেরণা। কেননা তিনি (ﷺ) বলেন, "যখন কোনো ব্যক্তি মারা যায়, তখন তিনটি জিনিস ব্যতীত তার সব আমল বন্ধ হয়ে যায়: *সাদাকায়ে জারিয়া* (এমন দান, যা থেকে মানুষ উপকৃত হয়), ওই জ্ঞান – যা মানুষকে উপকৃত করে; এবং পুণ্যবান সন্তান – যে তার জন্য দু'আ করে।"

বিশ্বকোষতুল্য মুসলিম মহামনীষীগণ তাদের অনুসন্ধানসমূহ লিপিবদ্ধ করার ক্ষেত্রে এক বিস্ময়কর উদ্যম প্রদর্শন করেন এবং এর মাধ্যমে তারা যুগান্তকারী তথ্যে সমৃদ্ধ অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করেন, যার প্রতিটি ছিল সুবিশাল। গ্রন্থসমূহ হাজারের পর হাজার পৃষ্ঠা ছাড়িয়ে যেত, খণ্ডের পর খণ্ডে বিস্তৃত হতো গ্রন্থের পরিসর এবং এসব পূর্ণ করে ফেলতো গ্রন্থাগারের সব তাক। ৮ম থেকে ১৩শ শতাব্দি পর্যন্ত বিস্তৃত মুসলিম সভ্যতার সোনালি যুগ প্রাচীন জ্ঞান-বিজ্ঞানকে কেবল বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করেনি, বরং সংযোজন ও সংশোধন, নয়া আবিষ্কার ও প্রচারের মাধ্যমে সেগুলোকে আরও সমৃদ্ধ ও নয়া আকার দান করে। জ্ঞান শেখা এবং তা-র সংগ্রহে মুসলিম কীর্তি সম্পর্কে জানতে হলে আপনি এই গ্রন্থের *বায়তুল হিকমা* অধ্যায়ে চলে যেতে পারেন।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের এই সমৃদ্ধ উপলব্ধির একেবারে কেন্দ্রে ছিল সরাসরি প্রত্যক্ষকরণের ধারণা। কোনো কিছু ঠিক মতো কাজ করছে কিনা, তা বোঝার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য উপায় হচ্ছে: নিজ চোখে প্রত্যক্ষ করা এবং কেবল এর পরেই আপনি তা লিখতে সক্ষম হবেন। ১০ম শতাব্দির শেষভাগে ইবনুল হাইছাম তার পরীক্ষণ সম্পূর্ণ অন্ধকার কক্ষে পরিচালনা করেন। ইবনুল হাইছাম ছিলেন ইতিহাসের অন্যতম প্রথম ব্যক্তি, যিনি পরীক্ষণের মাধ্যমে তার তত্ত্ব বা থিওরি যাচাই করেন এবং এর মাধ্যমে তিনি সকল বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির পরশপাথর – 'তুমি যা বিশ্বাস করো, তা প্রমাণ করো' – প্রতিষ্ঠা করেন। আপনি তার এবং তার পরীক্ষণ সম্পর্কে এই গ্রন্থের প্রথম বিভাগের দৃষ্টিশক্তি ও ক্যামেরা অধ্যায়ে আরও আলোচনা পাবেন।

জ্ঞানের প্রতি এই পিপাসা ছিল অনেকটা সংক্রমক রোগের ন্যায় সদা বিস্তৃতশীল, যার শাখা-প্রশাখা সমুদ্রের অতল গভীরে পৌঁছে ছিল। বহু শাস্ত্রে পারদর্শী মুসলিম পণ্ডিতদের পরীক্ষণের উপর প্রতিষ্ঠিত বিশ্বকোষ ভবনতুল্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের নয়া ইমরাত থেকে উপকৃত হতে ঝাঁকে ঝাঁকে অমুসলিমরা মুসলিম বিশ্বে পাড়ি জমায়।

বামে ইবনুল হাইছাম এবং ডানে গ্যালিলিও – যারা পর্যবেক্ষণ ও যুক্তির মাধ্যমে দুনিয়ার পর্যবেক্ষণ করেছেন। ১৬৪৭ খ্রিস্টাব্দের চাঁদের বিবরণ বিষয়ক ইয়োহান হাবেলিয়াস কর্তৃক রচিত Selenographia গ্রন্থের সম্মুখ প্রচ্ছদে এই দু'জন মনীষীকে দেখা যাচ্ছে। ইবনুল হাইছাম একটি জ্যামিতিক ডায়াগ্রাম ধরে আছেন, অন্যদিকে গ্যালিলিও একটি টেলিস্কোপ ধরে আছেন।

স্পেনের টলেডো শহরের সাম্প্রতিক একটি ছবি। ১২শ শতাব্দির মুসলিম টলেডো কমপক্ষে তিনটি ধর্মের লোক তথা মুসলিম, খ্রিস্টান ও ইহুদিদের স্থান করে দিয়েছিল, যেখানে তারা পাশাপাশি বসবাস ও কাজ করতো। মানুষ ও নিত্য-নতুন চিন্তার মিলন মেলার এই শহর পূর্ব ও পশ্চিম থেকে বিদ্বান ও অনুবাদকদের আকর্ষণ করে তার পানে ছুটে আসতে বাধ্য করেছিল।

> "বিচার দিবসে আদম সন্তানের পা এক চুলও নড়তে পারবে না, যতক্ষণ না তাকে চারটি বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে: কীভাবে সে তার জীবন ব্যয় করেছে, কীভাবে সে তার যৌবন অতিবাহিত করেছে, কোথা থেকে সে তার সম্পদ আহরণ করেছে ও কীভাবে সে ওই সম্পদ ব্যয় করেছে এবং সে তার জ্ঞানকে কীভাবে ব্যবহার করেছে।"
>
> – নবী মুহাম্মদ (ﷺ), সুনান তিরমিযী

১১৪০ খ্রিস্টাব্দে নরফোকের কর্মচাঞ্চল্যহীন এক গ্রামে জন্ম নেয়া ইংরেজ ধর্মযাজক ও বিজ্ঞানী ড্যানিয়েল মোরলী জ্ঞানের সন্ধানে বেরিয়ে পড়েন। তিনি ছিলেন ইউরোপীয় উদারমনা ও প্রগতিশীল ভাবনার এক চিন্তানায়কের নমুনা, যিনি তার মেধা ও মননকে মুসলিম জ্ঞান-বিজ্ঞান দ্বারা বিকশিত করেছিলেন।

ড্যানিয়েল মোরলী খুব সম্ভবত বাথ-নিবাসী অ্যাডেলার্ডের ছাত্র ছিলেন, যিনি ভবিষ্যৎ রাজা দ্বিতীয় হেনরির কাছে লিখে পাঠান যে, "লাতিন ভাষায় রচিত লেখনীগুলো সতর্কতার সাথে পাঠ করা এবং উপলব্ধিতে নিজেকে ব্যস্ত রাখবেন না, ... বরং গোলক, বৃত্ত এবং গ্রহ-নক্ষত্রের আবর্তনের ব্যাপারে আরবদের মতামত উপলব্ধির ব্যাপারেও মনোযোগী হন। আপনিই তো বলেন, যে জন্ম নিয়েছে এবং দুনিয়ার এই বৃহৎ মঞ্চে বেড়ে উঠেছে, কিন্তু সে যদি জগতের সৌন্দর্যের পিছনের কারণ অনসুন্ধান না করে, তবে সে এই জগতের রঙ্গ-মঞ্চের উপযুক্ত নয় এবং তাকে এখান থেকে বের করে দেয়া উচিত ...। আর তাই পৃথিবী ও তার উপাদানের ব্যাপারে আরবীতে যা কিছুই আমি শিখি না কেন, তা আমি লাতিন ভাষায় লিপিবদ্ধ করবো।"

নিজের শিক্ষাকে বিস্তৃত করার মানসে অন্যসব তরুণ শিক্ষার্থীর মতো ড্যানিয়েল তার নিজ জন্মভূমি ইংল্যান্ড ত্যাগ করে পূর্বে অগ্রসর হয়ে প্রথমত প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে আসেন। তার ভাষ্য মতে, এই বিশ্ববিদ্যালয় 'একটি জরাজীর্ণ ও মৃতপ্রায়' প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে এবং এখান থেকে দ্রুত বিদায়ের প্রহর তিনি গুণছেন। তিনি বলেন, "প্যারিসের শিক্ষকগণ এতটাই অজ্ঞ যে, তারা মূর্তির ন্যায় নিথর দাঁড়িয়ে থাকে এবং নীরবতার মাধ্যমে তারা প্রজ্ঞার কারিশমা দেখানোর একটা ভান ধরে।"

তাহলে প্রশ্ন হলো, তিনি কোথায় গিয়েছিলেন? বেশ ভালো প্রশ্ন এবং এই প্রশ্নের উত্তর তিনি নিজেই দিয়েছেন এভাবে, "এই দিনগুলোতে টলেডোর আরবী শিক্ষার সুনাম ও কদর যেহেতু সর্বত্র, তাই আমি দুনিয়ার সবচেয়ে বিজ্ঞ দার্শনিকদের কাছে শেখার জন্য দ্রুত সেখানে ছুটে গেলাম।" ১২শ শতাব্দির টলেডোতে কম করে হলেও তিনটি সংস্কৃতি পাশাপাশি বসবাস করতো: মুসলিম, খ্রিস্টান ও ইহুদি। এটা সাংস্কৃতিক উৎকর্ষতার এমন এক সময় ছিল, যেখানে সকলে শ্বাসরুদ্ধকরভাবে জ্ঞানের পিপাসায় কাতর ছিল।

যদিও টলেডো গির্জার আর্কাইভে থাকা হাজার হাজার আরবী পাণ্ডুলিপি জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছিল, তথাপি এই গির্জাতে ড্যানিয়েল মোরলীর ১২শ শতাব্দি সময়কালের প্রায় ২৫০০ এর মতো আরবী থেকে লাতিন ভাষায় অনূদিত পাণ্ডুলিপি অক্ষত রয়ে গেছে।

১২শ শতাব্দির টলেডোতে সম্ভবত বিজ্ঞানের ইতিহাসে আরবী থেকে লাতিন ভাষায় অনুবাদের সবচেয়ে বড় দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়েছিল। যা পশ্চিমা খ্রিস্টান বিশ্বের অগণিত পণ্ডিত ও অনুবাদককে আকর্ষিত করে। পশ্চিমা বিশ্বে গ্রিক দার্শনিক ও গণিতজ্ঞদের হারিয়ে যাওয়া গুরুত্বপূর্ণ লেখনীগুলো মুসলিমদের দ্বারা টলেডোতে আসে, সংরক্ষিত হয় এবং মুসলিমগণ গবেষণার দ্বারা সেগুলোর উৎকর্ষ সাধন করে। পশ্চিমা মহলে *অ্যাভেরস* নামে পরিচিত ইবনে রুশদের করা এরিস্টটলের পর্যালোচনা ও ব্যাখ্যা ছিল ইউরোপের ধ্রুপদী জাগরণের সত্যিকার সূচনা, যা ইউরোপীয় রেনেসাঁ শুরুর ২০০ বছর পূর্বে সংঘটিত হয়।

> "টলেডোর আসল রত্ন শহরের গ্রন্থাগারগুলোতে খুঁজে পাওয়া যাবে, যেখানে তিন সম্প্রদায় অর্থাৎ মুসলিম, খ্রিস্টান ও ইহুদি ধর্মের লোকেরা গুরুত্বপূর্ণ পাণ্ডুলিপি অনুবাদের সাথে জড়িত ছিল। মুসলিম, খ্রিস্টান ও ইহুদিদের সমন্বয়ে গঠিত দল প্রাচীন পাণ্ডুলিপিগুলোর আরবী অনুবাদ সম্পন্ন করতো এবং এরপর তারা সেগুলো *ক্যাস্টেলান* স্প্যানিশ ও লাতিন ভাষায় রূপান্তর করতো। এমন কাজের জন্য প্রয়োজন পারস্পরিক সহযোগিতা ও ধর্মীয় সম্প্রীতি। এই পারস্পরিক সহযোগিতা ও ধর্মীয় সম্প্রীতি বোঝানোর জন্য আন্দালুসীয় শব্দ *কন্সভিভেনসিয়া* (Convivencia) ব্যবহৃত হয়, যার অর্থ: একত্রে বসবাস।"
>
> – রাগেহ উমর, *An Islamic History of Europe* শীর্ষক বিবিসি'র প্রামাণ্যচিত্র

১২শ শতাব্দির শেষের দিকে লিখিত ইবনে রুশদ কর্তৃক রচিত এরিস্টটলের ব্যাখ্যা ও সারসংক্ষেপ গ্রন্থগুলোর লাতিন ভাষায় অনুবাদ শুরু করেন স্কটল্যান্ডের পণ্ডিত মাইকেল স্কট এবং তার মৃত্যুর পর ১২৩৬ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে তার শিষ্য হারমান দ্য জার্মান এই কাজ সমাপ্ত করেন।

টলেডো ও সিসিলি শহরে করা এই লাতিন অনুবাদগুলো ইউরোপের ভাগ্য বদলে দেয়। "ইবনে রুশদ হয়তো প্যারিসকে ইউরোপের বুদ্ধিবৃত্তিক রাজধানী হিসেবে বেছে নিতেন ... ধর্ম ও বিজ্ঞানের মাঝে আপাত যে দ্বন্দ্ব দৃশ্যমান হয় তিনি তা প্রশমনের চেষ্টা করছিলেন। কেননা বিজ্ঞানের মাধ্যমে যে সত্য উদ্ভাসিত হয়, প্রায়শই তা ধর্মগ্রন্থে নাযিল হওয়া সত্যের সাথে দ্বন্দ্বে জড়ায়। তার এই প্রচেষ্টা বিপরীতফল নিয়ে আসে, যখন তার ধারণাগুলো খ্রিস্টান গির্জাগুলোর দৃষ্টিগোচর হয়। তাৎক্ষণিকভাবে তারা ইবনে রুশদ ও এরিস্টটলের লেখাগুলো নিষিদ্ধ করে। প্যারিসের বুদ্ধিজীবীগণ পাল্টা প্রতিরোধ গড়ে তোলে এবং এই দ্বন্দ্ব বছরের পর বছর ধরে চলতে থাকে" – রাগেহ উমর, *An Islamic History of Europe* শীর্ষক বিবিসি প্রামাণ্যচিত্রে এই মন্তব্য করেন।

টলেডোতে অবস্থিত রাজা প্রথম পিটারের প্রাসাদটি আজ আরবী ও হিব্রু অনুবাদ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। ১৪শ শতাব্দির স্পেনে খ্রিস্টান, ইহুদি ও মুসলিমরা মিলেমিশে আরবী ও হিব্রু থেকে লাতিন ও স্প্যানিশ ভাষায় অনুবাদের কাজ করতো।

মাইকেল স্কট ও হারমান দ্য জার্মানের সাথে সাথে পুরো টলেডো শহর তৎকালের অনুবাদবিদদের দ্বারা মুখরিত ছিল। এদের মাঝে ক্রিমোনার জেরার্ড বিশেষভাবে উল্লেখ্যযোগ্য, যিনি আয-যাহরাবীর ৩০-খণ্ডের চিকিৎসা বিশ্বকোষ, ইবনুল হাইছামের আলোকবিজ্ঞানের উপর লিখিত বৃহদাকার "*আল-মানাযির*", আল-কিন্দীর আলোকবিজ্ঞানের উপর লিখিত প্রবন্ধ, আর-রাযীর লবণ ও ফিটকিরি (সালফেটের) শ্রেণিবিন্যাস এবং বনী মূসা ভাইদের জ্যামিতি বিষয়ক গ্রন্থাদি অনুবাদ করেন। ক্রিমোনার জেরার্ডের বিষয়টি আশ্চর্যকর ছিল যে, আরবী ভাষার উপর পূর্ণ দখলদারিত্ব না থাকা সত্ত্বেও তিনি ৮০-টির বেশি গ্রন্থের অনুবাদ সম্পন্ন করেন। মূলত তিনি স্থানীয় মোজারাব ও স্প্যানিশ খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের উপর নির্ভর করে এই কাজগুলো শেষ করেন, যেহেতু তারা আরবী ভাষা জানতো।

বিবিসি'র *Voices from the Dark* অনুষ্ঠানে বলা হয়, "(অনুবাদের) এই প্রক্রিয়া অনুবাদ থেকে অনুবাদে ভিন্ন হতো। অনুবাদের এই কাজ কখনো আরবী মাতৃভাষার স্থানীয় লোকদের সাহায্যে সম্পন্ন করা হতো। আরবী জানা স্থানীয় ওই লোক আরবী ও আধুনিক স্প্যানিশ ভাষার পূর্ববর্তী রোমান্স (*Romance*) ভাষায় পারদর্শী মধ্যবর্তী অনুবাদকের উদ্দেশ্যে উচ্চস্বরে বই পাঠ করতেন। এরপর রোমান্স (*Romance*) অনুবাদ লাতিন ভাষায় রূপান্তর করা হতো। কোনো কোনো অনুবাদক একাই এই কাজ সম্পন্ন করতে পারতেন, যেহেতু ৩-টি ভাষার উপর তার দক্ষতা ছিল।"

ষষ্ঠ আলফোনসোর দ্বারা টলেডো শহরের পুনর্নিয়ন্ত্রণ খ্রিস্টানদের হাতে চলে গেলেও শহরটি এই অর্থে মুসলিম থেকে যায় যে, এর লিঙ্গুয়া ফ্রাংকা বা যোগাযোগের প্রধান ভাষা তখনও আরবী ছিল, যাতে মুসলিম, ইহুদি ও মোজারাব সম্প্রদায়ের লোকেরা কথা বলতো; সমাজ, সংস্কৃতি ও কৃষ্টি ছিল মুসলিম ঘরানার এবং স্থাপত্যগুলো ছিল ইসলামী ধাঁচের। লম্বা বেষ্টনীর সরু রাস্তাগুলো সদ্য পৌঁছানো অনুবাদকদের অধ্যয়ন ও অস্থায়ীভাবে থাকার জন্য কক্ষের ব্যবস্থা করে দিতো। পশ্চিমা পণ্ডিতদের জন্য টলেডো তীর্থস্থানের মতো ছিল।

টলেডোতে করা লাতিন অনুবাদগুলোর পাণ্ডুলিপি আজও টলেডোর প্রধান গির্জার আর্কাইভে সংরক্ষিত। সেখানে প্রায় ২৫০০ এর মতো পাণ্ডুলিপি রয়েছে, যাতে ড্যানিয়েল মোরলীর সময়কালের আরবী অনুবাদও অন্তর্ভূত আছে।

০৬ গণিত

বেশ কয়েকটি গাণিতিক ধারণা রয়েছে, যেগুলো সম্পর্কে বলা হয়, এগুলো ১৬শ, ১৭শ ও ১৮শ শতাব্দির ইউরোপীয় পণ্ডিতদের বুদ্ধিদীপ্ত চিন্তা ও গবেষণার ফসল। কিন্তু অধ্যয়ন ও পাণ্ডুলিপি উদঘাটনের মাধ্যমে আমরা অবগত যে, ১০০০ বছর পূর্বের মুসলিম গণিতবিদগণ চরম অধ্যবসায়ের সাথে তাদের গবেষণায় রত ছিলেন। গণিতবিদদের একটা বিরাট অংশ আনুমানিক ৮০০ খ্রিস্টাব্দের ইরাক বা ইরান অঞ্চল থেকে এসেছিলেন, যে সময় বায়তুল হিকমা ছিল বাগদাদের শীর্ষস্থানীয় বুদ্ধিবৃত্তিক একাডেমি। বায়তুল হিকমা সম্পর্কে আরও তথ্য পেতে এই বিভাগের বায়তুল হিকমা অধ্যায় ঘুরে আসতে পারেন।

গণিতের ইতিহাসের এই উল্লেখযোগ্য সময়ের সূচনা হয় আল-খাওয়ারিযমীর হাত ধরে, যখন তিনি বীজগণিতের প্রস্তাবনার সাথে দুনিয়াকে পরিচয় করিয়ে দেন। আল-খাওয়ারিযমীর দেয়া এই নতুন ধারণার গুরুত্ব যে কত, তা উপলব্ধি করাটা অপরিহার্য। প্রকৃতপক্ষে এটা ছিল জ্যামিতি-নির্ভর গণিতের গ্রিক ধারণা থেকে সামনে এগিয়ে যাওয়ার এক বৈপ্লবিক প্রয়াস।

বীজগণিত মূলত একটি একত্রকরণ থিওরি, যা মূলদ সংখ্যা, অমূলদ সংখ্যা ও জ্যামিতিক বিস্তার – এদের সবগুলোকে বীজগাণিতিক উপাদান হিসেবে বিবেচনা করে। এটা গণিতকে নতুন এক মাত্রা দান করে এবং এমন একটি পথ তৈরি করে, যা পূর্বের ধারণা বা তত্ত্বের তুলনায় অধিকতর প্রশস্ত এবং এটা ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধির পথ সুগম করে। বীজগাণিতিক ধারণাগুলোর আবির্ভাবের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে, এটা গণিতকে এমনসব ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হওয়ার পথ করে দেয়, যা পূর্বে অসম্ভব ছিল।

আল-খাওয়ারিযমীর পর বীজগণিতের এই আলোকবর্তিকা হাতে তুলে নেয় তার উত্তরসূরি ৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে জন্ম নেয়া আল-কারাজী। মনে করা হয়, তিনি-ই প্রথম ব্যক্তি, যিনি বীজগণিতকে জ্যামিতিক অপারেশন থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করেন এবং সেখানে তিনি পাটিগণিতিক ধাঁচের অপারেশন জুড়ে দেন। আর এই পাটিগণিতিক ধাঁচই আজকের দিনের বীজগণিতের প্রধান অংশ। তিনিই সর্বপ্রথম x, x^2, x^3... এবং $1/x$, $1/x^2$, $1/x^3$... একপদী রাশিগুলোর সংজ্ঞা এবং এদের যেকোন দুটোর গুণফলের নিয়ম বা ফর্মুলা প্রদান করেন। তিনি বীজগণিতের একটি ধারার সূচনা করেন, যা কয়েক শতাব্দি ধরে বিকশিত ছিল।

সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন কর্তৃক ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে ইস্যুকৃত একটি স্মরণিক স্ট্যাম্প, যেখানে 'বীজগণিতের জনক' আল-খাওয়ারিযমীর চিত্র অঙ্কিত হয়েছে।

দুইশত বছর পর ১২শ শতাব্দির পণ্ডিত আল-কারাজীর গাণিতিক ধারার একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য আস-সামাওয়াল বীজগণিতের যথাযথ সংজ্ঞা প্রদান করেন, "(বীজগণিত) সকল গাণিতিক পন্থার আশ্রয় নিয়ে অজানাকে নিয়ে কাজ করে, যেমনিভাবে অঙ্কশাস্ত্রবিদ জানাকে নিয়ে কাজ করে।"

বীজগণিতের গল্পগাথায় পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ কীর্তিনায়ক হলেন কবি উমর আল-খাইয়্যাম। উমর খাইয়্যাম নামে সমধিক পরিচিত এই পণ্ডিত ১০৪৮ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কৌণিক ছেদগুলোর পারস্পরিক বিভক্তিকরণের মাধ্যমে প্রাপ্ত জ্যামিতিক সমাধানের ঘন সমীকরণের পূর্ণাঙ্গ শ্রেণিবিন্যাস প্রদান করেন। তিনি ঘন সমীকরণের বীজগাণিতিক সমাধানের পূর্ণ বিবরণ প্রদানের আশা করেছিলেন এবং বলেন, "যদি সুযোগ আসে

আজকের দিনের বিদ্যালয়ে যে বীজগণিত চর্চা হয়, তার মূল উৎস আল-খাওয়ারিযমীর "আল-জাবর ওয়াল মুকাবালা" গ্রন্থটি।

এবং আমি সফল হই, তবে আমি এই ১৪ গঠন এবং সেই সাথে তাদের সকল শাখা-প্রশাখা ও অবস্থা এবং সম্ভাব্য ও অসম্ভাব্যের মাঝে কীভাবে পার্থক্য করতে হয়, তা নিয়ে আলোচনা করে একটি পুস্তিকা প্রস্তুত করবো, সেখানে এই শাস্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ যাবতীয় উপাদান শামিল থাকবে।"

১২শ শতাব্দিতে আস-সামাওয়াল যখন আল-কারাজীর গাণিতিক ধারার চর্চায় ব্যস্ত ছিলেন, শারাফুদ্দীন আত-তুসী তখন উমর খাইয়্যাম কর্তৃক জ্যামিতিতে বীজগণিতের প্রয়োগের ধারাটি অনুসরণ করে যাচ্ছিলেন। তিনি ঘন সমীকরণের উপর প্রবন্ধ লিখেন এবং সেখানে উল্লেখ করেন, "(বীজগণিত) অন্য আরেকটি শাখায় মৌলিক অবদান রাখে, যা-র উদ্দেশ্য সমীকরণের মাধ্যমে বক্র রেখার অধ্যয়ন।" আর এর মাধ্যমে বীজগাণিতিক জ্যামিতির নতুন ধারা উন্মোচিত হয়।

বীজগণিত হলো এমন একটি ক্ষেত্র, যেখানে মুসলিম গণিতবিদগণ এর ক্রমবিকাশের ধারায় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনেন। ৯ম শতাব্দির বাগদাদের বায়তুল হিকমাতে বনী মূসা ভাই নামে পরিচিত তিন ভাইয়ের একটি দল ছিল। গৃহ বিভাগে আপনি বনী মূসা ভাইয়েরা কীভাবে নানা ধরনের ট্রিক ডিভাইস তৈরি করেছিল, তা সম্পর্কে জেনেছেন। তারা সহজাত প্রতিভাসম্পন্ন গণিতবিদ ছিলেন এবং ৮৩৬ খ্রিস্টাব্দে জন্ম নেয়া সাবিত ইবনে কুর্‌রা ছিলেন তাদের একজন শিক্ষার্থী। সংখ্যাতত্ত্বে তার অবদানের জন্য তিনি সর্বাধিক পরিচিত, যেখানে তিনি চমৎকার একটি উপপাদ্য উদ্ভাবন করেন, যা তাকে কয়েক জোড়া সমভাবাপন্ন সংখ্যা (*Amicable numbers*) আবিষ্কারে সফল করে।

সমভাবাপন্য সংখ্যাগুলো আরবী গণিতশাস্ত্রে ব্যাপক ভূমিকা রাখে। ১৩শ শতাব্দিতে সাবিতের উপপাদ্যের নতুন প্রমাণ পেশ করেন আল-ফারিসী এবং এর মাধ্যমে তিনি গুণনীয়ক নির্ণয় (*factorization*) এবং গুচ্ছ-বিন্যাসতত্ত্ব (*combinatorial*) সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ ধারণা উপস্থাপন করেন। এছাড়াও তিনি আরও এক জোড়া সমভাবাপন্য সংখ্যা আবিষ্কার করেন: ১৭,২৯৬ এবং ১৮,৪১৬, যা ১৮শ শতাব্দির সুইস গণিতবিদ লিওনার্দো ইউলারের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়। ইউলারের বহু বছর পূর্বেই আরেক মুসলিম গণিতবিদ মুহাম্মদ বাকির ইয়াজদী ১৭শ শতাব্দিতে সমভাবাপন্য সংখ্যার আরেকটি জোড়া আবিষ্কার করেন: ৯,৩৬৩,৫৮৪ এবং ৯,৪৩৭,০৫৬।

"(বীজগণিত) সকল গাণিতিক পন্থার আশ্রয় নিয়ে অজানাকে নিয়ে কাজ করে,
যেমনিভাবে অঙ্কশাস্ত্রবিদ জানাকে নিয়ে কাজ করে।"

– আস-সামাওয়াল, গণিতবিদ ও জ্যোতির্বিদ

১০ম শতাব্দিতে মুসলিম গণিতবিদগণ গণিতের আরেকটি শাখায় চরম শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেন, যখন ইবনুল হাইছাম সকল জোড় নিখুঁত সংখ্যাগুলোকে বিন্যস্ত করার প্রথম প্রয়াস চালান। ওইসব পূর্ণ সংখ্যাকে নিখুঁত সংখ্যা বলা হয়, যাদের প্রকৃত ধনাত্মক গুণনীয়কগুলি যোগ করলে ওই সংখ্যা পাওয়া যায় এবং এর সূত্রটি হলো: $(2^{k-1})(2^k-1)$, যেখানে 2^k-1 হলো মৌলিক সংখ্যা। এছাড়াও আমাদের জানা মতে তিনিই হলেন প্রথম ব্যক্তি, যিনি উইলসনের বহু আগেই তার প্রদান করা থিওরি সম্পর্কে অবগত ছিলেন। তত্ত্বটি এরূপ: p যদি মৌলিক সংখ্যা হয়, তবে বহুপদী $1+(p-1)!$ রাশিটিও p দ্বারা বিভাজ্য হবে। তবে তিনি এই তত্ত্বের প্রমাণ জানতেন কিনা, তা আমরা নিশ্চিত নই। ক্যামব্রিজের গণিতবিদ উইলসনের সাথে এই থিওরির আবিষ্কারকে সম্পৃক্ত করায় এটাকে উইলসনের থিওরি বলা হয়। কিন্তু এক্ষেত্রেও আমরা নিশ্চিত নই যে, তিনি তত্ত্বের প্রমাণ জানতেন কিনা। এর বছরখানেক পর ল্যাগরেঞ্জ নামের এক গণিতবিদ এই থিওরির 'প্রথম আবিষ্কারের' ৭৫০ বছর পর এর প্রমাণ পেশ করেন।

ব্যবসা ও প্রতিদিনের কাজে গণিতের ব্যবহার ছিল এবং বিশেষ করে হিসাব-নিকাশের ক্ষেত্রে এটা ছিল আবশ্যকীয় এক মাধ্যম। বর্তমানে আমাদের অধিকাংশই হিসেব ও গণনার ক্ষেত্রে একটি পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান রাখে, শূন্য দ্বারা যার সূচনা এবং যা বিলিয়ন ও ট্রিলিয়নেরও গণ্ডি পার করে। কিন্তু ১০ম শতাব্দির মুসলিম দেশগুলোতে ৩-টি স্বতন্ত্র গাণিতিক পদ্ধতি ব্যবহৃত হতো এবং ওই শতকের শেষ দিকে আল-বাগদাদীর মতো লেখক ভিন্ন ভিন্ন ওই পদ্ধতিগুলোর তুলনা করে গ্রন্থও রচনা করেছিলেন। এই ৩-টি পদ্ধতি হলো: আঙুল-ভিত্তিক পাটিগণিত, ষষ্ঠিক পদ্ধতি এবং আরবী সংখ্যা পদ্ধতি।

আঙুলের সাহায্যে পরিচালিত হিসাবের সাথে সম্পূর্ণ কথায় লেখা সংখ্যাগুলোর আবির্ভাব ঘটে, যা বণিক সম্প্রদায়ের মাঝে ব্যবহৃত হতো। এই পদ্ধতি ব্যবহার করে গণিতবিদরা যেমন, বাগদাদের আবুল ওফা ১০ম শতাব্দিতে বেশ কিছু পুস্তিকা রচনা করেছিলেন। আরবী সংখ্যার ব্যবহার ও প্রয়োগে তিনি ভীষণ দক্ষ ছিলেন এবং তিনি বলেন, "পূর্ব দেশীয় খিলাফতের অধীনস্থ জনগণ ও বণিক সম্প্রদায়ের মাঝে দীর্ঘ সময় ধরে এগুলোর কোনো ব্যবহার ও প্রয়োগ খুঁজে পাইনি।" ষষ্ঠিক পদ্ধতিতে আরবী বর্ণমালা সম্বলিত সংখ্যাগুলো অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই পদ্ধতি ব্যাবিলনীয়দের কাছ থেকে এসেছে এবং জ্যোতিষশাস্ত্রীয় নানা কাজে আরব গণিতবিদগণ অতিমাত্রায় এই পদ্ধতি ব্যবহার করতেন।

দশমিক স্থানীয়-মান পদ্ধতির সাথে আরবী সংখ্যা ও ভগ্নাংশের পাটিগণিত ভারতীয় সংস্করণ থেকে উদ্ভূত ও বিকাশ লাভ করে। ভারতীয় সংখ্যাগুলোকে মুসলিমগণ ১ থেকে ৯ পর্যন্ত আধুনিক সংখ্যায় একীভূত করে ফেলে, যা আরবী সংখ্যা হিসেবে সমধিক পরিচিতি। এমনটি ধারণা করা হয় যে, এই সংখ্যাগুলোর প্রত্যেকে তার নিজ প্রতীক বা চিহ্নের কোণের সংখ্যার উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু ৭-সংখ্যাটি এক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ তৈরি করে, যেহেতু মধ্যবর্তী আনুভূমিক রেখার উলম্ব বাহুকে অতিক্রম করার বিষয়টি অধুনা ১৯শ শতকের বিকাশ মাত্র। পরবর্তীতে এগুলো ইউরোপ ও উত্তম আমেরিকার প্রচলিত সংখ্যায় পরিণত হয়। এই সংখ্যাগুলো ভারতীয় সংখ্যা থেকে বেশ স্বতন্ত্র। উদাহরণস্বরূপ, ১-সংখ্যাটির একটি কোণ রয়েছে, ২-সংখ্যাটির দুটি কোণ রয়েছে, ৩-সংখ্যাটির তিনটি কোণ রয়েছে ইত্যাদি। এই সংখ্যাগুলোর আবির্ভাব তখন পর্যন্ত ব্যবহৃত লাতিন সংখ্যা দ্বারা সৃষ্ট সমস্যার সমাধান পেশ করে। আরবী সংখ্যাগুলো *গুবারী* সংখ্যা নামে পরিচিত ছিল। কারণ, হিসাবের জন্য মুসলিমগণ অ্যাবাকাস জাতীয় গণনাযন্ত্রের পরিবর্তে মাটির বোর্ড (গুবার) ব্যবহার করতো।

> "গণিত হলো এই দুনিয়ার বিষয়াদি এবং বিজ্ঞানের জগতে প্রবেশের দরজা ও চাবি ... আমরা যদি সন্দেহকে দূরে সরিয়ে নিশ্চয়তা এবং ভ্রান্তিকে পিছনে ফেলে সত্য লাভ করতে চাই, তবে আমাদের জন্য আবশ্যক হচ্ছে: জ্ঞানের মৌলিক ভিত্তি গণিতের উপর স্থাপন করা।"
>
> – রজার বেকন, ইংরেজ পণ্ডিত

মুসলিম গণিতবিদদের দ্বারা শূন্যের বিস্তৃত সংজ্ঞা ও ব্যবহার ছিল ভারতীয় পদ্ধতির ব্যাপক সংস্কার ও পরিমার্জন। মুসলিমগণ শূন্যকে একটি গাণিতিক বৈশিষ্ট্য প্রদান করে, আর তা হলো: যেকোন সংখ্যাকে শূন্য দিয়ে গুণ করলে তা শূন্যে পরিণত হয়। পূর্বে শূন্যকে খালি বা 'নাস্তি' বিবেচনা করা হতো। মুসলিমগণ শূন্যকে দশমিকীকরণেও ব্যবহার করে, যেন একটি সংখ্যার প্রকৃত অবস্থা জানা যায়, উদাহরণস্বরূপ, পূর্বে ২৩ লিখলে সংখ্যাটি দ্বারা ২৩, ২৩০ বা ২৩০০ ইত্যাদি বোঝানোর সম্ভাবনা থাকতো, কিন্তু শূন্যের ব্যবহারে সে সংশয় দূর হয়। লক্ষ্য করার মতো বিষয় হলো, আমরা যদি ষড়ভুজের মাঝে (বৃত্তের মতো বড়ো একটি) শূন্য বসে থাকার বিষয়টি কল্পনা করি, তবে ওই বৃত্তের ব্যাস এবং ষড়ভুজের বাহুর অনুপাত হবে গোল্ডেন রেশিও (সোনালি অনুপাত)-এর সমান। গোল্ডেন রেশিও সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে আপনি এই বিভাগের জ্যামিতি অধ্যায় দেখতে পারেন।

মুসলিম গণিতবিদগণ আরও কিছু সংখ্যার তাৎপর্য নিয়ে বেশ মোহিত ছিল, যেমন: ০ ও ১-এর সম্পর্ক এবং وَاحِدٌ (*ওয়াহিদ* – একক, আল্লাহর ৯৯-টি গুণবাচক নামের একটি) ও لا شَيْ قَبْلَهُ و لا شَيْ بَعْده (*লা শাইয়ুন কাবলাহু ওয়া লা শাইয়ুন বা'দাহু* – না তাঁর পূর্বে কিছু ছিল এবং না তাঁর পরে কিছু আছে)-এর মধ্যস্থ সম্পর্ক। এখানে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, আজকের দিনের কম্পিউটারের ভাষা হিসেবে কেবল এই দুটো সংখ্যা অর্থাৎ ০ ও ১ ব্যবহৃত হয়।

৩-টি উৎস থেকে আরবী সংখ্যা ইউরোপে প্রবেশ করে। প্রথমত, গারবার্ট (পোপ প্রথম সিলভেস্টার)-এর

মাধ্যমে, যিনি কর্ডোবাতে অধ্যয়ন শেষে রোমে ফিরে যান। এরপর ১২শ শতাব্দিতে চেস্টারের রবার্টের মাধ্যমে, যিনি দ্বিতীয় *গুবারী* (আরবী সংখ্যা) সম্বলিত আল-খাওয়ারিযমীর দ্বিতীয় গ্রন্থের অনুবাদ সম্পন্ন করেন। এ পথ ধরে ইউরোপে আরবী সংখ্যার প্রবেশের বিষয়টি সমকালীন ঐতিহাসিক কার্ল মেনিগার তার *Number Words and Number Symbols* গ্রন্থে তুলে ধরেনে। ইউরোপে আরবী সংখ্যার প্রবেশের তৃতীয় পথটি ১৩শ শতাব্দিতে ফিবোনাচ্চির হাত ধরে উন্মুক্ত হয়, যিনি ইউরোপীয় জনগণের কাছে নিজের আহরিত জ্ঞান ছড়িয়ে দেন। মূলত ফিবোনাচ্চির বাবা তাকে আলজেরিয়ার বুজি শহরের সাইয়্যেদ উমর নামে পরিচিত এক শিক্ষকের কাছে গণিত শেখার জন্য পাঠান, আর সেখান থেকেই তিনি এসব জ্ঞান হাসিল করেন। ফিবোনাচ্চির এই শিক্ষক বাগদাদ ও মাওসুল গণিতশাস্ত্রীয় ধারার শিক্ষা দিতেন, যাতে বীজগাণিতিক এবং ধারাবাহিক বা সহসমীকরণ অন্তর্ভুক্ত ছিল।

কায়রোর আলেকজান্দ্রিয়া ও দামেস্কের লাইব্রেরি ভ্রমণের পরপরই ফিবোনাচ্চি তার *Liber Abaci* গ্রন্থটি রচনা করেন। এই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায় আরবী সংখ্যা নিয়ে এবং সেখানে তিনি সংখ্যাগুলোকে এভাবে পরিচয় করিয়ে দেন, "ভারতীয়দের ৯-টি সংখ্যা হলো: ৯৮৭৬৫৪৩২১। এদের সাথে আরবীতে *সেফিরাম* (সিফরুন – صِفْرٌ) নামে পরিচিত '০' প্রতীক দিয়ে কাঙ্ক্ষিত যেকোন সংখ্যা লেখা সম্ভব।"

আরবী সংখ্যা সম্বলিত হিসাবের এই পদ্ধতি-ই মুসলিম গণিতবিদদের জন্য সংখ্যাতাত্ত্বিক ক্ষেত্রে ব্যাপক উচ্চতা হাসিলের পথ সুগম করে। যার ফলে আবুল ওফা ও উমর খাইয়্যামের মতো গণিতবিদদের পক্ষে মূলের উৎপাদক বের করা সম্ভব হয়। আল-কারাজী কর্তৃক উদ্ভাবিত পূর্ণসংখ্যার সূচকের জন্য দ্বিপদী উপপাদ্য (*binomial theorem*) দশমিক পদ্ধতির ভিত্তিতে সংখ্যাতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণের বিকাশে প্রধান ভূমিকা পালন করে। ১৪শ শতাব্দিতে আল-কাশী বীজগাণিতিক সংখ্যার আসন্ন মান নির্ণয় এবং সেইসাথে পাই-এর মতো বাস্তব সংখ্যাগুলোর দশমিক ভগ্নাংশ নির্ণয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। দশমিক ভগ্নাংশ নির্ণয়ে তার অবদান এতটাই অগ্রগণ্য ছিল যে, বহু বছর ধরে তাকে এই বিদ্যার জনক হিসেবে বিবেচনা করা হতো। প্রথমবারের মতো না হলেও তিনি 'n -তম বর্গমূল' নির্ণয়ের একটি এলগরিদম (*algorithm*) প্রদান করেন, পরবর্তীতে বহু শতাব্দি পর ইতালি ও ইংল্যান্ডের বিজ্ঞানী যথাক্রমে রুফিনি ও হর্নার বিশেষ এই পদ্ধতির পূর্ণতা দান করেন।

যদিও আরব গণিতবিদরা বীজগণিত, সংখ্যাতত্ত্ব ও সংখ্যা পদ্ধতি নিয়ে তাদের অবদানের জন্য সর্বাধিক পরিচিত, তথাপি তারা জ্যামিতি, ত্রিকোণমিতি ও গাণিতিক জ্যোতির্বিদ্যার মতো বিষয়গুলোতেও উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সমর্থ হয়।

বাম থেকে: ব্যাবিলনীয় ষষ্ঠিক সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহার করে কীভাবে ৪২৪,০০০ লিখা হয়েছে, তা-র একটি উদাহরণ তুলে ধরা হয়েছে। ডানে: ১০ম থেকে ১৪শ শতাব্দি পর্যন্ত আরবী সংখ্যার ক্রমবিকাশ এটা তুলে ধরছে যে, কোণের ব্যবহারের উপর ভিত্তি করে কীভাবে মুসলিমরা – আমাদের আজকের দিনে ব্যবহৃত ১ থেকে ৯ – আধুনিক সংখ্যাগুলো উদ্ভাবন করেছে।

১,৫৭,৪৬,৬০ = ৪২৪০০০
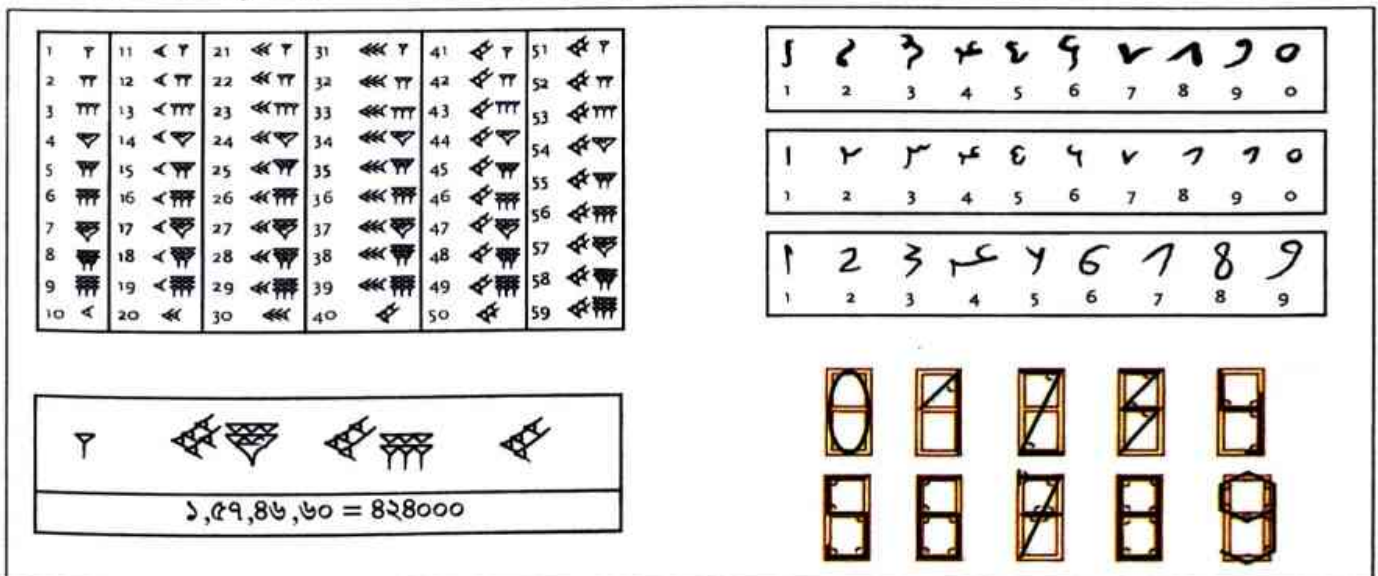
০৭ ত্রিকোণমিতি

মুসলিমদের দ্বারা প্রবল উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে চর্চিত জ্যোতির্বিদ্যার হাত ধরেই ত্রিকোণমিতির সূচনা। বস্তুত সালাতের ওয়াক্ত সঠিকভাবে নির্ণয়ের সাথে ত্রিকোণমিতি চর্চা ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। এমনকি মুসলিমদের বহু আগে গ্রিক জ্যোতির্বিদগণ নির্দিষ্ট ত্রিভুজের জানা কোণ ও বাহুর সাপেক্ষে অজানা কোণ ও বাহু পরিমাপ করতো এবং যার সাহায্যে তারা সূর্য, চাঁদ এবং সে সময়ের জানা ৫-টি গ্রহের গতিবিধি বুঝতে চাইতো।

সূর্য, চাঁদ ও গ্রহের অবস্থান সম্পর্কিত প্রশ্ন দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে গ্রিকরা নানা ছক, সারণী ও নিয়ম তৈরি করেন, যা-র সাহায্যে জ্যামিতিক সমস্যা সমাধান করা সম্ভবপর ছিল। এ ব্যাপারে সবচেয়ে দীর্ঘ ও সমৃদ্ধ আলোচনা পাওয়া যাবে আনুমানিক ২য় শতাব্দিতে আলেকজান্দ্রিয়ায় কর্মরত জ্যোতির্বিদ টলেমি রচিত *Almagest* (আলমাগেস্ট) গ্রন্থে। টলেমি রচিত এই গ্রন্থ মুসলিমদের হাত হয়ে ইউরোপের পৌঁছায়, যারা *Almagest* গ্রন্থের আরবী অনুবাদ করেন এবং এর পরিভাষাসমূহ আরও বোধগম্যভাবে উপস্থাপন করেন। *Almagest*-এর আরবী প্রতিশব্দ (আল-আ'যাম), যার মানে: শ্রেষ্ঠ।

প্রাচীনযুগের শেষ দিকের জ্যোতির্বিদরা তাদের যাবতীয় সমতল ত্রিকোণমিতিক সমস্যা সমাধানের জন্য প্রধানত *Almagest* গ্রন্থের পুস্তক-১-এ প্রাপ্ত সারণী ব্যবহার করতো, যা বৃত্তস্থ জ্যায়ের সারণী (*Table of chord*) তথা ত্রিকোণমিতিক সারণী নামে পরিচিত। কৌণিক চাপের পরিমাণ ১/২-ডিগ্রি থেকে ১৮০ ডিগ্রি পর্যন্ত ১/২-ডিগ্রি হারে বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে এই সারণী ৬০ একক ব্যাসার্ধের বৃত্তের সম্মুখ কোণস্থ জ্যায়ের দৈর্ঘ্য বলে দেয়।

"*শাকলুল কাত্তা'আ*" (পরস্পরছেদী আকৃতি) শীর্ষক পুস্তকে ১৩শ শতাব্দির মুসলিম জ্যোতির্বিদ আত-তূসী 'সমকোণী ত্রিভুজের সাথে সম্পৃক্ত সমস্যা' সমাধানে কীভাবে বৃত্তস্থ জ্যায়ের দৈর্ঘ্যের সারণী ব্যবহার করতে হয়, তার ব্যাখ্যা দেন। ত্রিভুজ ও বৃত্তস্থ জ্যায়ের মাঝে যে সম্পর্ক বিদ্যমান, তা আত-তূসীর নিবিড় পর্যবেক্ষণ দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং এই সম্পর্ক এরূপ: বৃত্তের অভ্যন্তরে ত্রিভুজ আঁকা যাবে, তখন ত্রিভুজের বাহুগুলো জ্যা হিসেবে বিবেচিত হবে, যেখানে সম্মুখস্থ চাপগুলো ত্রিভুজের কোণগুলোর বিপরীতে অবস্থান করে।

কিন্তু এই সারণীগুলোর উপর নির্ভর করার দুটো অসুবিধা রয়েছে। প্রথমত, সমকোণী ত্রিভুজের অজানা বাহু বা কোণের পরিমাণ নির্ণয়ে উদ্ভূত সকল ভিন্নতা সমাধানে এই সারণী ও মধ্যবর্তী ধাপগুলো প্রয়োজন মাফিক পরিবর্তন করে নিতে হয়। এই পদ্ধতি আধুনিক পদ্ধতির বিপরীত, যা ৬-টি পরিচিত ত্রিকোণমিতিক ফাংশন – সাইন (*sine*), কোসাইন (*cosine*) ও ট্যানজেন্ট (*tangent*) এবং এদের বিপরীত ফাংশন স্যাকেন্ট (*secant*), কোস্যাকেন্ট (*cosecant*) ও কোট্যানজেন্ট (*cotangent*) – এর সমন্বয়ে গঠিত। আধুনিক এই পদ্ধতি মুসলিম গণিতবিদদের দ্বারা উদ্ভাবিত এবং নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে বিন্যস্ত হয়। বৃত্তস্থ জ্যায়ের সারণীর দ্বিতীয় অসুবিধা হলো: বৃত্তস্থ চাপের দৈর্ঘ্য নির্ণয়ে প্রায়শই কোণগুলোকে দ্বিগুণ করে নিতে হয়।

প্রকৃতপক্ষে, ১০ম শতাব্দির পূর্বেই মুসলিম পণ্ডিতদের একটি ধারা ইতোমধ্যেই ত্রিকোণমিতির ভিত্তি দাঁড় করায়, যা আত-তূসীর জন্য সম্মুখে অগ্রসর হওয়াকে সম্ভবপর করে। আত-তূসী তাদের অবদানগুলো সংগ্রহ করেন, সেগুলো বিন্যস্ত করেন এবং বিশ্লেষণ করে তা আরও সমৃদ্ধ করেন।

তুরস্কের হাররানে জন্ম নেয়া আল-বাত্তানী ত্রিকোণমিতি শাস্ত্রের আরেক পৃথিকৃৎ। বর্তমান ইরাকের সামাররাতে ৯২৯ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণকারী এই মনীষীকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ জ্যোতির্বিদ ও গণিতবিদ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ত্রিকোণমিতি অধ্যয়নের ক্ষেত্রে তার অগ্রগামী ভূমিকার পিছনে অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করেছিল গ্রহানুপুঞ্জের আবর্তনের পর্যবেক্ষণ। মহাবিশ্ব বিভাগের জ্যোতির্বিদ্যা অধ্যায়ে তার ব্যাপারে আপনি আরও আলোচনা পাবেন – ইনশাআল্লাহ।
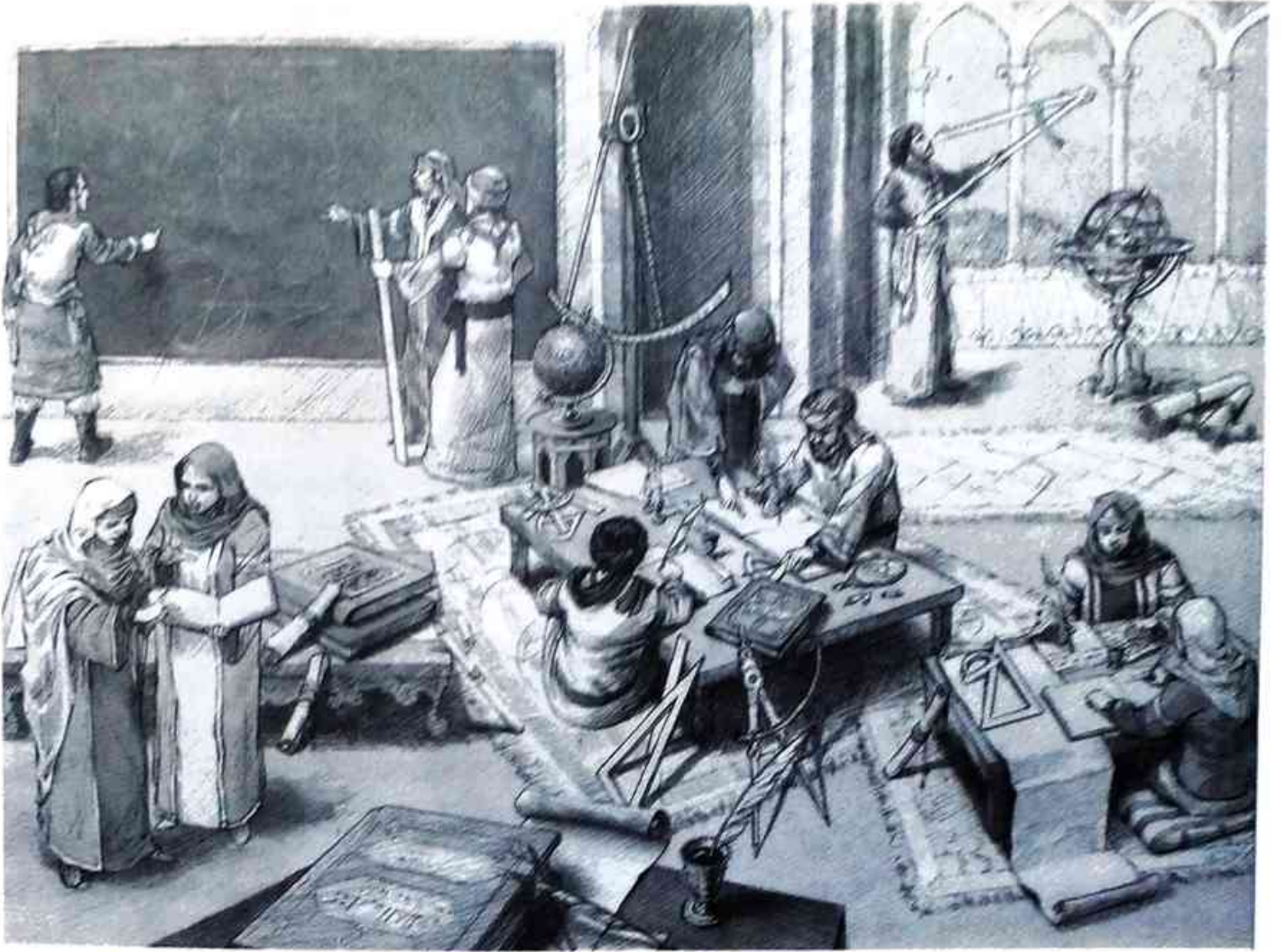
এক হাজার বছর পূর্বের মুসলিমগণ ত্রিকোণমিতি চর্চায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন, যেহেতু গ্রহের আবর্তন এবং বাহু ও কোণ নির্ণয়ে তারা ত্রিকোণমিতির সফল প্রয়োগ করেন। বর্তমানে গোলীয় ত্রিকোণমিতি (Spherical trigonometry)-সহ সাধারণ ত্রিকোণমিতিক ব্যবহৃত হয় জ্যোতির্বিদ্যা, মানচিত্রাঙ্কন ও নৌচালনবিদ্যার জটিল সমস্যা সমাধানে।

লক্ষণীয় বিষয় হলো, আল-বাত্তানী নিজের গাণিতিক সমীকরণ বিশ্লেষণের পাশাপাশি অন্য পণ্ডিতরা যেন 'পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা' অব্যাহত রাখে, সে ব্যাপারে বেশ উৎসাহ দিতেন, যেন এর মাধ্যমে তার কর্ম পূর্ণতা ও বিস্তৃতি লাভ করে। আল-বাত্তানীর মতো আবুল ওফা, ইবনে ইউনূস এবং ইবনুল হাইছামও গোলীয় ত্রিকোণমিতির সমৃদ্ধকরণে ভূমিকা রাখেন এবং সেটাকে জ্যোতিষশাস্ত্রীয় সমস্যা সমাধানে ব্যবহার করেন।

আল-বাত্তানী প্রথমবারের মতো সাইন (*sine*), কোসাইন (*cosine*) প্রতীক ব্যবহার করেন এবং এগুলোকে তিনি অনুপাতের বদলে দৈর্ঘ্য হিসেবে আখ্যায়িত করেন, যেমনটি আজ আমরা জানি। আল-বাত্তানী ট্যানজেন্ট (*tangent*)-কে 'বর্ধিত ছায়া' হিসেবে প্রকাশ করেন, যা দেয়ালের উপর স্থাপিত কল্পিত অনুভূমিক লাঠি থেকে উদ্ভূত। ১১শ শতাব্দিতে আল-বিরুনী ট্যানজেন্ট (*tangent*) ও কোট্যানজেন্ট (*cotangent*)-এর ত্রিকোণমিতিক ফাংশনের সংজ্ঞা নিরূপণ করেন, যা ভারতীয়দের কাছ থেকে পরীক্ষামূলকভাবে গ্রহণ করা হয়েছিল।

৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে জন্ম নেয়া আল-বিরুনী তাদের মাঝে অন্তর্ভুক্ত, যারা আধুনিক ত্রিকোণমিতির ভিত্তি নির্মাণে পথিকৃৎ ছিলেন। আল-খাওয়ারিযমী (জন্ম: ৭৮০) সাইন (*sine*), কোসাইন (*cosine*) প্রতীক এবং ত্রিকোণমিতিক সারণী প্রস্তুত করেন, যা পরবর্তীতে পশ্চিমে অনুদিত হয়।

বস্তুত, এসব ঘটনা ট্যানজেন্ট (*tangent*)-সহ নানা প্রতীকে সমৃদ্ধ আধুনিক ত্রিকোণমিতি উদ্ভাবনের ৫০০ বছর পূর্বেকার, উপরন্তু আরও ১০০ বছর পর এসব জ্ঞান নিকোলাস কপার্নিকাসের দৃষ্টিগোচর হয়।

০৮ রসায়ন

১৪শ শতাব্দির পাণ্ডুলিপিতে দেখা যাচ্ছে, গোলাকার পাত্রে গোলাপ ও পানির মিশ্রণ আগুনের উপর উত্তপ্ত হচ্ছে। এখান থেকে প্রাপ্ত বাষ্প সংগ্রহ করে শীতল করা হয়।

প্লাস্টিক, রেয়ন, কৃত্রিম রবার থেকে ইনসুলিন, পেনিসিলিন – এগুলোর সবই রসায়নে বিপ্লব আনয়নকারী প্রাথমিক সময়ের মুসলিম রসায়নবিদদের কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রির অবদান।

ইংরেজি 'কেমিস্ট্রি' (বাংলায় রসায়ন) শব্দটি আরবী 'কিমিয়া' থেকে উদ্ভূত এবং পদাশ্রিত নির্দেশক 'আল' যোগ করলে কিমিয়া পরিণত হয় 'আল-কিমিয়া'-তে। পশ্চিমে 'আল-কিমিয়া' শব্দের শেষ বর্ণ ফেলে দিয়ে বানানো হয় ইংরেজি 'আলকেমি'। মধ্যযুগীয় মুসলিম বিজ্ঞানীদের জন্য রসায়ন কোনো রূপকথা বা গুপ্তবিদ্যার চর্চা ছিল না, বরং তা কেবল রসায়নকে ঘিরেই আবর্তিত হতো।

ইসলামী স্বর্ণযুগে রসায়নে তিনজন মুসলিমের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, যাদের সময়কাল প্রায় ২০০ বছর যাবৎ বিস্তৃত ছিল।

■ জাবির ইবনে হাইয়ান (আনুমানিক ৭২২ থেকে ৮১৫ খ্রি:, ইরান)

সকল পণ্ডিত এ ব্যাপারে একমত যে, পশ্চিমে *জিবার* নামে পরিচিত জাবির ইবনে হাইয়ান রসায়নের জনক। ঔষধ বিক্রেতার এই পুত্র তার জীবনের অধিকাংশ সময় ইরাকের কুফা শহরে অতিবাহিত করেন, যেখানে তিনি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে রসায়নকে সুসংগত ধারায় নিয়ে আসেন। নিয়মিত ল্যাবরেটরি বা গবেষণাগারে কাজে ব্যস্ত রত থেকে তিনি ঊর্ধ্বপাতন, তরলীকরণ, স্ফটিকীকরণ, পাতন, শোধন, সংযুক্তিকরণ, অক্সিডেশন, বাষ্পীকরণ ও পরিস্রাবন পদ্ধতিগুলো উদ্ভাবন করেন এবং এগুলোকে পূর্ণতা দান করেন। নিজের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য না হারিয়ে রাসায়নিক উপাদানগুলো একত্র হয়ে কীভাবে একটি যৌগ গঠন করে, যা খালি চোখে দৃশ্যমান হয় না – এ ব্যাপারে তিনি আলোচনা করেন। এখনকার দিনে এই বিষয় বেশ সাধারণ মনে হলেও ১২৫০ বছর আগের প্রেক্ষাপটে তিনি তার সময়ের চেয়ে অনেক এগিয়ে ছিলেন।

সালফিউরিক, নাইট্রিক ও নাইট্রোমিউরিয়াটিক এসিড আবিষ্কারের মাধ্যমে জাবির রাসায়নিক পরীক্ষণের সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেন, যে এসিডগুলো আজ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

তিনি একটি নিখুঁত পরিমাপ যন্ত্র তৈরি করেন, যা এক রাতলের চেয়ে ৬,৪৮০ গুণ হালকা ওজনের উপাদান পরিমাপ করতে পারে (১ রাতল = ১ কেজি বা ২২০ পাউন্ড) এবং তিনি এটা লক্ষ্য করেন যে, অক্সিডেশনের বিশেষ পর্যায়ে ধাতুর ওজন হ্রাস পায়।

জাবির ইবনে হাইয়ানের কিছু লেখনীর মাঝে রয়েছে: "*আল-খাওয়াসুল কাবীর*" (রাসায়নিক উপাদান বিষয়ক বৃহৎ পুস্তক), "*আল-মাওয়াযিন*" (ওজন ও পরিমাপ), "*আল-মিযাজ*" (সংমিশ্রন) ও "*আল-আসবাগ*" (রঞ্জক)। ধাতব উপাদানগুলোর গঠনে তার তত্ত্বসমূহ তাত্ত্বিক রসায়নে উল্লেখযোগ্য অবদান হিসেবে বিবেচিত হয়। সামান্য কিছু পরিবর্তন ও সংযোজনসহ তার এই তত্ত্বসমূহ ১৮শ শতাব্দির আধুনিক রসায়নের শুরুর দিক পর্যন্ত টিকে ছিল।

জাবিরের এই সকল গবেষণা ইরাকের কুফাতে অবস্থিত তার নিজ ল্যাবরেটরিতে সম্পন্ন হয়, যা তার মৃত্যুর ২০০ বছর পর দামেস্ক প্রবেশদ্বার নামে পরিচিত শহরের একটি এলাকার কিছু ঘর ভাঙার সময় পুনরায় আবিষ্কৃত হয়। সেখানে পাওয়া পাথরকুচিগুলোর মাঝে একটি উখলি (চুন, বালি ও পানির মিশ্রণ) ও স্বর্ণের একটি বড় টুকরো ছিল।

■ আর-রাযী অথবা *রাযিস* (৮৬৪ থেকে ৯২৫ খ্রি:, ইরান)

পশ্চিমে রাযিস নামে পরিচিত মুহাম্মদ ইবনে যাকারিয়া আর-রাযী রসায়নের উপর "*সিররুল আসরার*" (রহস্যের রহস্য) নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন, যেখানে তিনি প্রমাণ করেন যে, মৌলিক পদার্থের শ্রেণিবিন্যাসে জাবির ইবনে হাইয়ানসহ তিনি তার পূর্বসূরি সকলের চেয়ে এগিয়ে। তিনি মৌলিক পদার্থকে পার্থিব, উদ্ভিদ ও প্রাণিজ পদার্থে বিভক্ত করেন এবং কৃত্রিমভাবে প্রাপ্ত পদার্থ – যেমন: লেড-অক্সাইড, কস্টিক সোডা এবং নানা ধরনের খাদ – এসবের ক্ষেত্রে সংখ্যা ১
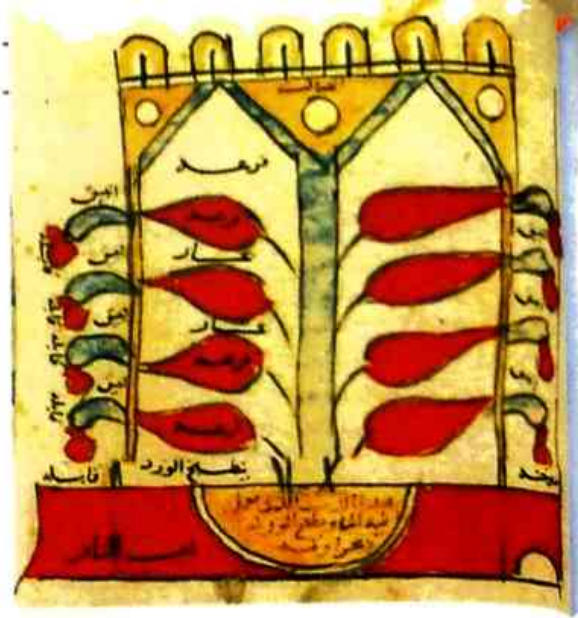
যোগ করেন। তার পূর্বে জাবির খনিজ পদার্থকে দেহ (যেমন: স্বর্ণ ও রুপা), সত্তা (যেমন: সালফার ও আর্সেনিক) এবং রূহ (যেমন: পারদ ও সাল-এমোনিয়াক বা এমোনিয়াম ক্লোরাইড) এই তিন ভাগে বিভক্ত করেছিলেন।

নিজের করা পরীক্ষাগুলো লিখে রাখার ক্ষেত্রে আর-রাযী ছিলেন সকলের চেয়ে অগ্রগামী। আমরা তার "*সিররুল আসরার*" থেকে জানতে পারি যে, ১১০০ বছর পূর্বেই তিনি পাতন, ভস্মীকরণ এবং স্ফটিকীকরণের মতো কাজগুলো করতেন।

তিনি ২০-এরও অধিক ল্যাবরেটরি যন্ত্র উদ্ভাবন করেন, সেগুলোর বিবরণ দেন এবং ব্যবহার করে দেখান। ওই সকল যন্ত্রের অনেকগুলো আজও ব্যবহৃত হয়, যেমন: ধাতু গলানোর পাত্র এবং পাতনের জন্য লাউ আকৃতির পাত্র বা গলাওয়ালা জগ।

■ আল-কিন্দী (৮০১ খ্রি: থেকে ৮৭৩, ইরাক)

ক্রিমোনার জেরার্ডের মতো অনুবাদকের বদৌলতে আল-কিন্দীর বহু লেখনী লাতিন ভাষায় অনূদিত হয়, যার ফলে আরবীর চেয়ে লাতিন ভাষায় তার অধিক লেখনী পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ, *De gradibus* (ডি গ্রাডিবাস) গ্রন্থে আল-কিন্দী বিশ্লেষণ করেন যে, বিভিন্ন উপাদানে মিশ্রিত বা সংশ্লেষিত ঔষধের যৌগিক গঠন ঔষধের নমুনা উপাদানের পরিমাণ ও মাত্রা থেকে গাণিতিকভাবে বের করা সম্ভব এবং নমুনা উপাদানের পরিমাণ বৃদ্ধির সাথে ঔষধের কার্যকারিতার মাত্রার মধ্যে জ্যামিতিক সম্পর্ক বিদ্যমান।

মুসলিম বিশ্বে উদ্ভূত অধিকাংশ জ্ঞান যেমন সেখানে স্থির থাকেনি, ঠিক তেমনি অন্যসব জ্ঞানের মতো আল-কিন্দীর রচনাগুলোও সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। তার লেখাগুলো লাতিন ভাষায় অনূদিত হয়, যা তার তত্ত্বগুলোর ইউরোপে বিস্তৃত হওয়ার প্রমাণ বহন করে। ইতালীয় ক্রিমোনার জেরার্ড অনুবাদের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন, যেমন: তিনি আর-রাযীর *De aluminibus et salibus* (লবণ ও ফিটকিরি-র শ্রেণিবিন্যাস ও তৎসংশ্লিষ্ট গবেষণা) গ্রন্থটি অনুবাদ করেন।

আলবার্টাস ম্যাগনাস ও রজার বেকনের মতো ১৩শ শতাব্দির ইউরোপের গুরুত্বপূর্ণ বিজ্ঞানীগণ অনুবাদের মাধ্যমে মুসলিম মনীষীদের এসব কর্মের সংস্পর্শে আসেন। রজার বেকন রসায়নের ব্যাপক গুরুত্বের ব্যাপারে বিশেষ বিশ্বাস রাখতেন, যা তিনি আরবী লেখাগুলোর লাতিন অনুবাদের মাধ্যমে উদ্‌ঘাটন করেন।

আরবী থেকে লাতিন ভাষায় অনুবাদের এই বিশাল হিড়িক ১২শ শতাব্দির মাঝামাঝি থেকে শুরু হয়। ১৩শ শতাব্দির শেষ তৃতীয়াংশে *Summa Perfectionis Magisterii* বা *Sum of Perfection* (পরিপূর্ণতার সমগ্র) শীর্ষক গ্রন্থের সাথে জাবিরের একটি গ্রন্থ *Liber Claritatis* নামে অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হয়। আরও ৪-টি প্রবন্ধের সাথে এক খণ্ডে সন্নিবেশিত এই গ্রন্থ ১৫শ থেকে ১৭শ শতাব্দির মাঝে বহুবার প্রকাশিত হয় এবং তা *The Summa* (সমগ্র) নামে সমধিক পরিচিতি পায়। খণ্ডটি এতটাই সাফল্য লাভ করে যে, তা মধ্যযুগের ইউরোপীয় রসায়নের প্রধান পাঠ্যপুস্তকে পরিণত হয়। এই ম্যানুয়েল গ্রন্থ শতাব্দির পর শতাব্দি ধরে সাধারণ রসায়ন শাস্ত্রে অপ্রতিদ্বন্দ্বি থাকে।

৯ম শতাব্দির রসায়নবিদ আর-রাযী বাগদাদে তার নিজের ল্যাবরেটরিতে কর্মরত আছেন। পাতন প্রক্রিয়া ছাড়া আজকের দিনের আধুনিক সুগন্ধি কল্পনাতীত ছিল।

পাতন প্রক্রিয়া

প্রথম দিকের রসায়নবিদ এবং রাসায়নিক উপাদান

মুসলিম সভ্যতার প্রতিভাধর সব পরীক্ষক এবং তাদের ঐতিহ্য

উল্লেখযোগ্য পরম্পরা: ১৭শ শতাব্দি পর্যন্ত ইউরোপীয় রসায়ন পাঠ্যপুস্তকগুলোকে প্রভাবিত করা।

স্থান: পারস্য

তারিখ: ৯ম শতাব্দি থেকে সূচনা

প্রধান ব্যক্তিত্ব: আর-রাযী এবং জাবির ইবনে হাইয়ান

প্রথম দিকের রসায়নবিদগণ গোলাপজল থেকে চুলের রঞ্জক কালি, সাবান থেকে রঙ ইত্যাদি প্রয়োজনীয় উপাদানের এক জমকালো সজ্জা তৈরির জন্য কাজ করেন। ৯ম শতাব্দির একেবারে শুরুর দিকের মুসলিম পরীক্ষকগণ স্ফটিকীকরণ, অক্সিডেশন, বাষ্পীকরণ, উর্ধ্বপাতন ও পরিস্রাবন সম্পর্কে অবগত ছিলেন। পরীক্ষণকে আরও নিখুঁত করার স্বার্থে তারা রাসায়নিক নমুনা উপাদানসমূহ ওজন করার জন্য সূক্ষ্ম মাপন যন্ত্র উদ্ভাবন করেন। এসব পরীক্ষণের পাশাপাশি তারা নতুন তাত্ত্বিক ধারণা ও রাসায়নিক উপাদান সংশ্লিষ্ট ধারণা নিয়ে হাজির হন, যার কতগুলো শতাব্দিকাল ধরে টিকে ছিল।

এই সময়ের বিজ্ঞানীগণ আধুনিক কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রির গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি স্থাপন করে। জাবির ইবনে হাইয়ান ও তার উত্তরসূরি মুহাম্মদ ইবনে যাকারিয়া আর-রাযী পদার্থের শ্রেণিবিন্যাস এবং রাসায়নিক উপাদান বিষয়ক জ্ঞানের বিন্যাসে নতুন পন্থা উদ্ভাবন করেন। তারা রসায়নের পাঠ্যপুস্তক রচনা করেন এবং সিরামিকের উজ্জ্বল্য বৃদ্ধি, চুলের জন্য নয়া রঞ্জক ও পানিনিরোধক কাপড়ের জন্য ভার্নিশ তৈরির পদ্ধতি নিয়ে গবেষণা চালান। অন্যরা সংশ্লেষী রাসায়নিক উপাদান নিয়ে কাজ করে, যা কীটনাশক, কাগজ তৈরি, রঙ করা এবং ঔষধ উৎপাদনে কার্যকর। পশ্চিমে রাযিস নামে খ্যাত আর-রাযী তার কেমিক্যাল ল্যাবরেটরিতে শতাধিক জিনিস আবিষ্কার করেন এবং প্রাপ্ত গবেষণাগুলো তার কৌতূহল উদ্রেককারী *"সিররুল আসরার"* গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন।

পশ্চিমে জিবার নামে পরিচিত জাবির বহু উদ্ভাবনী পরীক্ষা চালান, যার মাঝে রয়েছে: আগুনে দাহ্য নয় এমন কাগজ তৈরি করা এবং অন্ধকারেও পড়া যায় এমন কালি তৈরি করা। বলা হয়, পাতনের জন্য তিনি বিশেষ পাতন যন্ত্র *(alembic still)* তৈরি করেন, যা পাতন প্রক্রিয়ার জন্য ওই সময়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতিসমূহের অন্যতম। অদ্ভুত আকৃতির এই কাচ পাত্রে তরল পদার্থ জ্বাল দেয়া হতো এবং ওই তরল পদার্থ ঘন করে তার নানা উপাদানের বিশুদ্ধ অংশ আলাদা করা হতো, যা নির্গমন নলের মাধ্যমে নিঃসরিত হতো। রুচিকর সৌরভযুক্ত পানীয় – গোলাপজল পাতন প্রক্রিয়ায় উৎপাদিত অন্যতম প্রথম দ্রব্য, যা খাদ্য ও পানীয়কে সুবাশিত করতে এবং সুগন্ধি ও প্রসাধনী হিসেবে ব্যবহৃত হয়। সুগন্ধি রসায়ন নিয়ে আল-কিন্দী একটি গ্রন্থ রচনা করেন, যাতে বিভিন্ন ঘ্রাণের ১০৭-টি সুগন্ধির রেসেপি দেয়া আছে।

প্রথম দিককার রসায়নবিদগণ মদের পাতন করে বিশুদ্ধ অ্যালকোহল সংগ্রহ করতেন – পানের জন্য অবশ্যই নয় – বরং জীবানুনাশক হিসেবে ব্যবহারের জন্য কিংবা মাটিজাত রুপার উখার (কাঠ, লোহা বা তজ্জাতীয় কঠিন বস্তু মসৃণ করা বা কাটার জন্য ব্যবহৃত যন্ত্র)-এর সাথে মিশিয়ে কালি হিসেবে ব্যবহারের জন্য। সম্ভবত, এসবের মাঝে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো: নাফ্‌ত হিসেবে পরিচিত ঘন অশোধিত তেল পাতন করে জ্বালানী হিসেবে কেরোসিন উৎপন্ন করা এবং ১২শ শতাব্দিতে ভিনেগার পাতন করে শক্তিশালী এসিড উৎপাদন করা। তেলের পরিশোধনের জন্য পাতন প্রক্রিয়া আজও গুরুত্বপূর্ণ এবং কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিতে তা ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

১২শ ও ১৩শ শতাব্দিতে রসায়নের উপর লিখিত বহু আরবী পাঠ্যপুস্তক ও লেখা বৃহত্তর পাঠক সমাজের কাছে পৌঁছানোর জন্য লাতিন ভাষায় অনুদিত হতে শুরু করে। জাবির ইবনে হাইয়ানের সাথে সম্পৃক্ত এমন কিছু রচনা সমগ্র ১৭শ শতাব্দি পর্যন্ত বহুবার পুনর্মুদ্রিত হতে থাকে, যা মধ্যযুগে ইউরোপ জুড়ে রসায়ন শাস্ত্রের প্রধান পাঠ্যপুস্তকে পরিণত হয়।

১৮শ শতাব্দির রসায়ন বিষয়ক আরবী পুস্তিকাতে পাতন প্রক্রিয়া চিত্রায়িত হয়েছে। আরবী লেখাগুলোতে বিভিন্ন পাত্র ও পাতনযন্ত্রের বিবরণ দেয়া হয়েছে এবং উষ্ণ শীতলীকরণ পাত্র থেকে গ্রহীতা ফ্লাস্ক পর্যন্ত কীভাবে ঘনীভবন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়, তার বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে।

অন্যান্য প্রভাবশালী রসায়নবিদদের রচনাগুলোও বেশ আগ্রহ নিয়ে চর্চিত হতে থাকে। কীভাবে ১০০-এরও রাসায়নিক উপাদান তৈরি ও ব্যবহার করতে হয়, আর-রাযীর রচনা তা প্রদর্শন করে। সংশ্লেষিত ঔষধের ফলাফল রচিত আল-কিন্দীর *De gradibus* গ্রন্থটি ক্রিমোনার জেরার্ড অনুবাদ করেন। বিভিন্ন উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত মি গুণগত মানের ব্যাপারে তার প্রদান করা জটিল গাণিতিক সূত্রাবলী পশ্চিমা ঔষধবিজ্ঞানকে দারুণভাবে প্রভাবিত ক

০৯ বাণিজ্যিক রসায়ন

১১০০ বছর পূর্বের মুসলিম রসায়নবিদদের নিয়মতান্ত্রিক প্রচেষ্টা তাদের এমন এক প্রক্রিয়া আবিষ্কারে সক্ষম করে, যা আজকের দুনিয়ার প্রতিটি মানুষ ও জাতিকে দারুণভাবে প্রভাবিত করে যাচ্ছে। পানির ঠিক পরেই প্রক্রিয়ালব্ধ এই দ্রব্যকে জীবনের অন্যতম প্রয়োজনীয় উপাদান বিবেচনা করা হয়। কেইবা জানতো যে, আরবীতে নাফত নামে পরিচিত এই ঘন কালো তেলজাতীয় দ্রব্যের প্রায় ৪০০০-এরও অধিক ব্যবহার রয়েছে? অশোধিত তেলের ক্ষেত্রে পাতন প্রক্রিয়া ছাড়া না আমরা পেট্রোল পেতাম, আর না পেতাম কেরোসিন, অ্যাসফল্ট (পিচ) অথবা প্লাস্টিক।

পাতন হলো বিভিন্ন তরল পদার্থের গলনাংকের ভিন্নতার প্রেক্ষিতে তাদের পৃথক করার একটি উপায় বা প্রক্রিয়া এবং এই প্রক্রিয়া ৮ম শতাব্দি থেকেই মুসলিমদের নিকট সুপরিচিত ছিল। গোলাপজল ও গাছগাছড়া থেকে তৈরি 'এসেনশিয়াল তেল' উৎপাদন ছিল এটার প্রথম ও সুবিদিত প্রয়োগ। পাতন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মদ থেকে বিশুদ্ধ অ্যালকোহল সংগ্রহ করা হতো, যা প্রধানত অমুসলিম সম্প্রদায় ব্যবহার করতো, যেমন: মুসলিম শাসনাধীনে থাকা খ্রিস্টানগণ। জাবির ইবনে হাইয়ান শীতলীকরণের একটি প্রক্রিয়া উদ্ভাবন করেন, যা এটার পাতনে ব্যবহার উপযোগী ছিল। পাতনকৃত অ্যালকোহল ও অ্যালকোহলের চূর্ণ তখন এসিড, নানা ধরনের ঔষধ, সুগন্ধি ও লেখার কালি উৎপাদনের রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত হলেও পানীয় হিসেবে ব্যবহৃত হতো না, যেহেতু ইসলাম অ্যালকোহল ও অন্যান্য নেশাজাতীয় দ্রব্য সেবনে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে।

৮ম শতাব্দিতে জাবির ছিলেন প্রথম ব্যক্তি, যিনি চোলাই পাতনযন্ত্র উদ্ভাবন করেন, যা আজকের দিনের পাতন ল্যাবরেটরিগুলোতে ব্যবহৃত হয়। এই যন্ত্র দ্রব্যকে শীতল করে এবং পাতন প্রক্রিয়ার সাহায্যে প্রয়োজনীয় তরল উপাদান সংগ্রহ করে।

রসায়নের অন্যান্য পরিভাষার মতো *Alembic* (অ্যালেমবিক) শব্দটি এসেছে আরবী 'আল-আমবিক' শব্দ থেকে যার অর্থ: 'পাতনযন্ত্রের মাথা'। চোলাই পাতনযন্ত্রে একটি টিউব দ্বারা দুটো গলাওয়ালা জগ সংযুক্ত থাকে। এই চোলাই পাতনযন্ত্রে জাবির ফুটন্ত মদ ও লবণ থেকে দাহ্য ভাপ বা বাষ্প বেরিয়ে আসতে প্রত্যক্ষ করেন। তিনি তার রসায়ন গ্রন্থে

শোধনাগারগুলোতে পাতন প্রক্রিয়ায় অশোধিত তেল থেকে পেট্রোল ও কেরোসিন উৎপাদন করা হয়। নিচের এই শোধনাগার মালয়েশিয়াতে অবস্থিত।

বলেন, "এবং বোতলের মুখে যে আগুন দগ্ধ করে, তার উৎস ফুটন্ত মদ ও লবণ এবং উত্তম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন সমজাতীয় জিনিস, যেগুলো তেমন একটা ব্যবহার উপযোগী মনে করা হয় না, কিন্তু এই শাস্ত্রে সেগুলোর গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার রয়েছে।"

অ্যালকোহলের এই দাহ্য বৈশিষ্ট্য জাবিরের সময় থেকেই ব্যাপকভাবে বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হতো। ১৪শ শতাব্দির সামরিক প্রবন্ধগুলোতে দেখা যায় যে, সামরিক আগ্নেয়াস্ত্র বা বিস্ফোরক উৎপাদনে বহুদিনকার আঙ্গুরের পাতিত মদ গুরুত্বপূর্ণ উপাদানে পরিণত হয়। এসব পাণ্ডুলিপিতে এই সতর্কবার্তা উল্লেখ করা হয় যে, এ ধরনের পাতিত দ্রব্যগুলো সহজেই জ্বলে ওঠতে পারে, তাই এসব দ্রব্য বালিতে পুতে রাখা যায়, এমন পাত্রে সংরক্ষণ করে রাখতে হবে।

এসিডের ব্যাপারে এই ডায়াগ্রাম সতর্ক করছে। প্রাচীন দুনিয়া ভিনেগারের চেয়ে শক্তিশালী কোনো এসিড সম্পর্কে জ্ঞান রাখতো না। কিন্তু জাবির ইবনে হাইয়ানের আবিষ্কৃত এসিডগুলো রাসায়নিক পরীক্ষণের দরজা ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত করে।

আল-কিন্দী তার সুগন্ধি পাতনের জন্য সুবিখ্যাত ছিলেন। এসব বিবরণ তিনি তার প্রসিদ্ধ "*কিতাবুল কিমিয়া আল-আতরী ওয়াল তাসয়ি'দাত*" (সুগন্ধি ও পাতনের রসায়ন) গ্রন্থে উল্লেখ করেন। ওই গ্রন্থে তিনি পাতন প্রক্রিয়াকে এভাবে বর্ণনা করেন, "এবং যে কেউ পানি ফোটানোর যন্ত্রের সাহায্যে মদ পাতিত করতে পারে, যেখানে তা গোলাপজলের মতো বর্ণ ধারণ করে। একইভাবে ভিনেগারেরও পাতন সম্ভব, যেখানে তা গোলাপজলের মতো বর্ণ ধারণ করে বেরিয়ে আসে।"

মসৃণ রূপাকে পাতিত মদের সাথে চূর্ণ করে কীভাবে রুপার সাহায্যে লেখার উপকরণ প্রস্তুত করতে হয়, তা নিয়ে ৯০০ বছর পূর্বে তিউনিসিয়ার ইবনে বাদিস বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি বলেন, "মসৃণ রুপা নিয়ে পাতিত মদসহ তা তিনদিন চূর্ণ করুন, এরপর তা রৌদ্রে উত্তপ্ত করুন এবং আবার তা রৌদ্রে উত্তপ্ত করতে থাকুন যতক্ষণ না তা নরম মাটির মতো হচ্ছে, অতঃপর পানি দিয়ে তা আলতোভাবে ধুয়ে ফেলুন।"

যেমনটি আমরা উল্লেখ করেছি, অ্যালকোহল জাতীয় পানীয় পান করা মুসলিমদের জন্য হারাম, কিন্তু তাদের ঐকান্তিক ইচ্ছা ছিল পাতন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এর উপকারী ও ক্ষতিহীন উপাদানগুলো জনস্বার্থে ব্যবহার করা। অ্যালকোহলের এরূপ ব্যবহার ঔষধ শিল্প থেকে প্রসাধনী শিল্পে বিপুল পরিমাণ পণ্যের আবির্ভাব ঘটায়। এক হাজার বছর পূর্বে তাদের অধিকাংশ কাজেরই ব্যবহারিক প্রয়োগ ছিল এবং অন্য সভ্যতা ও সংস্কৃতি থেকে আহরিত জ্ঞান ও তাদের স্বকীয় গবেষণা বহু নতুন পণ্য ও দ্রব্যের উদ্ভাবন সম্ভব করেছিল, যেমন: কালি, বার্নিশ, ঝালাই করার রঙ, সিমেন্ট এবং নকল মুক্তা।

গুরুত্বপূর্ণ যেসব পরীক্ষণ সংশ্লেষী রসায়নের সূচনা চিহ্নিত করেছিল, তাদের মধ্যে 'ক্ষয়িষ্ণু উর্ধ্বপাতিত দ্রব্য' হিসেবে মারকিউরিক ক্লোরাইড আহরণসংক্রান্ত আর-রাযীর পরীক্ষা অন্যতম, যা তিনি তার লবণ ও ফিটকিরির শ্রেণিবিন্যাস ও তৎসংশ্লিষ্ট গবেষণা গ্রন্থে উল্লেখ করেন। এরসাথে বর্তমানে কীটনাশক হিসেবে ব্যবহৃত মারকিউরিক ক্লোরাইডগুলোর আবিষ্কার আরও বহু সংশ্লেষী পদার্থের আবিষ্কারের পথ সুগম করে। অন্যান্য দ্রব্যকে ক্লোরিনায়িত করার ক্ষমতাসম্পন্ন ক্ষয়িষ্ণু উর্ধ্বপাতিত দ্রব্যের আবিষ্কার মাটি খুঁড়ে অনেক খনিজ এসিডের সন্ধান লাভে সহায়তা করে। রক্তক্ষরণ রোধকারী সঙ্কোচক, উদ্দীপক, দাহক ও জীবানুনাশক ঔষধ হিসেবে বর্তমানে ক্ষয়িষ্ণু উর্ধ্বপাতিত দ্রব্যের গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োগ রয়েছে। বাণিজ্যিক রসায়ন ও ভারী রাসায়নিক দ্রব্যের ক্ষেত্রে মধ্যযুগের অন্যতম উল্লেখযোগ্য অবদান হলো 'ফিটকিরি-ঘটিত' শিলা থেকে ফিটকিরির পৃথকীকরণ ও উৎপাদন। কাগজ প্রস্তুত, রঞ্জক ও সালফিউরিক এসিডের উৎপাদনে ফিটকিরি ব্যবহৃত হতো। সালফিউরিক ও হাইড্রোক্লোরিকের মতো এসিডগুলো মূলত জাবির ইবনে হাইয়ান আবিষ্কার করেছিলেন।

১০ জ্যামিতি

জটিল, অভিজাত ও রুচিসম্পন্ন ডিজাইন দ্বারা নিজেদের ভবন সজ্জিতকরণে মুসলিমরা বেশ সুপরিচিত ছিল। এ ব্যাপারে আরও তথ্য আপনি এই বিভাগের 'শিল্প ও সর্পিল বস্তুর কারুকার্যময় নকশা' অধ্যায়ে পাবেন। জ্যামিতি কিংবা পরিমাপ, বিষয়-সম্পত্তি এবং বিন্দু, রেখা, কোণ, দ্বি-মাত্রিক ও ত্রি-মাত্রিক নকশার মধ্যস্থ সম্পর্কে ব্যাপক অগ্রগতি ব্যতীত এসব চমৎকার ডিজাইনের আবির্ভাব কখনো সম্ভবপর ছিল না।

পণ্ডিতগণ গ্রিকদের পরম্পরাগত জ্যামিতির জ্ঞান লাভ করেন, এরপর সেগুলোর বিকাশ ও সম্প্রসারণ ঘটান। ইউক্লিড তার *Elements* গ্রন্থে জ্যামিতি নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। অধিকাংশ আগ্রহী গণিতবিদদের জ্যামিতিতে হাতেখড়ি ইউক্লিডের বিস্ময়কর ও কালোত্তীর্ণ এই গ্রন্থের মাধ্যমে হতো।

জ্যামিতিতে মুসলিমগণ যে অনুসন্ধিৎসু পদক্ষেপ নিয়েছেন, সেটার ভিত্তি তিনটি হেলেনীয় স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রথমটি ইউক্লিডের *Elements* গ্রন্থটি, যা বাগদাদের ৮ম শতাব্দির বাইতুল হিকমায় অনূদিত হয়। দ্বিতীয়টি আর্কিমিডিসের *On the Sphere and Cylinder* (গোলক ও বেলন) এবং *The Heptagon in the Circle* (বৃত্তস্থ সপ্তভুজ) শীর্ষক দুটি গ্রন্থ। দ্বিতীয় গ্রন্থটি এখন আর মূল গ্রিক ভাষায় পাওয়া যায় না এবং এটা আমাদের নিকট সাবিত ইবনে কুররার আরবী অনুবাদের মাধ্যমে পৌঁছেছে। তৃতীয় ও চূড়ান্ত ভিত্তি পেরজার অ্যাপোলোনিয়াসের কঠিন গ্রন্থ, যা *The Conics* (চোঙ্গাকৃতি বস্তু) নামে পরিচিত। খ্রিস্টপূর্ব ২০০ খ্রিস্টাব্দের দিকে লেখা এই গ্রন্থ ৮-টি খণ্ডে বিভক্ত, যার মধ্যে মূল গ্রিক ভাষায় টিকে আছে ৪-টি; অন্যদিকে এটার ৭-টি খণ্ড আরবী অনুবাদের মাধ্যমে আমাদের নিকট এসেছে।

গ্রিক ও ইসলামী বিশ্ব, উভয়ের অধিকাংশ জ্যামিতিক গঠন (*conic sections*) চোঙ্গাকৃতি তত্ত্বের অধীনে একীভূত, যা বিভিন্ন জ্যামিতিক গঠন, কেন্দ্রীভূত আলোর জন্য আয়নার ডিজাইন এবং সূর্যঘড়ি তত্ত্বে ব্যবহৃত হতো। একটি নিরেট দ্বৈত-কোণক গঠিত হয় সোজা রেখার সম্প্রসারণের মাধ্যমে, যা ভূমি বা তল নামে পরিচিত বৃত্তের পরিধি থেকে বেরিয়ে আসে এবং একটি নির্দিষ্ট বিন্দু দিয়ে অতিক্রম করে, যে বিন্দুটি চূড়া বা শীর্ষ নামে পরিচিত। একটি সমতল ছেদক দ্বারা দ্বৈত-কোণকের কর্তনের মাধ্যমে কৌণিক ছেদকের উৎপত্তি ঘটে। অবশিষ্ট সমতল ছেদক উৎপাদকের সাপেক্ষে সমতল অংশের কোণ দ্বারা নির্ধারিত হয়। অ্যাপোলোনিয়াস সফলভাবে যুক্তি দেখান যে, বৃত্ত ব্যতীত কেবলমাত্র তিনটি ছেদক উৎপন্ন করা যায়: উপবৃত্ত (*ellipse*), অধিবৃত্ত (*parabola*) ও পরাবৃত্ত (*hyperbola*)।

> "জ্যামিতি সম্পর্কে অজ্ঞ ব্যক্তিকে এখানে প্রবেশ করতে দিও না।"
>
> – প্লেটোর একাডেমির উপর খোদাই করে লেখা

কৌণিক ছেদকের তত্ত্ব ব্যবহার করে আবু সাহল আল-কুহী সুষম সপ্তভুজ (*regular heptagon*) নামে পরিচিত সাতটি সমান পার্শ্বযুক্ত বহুভুজ গঠনের এক চমকপ্রদ প্রক্রিয়া উদ্ভাবন করেন। আবু সাহল আল-কুহী সহজাত প্রতিভাসম্পন্ন বিজ্ঞানীদের একজন, যাদেরকে বাগদাদের প্রভাবশালী ভূইয়া পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ পৃষ্ঠপোষকেরা গোটা মুসলিম জাহানের পূর্বাংশ থেকে একত্র করে। কাস্পিয়ান সাগরের দক্ষিণের পাহাড়ী অঞ্চলে বেড়ে উঠা এবং বাগদাদের বাজারে কাচের বোতল দিয়ে ভেলকিবাজি দেখানো আবু সাহল আল-কুহী এমন পৃষ্ঠপোষক পেয়ে তার মনোযোগ বিজ্ঞান গবেষণায় নিবদ্ধ করেন। আর্কিমিডিসের কাজের উপর তিনি আগ্রহ প্রদর্শন করেন এবং *On the Sphere and Cylinder* গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের ব্যাখ্যা লেখেন। কৌণিক ছেদ এবং এদের সাহায্যে জটিল জ্যামিতিক সমস্যা সমাধানে তার পূর্ণ মনোযোগ ছিল।

উদাহরণস্বরূপ, কৌণিক ছেদকের সাহায্যে কীভাবে একটি গোলক তৈরি করতে হয়, তিনি তা ব্যাখ্যা করেন। এই গোলকের খণ্ডিত একটি অংশ একক গোলকের খণ্ডিতাংশের সদৃশ হবে এবং এই গোলকের পৃষ্ঠতল দ্বিতীয় গোলকের খণ্ডিতাংশের সমান হবে। কৌণিক ছেদ অঙ্কন করতে সক্ষম 'পূর্ণ কম্পাস' নামে নতুন যন্ত্র উদ্ভাবন করলেও আবু সাহল আল-কুহীর মনোযোগ নিবদ্ধ ছিল সুষম সপ্তভুজ অংকনের বিস্তারিত নির্দেশিকা তৈরির মতো উচ্চতর লক্ষ্যের দিকে। বৃত্তস্থ সুষম সপ্তভুজের একটি প্রমাণ আর্কিমিডিস প্রদান করেন, যা এটা নির্দেশ করছে যে, সুষম সপ্তভুজ অঙ্কন করা সম্ভব। কিন্তু কীভাবে এটা আঁকতে হবে, তার পর্যাপ্ত ধাপ তিনি প্রদান করেননি। গণিতের তাত্ত্বিক জগতে এটা খুবই

সাধারণ একটি বিষয়। কখনো কখনো বিশেষ গাণিতিক সমস্যা সমাধান বা বিশেষ জ্যামিতিক গঠন অংকনের ধারাবাহিক প্রক্রিয়া নির্ণয় বেশ দুরূহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। এমন পরিস্থিতিতে গণিতবিদগণ এটা প্রমাণে নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখেন যে, এমন প্রক্রিয়া বিদ্যমান রয়েছে এবং ওই বিশেষ গঠন অংকনের দায়িত্ব তারা অন্যদের উপর ছেড়ে দেয়।

আর্কিমিডিস যদিও সুষম সপ্তভুজের প্রমাণ পেশ করেছেন, তথাপি এটার সত্যিকার অঙ্কন প্রক্রিয়া শতাব্দি ধরে গ্রিক ও মুসলিম গণিতবিদদের পালিয়ে বেড়াতে বাধ্য করেছে এবং এই পলায়ন এমন মাত্রায় ছিল যে, আবু আল-জুদ এই মন্তব্য করতে বাধ্য হন যে, "সম্ভবত এটার অঙ্কন প্রক্রিয়া খুবই জটিল এবং যে বিষয়ে এটা জ্যামিতিক প্রতিজ্ঞা হিসেবে কাজ করে, তার চেয়ে এটার প্রমাণ আরও জটিল।" আবু সাহল আল-কুহী এই জন্তুকে পোষ মানাতে সক্ষম হন এবং এই সমস্যাকে মাত্র তিনটি ধাপে সীমাবদ্ধ করতে সফল হন। এই তিন ধাপকে যদি উল্টে দেয়া যায়, তবে তা আমাদের কৌণিক ছেদ অংকনের দিকে নিয়ে যাবে। তিনি সপ্তভুজের এক বাহুর দৈর্ঘ্যের ভিত্তিতে প্রাসঙ্গিক কৌণিক ছেদ অঙ্কন করতে বলেন। এরপর প্রদত্ত অনুপাত মোতাবেক একটি বিভক্ত রেখা টানতে হবে এবং সে বিভক্ত রেখা থেকে বিশেষ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ত্রিভুজ গঠন করতে হবে। সবশেষে, উদ্ভূত ত্রিভুজ থেকে সপ্তভুজ অঙ্কন করতে হবে।

আবু সাহল প্রদত্ত কোনো কোণকে তিনটি সমান ভাগে বিভক্ত করার পদ্ধতি উদ্ভাবনের জন্যেও বিশেষভাবে পরিচিত। আবু সাহলের চেয়ে বয়সে তরুণ আব্দুল জালিল আস-সিজযী নামের সমসাময়িক এক পণ্ডিত এটাকে 'আবু সাহল আল-কুহীর উপপাদ্য' নামে আখ্যায়িত করেন। আব্দুল জালিল আস-সিজযী এই উপপাদ্যকে ব্যবহার করে সমান নয়টি বাহুর বহুভুজ (*nonagon*) অঙ্কন করেন।

সূর্যঘড়ির পৃষ্ঠভাগে কৌণিক ছেদ খোদাই করে সংযুক্ত করার জন্য কৌণিক ছেদ সম্পর্কে যন্ত্র নির্মাতাদের জ্ঞান থাকাটা অত্যাবশক ছিল। গ্রিকরা জানতো "দিনের বেলায় সূর্য যখন বৃত্তাকর পথ ধরে অগ্রসর হয়, তখন মাটিতে লম্বভাবে স্থাপন করা দণ্ডের শীর্ষ দিয়ে আলোকরশ্মি অতিক্রমের সময় তা দ্বৈত কোণক (*double cone*) উৎপন্ন করে। যেহেতু অনুভূমিক সমতল অংশ এই কোণকের উভয় অংশকে খণ্ডিত করে, সেহেতু অনুভূমিক সমতল অংশ দ্বারা কর্তিত অংশ অবশ্যই পরাবৃত্ত (*hyperbola*) হবে।" এটা সাবিত ইবনে কুর্‌রার নাতি ইব্রাহীম ইবনে সিনানকে এ বিষয়ে গবেষণা করতে ব্যাপকভাবে উদ্বুদ্ধ করেছিল। যদিও যকৃত বা লিভারের টিউমারের কারণে তার আয়ুষ্কাল খুব কম ছিল এবং ৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে মাত্র ৩৭ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন, তথাপি "তার রয়ে যাওয়া কাজ এটার স্বীকৃতি দিচ্ছে যে, গণিতের ইতিহাসে তিনি গুরুত্বপূর্ণ এক ব্যক্তি ছিলেন", যেমনটি সমসাময়িক লেখক জে. এল. বারগ্রেন মন্তব্য করেছেন।

বারগ্রেন এরপর ইব্রাহীম ইবনে সিনানের অবদানের সারাংশ টানেন এভাবে, "রেনেসাঁর পূর্ব পর্যন্ত আমাদের নিকট পৌঁছানো গবেষণার মাঝে পরাবৃত্তের খণ্ডিত অংশের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ে তার আলোচনা সবচেয়ে সরল ... সূর্যঘড়ির কাজের বেলায় তিনি একটি ঐক্যবদ্ধ ও একক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সম্ভাব্য সব ধরনের সময় পরিমাপক ঘড়ির ডিজাইন তৈরি নিয়ে আলোচনা করেন, যা ওইসব সমস্যা সমাধানে এক নতুন ও সফল সংযোজন এবং এটা পূর্ববর্তীদের প্রায়শই ধরাশায়ী করতো।"
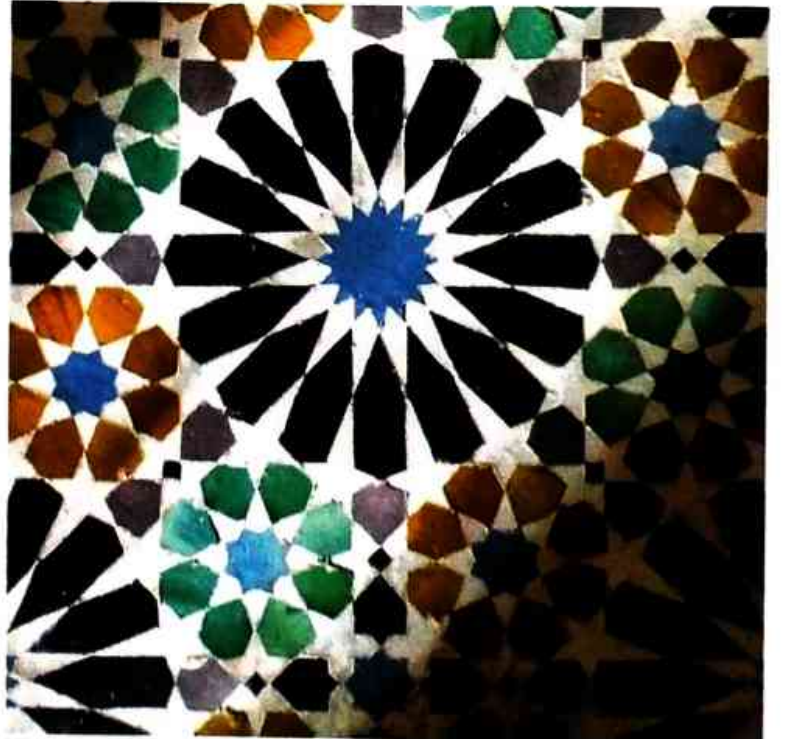
স্পেনের গ্রানাডায় অবস্থিত আল-হামরা প্রাসাদের টাইলসগুলি রঙিন ডিজাইনে সজ্জিত। অধিকাংশ ইসলামী টাইলসের ডিজাইনে জ্যামিতিক ও গাণিতিক সংকেত প্রয়োগ করা হতো।

প্রকৃতিতে পরিমাপ সর্বদাই গাণিতিক নকশা অনুসরণ করে, যা মুসলিম পণ্ডিতদের দারুণভাবে উৎসাহিত করেছিল। গোল্ডেন রেশিও-তে ধারাবাহিক বৈশিষ্ট্যের আপেক্ষিক আকার এমনভাবে অনুপাত গঠন করে যে, ক্ষুদ্রতর আকৃতির সাপেক্ষে বৃহত্তর আকৃতির অনুপাতটি বৃহত্তর সংখ্যার সাপেক্ষে ক্ষুদ্রতর ও বৃহত্তর দুটি আকৃতির যোগফলের সমান হয়। যেমনটি আমরা শামুকের খোলসের প্রকোষ্ঠে এবং উত্তর আমেরিকাতে জন্ম নেয়া বিশেষ প্রজাতির ফুল কনফ্লাওয়ারের কাঁটাযুক্ত বিন্যাসে দেখতে পাই।

মসজিদ, প্রাসাদ এবং লাইব্রেরির মতো সর্বসাধারণের ব্যবহার্য ভবন সজ্জিতকরণে ব্যবহারিক জ্যামিতিক ডিজাইনের আশ্রয় নেয়া হতো, আর এক্ষেত্রে মুসলিম জ্যামিতিবিদগণ দক্ষ কারিগরদের শিল্প-কৌশলে সংগতি বিধান এবং তাদের শিল্পের সীমা নিয়ে নানা ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে আগ্রহী ছিলেন। ৯৫০ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করা আবু নসর আল-ফারাবী, যিনি সঙ্গীত, দর্শন এবং এরিস্টটলের উপর ব্যাখ্যামূলক কাজের জন্য সমধিক পরিচিত, তিনিও সীমিত সামর্থ্যের বিভিন্ন যন্ত্র দ্বারা নানা ধরনের জ্যামিতিক গঠন তৈরির বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করেন। অদ্ভুতভাবে তার প্রবন্ধের শিরোনাম "*আসরারুত তাবিয়াত ফী দাকায়িকিল আশকালিল হানদাসিয়াহ*" (জ্যামিতিক গঠনের বিস্তারিত বিবরণ ও তার প্রাকৃতিক গঠনের রহস্য)। আল-ফারাবীর মৃত্যু হলে তার এই অবদানকে পরবর্তীতে আবুল ওয়াফা নিজের "*কিতাব ফিমা ইয়াহতাজু সানাউ ফী আমালিল হানদাসাতী*" (কারিগরদের জন্য প্রয়োজনীয় জ্যামিতিক গঠন) শীর্ষক গ্রন্থে একত্র করেন। এই গ্রন্থে তিনি প্রতিটি গঠনের বিস্তারিত বিবরণ ও সেটার পিছনে প্রয়োজনীয় যুক্তি প্রদান করেন।

আবুল ওয়াফা যেসব সমস্যার দিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করেন, তার মাঝে রয়েছেঃ কোনো একটি কর্তিত রেখার শেষ বিন্দুতে লম্ব অঙ্কন করা; কোনো একটি রেখাকে যেকোন সংখ্যায় সমানভাগে বিভক্ত করা, বৃত্তে বর্গক্ষেত্র অঙ্কন করা এবং বিভিন্ন বাহু (৩, ৪, ৫, ৬, ৮, ১০) দ্বারা সমান বহুভুজ গঠন করা। অবাক করা বিষয় হলো, এসব গঠন নির্দিষ্ট একপ্রান্ত উন্মুক্ত ও সরল প্রান্তবিশিষ্ট 'জংধরা কম্পাস' দিয়েই আঁকা হয়েছে।

মুসলিম কারিগর, স্থাপত্যবিদ ও ক্যালিগ্রাফি অঙ্কনকারীদের জন্য জ্যামিতির বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। পরিমাপের ক্ষেত্রে প্রকৃতি ও গাণিতিক প্রকাশভঙ্গির মাঝে যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে, এ ব্যাপারে তাদের মাঝে গভীর সচেতনতা বিদ্যমান ছিল এবং প্রতিনিয়ত তারা এসব সুনিবিড় সম্পর্ক দ্বারা অনুপ্রাণিত হতেন।

এমন ধরনের পরিমাপের মাঝে গোল্ডেন রেশিও অন্তর্ভুক্ত। চোখে প্রশান্তি এনে দেয়া পরিমাপের এই অনুপাত প্রকৃতিতে বহুল পরিমাণে দৃশ্যমান, যেমনঃ শামুকের খোলস ও গাছের পাতা। সাধারণ মানুষের ভাষায়, গোল্ডেন রেশিও দ্বারা সজ্জিত কোনো বস্তুর প্রস্থ মোটামুটিভাবে তার উচ্চতার দুই-তৃতীয়াংশ বা আনুমানিক অনুপাত ১.৬১৮। এটাকে গোল্ডেন রেশিও এজন্য বলা হয় যে, যদি কোনো রেখা বিভক্ত করা হয়, তবে বৃহত্তর অংশের তুলনায় ক্ষুদ্রতর অংশের অনুপাত সমগ্র অংশের সাপেক্ষে বৃহত্তর অংশের অনুপাতের সমান হবে। আনুমানিকভাবে এই অনুপাত দাঁড়ায় ৮:১৩ এবং এই অনুপাত শিল্প ও স্থাপত্যের বিভিন্ন কর্মে দৃশ্যমান।

জ্যামিতিক এসব ঘটনা দ্বারা বিমোহিত থাকার পাশাপাশি মুসলিম শিল্পীগণ যেকোন 'বিশৃঙ্খল' ব্যবস্থার কেন্দ্র অনুসন্ধান করতেন। আর তাই অনুপাতের সাপেক্ষে কেন্দ্রের ধারণাটিও তাদের মনোযোগের বস্তুতে পরিণত হয়।

১০ম শতাব্দির *ইখওয়ানুস সাফা* বা পবিত্রতার ভ্রাতৃসংঘ নামে পণ্ডিতদের একটি সংগঠন অনুপাত সম্পর্কে তাদের ধারণা তাদের রচিত "*রাসাইল*" প্রবন্ধমালায় বিবৃত করে। খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দির স্থপতি ও লেখক ভিটরুভিয়াসের অনুসিদ্ধান্ত সম্পর্কে তারা অবগত ছিলেন। ভিটরুভিয়াস মানবদেহকে আনুপাতিক ব্যবস্থা হিসেবে পরিমাপ করেন। কিন্তু *ইখওয়ানুস সাফা* ভিটরুভিয়াসের এই পরিমাপে ত্রুটি নির্দেশ করে, যেহেতু এই পরিমাপ নাভির পরিবর্তে কুঁচকি বা ত্রিকাস্থিকে কেন্দ্র হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

ভিটরুভিয়াসের এই অনুসন্ধান মূলত গ্রিক নিয়মনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং এই নিয়মনীতি আবার প্রাচীন মিসরীয় অনুপাত নীতির উপর ভিত্তিশীল, যা দেবতা ওসিরিসের মেরুদণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত। 'ঐশ্বরিক মেরুদণ্ড' অথবা জেট পিলার (*উলবঃ চ্রষষধৎ*) বস্তুত ওসিরিসের পূর্বরাজবংশীয় চিত্রায়ন, যা স্থিতি, সহিষ্ণুতা ও কল্যাণ নির্দেশ করে।

ঘাম ঝরানো গবেষণার পর *ইখওয়ানুস সাফা* ভিন্ন এক উপসংহারে পৌঁছায়। তারা এটা প্রতিষ্ঠিত করে যে, মানবদেহকে যদি প্রসারিত ও বিস্তৃত করা হয়, তবে হাতের আঙ্গুলের ডগা এবং পায়ের আঙ্গুল একটি কল্পিত বৃত্তের পরিধি স্পর্শ করে। মানবদেহ যদি সাত বছরের কম শিশুর হয়, তবে এই কল্পিত বৃত্তের কেন্দ্র কুঁচকি নয় বরং নাভি। এই নিখুঁত অনুপাত – নাভি যার কেন্দ্র, তা সাত বছর থেকে অসামঞ্জস্যশীল হতে শুরু করে [৭ বছর পর্যন্তকে সময়কে মানুষদের নিষ্পাপ থাকার কাল বিবেচনা করা হয়]। জন্মের সময় দেহের মধ্যবিন্দু থাকে নাভি। ব্যক্তির বৃদ্ধির সাথে সাথে মধ্যবিন্দু হারাতে থাকে, যতক্ষণ না তা কুঁচকি বা ত্রিকাস্থিতে পৌঁছাচ্ছে।

লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির 'ভিটরুভিয়ান মানব' মানবদেহের অনুপাত প্রদর্শন করছে, যা ১০ম শতাব্দিতে ইখওয়ানুস সাফা কর্তৃক রচিত "রাসাইল" প্রবন্ধমালায় আলোচিত হয়েছে।

ধর্মীয় চিত্রগুলোতে সমানুপাতিক অনুপাত একটি আদর্শ নকশা বা অবয়ব প্রদান করে। প্রস্থ আট একক, উচ্চতা দশ একক এবং মধ্যবিন্দু হচ্ছে: নাভি। দেহের কাঠামো আটটি মাথার সমান, পা দেহের $\frac{১}{৮}$ অংশ, মুখমণ্ডল দেহের $\frac{১}{৮}$ অংশ, কপাল মুখমণ্ডলের এক-তৃতীয়াংশ এবং মুখমণ্ডল চারটি নাক বা চারটি কানের সমান।

নাভি বৃত্তের কেন্দ্র হিসেবে পৃথিবী ও জৈব উপাদানের অবস্থা নির্দেশ করে এবং এটা এক ধরনের ঐশ্বরিক অভিব্যক্তি প্রকাশ করে। সৃষ্টিতত্ত্ব, সঙ্গীততত্ত্ব, ক্যালিগ্রাফি এবং ১০ম শতাব্দি থেকে সব ধরনের শিল্পে এই ঐশ্বরিক অনুপাত প্রতিফলিত হয়ে আসছে। এগুলোকে ভারসাম্য অনুসন্ধানের চাবিকাঠি হিসেবে বিবেচনা করা হতো এবং আধ্যাত্মিক ব্যক্তিদের জন্য তা ছিল: আল্লাহর নৈকট্য।

উদাহরণস্বরূপ, আট সংখ্যার স্বাভাবিক সামঞ্জস্যকে মুসলিম পণ্ডিতগণ মৌলিক সংখ্যার দৃষ্টিতে দেখতেন, যা তাদের উদ্বুদ্ধ করেছিল সঙ্গীতের স্বরগ্রাম পরিমাপ, কবিতা, ক্যালিগ্রাফি এবং বিভিন্ন শৈল্পিক বিষয়ে প্রয়োগ করতে।

উমর আল-খাইয়্যাম প্রবর্তিত বীজগাণিতিক জ্যামিতির চমকপ্রদ পুরো ক্ষেত্র এবং লেন্স নিয়ে আত-তুসী প্রদত্ত জ্যামিতিক তত্ত্ব – জ্যামিতিতে নতুন দুটো শাখার সংযোজন ঘটায়। এ ব্যাপারে আরও জানতে এই বিভাগের গণিত অধ্যায় এবং গৃহ বিভাগের দৃষ্টিশক্তি ও ক্যামেরা অধ্যায় ঘুরে আসতে পারেন।

১১ শিল্প এবং সর্পিল বস্তুর কারুকার্যময় নকশা

শৈল্পিক কিছু ডিজাইনে নজর দিতে পারেন, চোখের পলক ফেলার সাথে সাথে আপনার চোখে ধরা পড়বে ভিন্ন ভিন্ন আকার ও অবয়ব। এ ধরনের জ্যামিতিক শিল্প শুদ্ধ গণিত ও দূরত্ব শিল্পের এক সংমিশ্রণ – যেন আকার ও পুনরাবৃত্তিময় বিন্যাসের পারস্পরিক ক্রিয়া চলছে। মানুষের অবয়ব না থাকলেও জটিল এসব ডিজাইন বয়ে চলা রেখার সমন্বয়ে গঠিত। তাকানোর সাথে সাথে এসব ডিজাইন বদলে যাচ্ছে মনে হবে, এ ধরনের কারিশমা মূলত গভীর চিন্তা ও আধ্যাত্মিক মনসংযোগকে দারুণভাবে উৎসাহিত করে; এসব কারণে এগুলো মসজিদে বেশ ভালোভাবেই মানানসই ছিল।

চিত্রাঙ্কনে নবী মুহাম্মদ (ﷺ) মানুষ ও জীবজন্তুর অবয়ব ব্যবহারের বিরোধী ছিলেন। কেননা তিনি চাননি ধর্মান্তরিত হওয়ার সময় মুসলিমদের মনোযোগ আল্লাহ হতে সরে গিয়ে মূর্তি, প্রতিকৃতি কিংবা বস্তুগত দুনিয়া উপাসনার মতো ইসলাম পূর্ব কালচারের দিকে ঝুঁকে পড়ুক।

এর ফলশ্রুতিতে জ্যামিতি মুসলিম বিশ্বের প্রধান শিল্পে পরিণত হয়। শিল্পীগণ নিজেদের কল্পনাশক্তি ও সৃজনশীলতাকে উজাড় করে সম্পূর্ণ নতুন এক শিল্পের সৌধ নির্মাণ করে, যা সর্পিল কারুকার্যময় নকশা বা অ্যারাবেস্ক (*Arabesque*) নামে পরিচিত। মূলত এটা জ্যামিতিক শিল্পেরই একটি নয়া ধারার বিকাশ। সর্পিল কারুকার্যময় নকশা এক ধরনের বিন্যাস, যেখানে অনেকগুলো একক (বা ইউনিট) সংযুক্ত হয়ে একত্রে মিশে যায়। সবগুলো একক অন্যদের থেকে উদ্ভূত হয়ে সবদিকে ছড়িয়ে পড়ে। প্রতিটি স্বাধীন একক নিজে থেকেই সম্পূর্ণ এবং স্বতন্ত্র হিসেবে ব্যবহারযোগ্য হলেও সবগুলো একক সংযুক্ত হয়ে সামগ্রিক কাঠামোর একটি অংশ গঠন করে। দ্বিমাত্রিক এই ডিজাইনগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছাদ, দেয়াল, কার্পেট, আসবাবপত্র ও বস্ত্রাদির উপরিতল সজ্জিত করতে ব্যবহৃত হতো।

তোপকাপি স্ক্রল হলো জটিল এই শিল্পের সবচেয়ে চমৎকার একটি নিদর্শন, যা অতি সম্প্রতি ইস্তাম্বুলে আবিষ্কৃত হয়েছে। তোপকাপি স্ক্রলটিতে দেয়ালের উপরিতল ও খিলানের জন্য ১১৪-টি স্বতন্ত্র জ্যামিতিক নকশা রয়েছে, যা ১৫শ শতাব্দির শেষভাগ বা ১৬শ শতাব্দিতে পারস্যে কর্মরত এক শ্রেষ্ঠ নির্মাতার অনন্য কীর্তি। এ ধরনের কর্মের এটাই সর্বাধিক প্রাচীন নিদর্শন, যা অবিকৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে। এটার আবিষ্কারের পূর্বে ইসলামী স্থাপত্য স্ক্রলের মাঝে সবচেয়ে প্রাচীন নিদর্শন ছিল ১৬শ শতাব্দিতে উজবেকিস্তানের বুখারায় পাওয়া বিচ্ছিন্ন কিছু স্ক্রল।

পুষ্পবৃন্ত, পাতা ব্যবহার করে সর্পিল কারুকার্যময় নকশা কখনো লতা বা ফুলের সজ্জা, আবার কখনো লতাগুল্ম ও জ্যামিতিক বিন্যাসের সমন্বয়। এই ডিজাইনগুলো সমানভাবে ইউরোপীয়দের মুগ্ধ করে। রেনেসাঁ যুগ থেকে শুরু করে বারোক, রোকোকো, আধুনিক শিল্প (বিশেষ করে গ্রুটেস্ক) ও স্ট্র্যাপওয়ার্ক সবগুলো শিল্পে সর্পিল কারুকার্যময় নকশার ছাপ দারুণভাবে লক্ষণীয়।

লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি সর্পিল কারুকার্যময় অ্যারাবেস্ক নকশা দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হন এবং জটিল এসব বিন্যাসের পিছনে যথেষ্ট সময় ব্যয় করেন। ইংল্যান্ডের রাজা অষ্টম হেনরির পরিহিত বিখ্যাত গিঁটযুক্ত ডিজাইনের আলখেল্লা, যেটা তার প্রতিকৃতিতে দৃশ্যমান, সেটার পার্শ্বদেশ ও পর্দাতে সর্পিল কারুকার্যময় অ্যারাবেস্ক নকশা দৃশ্যমান। রাফায়েলের মতো ড্যুরারও জ্যামিতিক নকশা ব্যবহার করেছিলেন। ১৭শ

ইরানের ইস্পাহানে অবস্থিত লুতফুল্লাহ মসজিদ। এখানে আরাবেস্ক নকশা ও কুরআনের আয়াতের ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শিত হয়েছে।

শতাব্দির ফরাসি শিল্পী জিন বেরেনের গ্রুটেস্ক ডিজাইনে সর্পিল কারুকার্যময় নকশার উপস্থিতি দৃশ্যমান এবং ১৬শ শতাব্দির ইতালির শিল্পীরা এটাকে *আরাবেসসি* (*arabeschi*) হিসেবে আখ্যায়িত করে।

> "গাণিতিক পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে মুসলিম কারিগরগণ অসীমের ধারণা নিয়ে কী ধরনের অনুসন্ধান চালিয়েছেন, জ্যামিতিক নকশার এমন আশ্চর্যজনক সজ্জা আমাদের সামনে সেটাই তুলে ধরে।"
>
> – *An Islamic History of Europe* শীর্ষক বিবিসি'র প্রামাণ্যচিত্রে গ্রানাডার আল-হামরা সম্পর্কে আলোকপাত করার সময় রাগেহ উমর এ মন্তব্য করেন।

বিংশ শতাব্দির শিল্পীদের মাঝে জ্যামিতি শিল্প দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছেন, তাদের মাঝে ডাচম্যান এম. সি. এশসার অন্যতম। অনন্য ও চমৎকার কিছু শৈল্পিক সৃষ্টি উপহার দেয়ার পাশাপাশি তিনি বিস্তৃত পরিসরে গাণিতিক ধারণার প্রয়োগ ঘটান। মজার ব্যাপার হচ্ছে, আল-হামরা প্রাসাদে ব্যবহৃত টালি নকশা হচ্ছে তার এসব কর্মের উৎস, যেটা তিনি ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে পরিদর্শন করেন। বেশ কিছুদিন ব্যয় করে তিনি এসব নকশা অঙ্কন করেন এবং এ ব্যাপারে তার নিজের মন্তব্য এরূপ: "আমার অর্জিত জিনিসের মাঝে এটা ছিল সর্বাধিক প্রাচুর্যময়।"

সর্পিল কারুকার্যময় নকশাই যে কেবল ইউরোপে প্রবেশ করেছিল, ব্যাপারটি তেমন নয়, বরং মুসলিম বিশ্ব থেকে তৈলচিত্র আমদানির হাত ধরে ১৪শ শতাব্দিতে ইউরোপীয় শিল্পী মহলে এক গুরুত্বপূর্ণ পট পরিবর্তনের সূচনা ঘটে। পূর্বে তারা কাঠের বোর্ডে ডিম, পানি, মধু ও রঙের সংমিশ্রণে তৈরি রঙিন প্রলেপ ব্যবহার করতো। তিসির বীজের দামি তৈলচিত্র ইউরোপীয় চিত্রকর্মে নাটকীয় প্রভাব ফেলে, যেহেতু এটা ফ্লেমিশ (*Flemish*) ও ভেনিসের চিত্রকর্মের রঙের সম্পৃক্তি বাড়িয়ে দেয়।

বা থেকে: [১] ১৫০৯-১৫৪৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত শাসন করা রাজা অষ্টম হেনরির প্রতিকৃতি, যেখানে তার জামার পার্শ্বদেশে ও পর্দাতে ইসলামী গিঁটযুক্ত নকশা দেখা যাচ্ছে; তিনি উসাক তারকা সম্বলিত তুর্কি কার্পেটে দাঁড়িয়ে আছেন। [২] তুরস্কের তোপকাপি প্রাসাদের সিরামিক টাইলসটি ইযনিক অঞ্চলের নীল নকশা প্রদর্শন করছে। [৩] ১৫শ শতাব্দির শেষার্ধ বা ১৬শ শতাব্দির তোপকাপি স্ক্রলে দেয়ালের উপরিতল ও খিলানের জন্য স্বতন্ত্র জ্যামিতিক নকশা রয়েছে, যা পারস্যের এক শ্রেষ্ঠ নির্মাতা সংকলন করেন।

১২ লিপিকার

কী মিসরীয় হাইরোগ্লিফিক কী চীনা বা জাপানি লিপি – শোভাবর্ধক লেখনী হিসেবে এ সবগুলো লিপির রয়েছে বহু ধরন, কিন্তু আরবী ক্যালিগ্রাফি এসব লেখনী থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে বিকশিত হয়েছে। ৭ম শতাব্দিতে ইসলামের বিকাশের পূর্বে ক্যালিগ্রাফির অস্তিত্ব আরবে থাকলেও মুসলিমদের হাতেই এটার উল্লেখ্যযোগ্য সমৃদ্ধি ঘটে। তারা এটাকে শিল্পে ব্যবহার করে, কখনো জ্যামিতিক কখনো প্রাকৃতিক অবয়বের সমন্বয়ে, আবার কখনো এটা রূপ নেয় ইবাদতে, যখন তা ব্যবহৃত হতো কুরআনের আয়াত চিত্রায়নে। যেহেতু কুরআন তার পাঠক ও লিপিকারদের জন্য ঐশ্বরিক পুরস্কারের নিশ্চয়তা দিয়েছে। জ্ঞানের প্রতীক হিসেবে স্বীকৃত কলম-আশ্রিত ক্যালিগ্রাফি শিল্প ছিল আল্লাহকে স্মরণের এক শিল্প।

শৈল্পিক ভঙ্গিতে লেখার এই উদ্দীপনার সাথে আরেকটি চূড়ান্ত উপাদান মিলিত হয়ে ক্যালিগ্রাফির ব্যাপক জনপ্রিয়তায় গতি সঞ্চার করে। আর তা হলো: (আল্লাহর বা কুরআনের) শব্দ, নাম ও বাক্যের সাথে রুহানি শক্তিকে সম্পৃক্ত করা, যেগুলোকে শয়তান থেকে সুরক্ষা লাভের রক্ষাকবচ হিসেবে বিবেচনা করা হতো।

আরবী ক্যালিগ্রাফির ভাষাটি প্রাচীন সেমেটিক ভাষার পরিবারভুক্ত এবং এটা বেশ কিছু লিপির আকারে আবির্ভূত হয়েছে, যার মধ্যে *কুফি* ও *নাসখ্* বিশেষভাবে পরিচিত।

ইরাকের কুফা শহর হতে *কুফি* লিপির উদ্ভব। কুফা শহরের কুফি ধারার লিপিকারগণ কুরআন লেখার এই স্টাইল ব্যবহার করতেন। এই লিপিতে বর্ণগুলো কৌণিক প্রকৃতির হয়ে থাকে।

নাসখ্ লিপি *কুফি* লিপির চেয়ে প্রাচীনতর হলেও আধুনিক আরবী লেখনী ও প্রকাশনার সাথে এটার অনেকটা মিল পরিলক্ষিত হয়। এটা সংযুক্ত, টানা টানা লিপি ও বৃত্তাকার প্রকৃতির এবং এটার বেশ কিছু স্টাইল রয়েছে। ১০ম শতাব্দির একেবারে শুরুর দিকে বিখ্যাত ক্যালিগ্রাফি শিল্পী আবু আলী ইবনে মুকলা জ্যামিতিক নিয়মের ভিত্তিতে লিপির একটা শ্রেণিবিন্যাস উদ্ভাবন করেন। এটা বর্ণ পরিমাপের একটি একক প্রতিষ্ঠা করে, যার সাহায্যে বিভিন্ন বর্ণের মাঝে ভারসাম্য বজায় রাখা সম্ভব হয়। তিনি ছয়টি কৌণিক লিপির হিসেব করেন, যেগুলো *আল-কালাম আস-সিত্তা* হিসেবে পরিচিতি পায়। অটোমানদের দ্বারা বিকশিত *নাসখ্* ক্যালিগ্রাফি *কুফি* স্টাইলের চেয়ে বেশি জনপ্রিয় হয়ে উঠে।

কাগজ প্রচলনের পূর্বে কুরআন নকল করা, পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করা এবং এ জাতীয় কাজের জন্য প্রধান অবলম্বন ছিল চামড়ার পাণ্ডুলিপি ও প্যাপিরাস। চামড়ার পাণ্ডুলিপি টেকসই, দ্যুতিময় ও ব্যয়বহুল হলেও এটার একটি পাশই ব্যবহার উপযোগী। প্যাপিরাস ভঙ্গুর প্রকৃতির এবং সেখানে যা লেখা হতো, তা মুছে ফেলা যেত না, ফলশ্রুতিতে সরকারি নথি

বামে: বিশ্ব নন্দিত তুর্কি ক্যালিগ্রাফি শিল্পী হাসান সেলেবী তার এক শিষ্যকে ক্যালিগ্রাফি অঙ্কনে দিক-নির্দেশনা দিচ্ছেন। ডানে: প্রাচীন কুফি লিপিতে লেখা কুরআনের দুটো আয়াত (সূরা লুকমানের ২১ ও ২২-নং আয়াত); মাঝের বৃত্তটি দুটো আয়াতের মধ্যস্থ বিরতি নির্দেশ করছে।

কাহিনী: *হাই ইবনে ইয়াকযান*-এর রহস্য
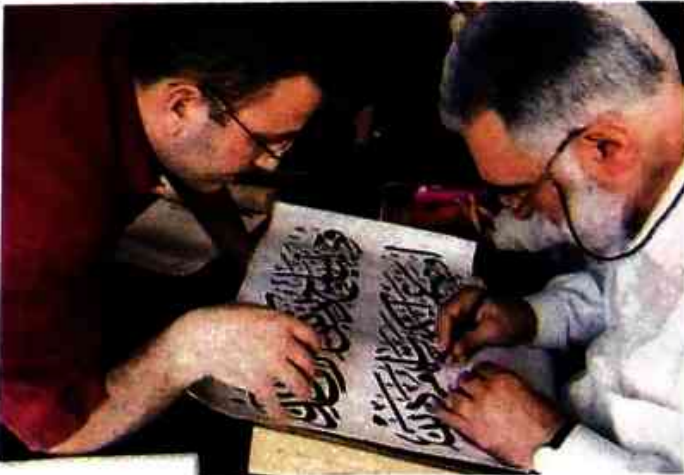
ইবনে তুফায়েলের হাই ইবনে ইয়াকযান অবলম্বনে করিমা সোলবার্গের আঁকা চিত্রকর্ম, যেখানে হাই ইবনে ইয়াকযানকে তার পালক 'মা' হরিণীর সাথে দেখা যাচ্ছে। ১৮শ শতাব্দির ড্যানিয়েল ডেফোর Robinson Crusoe-এর সাথে ১২শ শতাব্দির হাই ইবনে ইয়াকযানের বেশ সাদৃশ্য বিদ্যমান।

১২শ শতাব্দির মুসলিম স্পেনে ইবনে তুফায়েল নামে পরিচিত সহজাত প্রতিভাসম্পন্ন এক দার্শনিক, গণিতবিদ, কবি ও চিকিৎসকের জন্ম হয়। আবু বকর ইবনে আব্দুল মালিক ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে তুফায়েল আল-কায়সী তার পূর্ণ নাম, পশ্চিমে যিনি আবুবাকের নামে পরিচিত। আন্দালুসের আলমোহাদ সাম্রাজ্যের শাসক আবু ইয়াকুব ইউসুফের উপদেষ্টা ও রাজসভার চিকিৎসকের মতো রাজকীয় পদে তিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন। *হাই ইবনে ইয়াকযান* উপন্যাসের জন্য বর্তমানে তিনি সমধিক পরিচিত, যার মূল পাণ্ডুলিপি এখন অক্সফোর্ডের বডলিয়ান লাইব্রেরিতে রয়েছে। এই উপন্যাস একই নামের পূর্ববর্তী আরেকটি উপন্যাস থেকে অনুপ্রাণিত, যা এক শতাব্দি পূর্বের তথা ১১শ শতাব্দির চিকিৎসক-দার্শনিক ইবনে সীনা রচনা করেন এবং তিনিও তার উপন্যাসের নাম রেখেছিলেন *হাই ইবনে ইয়াকযান*। কিন্তু ড্যানিয়েল ডেফো কর্তৃক রচিত *Life and Strange Adventures of Robinson Crusoe* গ্রন্থটি কি এই উপন্যাসকে অবলম্বন করে রচিত?

হাই ইবনে ইয়াকযান-এর অর্থ: 'সদাজাগ্রতের পুত্র, জীবিত' অর্থাৎ এটা 'সদাজাগ্রতের পুত্র জীবিতের গল্প', যেখানে ঘুমন্ত শৈশব থেকে *হাই* চরিত্রটির জ্ঞানের দিকে এগিয়ে যাওয়ার কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। যে জ্ঞান দিয়ে সে দুনিয়া ও তার চারিপাশ সম্পর্কে পূর্ণরূপে চিন্তা করতে সক্ষম হয়।

এক রাজকন্যার শিশু পুত্র হাই-এর মাধ্যমে গল্পটির সূচনা, যার জন্ম গোপন ছিল। তাকে নিরক্ষীয় একটি দ্বীপে ফেলে আসা হয়, যেখানে একটি হরিণী তাকে দুধ পান করায়। এখানে সে তার জীবনের প্রথম ৫০ বছর কোনো মানুষের সাক্ষাত ছাড়াই পার করে। তার এই নির্বাসনকাল সাত বছর করে সাতটি পর্যায়ে অতিবাহিত হয়। সাত বছরের প্রতিটি পর্যায়ে সে নিজেই তার শিক্ষক এবং নিজে নিজে সে তার নিজ ও চারপাশ সম্পর্কে জানতে থাকে।

হাই ইবনে ইয়াকযান-এর প্রথম ইংরেজি অনুবাদ ১৭০৯ খ্রিস্টাব্দে সম্পন্ন হয়। ১১ বছর পরে ড্যানিয়েল ডেফোর বিখ্যাত বইটি প্রকাশিত হয়। ডেফোর সমসাময়িক অনেকে বলেন, জুয়ান ফার্নান্দেস দ্বীপে চার বছরের বেশি সময় কাটিয়ে আসা স্কটল্যান্ডের নাবিক আলেকজান্ডার সেলকার্কের অভিজ্ঞতার আলোকে ডেফো তার গল্প দাঁড় করান। কিন্তু *Robinson Crusoe* ও *হাই ইবনে ইয়াকযান*-এর মধ্যে যে ধরনের সাদৃশ্য বিদ্যমান, তা থেকে এটা সহজেই অনুমেয় যে, ডেফো খুব সম্ভবত মুসলিম এই কীর্তি সম্পর্কে অবগত ছিলেন। দ্বীপে জাহাজের ধ্বংসাবশেষ থেকে একাকী দিনযাপনের নিদারুণ কষ্ট এবং টিকে থাকার সংগ্রাম থেকে শুরু করে বহু বিষয়েই *Robinson Crusoe* ও *হাই ইবনে ইয়াকযান*-এর মধ্যে ব্যাপক সাদৃশ্য দৃশ্যমান।

সংরক্ষণে এটা বিশেষভাবে ব্যবহৃত হতো। উভয়টি বেশ দামী হওয়ায় যখন এদের সস্তা বিকল্প হিসেবে ৮ম শতাব্দির শেষভাগে চীন থেকে কাগজ উৎপাদনের কলা-কৌশল আয়ত্ত করে মুসলিমরা ব্যাপক হারে কাগজ উৎপাদন শুরু করে, তখন লেখার শিল্প এক নয়া যৌবন লাভ করে।

মুসলিম ও ইউরোপীয় রাজসভার সদস্যদের মধ্যে উপহার আদান-প্রদানের পথ ধরে ইউরোপ আরবী ক্যালিগ্রাফির সংস্পর্শে আসে। প্রথম দিকে, ইউরোপীয়রা আরবী ক্যালিগ্রাফিতে কী লেখা আছে, তা না জেনেই সেটার অনুকরণ করতো। ৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে মিশরে নির্মিত ইবনে তুলুন মসজিদের *কুফি* লিপিতে অঙ্কিত শিলালিপি প্রথমত ফ্রান্সের গথিক শিল্পে নতুনভাবে বানানো হয় এবং এরপর ইউরোপের অন্যান্য অংশে তা ছড়িয়ে পড়ে। দক্ষ ভাস্কর গ্যান ফ্রিদাসের করা ফ্রান্সের ল্য পুইয়ে অবস্থিত ক্যাসিড্রাল বা প্রধান গির্জার বারান্দাস্থ খ্রিস্টীয় ভজনালয়ের খোদাই করা কাঠের দরজা এবং ল্য পুইয়ের নিকটস্থ ল্য ভ্যট চিলাকের গির্জার খোদাই করা দরজা – এমন কীর্তিগুলোও যে ইবনে তুলুন মসজিদের

অনুকরণে করা, এমনটি বিবেচনা করা হয়। ইতালির আমালফির যেসব বণিক কায়রো ভ্রমণ করেছে, ধারণা করা হয় যে, ইউরোপে এসব ডিজাইনের অনুপ্রবেশের পিছনে এসব বণিকই দায়ী। যেহেতু তাদের সাথে কায়রোর ফাতিমী সাম্রাজ্যের বিশেষ সম্পর্ক ছিল।

> "পড় – তোমার প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। যিনি মানুষকে রক্তপিণ্ড থেকে সৃষ্টি করেছেন। পড় – এবং তোমার প্রতিপালক দয়ালু। যিনি কলমের সাহায্যে মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন। শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে, যা সে জানতো না।" – কুরআন (৯৬:১-৫)

Legacy of Islam গ্রন্থে প্রফেসর টমাস আরনল্ড বলেন, আয়ারল্যান্ডে ৯ম শতাব্দির একটি ক্রুশ পাওয়া যায়, যেখানে কুফি ক্যালিগ্রাফিতে *বাসমালাহ* (*বিসমিল্লাহি* – বাক্যের সংক্ষিপ্ত রূপ) বা 'আল্লাহর নামে শুরু করছি' বাক্যটি খোদাই করা ছিল। শিল্পকলার অন্যান্য শাখা বিশেষভাবে চিত্রাঙ্কনে স্টাইলের জন্য কুফি লিপি যোগ করা হতো। লোকেরা ক্যালিগ্রাফির দিকে ঝুকে পড়ে। এমনকি ইতালীয় রেনেসাঁর চিত্রকর জেনটাইল দ্য ফ্যাব্রিয়ানো তার "*Adoration of the Magi*" চিত্রকর্মে জামার কিনারার শোভাবর্ধনে ক্যালিগ্রাফি ব্যবহার করেন। যেমনটি আমরা আজ জানি যে, কলমের পূর্বে *কালাম* বা নলখাগড়ার কলমসহ লেখার বিভিন্ন ধরনের সামগ্রী ছিল। বিপুল চাহিদাসম্পন্ন নলখাগড়াগুলো আরব উপসাগরের উপকূলীয় এলাকাগুলোতে আসতো এবং এগুলো তৎকালীন সময়ে দারুণ মূল্যবান বাণিজ্যিক পণ্য ছিল। এগুলোর দৈর্ঘ্য ২৪ থেকে ৩০ সেন্টিমিটারের (৯.৫ ও ১১.৮ ইঞ্চির) মাঝে ছিল এবং সাধারণভাবে এগুলোর ব্যাসের পরিমাপ এক সেন্টিমিটার (০.৪ ইঞ্চি) হতো। প্রতিটি লিপির স্টাইলের জন্য নির্দিষ্ট কোণে কাটা ভিন্ন ভিন্ন নলখাগড়ার প্রয়োজন হতো।

কালো ও ঘন বাদামি কালি প্রায়শ ব্যবহৃত হলেও বিভিন্ন ধরন ও রঙের কালি ছিল, যেগুলোর প্রতিটির তীব্রতা ও ঘনত্ব সম্পূর্ণ আলাদা। ক্যালিগ্রাফি শিল্পীগণ সাধারণত নিজেরাই তাদের কালি তৈরি করতো এবং কখনো কখনো কালি তৈরির এসব রেসিপি তারা সযত্নে গোপন রাখতো। নীল চামড়ার লেখনী বস্তু, প্রচ্ছদ পাতা, চিত্র এবং শিরোনাম পাতাতে রুপা ও স্বর্ণের কালি ব্যবহৃত হতো। লাল, সাদা ও নীল কালিগুলো মাঝে মাঝে রঙিন শিরোনামে ব্যবহৃত হতো। কালি শুকানোর জন্য ক্যালিগ্রাফি শিল্পীগণ কালি পাত্র, পালিশ করা পাথর ও বালুকে বাড়তি সরঞ্জাম হিসেবে ব্যবহার করতেন।

কলম তৈরীর কাহিনী

৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে মিশরের সুলতান আল-মুয়িজ্জের বিশিষ্ট সাংবাদিক, অন্তরঙ্গ বন্ধু ও সহচর "*কিতাবু মাজালিস ওয়াল মাসায়ারাত*" (শ্রোতা ও সম্মেলন বিষয়ক পুস্তক) রচনা করেন। রাজার অন্তরঙ্গ এই সহচরের পুরো নাম কাযী আবু হানিফা আন-নুমান ইবনে মুহাম্মদ। তার রচিত এই গ্রন্থে তিনি ঝরনা-কলম তৈরির জন্য আল-মুয়িজ্জের নির্দেশ প্রদানের ঘটনাটি তুলে ধরেন:

"আমরা এমন একটি কলম তৈরি করতে চাই, যেটা কোনো দোয়াতের সাহায্য ছাড়াই লিখে যাবে এবং যার কালি তার ভিতরেই মজুদ থাকবে। কলমটি কেবল কালি দিয়ে পূর্ণ করা হবে এবং তা দিয়ে যে কেউ তার ইচ্ছে মতো লিখতে পারবে। লেখক তার জামার আস্তিন বা তার ইচ্ছে মতো জায়গায় এটাকে রাখতে পারবে এবং এটা থেকে কোনো দাগ হবে না, আর না এটা থেকে কালির বিন্দু বেরিয়ে আসবে। লিখতে চাইলেই কেবল কালি বেরুবে। (এমন ধরনের কলম) পূর্বে কেউ কখনো বানিয়েছে, এ ব্যাপারে আমাদের কাছে কোনো তথ্য নেই। যে বিষয়টির প্রকৃত তাৎপর্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে চিন্তা করবে, সে এর পিছনের প্রজ্ঞাকে উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে। আমি বললাম, 'এটাও কি সম্ভব?' জবাবে তিনি বললেন, "আল্লাহ চাইলে এটা সম্ভব।"

এই ঘটনার কিছুদিন পর একজন কারিগর একটি কলম নিয়ে আসেন, কালি পূর্ণ থাকা অবস্থায় যা দিয়ে লেখা যায়। তিনি কলমটি উল্টে দিতেন, এক পাশ থেকে আরেক পাশে কাত করতেন, কিন্তু তা থেকে কালি বের হতো না। লেখা ছাড়া কলমটি কালি নিঃসরণ করতো না এবং এটা হাত বা জামাতে কোনো দাগ ফেলতো না। সবশেষে, এটার জন্য কালির পাত্র লাগতো না, যেহেতু এটার ভেতরেই কালির পাত্র আড়াল হয়ে আছে।

তোপকাপি প্রাসাদের দক্ষ ধাতুর প্রলেপক মেমুর ওস্ত কর্তৃক জালি
দিওয়ানী রীতিতে কুরআনের সূরা আলাকের ধাতুর প্রলেপন।

১৩ কথাশক্তি

বর্ণমালার এ তালিকাটি মূলত অল্প কিছু শব্দের নমুনা, যেগুলো মুসলিম সভ্যতা থেকে এসেছে এবং ইংরেজি ভাষায় তাদের আসল অর্থ বজায় রেখে আসন গেড়েছে। এটা ছোট একটি নির্বাচিত তালিকা। প্রকৃত তালিকা তো হাজার ছাড়িয়ে যাবে।

দিয়ে এডমিরাল (*admiral*), যা আমীর আল- ' ... সেনাপতি' শব্দ থেকে উদ্ভূত, যেমনঃ আমীর আল-বাহর (أمير البحر) অর্থাৎ 'সমুদ্রের সেনাপতি'। ইউরোপীয়রা যখন *আমীর আল-* শব্দটি গ্রহণ করে, তখন তারা এর সামনে নিজেদের লাতিন উপসর্গ এড- (*ad-*) সংযুক্ত করে এডমিরাল (*admiral*) তৈরি করে। পুরাতন ফ্রেঞ্চ ভাষা হয়ে এটা যখন ইংরেজিতে প্রবেশ করে, তখনও এটার অর্থ 'সেনাপতি' ছিল। ইংল্যান্ডের রাজা অষ্টম এডওয়ার্ডের সময় হতে এর সাথে নৌযুদ্ধের প্রগাঢ় সম্পর্ক জুড়তে শুরু করে। A দিয়ে আরেকটি শব্দ আর্সেনাল (*arsenal*), যা দার আস-সিনা'আ (دار الصناعة) হতে এসেছে, যার অর্থঃ 'কারখানা / ইন্ডাস্ট্রি', যেমনঃ ফ্যাক্টরি। এই শব্দ ভেনেসীয় ইতালিতে ধার করা হয় এবং প্রথম অক্ষর 'd' উচ্চারিত না হওয়ায় শব্দটি আরযানা-তে (*arzana*) পরিণত হয়। এই শব্দ ভেনিসে বড় নৌ-ডকইয়ার্ড (জাহাজ নির্মাণ ও মেরামত কারখানা) বোঝাতে ব্যবহৃত হতো। আজকের দিনেও ডকইয়ার্ড শব্দটি আরযিনাল (*Arzenale*) হিসেবে পরিচিত। হয় ইতালীয় বা ফরাসি আরযিনাল (*Arzenale*) থেকে এই শব্দ ইংরেজিতে প্রবেশ করেছে এবং শব্দটিকে কেবল ডকইয়ার্ড বোঝাতেই ব্যবহৃত হয়। ১৬শ শতাব্দির শেষার্ধে শব্দটির সাধারণ মর্ম 'গোলা-বারুদের গুদাম' (*ammunition storehouse*) হিসেবে প্রচলিত হতে শুরু করে।

B দিয়ে বারবিকান (*barbican*) এসেছে আরবী 'বাব আল-বাকারা' (بَاب البَقَارة) হতে, যার অর্থঃ ছিদ্রযুক্ত ফটক বা গেট।

দিয়ে ক্রিমসন (*crimson*) এসেছে কিরমিযি (قرمزي) হতে, যা কিরমিযের সাথে সম্পৃক্ত। C দিয়ে আরেকটি শব্দ ক্যাভিয়ার (*caviar*), যা সম্ভবত 'ডিম রয়েছে' অর্থবিশিষ্ট ফারসি কায়া-দার থেকে উদ্ভূত, কিংবা 'শক্তি বা বল সমৃদ্ধ কেক বা পিঠা' / 'প্রেমিকদের রুটি' অর্থ সম্বলিত চাভ-যার থেকে উদ্ভূত। এ ধরনের নাম এটার সুবিদিত কাম-উদ্দীপক বৈশিষ্ট্যের ইঙ্গিত বহন করে। অন্যদের মতে এটা তুর্কি হাভয়ার থেকে এসেছে, যার অর্থঃ 'মাছের ডিম।

দিয়ে ড্রাগোম্যান (*dragoman*), যেসব দেশে আরবী, তুর্কি বা ফারসি ভাষা প্রচলিত, সেখানের দোভাষী বা টুরিস্ট গাইডদের বোঝাতে শব্দটি ব্যবহৃত হয়। শব্দটি আরবী তারজুমান এবং তারজামা [ترجم] (ব্যাখ্যা করা) ক্রিয়া থেকে উদ্ভূত।

দিয়ে এল-সিড (*El-Cid*), যা ১২শ শতাব্দির স্পেনের মহাকাব্যিক কবিতার এক নায়কের জন্য ব্যবহৃত হয় এবং শব্দটি 'মহামান্য' অর্থবিশিষ্ট আরবী আল-সাইয়্যেদ (السَّيد) হতে উদ্ভূত।

দিয়ে ফোমালহুট (*Fomalhaut*), যা পৃথিবী থেকে ২৪ আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত পাইসিস অস্ট্রিনাস (*Piscis Austrinus – বাংলায় যার অর্থ দক্ষিণ মৎস*) নামক নক্ষত্রপুঞ্জের অন্তর্গত একটি তারকা। এই শব্দ আরবী 'ফাম আল-হুত' (فَمُ الحُوت) শব্দ থেকে আগত, যার অর্থ 'মাছের মুখ'।

দিয়ে গুল (*ghoul*), যা আরবী গুল (غول) থেকে উদ্ভূত এবং এর অর্থ: অপদেবতা। G দিয়ে জিরাফ (*giraffe*)-ও হয়, যা আরবী যারাফা থেকে এসেছে।

দিয়ে হ্যাযার্ড (*hazard*), যা আরবী নারদ (نَرْدٌ) হতে উদ্ভূত এবং এর অর্থ: 'পাশা খেলা'।

দিয়ে ইযার (*Izar*), যা এন্ড্রোমিডা (*Andromeda*) নক্ষত্রপুঞ্জের একটি তারকা। এটা আরবী আল-ইযার (الإزار) থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ: 'আবরণ বা পর্দা'।

দিয়ে জার (*jar*), যা আরবী জার্‌রাহ (جَرَّة) থেকে উৎসারিত এবং এটা বৃহৎ মাটির পাত্র বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। J দিয়ে আরেকটি শব্দ জেসমিন (*jasmine*), যা ফারসি ইয়াসমিন থেকে এসেছে।

দিয়ে কোহল (*kohl*), যা আরবী কুহল (كحل) থেকে উদ্ভূত এবং যা মিহি গুঁড়া বা সচরাচর সুরমা বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। এটা চোখের সজ্জাকরণ বা আইলাইনার (চোখের রেখাকে গাঢ় করার তুলি) হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

দিয়ে লাইলাক (*lilac*), যা আরবী লাইলাক (ليلك) হতে এসেছে এবং এই শব্দ আবার ফারসি নিলাক থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ: নীল। L দিয়ে আরেকটি শব্দ লেমন (*lemon*), যা ফারসি লিমুন থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ: লেবু।

দিয়ে মাফিয়া (*mafia*), যা 'অহমিকা' বা 'চটকদার' অর্থবিশিষ্ট আরবী মুবাহা (مُبَاهَاةٌ) থেকে আগত। সিসিলিতে লক্ষণীয়ভাবে অলংকৃত ও অভিব্যক্তিশীল বাচ্চা মেরাগ বোঝাতে মাফিয়োসো (*Mafioso*) শব্দটি ব্যবহৃত হয়। M দিয়ে ম্যাট্রেস (*mattress*)-ও হয়, যা প্রাচীন ফরাসি শব্দ ম্যাটারাস (*matelas*) থেকে নেয়া এবং এই ফরাসি শব্দ আরবী মাতরাহ (مطرح : যেখানে কোনোকিছু ছুড়ে ফেলা হয়) এবং তারাহা (طرح : নিক্ষেপ করা/ ছুড়া) থেকে উদ্ভূত।

দিয়ে নাদির (*nadir*), যা অধোবিন্দু বা ভূপৃষ্ঠে দণ্ডায়মান ব্যক্তির পায়ের সোজা নীচে ভূগোলকের অপর পৃষ্ঠের উপরিস্থিত আকাশবিন্দু। এটা আরবী নাদির আস-সামত্ থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ: 'সর্বনিম্ন বিন্দু'।

দিয়ে অরেঞ্জ (*orange*), যা ফারসি নারাঞ্জ অথবা নারাঙ্গ শব্দ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ: কমলা।

দিয়ে ফারকাদ (*Pherkad*), উরসা মাইনর নক্ষত্রপুঞ্জের একটি তারকা, যা আরবী আল-ফারকাদ (الفرقد) থেকে এসেছে এবং এর অর্থ: বাছুর।

দিয়ে কানুন (*qanun*) – এক প্রকারের বাদ্যযন্ত্র। এটা হার্প (বীণাজাতীয় বাদ্যযন্ত্র) এবং যিথার (বহুতারের বাদ্যযন্ত্রের) পূর্বপুরুষ, যা ১০ম শতাব্দিতে আল-ফারাবী প্রবর্তন করেন। রোমান আমলে এটা স্বতন্ত্র বাদ্যযন্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হতো।

দিয়ে দাবার গুটি রুক (*rook*), যা ফারসি রুখ থেকে এসেছে।

দিয়ে সোফা (*sofa*), প্রাচীনকাল থেকে বিদ্যমান এক আরবীয় শাসকের গদি বোঝানোর জন্য শব্দটি ব্যবহৃত হতো। এটার প্রকৃত উৎস সুফ্ফাহ, যার অর্থ: লম্বা আসন বা দিওয়ান (রাজসভা)। S দিয়ে সুগার (*sugar*), যা আরবী সুক্কার (سُكَّر) থেকে আগত এবং এর অর্থ: চিনি। সো লং (*so long* – বিদায়) এসেছে বিদায় অভিবাদন হিসেবে ব্যবহৃত সালাম শব্দ থেকে, যার অর্থ: শান্তি।

দিয়ে ট্যাবি (*tabby*), যার অর্থ: স্ট্রাইপ বা ডোরাকাটা বিন্যাসের রেশমি জামা। এই শব্দ ১৬৩৮ খ্রিস্টাব্দে ফরাসি শব্দ থেকে ধার করা হয়। ফরাসিরা তাবিস (*tabis*) শব্দটি ব্যবহার করতো, যা আরবী আত্তাবি (عتّابي) থেকে এসেছে এবং এর অর্থ: 'আত্তাবিয়া অঞ্চলে প্রস্তুতকৃত'। আত্তাবিয়া বাগদাদের একটি শহর। ১৬৯৫ খ্রিস্টাব্দের দিকে ট্যাবি ক্যাট (*tabby cat*) বাগধারাটি ব্যবহৃত হতে শুরু করে এবং 'ডোরাকাটা বিড়াল' বোঝাতে বিশেষ্য হিসেবে ট্যাবি শব্দের প্রচলন ১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দের দিকে হয়। T দিয়ে ট্যালকম পাউডার (*talcum powder*)-ও হয়, যা আরবী আত-তালক্ব (الطلق) থেকে লাতিন টালকুম (*talcum*) হয়ে ইংরেজিতে প্রবেশ করে। ট্যালক (*talc*) হিসেবে মধ্যযুগীয় লাতিনে ১৩১৭ খ্রিস্টাব্দের দিকে সর্বপ্রথম এই শব্দের ব্যবহার হয় এবং ১৫৮২ খ্রিস্টাব্দে স্পেনে ট্যালকো (*Talco*) এবং ফ্রান্সে ট্যাল্ক (*talc*) হিসেবে শব্দটির ব্যবহার ঘটে। জার্মানিতে এটার রূপ টালকুম (*Talkum*)।

দিয়ে উনুকালহাই (*Unukalhai*), এটা সার্পেন্ট (*Serpent* – সাপ) নামক নক্ষত্রপুঞ্জের একটি তারকা, যা আরবী উনুক আল-হাইয়্যা (عنق الحية) থেকে উদ্ভূত এবং এর অর্থ: 'সাপের গলা'।

দিয়ে ভিযিয়ার (*vizier*), এর অর্থ: 'দারোয়ান, সরকারি কর্মচারী', যা আরবী ক্রিয়া ওয়াযারা (وَزَرَ – তামিল করা/পালন করা) থেকে উদ্ভূত। V দিয়ে আরেকটি শব্দ ভিগা (*Vega*), যা লাইরা (*Lyra* – বীণামণ্ডল) নক্ষত্রপুঞ্জের সবচেয়ে উজ্জ্বল তারকা, এবং এটা আরবী 'আন-নিসর আল-ওয়াকি' (النسر الواقع) থেকে এসেছে এবং এর অর্থ: 'পতনশীল শকুন'।

দিয়ে ওয়াদি (*wadi*), উপত্যকা অথবা বর্ষাকাল ছাড়া শুকনো থাকে এমন গিরিখাত। শব্দটি আরবী ওয়াদি (وادي) থেকে এসেছে, যার অর্থ: 'উপত্যকা'।

বীজগণিতে ব্যবহৃত হয়, সাধারণত 'কোনো অজানা জিনিস' বোঝাতে। এটা এক আরবীয় উদ্ভাবন, যা গাণিতিক সমস্যা সমাধানে ব্যবহৃত হয়।

দিয়ে ইয়োগার্ট (*yoghurt*)। আসল তুর্কি শব্দটি ছিল ইয়োগুরুত (*yogurut*), কিন্তু ১১শ শতাব্দির দিকে শব্দটি ইয়োগার্টে পরিণত হয়। তুর্কি উচ্চারণে জি (g) শব্দটি হালকা হলেও ইংরেজি উচ্চারণে তা বেশ ভারী। তুর্কিতে ইয়োগ (*yog*) সাধারণত 'ঘন করা' বোঝাতে ব্যবহৃত হয় এবং ইয়োগুর (*yogur*) শব্দ 'ময়দা ইত্যাদি পিষে এবং হাতে ঠেসে তাল বানানো' বোঝাতে ব্যবহৃত হয়।

দিয়ে যেনিথ (*zenith*), সর্বোচ্চ বিন্দু বা চূড়া, যা প্রাচীন স্পেনীয় শব্দ যেনিট (*zenit*) থেকে এসেছে। প্রাচীন স্পেনীয় শব্দটি আরবী সামত্ (سمت) হতে আগত, যার অর্থ: 'পথ বা রাস্তা'। আরবী পরিভাষা সামত্ আর-রাস (سمت الرأس)-এর অর্থ: 'মাথার উপরে থাকা পথ' অথবা একজন ব্যক্তির সোজা উপরের বিন্দু।

চতুর্থ অধ্যায়

"কোনো বস্তু (সম্পর্কে) সবকিছু স্পষ্ট না করে তা বিক্রি করা যেমন বৈধ নয়, তেমনি বৈধ নয় (ওই বস্তুর খুঁত) সম্পর্কে জানা সত্ত্বেও তা প্রকাশ থেকে বিরত থাকা।"

– নবী মুহাম্মদ (ﷺ), আল-হাকিম ও আল-বায়হাকি সূত্রে বর্ণিত

বাজার

কৃষি বিপ্লব • কৃষি ম্যানুয়েল • পানি ব্যবস্থাপনা • পানি সরবরাহ বাঁধ • বায়ুকল (উইন্ডমিল) • বাণিজ্য • বস্ত্রশিল্প (টেক্সটাইল) কাগজ • মৃৎশিল্প • কাচশিল্প • অলংকার • মুদ্রা

পণ্য বিনিময়, স্বর্ণ, কাগুজে মুদ্রা বা ডিজিটাল লেনদেন যাই হোক না কেন, মানুষ বহু সহস্রাব্দ ধরে এসবের মাধ্যমে লেনদেন ও পণ্য সংগ্রহ করে আসছে। ১২০০ বছর যাবৎ ইসলামী বিশ্ব জ্ঞান, প্রভাব ও উদ্ভাবনের পাওয়ার হাউজ ছিল, যার পিছনে চালিকাশক্তি হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে তিন মহাদেশ জুড়ে লেনদেনে জড়িত সুবিশাল অর্থনীতি। উদ্যোগী মুসলিমগণ দ্রুত হারে পণ্য উৎপাদন করতে থাকে এবং টেক্সটাইল থেকে রাসায়নিক শিল্পসহ বহু ইন্ডাস্ট্রিতে তারা প্রযুক্তিগত ব্যাপক উন্নতির স্বাক্ষর রাখে। এখান থেকে সহজেই অনুমেয় হয় যে, বিপুল সংখ্যক মানুষ এসব বিকাশমান ক্ষেত্রে কর্মরত ছিল।

গবেষণা-নির্ভর কৃষিজ পদ্ধতি, উন্নত সেচ ব্যবস্থা এবং ভূমি মালিকানা অধিকার – এসব নির্দেশ করছে যে, ওই সময় মানুষের জীবনযাত্রার মান বেশ উন্নত ছিল, যেহেতু পর্যাপ্ত পরিমাণ খাবারের জোগান তাদের ছিল। খামারশিল্পে উদ্ভাবন কুশলের মাঝে ছিল: কবুতরের বিষ্ঠা দ্বারা মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি। এই প্রচলন ইরানে ব্যাপক সমৃদ্ধি লাভ করে, সেখানে পাখিদের বসবাসের জন্য মাঠের চারপাশে ১৮ থেকে ২১ মিটার উঁচু টাওয়ার ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসানো হতো। এসব রীতি ও জ্ঞান যখন পশ্চিমে ধীরে ধীরে পৌঁছাতে শুরু করে, তখন এসবের সাথে সাথে টঙ্কন (মুদ্রা প্রস্তুত কারখানা), চেক এবং কাগজও সেখানে প্রবেশ করে; অন্যদিকে কায়রোর মতো প্রাণবন্ত শহরগুলোর কর্মচাঞ্চল্যে দুনিয়ার ধনভাণ্ডার পুনঃপ্রত্যাবর্তিত হতো। এই বিভাগে আপনি বাণিজ্যের স্তরগুলোর আবরণ খুলে এটা আবিষ্কার করবেন যে, ওই সময়ের বাজার ব্যবস্থা আমাদের আজকের দিনের চেয়ে খুব একটা ভিন্ন ছিল না।

উল্টো পৃষ্ঠার চিত্র: ১৩শ শতাব্দির এই চিত্রে মুসলিম নারী ও পুরুষদের বস্ত্র, সিরামিক ও কাচ বেচা-কেনার দৃশ্য চিত্রায়িত হয়েছে।

০১ কৃষি বিপ্লব

এক হাজার বছর আগে খাদ্যের উৎসের সাথে আমাদের যেরূপ সম্পর্ক ছিল, আজ আর তেমনটি নেই, বরং আজকের দিনে আমরা বলতে গেলে খাদ্যের উৎস থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন। আমাদের খুব কম লোকই জমিতে কাজ করে কিংবা নিজেরা পশুপাখি পালন করে। আমরা স্থানীয় দোকান বা সুপারমার্কেটে যাই এবং বিশ্বের বিভিন্ন স্থান থেকে আগত পণ্য আমাদের আনন্দিত করে। আমরা সেখানে পাকিস্তানি আম, আমেরিকান স্ট্রবেরি, হল্যান্ডের মাশরুম, নিউজিল্যান্ডের ভেড়ার মাংস এবং আর্জেন্টিনা থেকে আসা গরুর মাংসের স্বাদ নিতে পারি। এখন আর গ্রীষ্মের আপেল কিংবা ভিনেগারে সংরক্ষিত শীতকালীন সবজির জন্য আমাদের আর অপেক্ষা করতে হয় না, বরং আমাদেরকে কেবল সুপারমার্কেটের এক তাক থেকে আরেক তাকে যেতে হয়। স্থানীয় মৌসুম ও জলবায়ুর সাথে সম্পর্কহীন বৈশ্বিক খাবারের এই ধারণা মোটেও নতুন নয়। বরং এখানে নতুন হচ্ছে: বর্তমানের অধিকাংশ খাদ্যই আমদানী নির্ভর এবং সেগুলো স্থানীয় খামার বা ক্ষেতে উৎপাদিত নয়।

৯ম শতাব্দিতে মুসলিম কৃষকেরা একের পর এক উদ্ভাবনের নজির স্থাপন করে যাচ্ছিল; তারা বিশ্বের আনাচ-কানাচ থেকে নতুন নতুন শস্য নিয়ে আসার পাশাপাশি নিবিড় সেচ ব্যবস্থার বিকাশে অপ্রতিদ্বন্দ্বি ভূমিকায় সমুজ্জ্বল ছিল। স্থানীয় পরিবেশে তারা বৈশ্বিক জ্ঞানের প্রয়োগ ঘটায়, অন্যদিকে বিস্তৃতি ঘটায় বাস্তবসম্মত চাষাবাদের, যেখানে একক ভূমি মালিকানা ব্যবস্থাও অন্তর্ভুক্ত ছিল। এসবের মানে দাঁড়াচ্ছে: তাদের খাদ্যের যোগানে ব্যাপক বৈচিত্র ছিল, পূর্বে যা অসম্ভব ছিল।

■ বৈশ্বিক জ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি

পর্যটক ও ভ্রমণ পিপাসুতে ঠাসা সভ্যতা হওয়ার সুবাদে মুসলিমরা জ্ঞান ও তথ্যের জন্য তৎকালীন জানা পৃথিবী চষে বেড়িয়েছে। এশিয়ার শুষ্ক প্রান্তরের ন্যায় রুক্ষ ও কঠিনতর পরিবেশ থেকে পিরিনীয় পর্বতমালা পর্যন্ত ভ্রমণ – এভাবে তারা তাদের চাক্ষুষ অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের সাহায্যে তৈরি করে সুবিশাল কৃষি ম্যানুয়েল (সহায়ক পুস্তিকা)। এগুলো ছিল "অতীত ও বর্তমান, নিকট প্রাচ্য ও পশ্চিম এবং আন্দালুসের বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের এক চমৎকার সাংস্কৃতিক মহামিলন", যেমনটি ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে মার্কিন ঐতিহাসিক এস পি স্কটের ভাষ্যে ফুটে উঠেছে।

টরেন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এনড্রু ওয়াটসন বলেন, মুসলিম বিশ্ব "তিন বা চার শতাব্দি ধরে এক বৃহৎ ঐক্যবদ্ধ ভৌগোলিক এলাকা হিসেবে টিকে ছিল ... (মুসলিম সভ্যতা) নতুন সবকিছু লুফে নিতে আশ্চর্যজনকভাবে প্রস্তুত ছিল। এমনকি এই সভ্যতা নতুনত্বের বিস্তৃতিতেও দারুণভাবে সক্ষম ছিল ... আচার-আচরণ, সামাজিক গঠন, প্রতিষ্ঠান, অবকাঠামো, বৈজ্ঞানিক সমৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক উৎকর্ষ সব ক্ষেত্রেই তারা তাদের ভূমিকা একসাথে আদায় করেছিল ... কেবল কৃষিক্ষেত্রেই নয় বরং অর্থনীতির অন্যান্য ক্ষেত্র এবং একইসাথে অর্থনীতি বহির্ভূত জীবনের বহু ক্ষেত্রই নতুনকে গ্রহণ ও সেটাকে ছড়িয়ে দেয়ার সক্ষমতা দ্বারা দারুণভাবে আচ্ছন্ন ছিল।"

ভারত থেকে আগত তুলা সিসিলি ও আন্দালুসে প্রধান শস্য হিসেবে প্রচলিত হয়।

বৈচিত্রময় ভৌগোলিক এলাকা থেকে আহরিত জ্ঞানের এই বিশাল সম্ভার দিয়ে মুসলিমরা সুন্দরতম ঘোড়া ও ভেড়া লালন-পালন থেকে শুরু করে সর্বাধুনিক ফল ও সবজির বাগান চাষাবাদেও দারুণভাবে সফল ছিল। উপযুক্ত কীটনাশক ব্যবহার করে কীভাবে কীট-পতঙ্গের মুকাবিলা করতে হয়, তা তাদের জানা ছিল এবং গাছের গ্রাফটিং (গাছকলম প্রক্রিয়া) এবং চারার সংকরায়নের মাধ্যমে নতুন প্রজাতি সৃষ্টিতে তারা ছিল নিখুঁত কারিগর।

আজকের দিনে স্থানীয় দোকান ও বাজারগুলোতে গোটা বিশ্ব থেকে আগত তাজা ও সতেজ খাদ্য অনায়াসে পাওয়া যায়।

■ **নতুন শস্য বা ফসল**

প্রাচীন ভূ-মধ্যসাগর তীরবর্তী বিশ্বে প্রধানত শীতকালীন ফসলের চাষ হতো এবং প্রতি দু'বছরে একটি জমি থেকে কেবল একটি ফসল পাওয়া যেত। আন্দালুসের মুসলিমদের দ্বারা পালাক্রমিক ফসল চাষাবাদ পদ্ধতি প্রবর্তন এবং সেইসাথে বিশ্বের আনাচে-কানাচে বিশেষ করে ভারত থেকে নতুন ফসল নিয়ে আসার আগ পর্যন্ত সেখানে এই অবস্থা বিরাজ করছিল। বহু ফলনের জন্য প্রয়োজন ছিল উষ্ণ আবহাওয়ার – যা গ্রীষ্মের দীর্ঘায়িত দিনের আলো থেকে পাওয়া যেত, কিন্তু স্পেনের শুষ্ক মৌসুমে খুবই সামান্য বৃষ্টি হতো। মুসলিম সেচ ব্যবস্থা প্রচলনের বদৌলতে এখন সেখানে প্রতি বছর অসংখ্য শস্যের চারটি ফলন পাওয়া সম্ভবপর হয়েছে।

কলার মতো প্রায়-গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ফসল এবং নতুন শস্যগুলো উপকূলীয় এলাকাতে উৎপাদিত হতো। নতুন শস্যগুলোর মাঝে ধান, বাতাবি লেবু, পীচফল, বরই, রেশম, খোবানি (এপ্রিকট), তুলা, আর্টিচোক, বেগুন, জাফরান ও আখ উল্লেখযোগ্য। মুসলিমরা স্পেনে আখের প্রচলন ঘটায়, যেটা সেখানে ব্যাপক প্রভাব ফেলে এবং এর পাশাপাশি তারা এটাকে ইথিওপিয়া ও জানজিবারে নিয়ে যায়, যে অঞ্চলগুলো এখন উন্নত মানের চিনি উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত।

> "গাছের একটি চারা রোপণও পুণ্যের কাজ, এমনকি ওই দিনে দুনিয়া ধ্বংস হলেও।"
>
> – নবী মুহাম্মদ (ﷺ), বুখারি ও মুসনাদ আহমাদ সূত্রে বর্ণিত

রেশম শিল্প দারুণভাবে সমৃদ্ধ হয়, শণ গাছের চাষাবাদ শুরু হয় এবং শণের তৈরি কাপড় রপ্তানি হতে থাকে। স্পেনের বৃষ্টিপাতহীন শুষ্ক বনে অধিক হারে জন্মানো এস্পার্টো ঘাস সংগ্রহ করে সেগুলো থেকে ঝুড়ি এবং মেঝে ঢাকার উপকরণ প্রস্তুত করা হতো।

১০ম শতাব্দির মুসলিম পর্যটক ও ঐতিহাসিক আল-মাসউদী কমলা ও সিট্রন (লেবু জাতীয় ফলের) প্রচলনের ব্যাপারে লিখেন, "কমলা গাছ (*শাজার আন-নারাঞ্জ*) ও সিট্রন গাছ (*আল-উতরুয আল-মুদাওয়্যার*) আনুমানিক ৩০০ হিজরী [৯১২ খ্রিস্টাব্দের] দিকে ভারত থেকে আনা হয় এবং ওমানে প্রথম চাষ করা হয়। এখান থেকে সেগুলো বসরা হয়ে ইরাক ও সিরিয়াতে প্রবেশ করে। খুব অল্প সময়ের মধ্যে এই ফলগুলো তারতুস ও অন্যান্য সীমান্তবর্তী সিরীয় এলাকা ও উপকূলীয় শহরের মানুষদের বাড়িতে বাড়িতে পৌঁছে যায়। এই গাছগুলো রাতারাতি এন্টিয়ক, ফিলিস্তিন ও মিশরে ছড়িয়ে পড়ে, যেখানে কিছুকাল আগেও এগুলো অপরিচিত ছিল।"

বাম থেকে: দক্ষিণ ইউরোপে মুসলিমরা এনেছে এবং চাষাবাদের প্রচলন করেছে এমন কিছু শস্যের মাঝে বাতাবি লেবু, খেজুর ও ডুমুর বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এসব শস্যের স্থানান্তর প্রায়শই ব্যক্তিবিশেষের প্রবল আগ্রহের কারণে ঘটতো, যেমনটি আমরা প্রথম আবদুর রহমানের বেলায় দেখি। খেজুরসহ বেশকিছু প্রজাতির আন্দালুস বা স্পেনে অনুপ্রবেশের পিছনে দায়ী ছিল সিরিয়ায় ফেলে আসা তার আবাসভূমির নৈসর্গিক দৃশ্যের স্মৃতিচারণ। এমনটি করে তিনি নিজেকে এই প্রবোধ দিতেন যে, আন্দালুসের এই নতুন ভূমিতে থেকেও তিনি তার নিজ আবাসভূমেই আছেন। কর্ডোবার প্রধান বিচারপতি মুয়াবিয়া ইবনে সালেহের মাধ্যমে দামেস্ক হতে আন্দালুসে বিভিন্ন জাতের ডালিমের প্রচলন ঘটে, অন্যদিকে সফর নামের জর্ডানের এক সৈনিক ডুমুরের কাটিং বা চারা কলম এনে তা স্পেনের মালাগায় নিজ জমিতে রোপণ করেন। পরবর্তীতে ডুমুরের এই প্রজাতিগুলো সমগ্র ভূখণ্ডে ছড়িয়ে পড়ে এবং ওই সৈনিকের নামে এগুলোকে *সাফ্রি* নামে ডাকা হতে থাকে।

■ সেচ ব্যবস্থা

যেমনটি আমরা দেখেছি যে, শস্যাদি গ্রীষ্মের উত্তাপে বৃদ্ধি পেত এবং নতুন এসব শস্যের কতগুলোর জন্য সহজলভ্য পানির তুলনায় আরও বেশি পরিমাণ পানির দরকার হতো, যেমন: আখের চাষাবাদের জন্য প্রতি চার থেকে আট দিন অন্তর অন্তর পানির প্রয়োজন পড়ে। ১১শ শতাব্দির শেষভাগে তুলার চাষ শুরু হয় এবং মধ্যযুগীয় ঐতিহাসিক ইবনে বাস্সালের বর্ণনা অনুসারে অঙ্কুরিত হওয়ার সময় থেকে আগস্ট পর্যন্ত প্রতি দু' সপ্তাহ অন্তর অন্তর পানি দেয়া লাগতো। আন্দালুসের অধিবাসীগণ তুলা উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল এবং তারা সেগুলো মরক্কোর সিজিলমাসা থেকে সুদূর আফ্রিকার ইফরিকিয়া অঞ্চল পর্যন্ত রপ্তানী করতো। কমলা, বিভিন্ন ধরনের বাতাবি লেবুর চারা এবং সেইসাথে বিভিন্ন জাতের ফলের গাছ ও শুষ্ক মৌসুমি শস্যের জন্য সেচের দরকার পড়তো।

তাহলে পানির এই চাহিদা কীভাবে মেটানো হতো? পানি কয়েক মিটার উঁচুতে তুলে পাম্প ও জলচালিত চাকা বা *নাউরের* মাধ্যমে প্রতিনিয়ত পানিপ্রবাহ নিশ্চিত করার বিদ্যাতে মুসলিমরা বেশ পারদর্শী ছিল। ধান চাষে পানি সরবরাহ করার জন্য কেবলমাত্র ভেলেন্সিয়া প্রদেশেই ৮,০০০-এর মতো *নাউর* বানানো হয়েছিল। মুসলিমগণ পশুর প্রাচীন ব্যবহারকে শক্তিচালিত কলা-কৌশলে বদলে দেয় এবং অত্যাধুনিক গিয়ারিং মেকানিজম বা যন্ত্রকৌশল উদ্ভাবন করে। সাহারার মতো রুক্ষ ও ঊষর মরুভূমির মধ্য দিয়ে পানি নেয়ার জন্য তারা পাতাল নালা বা *ক্বানাত* খনন করে। এই বিভাগের পানি ব্যবস্থাপনা এবং পানি সরবরাহ অধ্যায়ে আপনি সেচ ও পানি সরবরাহের নানা কৌশল সম্পর্কে আরও তথ্য পাবেন।

চাষাবাদের জমিতে যথাযথভাবে পানির সরবরাহ নিশ্চিত করতে হলে সেচ ব্যবস্থায় সাধারণ উচ্চতা স্তর বা লেভেলের সঠিক হিসেব অপরিহার্য, আর গণিতে অগ্রগামী হওয়ার সুবাদে মুসলিমগণ সেচ ব্যবস্থার এই ক্ষেত্রে বেশ সুবিধাজনক পর্যায়ে ছিল। ত্রিভুজ প্রক্রিয়ার সাহায্যে তারা অনায়াসে নিখুঁতভাবে উচ্চতা পরিমাপ করতে পারতো।

১১শ শতাব্দিতে স্পেনের টলেডোতে জ্যোতিষশাস্ত্রে যে মানের অগ্রগতি সাধিত হয়, গণিতের পাশাপাশি সেগুলোও কৃষির সমৃদ্ধিতে দারুণ ভূমিকা রেখেছিলেন। যেমনটি বিবিসি নির্মিত *An Islamic History of Europe* শীর্ষক প্রামাণ্যচিত্রে রাগেহ উমর মন্তব্য করেন, "জ্যোতিষশাস্ত্রীয় সারণীগুলো কৃষিতে ব্যবহৃত হতো ... এই সারণীগুলো বীজ বপন ও ফসল সংগ্রহের সময় নির্দেশ করতো।"

■ ভূমি মালিকানার নতুন পন্থা

খাদ্য উৎপাদনে যে বিপুল সমৃদ্ধি এসেছিল, তার নেপথ্যের সর্বশেষ উপাদানটি ছিল ভূমি মালিকানার এক নয়া ও বলিষ্ঠ ব্যবস্থার গোড়াপত্তন। নয়া এ ব্যবস্থার ফলে বড় বড় ভূমি মালিকের শোষণের জাঁতাকলে দুঃখ-কষ্টে নিষ্পেষিত হওয়ার বদলে কৃষকরা এখন নিজেদের ও সমাজের জন্য আরও বেশি কাজ করতে সক্ষম হয়। ভূমি মালিকানা ব্যবস্থায় এটা ছিল এক বৈপ্লবিক সামাজিক পরিবর্তন, যেখানে শ্রমিকদের অধিকারের বিষয়টি সামনে নিয়ে আসা হয়। এ ব্যবস্থার বদৌলতে যেকোন ব্যক্তি এখন জমি ক্রয়-বিক্রয়, বন্ধক রাখা, উত্তরাধিকার লাভ এবং নিজের ইচ্ছেমতো জমি চাষাবাদ বা অন্যদের দিয়ে চাষ করার অধিকার পায়।

> এ পর্যন্ত মানুষের উদ্ভাবনকুশলতা দ্বারা সৃষ্ট ব্যবস্থাতে স্পেনের মুসলিমদের কৃষি ব্যবস্থা ছিল "*অত্যন্ত জটিল, সর্বাধিক বৈজ্ঞানিক ও বেশ নিখুঁত।*"
>
> – ১৯শ শতাব্দির মার্কিন ঐতিহাসিক এস পি স্কট

কৃষি, ইন্ডাস্ট্রি, বাণিজ্য ও কর্মচারী নিয়োগ – এ জাতীয় প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ লেনদেন চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে সম্পন্ন হতো এবং প্রতিটি পক্ষ চুক্তির একটি কপি সংরক্ষণ করতো। যারা জমিতে শারীরিকভাবে শ্রম দিতো, তারা তাদের শ্রমের বিনিময়ে উৎপাদিত ফসলের একটি উপযুক্ত অংশ লাভ করতো। ভূমি মালিক ও চাষীদের মধ্যকার টিকে থাকা চুক্তিনামাগুলোতে দেখা যায় যে, ভূমি মালিক তার জমিতে উৎপাদিত ফসলের অর্ধেক পর্যন্ত রাখতো।

এসব কৃষি উদ্ভাবনের বদৌলতে জীবনযাত্রার মান রাতারাতিভাবে উন্নত হয় এবং সারা বছরব্যাপী উৎপাদনযোগ্য ফল ও সবজির বদৌলতে সকলের জন্য উন্নত ও পুষ্টিকর খাবার গ্রহণ সম্ভবপর হয়ে উঠে, আর এভাবে শীতকালের জন্য শুকিয়ে খাবার সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা কমতে থাকে।

বাতাবি লেবু ও জলপাইয়ের চাষ সাধারণ ব্যাপারে পরিণত হয় এবং প্রতিটি শহরে ফুল ও ফলের বাগানের বাজার গজিয়ে উঠে। এসবই নিরবিচ্ছিন্ন ফসল তোলার সাথে সম্পৃক্ত ছিল, যদিও এ পদ্ধতি মাটির উর্বরতা কমিয়ে দেয়, কিন্তু এর বিকল্প হিসেবে নিবিড় সেচ ব্যবস্থা এবং একইসাথে মাটির উর্বরতা বাড়ানোর নানা পদ্ধতি (প্রধানত কবুতরের বিষ্ঠা ব্যবহার) ও কৌশল আয়ত্ত করা হয়।

পশু ব্যবস্থাপনা এবং বিভিন্ন এলাকার পশু ব্যবহার করে বাছাইকৃত প্রজনন প্রক্রিয়ার সুবাদে উন্নত জাতের ঘোড়া ও শক্ত সামর্থ্য উট পাওয়া যেত, যেগুলো সাহারা মরুভূমির ন্যায় এলাকাতে বাণিজ্য কাফেলার পণ্য বহনে সক্ষম ছিল।

মাংস ও পশমের ন্যায় পশুজাত পণ্য ওইসব এলাকায় সহজলভ্য হয়ে উঠে, যেখানে এক সময় এগুলোকে বিলাসিতা ভাবা হতো। এর মাঝে পশুর মল থেকে ব্যবহার্য সার উৎপাদনও অন্তর্ভুক্ত ছিল। তিউনিসিয়া, আলজেরিয়া ও মরক্কোর মতো *মাগরিব* বা পশ্চিমাঞ্চলের উন্নতমানের পণ্যগুলো অতি দ্রুত তৎকালীন জ্ঞাত দুনিয়ার সর্বত্র জনপ্রিয় হয়ে উঠে।

কেবল পশমি সুতাই নয়, বরং সেইসাথে রেশম ও তুলার উৎপাদনও শুরু হয়। তুলা – যার মূল উৎস ভারত – সিসিলি ও আন্দালুসে প্রধান শস্যে পরিণত হয়, যার সুবাদে এককালের দুষ্প্রাপ্য ও বিলাসী পণ্যটি সকলের হাতের নাগালে চলে আসে। তুলনামূলক অল্প সময়ের মধ্যেই পোশাক-পরিচ্ছদের সাথে সম্পৃক্ত বিস্তৃত পরিসরের টেক্সটাইল সামগ্রী জনসাধারণের নাগালে আসে, যা নানা রঙ-বৈচিত্রসহ তাদের সামনে হাজির হয়।

আখের চাষাবাদের ইতিকথা

"পারস্যের খুরজিস্থান থেকে আখের চাষ পশ্চিমে ছড়িয়ে পড়ে এবং গোটা মধ্যযুগ ধরে শুস্তার (প্রাচীন সুসা) বৃহৎ পরিসরে আখের উৎপাদনে সমধিক পরিচিত ছিল। চিনির পরিশোধন শিল্পে আরবরা অধিক হারে সম্পৃক্ত হয়।

মুসলিম শাসনের উপর ভর করে আখের চাষ ও উৎপাদন ভারত থেকে সুদূর মরক্কো হয়ে পৃথিবীর আনাচে-কানাচে পৌঁছে যায়। মুসলিম অধ্যুষিত স্পেন ও সিসিলি হয়ে এটা ইউরোপের দক্ষিণে ছড়িয়ে পড়ে।"

– গায় লি স্ট্রাঞ্জ, বিংশ শতাব্দির প্রাচ্যবিদ

০২ কৃষি ম্যানুয়েল

কোনো বাগান বা ফসলের পূর্ণ বিকাশের জন্য আবশ্যক পরিচর্যা ও পরিবেশের মধ্যে বাস্তব সামঞ্জস্য থাকা। ভালো পরাগায়ন ও ফসল তোলা নিশ্চিত করতে প্রয়োজন মাটির বিভিন্ন উপাদান, পানি এবং মানবীয় হস্তক্ষেপের যথার্থ অনুপাত। সর্বোচ্চ উৎপাদন লাভের অদম্য আগ্রহ এবং সেইসাথে যে মাটি ও চারাগাছের উপর তারা নির্ভর করতো, সেগুলোর গঠন ও বিকাশ ধারা ব্যাহত না করে স্পেনের মুসলিমগণ কৃষির এক নিয়মতান্ত্রিক অধ্যয়নের সূচনা করে, যেখানে আজ থেকে শত শত বছর পূর্বে মৃত্তিকা রসায়ন ও মাটি ক্ষয়ের মতো বিষয়গুলো অন্তর্ভূত ছিল।

মুসলিম কৃষি ব্যবস্থা অত্যাধুনিক একটি ব্যাপার ছিল, যা পরিবেশের ভারসাম্য বজায়ের পাশাপাশি উপহার দিয়েছিল উচ্চ ফলনশীল ব্যবস্থা। তাদের ছিল কৃষি ম্যানুয়েল, যেখানে বলতে গেলে সবকিছুই বিস্তারিত ছিল, যেমন: লাঙল চাষ, সাধারণ ও বিশেষ নিড়ানি, গর্ত করা এবং মই দেয়ার মাধ্যমে মাটি উপযুক্ত করার বিবরণ। গুণগত মানের উপর ভিত্তি করে মাটির শ্রেণিবিন্যাসের পাশাপাশি পানিরও শ্রেণিবিন্যাস করা হয়। টলেডোর আমিরের মালি ইবনে বাস্সাল ১০৮৫ খ্রিস্টাব্দে "*কিতাবুয যারাআ*" (*কৃষি বিষয়ক পুস্তক*) নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন, যেখানে তিনি মাটিকে দশটি শ্রেণিতে ভাগ করেন এবং বছরের মৌসুম অনুসারে প্রত্যেক শ্রেণির মাটি কী পরিমাণ জীবনীশক্তি ধরে রাখতে পারে, তা নির্দেশ করেন। জানুয়ারি থেকে মে মাস সময়ে পতিত জমিতে চারবার ফসল চাষের ব্যাপারে তিনি বেশ জোর দেন এবং ক্ষেত্রবিশেষে তিনি দশবার ফসল চাষের উৎসাহ পর্যন্ত দেন, উদাহরণস্বরূপ: তুলা জাতীয় শস্য, যেগুলোর চাষাবাদ ভূমধ্যসাগরীয় উপকূলের শক্ত মাটিতে করা হতো।

মুসলিম স্পেনের সেভিল শহরের বাসিন্দা এবং ১২শ শতাব্দির উদ্ভিদতত্ত্ববিদ ইবনে আল-আওয়াম পূর্ববর্তী গ্রিক, মিশর ও পারস্যের পণ্ডিতদের গবেষণা একত্র করে "*কিতাবুয যারাআ*" (কৃষি পুস্তক) নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন, যেখানে কৃষি ও পশু ব্যবস্থাপনা নিয়ে ৩৪-টি অধ্যায় ছিল এবং একইসাথে এই গ্রন্থে কৃষকদের জন্য নিখুঁত বর্ণনা

আল-বিরুনীর লেখা "আছারুল বাকিয়া আনিল কুরুনিল খালিয়া" (বিগত শতাব্দির অবশিষ্ট স্মৃতি) গ্রন্থের ১৪শ শতাব্দির একটি ফারসি পাণ্ডুলিপি, যেখানে দেখা যাচ্ছে: মানুষ মাঠে কাজ করছে এবং একজন সেখানে কোদাল চালাচ্ছে।

বাম হতে: ৯৬১ খ্রিস্টাব্দের কর্ডোবা-ক্যালেন্ডারে প্রতিটি মাসের কর্মকাণ্ড ও সময়সূচি নির্ধারিত ছিল। মার্চ মাসে লেখা রয়েছে: এ মাসে গোলাপ প্রস্ফুটিত হবে এবং তিতির পাখির আগমন ঘটবে।

সম্বলিত নির্দেশনাও অন্তর্ভূত ছিল। এছাড়াও ৫৮৫-টি গাছের বিবরণ, ৫০-টিরও অধিক ফল গাছের রোপণ পদ্ধতির ব্যাখ্যা, গ্রাফটিং, মাটির বৈশিষ্ট্য ও চাষের জন্য মাটি প্রস্তুতকরণ, সার দেয়া, গাছের রোগ-বালাই ও সেগুলোর প্রতিকার, বাগান ব্যবস্থাপনা, সেচ ব্যবস্থা, বিভিন্ন গাছের মধ্যে বৈশিষ্ট্যগত সাদৃশ্য এবং মৌমাছি পালনের মতো বিষয়সমূহ এতে স্থান পেয়েছে। জলপাই, কীভাবে জলপাইয়ের চারা লাগাতে হয়, এদের রোগ-বালাইয়ের চিকিৎসা, গ্রাফটিং, জলপাই সংগ্রহ থেকে জলপাইয়ের বৈশিষ্ট্য, অলিভ অয়েল (জলপাই তেলের) পরিশোধন ও কন্ডিশনিং (বিশেষ অবস্থায় আনয়ন)-এর মতো বিষয়াদি – বলতে গেলে জলপাই সম্পর্কে আপনার যা জানার দরকার, তার সবই এই গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে। এমনকি এ গ্রন্থে লাঙল দেয়ার পদ্ধতি, কতবার দিতে হবে, বীজ বপনের সময়, কীভাবে বীজ বপন করতে হবে, বীজ বপনের পর এবং বৃদ্ধির সময় পর্যন্ত পানি দেয়া, চারাগাছের পরিচর্যা এবং ফসল তোলার উপর আলাদা অধ্যায় রয়েছে। এসব তথ্য আয়ত্তের পর একজন সচেতন কৃষক ব্যর্থ হতে পারেন না, ফলশ্রুতিতে এই গ্রন্থের বিষয়বস্তুর অধিকাংশই ১৮শ ও ১৯শ শতাব্দির মাঝামাঝি থেকে স্প্যানিস ও ফরাসি ভাষায় প্রকাশিত হতে থাকে।

৯৬১ খ্রিস্টাব্দের বিখ্যাত 'কর্ডোবা-ক্যালেন্ডার' বর্ণিত পদ্ধতিসমূহের নির্ভুলতা সত্যই অবাক করার মতো। বছরের প্রতি মাসের কর্মকাণ্ড ও সময়সূচি নির্ধারিত ছিল। উদাহরণস্বরূপ, মার্চ মাসে ডুমুরের গ্রাফটিং করা হতো এবং এ সময়ে বছরের শুরুর দিকের খাদ্যশস্য জন্মাতে শুরু করতো। এটা ছিল আখ রোপণের সময় এবং এ সময়ে মৌসুমি গোলাপ ও লাইলাক ফুলের মুকুল গজাতো। তিতির পাখির আগমন হতো, রেশমি গুটি পোকা ডিম ফোটাতো এবং মালেট নামের সামুদ্রিক মাছ নদীতে তাদের যাত্রা আরম্ভ করতো। এছাড়াও এই মৌসুমে শশার চাষ এবং তুলা, জাফরান ও বেগুনের বীজও বপন করা হতো। এই মাসে আঞ্চলিক খাজনা সংগ্রহের জন্য সরকারি ডাক ব্যবস্থা ঘোড়া সংগ্রহ করতো। পঙ্গপালের আবির্ভাব হতো এবং তারা তাদের ধ্বংসলীলা চালাতো। লেবু এবং রঞ্জন ও ঔষধে ব্যবহৃত সুগন্ধি গুল্ম মারজোরাম চাষের উপযুক্ত সময় ছিল এ মাস এবং বহু পাখির জন্য এটা ছিল মিলন মৌসুম।

কৃষির সাথে সম্পর্ক রাখে এমন কোনো কৌশলের প্রয়োগ বাকি ছিল না। প্রতিটি শস্যকে ধরে ধরে অত্যন্ত নিবিড়ভাবে পর্যালোচনা করা হতো। উদাহরণস্বরূপ, ইবনে বাস্সাল এমন জমিতে ধান চাষের জন্য বলতেন, যেটা উদীয়মান সূর্য বরাবর মুখ করে থাকতো। এরপর জৈব সার প্রয়োগ করে মাটি পুরোদস্তুর প্রস্তুত করার উপর তিনি বেশ জোর দিতেন। ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসের দিকে চারা রোপণের জন্য বলতেন। নির্দিষ্ট জমিতে কী পরিমাণ ধানের চারা রোপণ করতে হবে এবং কীভাবে তা সম্পন্ন করতে হবে, সে বিষয়ে ইবনে আল-আওয়াম বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। নির্দিষ্ট উচ্চতায় সেচ দেয়া, বিশেষ করে ধানের চারা রোপণের পূর্বে জমিকে নির্দিষ্ট উচ্চতায় পানিতে ডুবিয়ে রাখার অপরিহার্যতা সম্পর্কে তিনি দীর্ঘ আলোচনা করেছেন; যেমন: পানি শুষে নিলে মাটিতে বীজ পুততে হবে এবং জমিকে পুনরায় পানিতে ডুবিয়ে দিতে হবে।

> "প্রকৃতির প্রতি নিবিড় ভালোবাসা এবং কর্মচঞ্চল জীবনযাপন পদ্ধতির সুবাদে ধ্রুপদী ইসলামী সমাজ বাস্তুতান্ত্রিক ভারসাম্য লাভ করে এবং ... বিভিন্ন সভ্যতার রীতিনীতির জ্ঞান আয়ত্ত করে সেটার ভিত্তিতে তারা অর্জন করে সফল ও ভারসাম্যময় কৃষি ব্যবস্থা। সমৃদ্ধির এ সীমা নিছক কিছু কায়দা-কানুন একত্রে জমা করার চেয়েও নিগূঢ় ও তাৎপর্যময় ছিল, বরং এটা ছিল এক স্থায়ী বাস্তুতান্ত্রিক সাফল্য, যা মানব ইতিহাসের ধারাপ্রবাহ চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হয়েছে।"
>
> – লুসি বোলেন্স, *The use of plants for dyeing and clothing* (*রঞ্জক ও পোশাকের জন্য লতাগুল্মের ব্যবহার*) নামক গ্রন্থের লেখক

ক্ষতিকারক পরজীবী নিধন, আগাছা দূর এবং ফসল তোলা ও নিরাপদভাবে ফসল সংরক্ষণের বিষয়েও ধান বিশেষজ্ঞগণ মনোযোগ দেন। খাদ্য হিসেবে চাল নানা উপায়ে খাওয়া যেতে পারে এবং ইবনে আল-আওয়াম এটা উল্লেখ করেন যে, মাখন, তেল, চর্বি ও দুধ দিয়ে চাল রান্না করে খাওয়াটাই সর্বোত্তম পদ্ধতি। আলমোহাদ রাজবংশের অজ্ঞাতনামা এক লেখকও রান্নার রেসিপি সম্পর্কে "*কিতাব আত-তাবাখ আল-মাগরিবী ওয়াল আন্দালুসী*" (মাগরিব ও আন্দালুসের রান্না) নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন, যেখানে বহুপদের রেসিপি ছিল, যার মধ্যে পাঁচটি রেসিপি ছিল চাল নিয়ে এবং সবগুলোই অত্যন্ত মজাদার ছিল।

উপযুক্ত ভারসাম্য অর্জনের লক্ষ্যে জমির উর্বরতা নিশ্চিত করা ছিল কৃষির এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কৃষির এই ক্ষেত্রে মুসলিমগণ নিবিড় অনুসন্ধান অব্যাহত রাখে এবং আশ্চর্যজনকভাবে হাজার বছর পার হওয়ার পরেও আবাদি জমিগুলো আজও অপরিবর্তিত আছে, যেহেতু মধ্যযুগীয় মুসলিমগণ তাদের জমিতে পরিমিত মাত্রায় অবাধে জৈব সার প্রয়োগ করতো। ইবনে আল-আওয়াম বর্ণনা করেন যে, সর্বোত্তম সার কবুতরের বিষ্ঠা থেকেই আসে এবং আজকের মানদণ্ড মোতাবেক এটা নিশ্চিতভাবে পরিবেশবান্ধব ও প্রাকৃতিক।

ইরানে জমির বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বৃত্তাকার টাওয়ার স্থাপন করা হতো। চূড়া থেকে বেরিয়ে আসা ছোট প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট মাটির ইট দিয়ে তৈরি এই টাওয়ারগুলোতে কবুতর রাখা হতো। উচ্চতায় এই টাওয়ারগুলো ১৮ থেকে ২১ মিটার (৬০ থেকে ৭০ ফুট) হতো এবং সার হিসেবে ব্যবহারের জন্য কবুতরের বিষ্ঠা সংগ্রহ করা এবং অধিকহারে কবুতরের বংশবৃদ্ধির জন্য এগুলো ব্যবহৃত হতো।

এই টাওয়ারগুলোর ভিতরে মৌচাকের খুপরি বা কামরার মতো ছোট ছোট প্রকোষ্ঠ ছিল। দীর্ঘ সময় ধরে জমে থাকা পাখির বিষ্ঠা সংগ্রহ করে জমির সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়া হতো। সচরাচর ১ বছর পরপর কবুতর-টাওয়ারগুলো পরিষ্কার করা হতো। বলা হয় যে, খোদ ইরানের ইস্পাহানের বাহিরেই ৩০০০-এরও বেশি কবুতর-টাওয়ার ছিল।

বা থেকে: ইরানের ইস্পাহানের সন্নিকটে কবুতর-টাওয়ারের ধ্বংসাবশেষ আজও দাঁড়িয়ে আছে। মুসলিমরা কবুতরের বিষ্ঠাকে সর্বোৎকৃষ্ট জৈব সার মনে করতো এবং জমিতে তারা ব্যাপকহারে এটা ব্যবহার করতো। ডানে: ডাক মারফত সংবাদ আদান প্রদানের বাহন হিসেবে ব্যবহারের জন্য অধিকহারে কবুতরের প্রজননে জোর দেওয়া হতো।
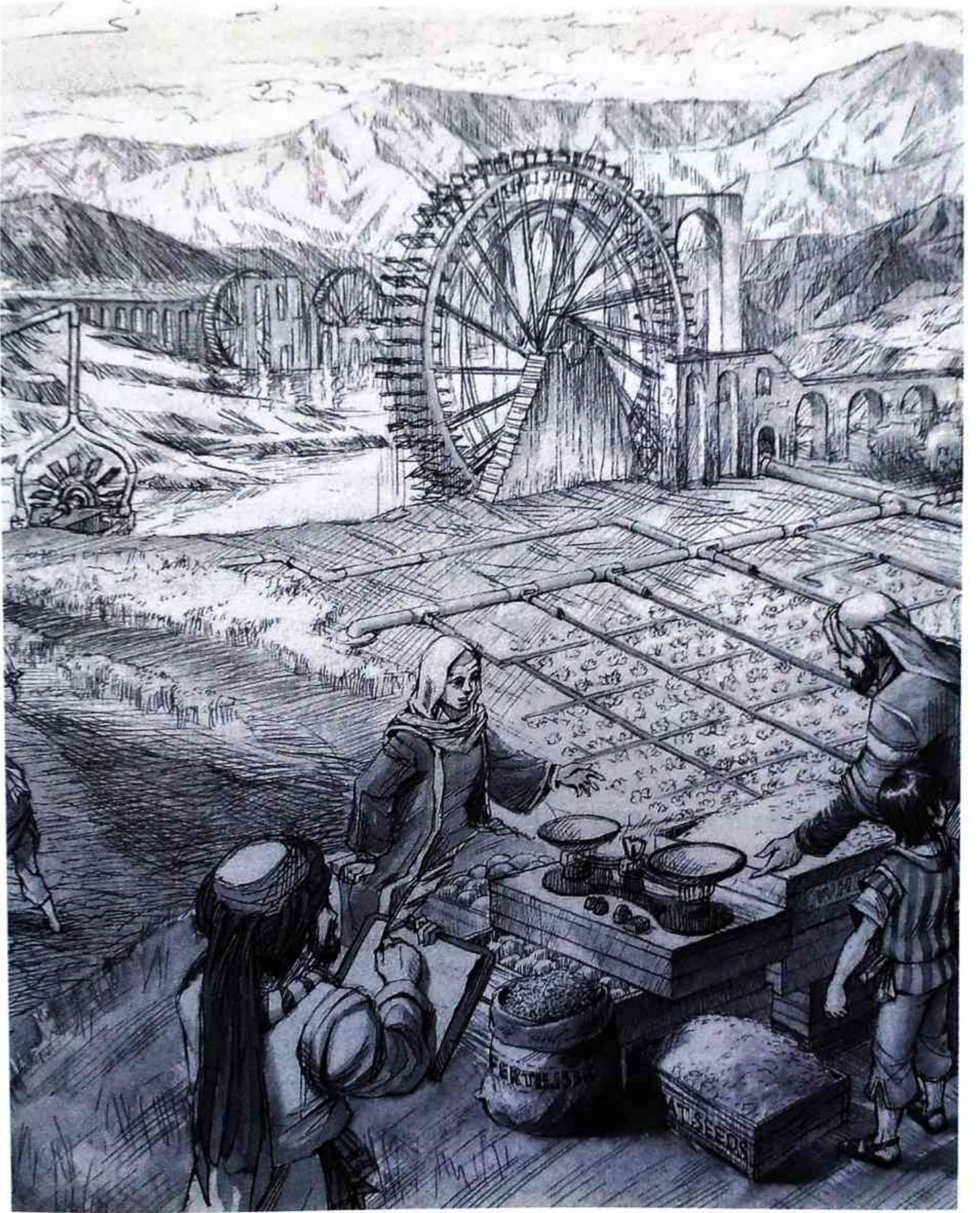
মুসলিম কৃষকদের কর্মকাণ্ড শিল্পীর তুলিতে নতুনভাবে ফুটে উঠেছে। ৯ম শতাব্দির সৃজনশীল কৃষকগণ নতুন শস্যের চাষ, সর্বাধুনিক সেচ কৌশলের বিকাশে ভূমিকা রাখা, জৈব সারের ব্যবহার, বৈশ্বিক জ্ঞান স্থানীয় পরিমণ্ডলে প্রয়োগ এবং চাষাবাদ প্রক্রিয়াকে বৈজ্ঞানিক তথ্য-উপাত্তের উপর ভিত্তিশীল রাখার মতো বৈপ্লবিক কাজে লিপ্ত ছিল। এগুলো তাদের ধাবিত করে এক কৃষি বিপ্লবের দিকে এবং এর মাধ্যেমে আরও অধিক সংখ্যক মানুষের দোরগোড়ায় সতেজ খাবার পৌঁছে যায়।

০৩ পানি ব্যবস্থাপনা

আন্দালুসিয়া কী আফগানিস্তান, শিকাগো কী কায়রো, যেখানেই থাকেন না কেন – কৃষি ও জীবন ধারণের জন্য পানির কোনো বিকল্প নেই। পানি জীবনের উৎস। মুসলিমরা পরম্পরাগতভাবে তৎকালের প্রচলিত সেচ ব্যবস্থা পায়। কিছু জিনিসকে তারা আগের মতো রেখে দেয়, কিছু জিনিসে নিয়ে আসে পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের ছোঁয়া, আবার সূচনা ঘটায় নতুন কিছু কৌশলের।

মুসলিমদের প্রযুক্তিগত অগ্রযাত্রার পিছনে গুরুত্বপূর্ণ কারিগর ছিল গণিতশাস্ত্রে প্রভূত সমৃদ্ধি, যার মানে দাঁড়াচ্ছেঃ পানি উত্তোলন বিদ্যা ও সেচ কার্য সম্পাদনের সাথে সম্পৃক্ত যন্ত্রপাতি প্রতিনিয়ত বৈপ্লবিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যেত। ১১শ শতাব্দির পারস্যের গণিতবিদ ও প্রকৌশলী মুহাম্মদ আল-কারাজী 'মাটির নিচে লুকানো পানি জমিনে উঠানোর ব্যাপারে' আলোচনা করেন। জরিপ যন্ত্র, পানির উৎসের সন্ধান প্রক্রিয়া এবং মাটির নিচে পানি নিষ্কাশনের নালা খনন যন্ত্রের মতো বিষয়গুলোর বিবরণও তিনি দিয়েছেন।

বাষ্পায়নের মাধ্যমে পানি শুকিয়ে যাওয়া প্রতিরোধ করতেই মাটির নিচে এসব পানি নিষ্কাশন নালা বা সুড়ঙ্গ খনন করা হতো। এগুলোকে *ক্বানাত* বলা হতো এবং এগুলোর সবচেয়ে প্রাচীনতম নমুনা পারস্যে রয়েছে। কৃষিতে ব্যাপক কৃষিজ সমৃদ্ধি, অধিক চাষাবাদের ধারায় এগুলো পরিণত হয় চাষাবাদের অপরিহার্য সহযোগিতে এবং মধ্যপ্রাচ্যের শুষ্ক জলবায়ুতে *ক্বানাত* ভবনগুলো রূপ নেয় কৃষির অত্যাবশকীয় অঙ্গে। পরবর্তীতে এগুলো স্পেনের কর্ডোবাতে এসে নাগরিক জীবনের গৃহস্থালির কাজে পানির প্রাপ্তিকে সহজলভ্য করে দেয়।

পারস্য ও আজকের আফগানিস্তানে হাজারেরও বেশি কুয়া ছিল, যার সবগুলোই এসব পাতাল নালা দ্বারা সংযুক্ত ছিল। পলি মাটির আস্তরণ ও ছাদ ক্ষয়ের সমস্যা মুকাবিলা এবং মাইলের পর মাইল দুর্গম মরুভূমি ও বৈরী ভূখণ্ডে পানির অবিরাম প্রবাহ নিশ্চিত করতেই এগুলো নির্মিত হয়েছিল। কিছু কিছু কঠিন পাবর্ত্য এলাকাতে *ক্বানাত*গুলো সমতলের ঝরনা হিসেবে দৃশ্যমান হয়, অতঃপর ভূতাত্ত্বিক পরিবর্তনের কারণে সেগুলো আবার হারিয়েও যায়। আলজেরিয়ার সাহারা অঞ্চলে পাতাল টানেল বা সুড়ঙ্গের বিস্তৃত নেটওয়ার্ক ছিল, যা *ফোগ্গারাস* (*ফাজ্জারাত*) নামে পরিচিত ছিল।

এখানের কৃষকরা এলাকার সবার জন্য পানির ব্যবহার নিশ্চিত করতে জলচালিত ঘড়ি, ক্লেপসিডরা ঘড়িও ব্যবহার করতো, যেহেতু এগুলোর সাহায্যে দিন ও রাতে প্রতিটি কৃষক কী পরিমাণ পানি পাচ্ছে, তা পরিমাপ করা যেত।

জলবিদ্যুৎ বাঁধ ও আধুনিক সেচ ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও ইরানের কিছু কিছু এলাকাতে *ক্বানাত*গুলো আজও কৃষকদের জন্য জীবনতুল্য। শিরাজের উত্তর-পূর্ব এলাকাতে পানির মতো মূল্যবান জিনিস কুয়া থেকে উত্তোলন করা হতো, যেখানে পানির যোগান উৎস ছিল এই পাতাল নালাসমূহ।

কায়রোর নিকটবর্তী ফুসতাতের রাওয়াদা দ্বীপের নাইলোমিটার, যা ৮৬১ থেকে ৮৬২ খ্রিস্টাব্দের দিকে নির্মিত হয়। কেন্দ্রে অবস্থিত অষ্টভুজের কলামগুলো প্রাচীন কিউবিট স্কেলে নীলনদের পানির উচ্চতা পরিমাপে ব্যবহৃত হতো।

একে অপরের সাথে সংযুক্ত ইংরেজি 'এল' আকৃতির কুয়ার সিরিজ ব্যবহার করে মুসলিমগণ দূর দূরান্তে পানি পরিবহনে সক্ষম ছিল। কুনাত নামে পরিচিত পাতাল পানি নিষ্কাশন টানেলগুলো ইরানের ইস্পাহানের নিকটবর্তী ছিল। বায়ু চলাচলের জন্য এসব কুনাতে ম্যানহোল ঢাকনা ছিল, যা টানেলের মধ্য দিয়ে পানি প্রবাহ সচল রাখতো। কুনাতগুলো আজও ব্যবহৃত হয়।

উষ্ণ ও শুষ্ক জলবায়ুর এসব এলাকাতে পানির দুষ্প্রাপ্যতার কারণে আজকের দিনের মতো পানি ব্যবহারে নিয়ন্ত্রণ ও নজরদারি আনা আবশ্যক ছিল। তৎকালীন শাসকেরা এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট বিশাল জলাধার, যেমন: বাঁধগুলো রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ছিল, অন্যদিকে স্থানীয় জনগণ পানি উত্তোলন যন্ত্র ব্যবহার করে সীমিত মাত্রায় পানি উত্তোলনে মনোযোগী ছিল।

মিশরে নীলনদের পানির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা জীবনের প্রতিটি স্তরে অত্যন্ত গুরুত্ববহ ছিল। ১৪শ শতাব্দির দুই মিশরীয় ঐতিহাসিক আন-নুয়াইরী ও আল-মাকুরিযী বাঁধ ও নীলনদের জলপথ ব্যবস্থাপনায় ব্যাপক গুরুত্বারোপ করেন। নালাপথ খনন, পরিচ্ছন্ন রাখা এবং বাঁধসমূহ তদারকির দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল আইয়ুবী ও মামলুক উভয় সাম্রাজ্যের অধীনস্থ সুলতান ও ভূমি মালিকদের উপর। ইরাকে বৃহৎ স্থাপনাগুলো সুলতানের অধীনে ছিল এবং ছোটগুলো ছিল জনগণের অধীনে। এ ধরনের বৃহৎ স্থাপনাগুলো তদারকির দায়িত্ব অধিকাংশই প্রখ্যাত আমির ও সরকারি কর্মকর্তাদের উপর বর্তাতো। মামলুক সাম্রাজ্যের অধীনে এমন কর্মকর্তাকে '*কাশিফ আল জুসুর*' বলা হতো, যার কাজ ছিল মিশরের প্রতিটি প্রদেশের বাঁধগুলো দেখাশুনা করা।

পানির অপচয় নিষিদ্ধ করা হয়। পানি নিয়ে সব ধরনের বিবাদ ও পানি-সংক্রান্ত আইনের লঙ্ঘন হলে তা আদালতের মাধ্যমে মিমাংসা করা হতো। লক্ষনীয় বিষয় হলো, এ আদালতের বিচারক খোদ কৃষকদের দ্বারা নির্বাচিত হতো এবং তা *Tribunal of the Waters* (পানি ব্যবস্থাপনা ট্রাইবুনাল) নামে পরিচিত ছিল। প্রতি বৃহস্পতিবার শহরের প্রধান মসজিদের দ্বারপ্রান্তে এই আদালত বসতো। এক হাজার বছর পার হয়ে আজও এই ট্রাইবুনাল ভ্যালেন্সিয়াতে বসে, তবে তা এখন মসজিদ নয় বরং প্রধান গির্জার দ্বারপ্রান্তে।

১২শ শতাব্দির উদ্ভিদ বিজ্ঞানী ইবনে আল-আওয়াম তার *"কিতাবুয যারাআ"*-তে ড্রিপ (ফোঁটায় ফোঁটায় প্রবহমান) সেচ কৌশল নিয়ে আলোচনা করেন এবং মন্তব্য করেন যে, এ কৌশল পানি সংরক্ষণ করে এবং কিছু প্রজাতির জন্য মাত্রাতিরিক্ত পানির সরবরাহ প্রতিহত করে। তিনি গাছের মূলে নির্দিষ্ট আকারের ফুটোসহ পানিপূর্ণ পাত্র আংশিকভাবে পুঁতে দিতেন। পাত্রের গায়ে থাকা নির্দিষ্ট আকারের ফুটোগুলো পানির ড্রিপিং রেট তথা পানির ফোঁটায় ফোঁটায় নিঃসরণ হারকে নিয়ন্ত্রণ করতো। বর্তমানে এই পদ্ধতি দুনিয়া জুড়ে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং (পূর্ত-প্রকৌশল) ও মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং (যন্ত্র-প্রকৌশল)-এ বেশ দক্ষ থাকায় পানি উত্তোলনে কিছুই মুসলিমদের পথ আগলে দাঁড়াতে পারেনি, এমনকি পানির উৎস গিরিসঙ্কটে থাকলেও। পানি উত্তোলন যন্ত্র ও পাম্পের ন্যায় অত্যাধুনিক যন্ত্রের কল্যাণে পুরো সমাজে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সংঘটিত হয়।

০৪ পানি সরবরাহ

একবার কল্পনা করুন তো প্রবহমান পানি ছাড়া আপনার জীবন চলছে, যেখানে মাইলের পর মাইল হেঁটে আপনাকে নদী বা খালে যেতে হচ্ছে এবং সেখানে গিয়ে এটা ভাবতে হচ্ছে যে, কীভাবে বালতিতে পানি তোলা হবে, যেহেতু খরস্রোতা পানির উৎসের ধারে কাছেও যাওয়া সম্ভব নয়। ৮০০ বছর পূর্বে পানি উত্তোলন যন্ত্র ও পাম্পের ন্যায় যুগান্তকারী যন্ত্রসমূহের উদ্ভাবন ও প্রচলনের আগ পর্যন্ত মুসলিমদের অবস্থা অনেকটা এমনই ছিল।

পানি আটকে রাখা, কৃত্রিম নালাপথ তৈরি, পানি সংরক্ষণ ও উত্তোলনের নিত্য নতুন কৌশল উদ্ভাবন এবং নিজেদের অর্জিত ও অন্যান্য সভ্যতা থেকে প্রাপ্ত জ্ঞানের ভিত্তিতে সে সময়কার প্রচলিত যন্ত্রসমূহে মুসলিমগণ নিয়ে আসে সুনিপুণ সৃজনশীলতার ছাপ।

প্রাচীন মিশরীয়রা *শাদুফের* মতো যন্ত্র ব্যবহার করতো। সাধারণ মনে হলেও এটা পানি উত্তোলনের কার্যকর এক যন্ত্র ছিল। আবর্তনশীল লম্বা দণ্ডে বালতি বেঁধে এ যন্ত্রের সাহায্যে নদী থেকে পানি উত্তোলন করা হতো। ওজনের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য বালতিতে একটি পাল্টা-ওজন থাকতো এবং এগুলো বহন করতো অনুভূমিক কাঠের দণ্ডের উপর দাঁড়ানো দুটি খুঁটি বা স্তম্ভ। এই যন্ত্র মিশরে আজও ব্যবহৃত হয়।

খ্রিস্টপূর্ব ১০০ থেকেই খরস্রোতা নালাপথ বা খাল থেকে উঁচু জমিতে পানি উত্তোলনের জন্য বৃহৎ জলচালিত চাকা বা *নাউর* ব্যবহৃত হতো। রোমান লেখক, স্থপতি ও প্রকৌশলী ভিটরুভিয়াস সাধারণ অথচ শক্তিশালী এই যন্ত্রের কথা উল্লেখ করেন। যেকোন জলচালিত চাকার মতো প্রবহমান পানির স্রোত এটার প্রান্তে থাকা প্যাডেল কম্পার্টমেন্টে সজোরে ধাক্কা দিতো, আর তাতেই এটা চলা শুরু করতো। প্যাডেল কম্পার্টমেন্টগুলো পানি দিয়ে পূর্ণ হতো এবং এগুলো একেবারে চূড়াতে তুলে আনা হতো, যেখানে পানি সরবরাহের কৃত্রিম নালার সাথে সংযুক্ত প্রধান ট্যাংক বা জলাধারে এই কম্পার্টমেন্টগুলো পানি শুন্য হতো। রোমান ও পারসীয়দের ব্যবহৃত এই যন্ত্র মুসলিমরা নিজেদের চাহিদামাফিক ব্যবহার উপযোগী করে এটাকে আরও বেশি সুসংহত ও কার্যক্ষম করে তোলে।

সিরিয়ার হামায় অবস্থিত এই নাউরগুলো অরন্টেস নদী থেকে পানি উত্তোলন করতো।
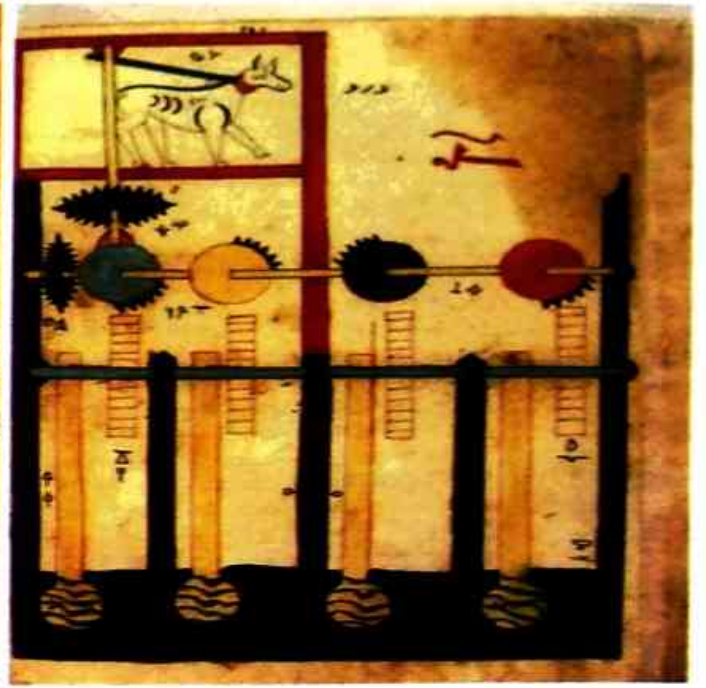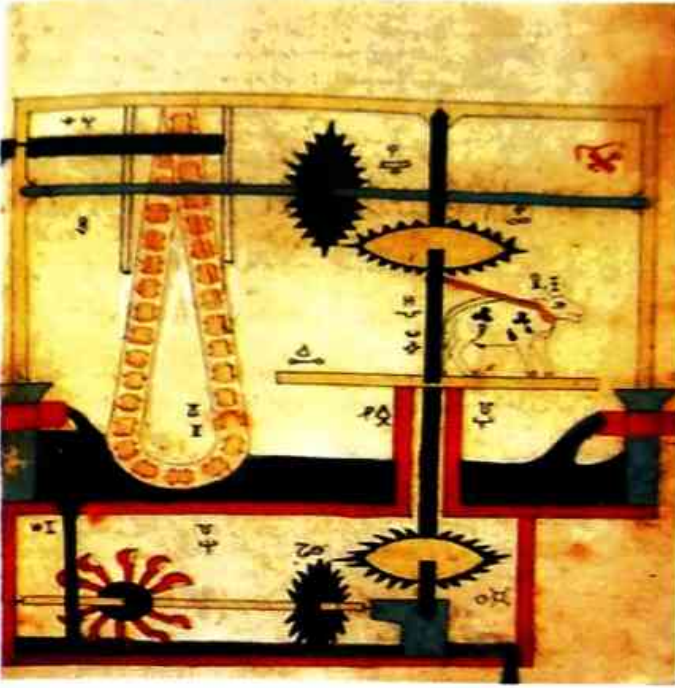
১৩শ শতাব্দির পাণ্ডুলিপির কিছু পাতা, যেখানে আল-জাযারীর ডিজাইন করা দুটো পানি উত্তোলন যন্ত্রের ছবি চিত্রিত হয়েছে। গিয়ারবিশিষ্ট সঞ্চালন দণ্ডের সাহায্যে একটি জল-টার্বাইন দ্বারা পানি উত্তোলন যন্ত্রটি চালু হতো। গিয়ারবিশিষ্ট সঞ্চালন দণ্ড লম্বালম্বি অনেকগুলো বাঁধা বালতি বহন করা চাকাকে ঘুরিয়ে দিতো। আল-জাযারী কাঠের তৈরি জন্তুর প্রতিকৃতি ঘূর্ণায়মান চাকতির উপর রেখে দিতেন যেন মানুষ এটা ধারণা না করে যে, স্বয়ংক্রিয় এই যন্ত্র 'জাদুর' মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। মানুষ মনে করতো এটা একটি জন্তু দ্বারা চালিত হতো এবং এটা আংশিক দাঁতবিশিষ্ট কতগুলো গিয়ারের সহায়তায় চারটি স্তুপে গতির সঞ্চার করতো। এর ফলে একবারে এক স্তুপ করে নদী থেকে পানি উঠাতো। এই নকশাতে প্রথমবারের মতো Camshaft (দন্তকবিশিষ্ট সঞ্চালন দণ্ড) দৃশ্যমান হয়েছে, যা এই পানি উত্তোলন যন্ত্রের পুরো যান্ত্রিক কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ করতো।

> "ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ইতিহাসে আল-জাযারীর উদ্ভাবন ও কর্মের গুরুত্বকে খাটো করা কোনোভাবে সম্ভব নয়। কেননা তার কর্ম আমাদের নিয়ে যায় বিভিন্ন যন্ত্রের ডিজাইন, প্রস্তুতপ্রণালী ও সন্নিবেশের প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনার এক বিপুল ভাণ্ডারে।"
>
> – সরকারি সনদপ্রাপ্ত বৃটিশ প্রকৌশলী ডোনাল্ড হিল, ১৯৭৪।

৭ম শতাব্দির শেষার্ধে বসরায় অবস্থিত একটি খাল খননের আলোচনায় সর্বপ্রথম কোনো মুসলিম *নাউরের* বিষয়টি উল্লেখ করেন। সিরিয়ার হামা প্রদেশের অরন্টেস নদীতে আজও এসব জলচালিত চাকার দেখা মেলে, যদিও এগুলো আর ব্যবহৃত হয় না। এগুলোর চাকা বেশ বড় আকৃতির ছিল এবং সবচেয়ে বড়টির ব্যাস প্রায় ২০ মিটার (৬৫.৬ ফুট) এবং এর বৃত্তাকার কাঠামো ১২০-টি কম্পার্টমেন্টে বিভক্ত ছিল। স্পেনের মুর্সিয়াতে *লা নরা* (*La Nora*) নামে পরিচিত *নাউরগুলো* আজও সচল, কিন্তু এদের আসল চাকাগুলোর স্থান এখন স্টিলের চাকা দখল করে নিয়েছে। এ বিষয় বাদে বলা যায়, স্পেনের মুর আমলের কৃষি ব্যবস্থা কার্যত অপরিবর্তনীয়। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে এখনও বহু *নাউর* রয়েছে, যেগুলো অনায়াসে আধুনিক পাম্পের সাথে সফল প্রতিযোগিতার সামর্থ্য রাখে।

অনেক মুসলিম প্রযুক্তিবিদ এটা প্রত্যক্ষ করেন যে, শক্তি উৎপাদনে পানি ও জীবজন্তুর ব্যবহার কাজের মাত্রা দারুণভাবে বাড়িয়ে দেয়। আল-জাযারী ও তাকিউদ্দীনের মতো দু'জন সৃষ্টিশীল মুসলিম প্রকৌশলী অসংখ্য পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে বহু অভূতপূর্ব যন্ত্র নির্মাণ করেন, যা আজকের আধুনিক সভ্যতাতে ব্যাপক প্রভাব সৃষ্টিকারী *Automated machinery* বা স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের পথিকৃৎ।

আল-জাযারী ১২শ শতাব্দির শেষার্ধ ও ১৩শ শতাব্দির শুরুর দিকে দক্ষিণ তুরস্কে বসবাস করতেন। দিয়ারবাকিরের আরটুক রাজা আনুমানিক ১১৮০ খ্রিস্টাব্দে তাকে সরকারি কাজে নিয়োগ দেন। একজন দক্ষ স্থাপত্য নকশাবিদ হিসেবে

তিনি এমন এক সুনিপুণ পানি উত্তোলন যন্ত্র উদ্ভাবন করেন, যেখানে হাতের একটি অঙ্গুলি হেলানো ছাড়াই বিপুল পরিমাণ পানি অনায়াসেই তোলা যেত। তিনি তার ক্র্যাংক-সংযুক্ত দণ্ড ব্যবস্থাতে (*crank-connecting rod system*) সর্বপ্রথম ক্র্যাংক (*crank*)-এর ব্যবহার করেন। যন্ত্র আবিষ্কারের ইতিহাসে ক্র্যাংককে এক মহাগুরুত্বপূর্ণ সংযোজন বিবেচনা করা হয়। কেননা, এটা চক্রাকার গতিকে সরলরৈখিক গতিতে রূপান্তর করতে সক্ষম। গাড়ির ইঞ্জিন ও রেলের স্বয়ংক্রিয় ইঞ্জিনের মতো জটিল যন্ত্র থেকে শুরু করে খেলনার মতো প্রায় সব ধরনের যন্ত্রে আজকের দিনে ক্র্যাংক ব্যবহৃত হয়।

আল-জাযারী এমন এক যন্ত্র ব্যবহার করেন, যা কড়িকাঠের কৃত্রিমনালার সাহায্যে একটি জন্তুর দ্বারা চালু হতো। কড়িকাঠের কৃত্রিমনালা পিচ্ছিল-ক্র্যাংক যান্ত্রিক পদ্ধতি (*slider-crank mechanism*) নামে পরিচিত গিয়ার ও ক্র্যাংকের সাহায্যে গঠিত জটিল ব্যবস্থার মাধ্যমে উপর ও নিচে চালিত হতো। ১৫শ শতাব্দিতে সংঘটিত প্রকৌশল বিপ্লবের আগ পর্যন্ত ইউরোপের কোথাও যন্ত্রের অংশ হিসেবে ক্র্যাংক ব্যবহৃত হয়েছে, এমন কোনো দৃষ্টান্ত নেই।

■ **আল-জাযারীর ঘূর্ণায়মান পাম্প**

আল-জাযারী পানি উত্তোলনের জন্য পাঁচটি যন্ত্র ডিজাইন করেন, যার মধ্যে দুটো ছিল শাদুফের উন্নত সংস্করণ এবং আরেকটি ছিল জন্তুর শক্তিকে গিয়ার ও জলশক্তি দ্বারা প্রতিস্থাপন। ক্র্যাংক-চালিত সঞ্চালন দণ্ড (*crankshaft*) উদ্ভাবনের পর জলচালিত পাম্প নির্মাণের মাধ্যমে তার আরেকটি মৌলিক ও অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জিত হয়। জলচালিত পাম্পে অন্তর্ভুক্ত ছিল খাঁজকাটা চাকা (*cogwheels*), তামার পিস্টন, চোষণ যন্ত্র, নিঃসরণ পাইপ এবং একমুখী দোলক কপাটিকা (*clack valve*)। এই পাম্প ১২ মিটার (৩৯.৪ ফুট) উচ্চতায় অবস্থিত সরবরাহ ব্যবস্থাতে পৌঁছে দেয়ার জন্য পানি চুষে নিতে পারতো, যে পানি সেচ ও পয়ঃনিষ্কাশনে ব্যবহৃত হতো। এটা দ্বৈত-ক্রিয়া নীতির প্রথম উদাহরণ, যেখানে একটি পিস্টন পানি চুষে নিচ্ছে, অন্যদিকে আরেকটি পিস্টন তা নিঃসরণ করছে। আল-জাযারী পিস্টন ও একমুখী কপাটিকা এমন নিখুঁতভাবে সংযুক্ত করে দিতেন যে, এরা অত্যন্ত দারুণভাবে কাজ করতো।

আপনার যদি কখনো মনে হয় যে, ঘূর্ণায়মান পাম্পের সাহায্যে আপনি ১৩শ শতাব্দির পানি উত্তোলন যন্ত্র বানাবেন, তবে যন্ত্রটির কার্যপ্রণালীর বিবরণ নিম্নরূপ:

জলচালিত কলের মতো এটাকে কোনো প্রবহমান নদীর কাছে বসাতে হবে, যেখানে এটার অর্ধেক প্যাডেল উত্তাল স্রোতের মাঝে থাকবে। প্যাডেল চাকা ঘোরার মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ গিয়ারিং কার্যক্রম চালু হয়ে তা পিস্টনকে কর্মক্ষম করে তুলে এবং পিস্টনটি লিভার বা ভার উত্তোলক বাহুর গতির সাথে উঠা-নামা করতে থাকে। আর এভাবেই তৈরি হয়ে গেল একটি ঘূর্ণায়মান পাম্প।

দোলক কপাটিকা পাইপের সাহায্যে পানি ভেতরে প্রবেশ করাতো এবং বাহিরে বের করে দিতো। অন্তর্গামী পাইপ পানিতে ডুবে থাকতো এবং যখনই পিস্টনকে এর সিলিন্ডারের দৈর্ঘ্য মোতাবেক টেনে তোলা হতো, তখনই অন্তর্গামী কপাটিকার সাহায্যে পানি এর মধ্যে শোষিত হতো। বহির্গামী কপাটিকা এই সময় ভর ও শীর্ষবিন্দুতে অবস্থানের কারণে বন্ধ থাকতো।

পিস্টনটি যখন সজোরে ধাক্কার অবস্থানে চলে যেত, তখন সিলিন্ডারে থাকা পানি বহির্গামী কপাটিকা দিয়ে বেরিয়ে যেতে বাধ্য হতো এবং অন্তর্গামী পাইপের চেয়ে সরু একটি বহির্গামী পাইপের মাধ্যমে পানি নিঃসরিত হতো। অন্তর্গামী কপাটিকা এই সময় ভর ও শীর্ষবিন্দুতে অবস্থানের কারণে বন্ধ থাকতো।

এই প্রক্রিয়া যন্ত্রটির উভয় অংশে পালাক্রমে চলতো। যন্ত্রের এক অংশ যখন ধাক্কা দেয়ার কায়দায় থাকতো, তখন অপর অংশটি টেনে তোলার অবস্থায় থাকতো। ফলশ্রুতিতে জলচালিত চাকার একটি আবর্তন সম্পন্ন করার সময়ে দুই 'একক পরিমাণ' পানি উত্তোলিত হতো। যতক্ষণ পানির প্রবাহ থাকতো, ততক্ষণ পানি উত্তোলন চলমান থাকতো।

সেচের কাজে মিশরীয় শাদুফের ব্যবহার এই খোদাই-কর্মে চিত্রায়িত হয়েছে।

বায়ে: চিত্রকর্মটিতে তাকিউদ্দীনের ছয়-সিলিন্ডার পানির পাম্প প্রদর্শিত হচ্ছে। ক্যামশাফ্‌ট সংযুক্ত দণ্ডের গতি নিয়ন্ত্রণ করে যেন ছয় পিস্টনে ক্রমবর্ধমান হারে গতির সঞ্চার হয়, এতে করে লাগাতার পানি উত্তোলিত হতে থাকে। ডান থেকে উপরে: ক্যামশাফ্‌ট ও জলচালিত চাকার একটি দৃশ্য। ডান থেকে নিচে: পিস্টন ও সিলিন্ডার অংশের নিকট-দৃশ্য।

■ **তাকিউদ্দীনের ছয়-সিলিন্ডার পাম্প**

প্রযুক্তির ময়দানের আরেক বিস্ময় ১৬শ শতাব্দির অটোমান প্রকৌশলী তাকিউদ্দীন ইবনে মারূফ আর-রশিদ, যিনি "*আত-তুরুক আস সানিয়াতি ফীল আলাতির রূহানিয়াতি*" (রূহানি যন্ত্রসমূহের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কলাকৌশল) নামে যন্ত্র প্রকৌশলের উপর একটি গ্রন্থ রচনা করেন। বাষ্পশক্তির 'আবিষ্কারের' প্রায় একশত বছর পূর্বে জলচালিত পাম্পের আলোচনার পাশাপাশি তিনি প্রাথমিক পর্যায়ের সাদামাটা বাষ্পচালিত ইঞ্জিন নিয়ে নিজস্ব পরীক্ষা-নিরীক্ষার কথা উল্লেখ করেন।

তার নির্মিত ছয়-সিলিন্ডার পাম্প এবং পানি উত্তোলন যন্ত্র বস্তুত কাগজ প্রস্তুতকরণ ও ধাতুসংক্রান্ত কাজের ইতিহাসের সাথে সম্পৃক্ত। কেননা তার নির্মিত পিস্টনগুলো অনেকটা বাষ্পচালিত হাতুড়ির মতো এবং এগুলো দ্বারা কাগজের জন্য কাঠের মণ্ড তৈরি করা যেত অথবা এক আঘাতে ধাতুর লম্বা সরু খাঁদ দূর করা যেত।

এই পাম্প কীভাবে কাজ করে, তাকিউদ্দীন তার পাণ্ডুলিপিতে সেটা তুলে ধরেন। ছয়-সিলিন্ডার পাম্পটির সাথে ছিল লম্বা অনুভূমিক অক্ষদণ্ড বা *Camshaft* -এর সাথে সংযুক্ত একটি জলচালিত চাকা। আর এই চাকার সাথে ছিল এর দৈর্ঘ্য মোতাবেক ছয়টি দন্তক (*Cam*)। নদীর উত্তাল স্রোত জলচালিত চাকাকে ধাক্কা দিতো, যা ক্যামশাফ্‌টকে ঘোরাতো ও পাক দিতো। ক্যামশাফ্‌টের প্রতিটি দন্তক সংযুক্ত দণ্ডকে নিচের দিকে ধাক্কা দিতো এবং সবগুলো সংযুক্ত দণ্ড কেন্দ্র বরাবর ঘুরতে থাকে। সংযুক্ত দণ্ডের আরেক পাশে ছিল লেড বা সীসার ভার, যা উপরে উত্তোলিত হতো এবং সাথে করে পিস্টনকেও উপরে তুলে আনতো।

এভাবে একটি বায়ুশূন্য অবস্থার সৃষ্টি হতো এবং দোলক কপাটিকার সাহায্যে পানি পিস্টন সিলিন্ডারে শোষিত হতো। নির্দিষ্ট কোণে ক্যামশ্যাফ্‌টের আবর্তনের পর দন্তক সংযুক্ত দণ্ডকে অবমুক্ত করে দিতো, এরপর পিস্টনের ধাক্কা শেষ হতো। ভরের সাহায্যে সীসার ওজন পিস্টনকে নিচে নামিয়ে পানিকে দোলক কপাটিকার বিপরীতে বল প্রয়োগ করতো, কিন্তু দোলক কপাটিকা বন্ধ থাকায় পানিকে ভিন্ন আরেকটি ছিদ্র দিয়ে নির্গমন পাইপে যেতে হতো। একই সময়ে সবগুলো অংশের যুগপৎ ক্রিয়া এবং সঞ্চালন দণ্ডের অধীনে দন্তকগুলোর কৌণিক বিন্যাস দ্বারা সবগুলো পিস্টনের সুনিয়ন্ত্রিত অনুক্রমে পাম্পটির যান্ত্রিক ক্রিয়ার সৌন্দর্য দৃশ্যমান হয়।

যন্ত্রের উপর নির্ভরতার পূর্বে যখন আমাদের চারপাশে না গাড়ি ছিল না ছিল সাইকেল বা ইলেকট্রিক পাম্প, ঠিক তখন এই আবিষ্কারগুলো সমাজ ও সভ্যতাকে আসলেই বদলে দিয়েছিল। এই যন্ত্রগুলো হয়তো ব্যাপক ভিত্তিতে নির্মিত হতো না, তথাপি বহু শহরেই পানির পাম্পের দেখা মিলতো। যার ফলে মানুষদের না পানি সংরক্ষণের পাত্রের পসরা সাজাতে হতো, আর না তাদের শাদুফ দিয়ে পানি উত্তোলনে নিজেদের পালা আসার জন্য অপেক্ষা করতে হতো। বরং তারা পাম্প বা কৃত্রিম নালার পাশে দাঁড়িয়ে কেবল পানি উত্তোলন চাকাগুলোর জমা করা মূল্যবান তরল সংগ্রহের জন্য অপেক্ষা করতো, যেমনিভাবে আমরা কল থেকে পানির প্রবাহের জন্য অপেক্ষা করি।

ঘূর্ণায়মান পাম্প

পানি সরবরাহ

পিপাসার্ত কৃষি ব্যবস্থার জন্য নয়া সেচ প্রযুক্তি

উল্লেখযোগ্য পরম্পরা: সেচ ব্যবস্থার কল্যাণেই পীচফল, বেগুন ও ধানের মতো শস্যগুলো পশ্চিমের স্পেনে পৌঁছেছে।

অবস্থান: দিয়ারবাকির, বর্তমান তুরস্ক
তারিখ: ১২শ শতাব্দির শেষার্ধ
উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব: আল-জাযারী, যন্ত্র প্রকৌশলী

শতশত বছর পূর্বের মুসলিম স্পেনে আপনি হয়তো হাজারেরও অধিক পানি উত্তোলন-চাকা দেখতে পাবেন, যেগুলো ধানের জমিতে সেচকাজে ভীষণ ব্যস্ত ছিল। কিন্তু প্রতিটি শহর ও গ্রামে সেচ প্রদানে সেগুলো সক্ষম ছিল না।

১২শ শতাব্দির প্রকৌশলী আল-জাযারী স্থানীয় মানুষদের কাছে সরাসরি পানি সরবরাহ নিশ্চিত করতে পানি উত্তোলনের বিভিন্ন যন্ত্র নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান। তার করা পাঁচটি ডিজাইনের মধ্যে দ্বিগুণ কর্মক্ষম চোষণ পাম্প ছিল সর্বোন্নত। তামার পিস্টন, কার্যকর বায়ু নিরোধক, চওড়া পাখনাযুক্ত কপাটিকা ব্যবহার করে আল-জাযারী এমন এক পাম্প উদ্ভাবন করেন, যা দুটো সিলিন্ডার দিয়ে নদীর পানি শুষে নিতো এবং এই যন্ত্রের উপরে থাকা এক ফালবিশিষ্ট নির্গমদ্বারে শুষে নেয়া পানি খালি করতো।

১৬শ শতাব্দির বিজ্ঞানী ও প্রকৌশলী তাকিউদ্দীন তার অত্যাধুনিক ছয়-সিলিন্ডার পাম্পের ডিজাইনে নদীর উত্তাল পানি শক্তি উৎপাদনে ব্যবহার করেন এবং তিনি তার রচিত "*আত-তুরুক আস সানিয়াতি ফীল আলাতির রূহানিয়াতি*" নামক পুস্তকে এই ধারণা প্রকাশ করেন। এছাড়াও তিনি বাষ্পচালিত টার্বাইনের প্রাথমিক একটি প্রকার নিয়ে আলোচনা করেন, যে ধারণাটি প্রায় এক শতাব্দি পর পুনরায় আলোচনায় উঠে আসে।

তাকিউদ্দীনের ছয়-সিলিন্ডার পাম্পটি একটি পানি উত্তোলন-চাকা দিয়ে চালিত হতো, যার সঞ্চালন দণ্ডে ছয়টি পেঁচানো আকৃতির গজাল বা দন্তক (Cam) ছিল। পানি উত্তোলন-চাকার অভ্যন্তরের ঘূর্ণায়মান ফাঁকা অংশে থাকা গজালগুলো পরস্পর সংযুক্ত দণ্ডের একটি সিরিজকে সচল করতো, যার ফলে এদের প্রত্যেকেই এক একটি পিস্টনকে টেনে উপরে তুলতো। টেনে তোলা এই পিস্টনগুলো একটি কপাটিকার সাহায্যে পানি শুষে সিলিন্ডারে জমা করতো। সঞ্চালন দণ্ডটি ঘূর্ণায়মান হওয়ায় পরস্পর সংযুক্ত দণ্ডগুলো খালাস করতো এবং ভার প্রযুক্ত হয়ে পিস্টনকে আবারও নিচে নামিয়ে দিতো, যার ফলে সরবরাহ ব্যবস্থার সাথে সংযুক্ত একটি পাইপের মাধ্যমে সিলিন্ডার হতে পানি বেরিয়ে যেত।

এমন যুগপৎ ক্রিয়ার বদৌলতে পাম্পটি কোনো বিঘ্ন ছাড়াই পানি সরবরাহ করতো এবং সেইসাথে হাতুড়িও পরিচালনা করতে সক্ষম ছিল, যা দিয়ে কাগজের মণ্ড ও ধাতু পেটানো হতো। তাকিউদ্দীনের ছয়-সিলিন্ডার পাম্পের মতো উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন যন্ত্রের নিহিতার্থ হচ্ছে: মানুষকে আর পানির জন্য কোনো লাইনে দাঁড়াতে হবে না।

মুসলিম বিশ্বে যে কৃষি বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে, তার পিছনে পানি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হিসেবে কাজ করেছে। ব্যবসায়ীগণ ধান, পীচফল, এপ্রিকট, বেগুন স্পেনে এনে রোপণ করতো এবং এমন উন্নত সেচ প্রযুক্তি ব্যবহার করে জমিতে প্রয়োজনীয় পানির জোগান দিতো। প্রজনন ও পশুপালনের নয়া কৌশল সকলের কাছে মাংস ও পশম সহজলভ্য করে দেয়, অথচ পূর্বে এসব অঞ্চলে এগুলো কেবল বিলাসিতা ভাবা হতো। পুরুষ ও নারীরা এমনসব খামারে কাজ ও ব্যবসায়িক লেনদেন করতো, যেখানে দূরবর্তী পানি উত্তোলন যন্ত্র ও পরস্পর সম্পর্কযুক্ত কৃত্রিম খালের মাধ্যমে পানি সরবরাহ করা হতো।

আধুনিক কৃষি পদ্ধতি আজ সর্বত্র বিস্তৃত; তথাপি শাদুফ নামে পরিচিত হস্তচালিত পানি উত্তোলনের প্রাচীন যন্ত্রের ব্যবহার আজও আপনি মিশরে দেখতে পাবেন।

পাণ্ডুলিপিতে আল-জাযারির ঘূর্ণায়মান পাম্প দেখা যাচ্ছে। এটা সেই পাণ্ডুলিপি যেখানে প্রথমবারের মতো ক্র্যাংক (Crank)-এর চিত্র প্রদর্শিত হয়েছে।

উপরে: আল-জাযারীর ঘূর্ণায়মান পাম্পের ত্রিমাত্রিক চিত্রায়ন। এই যন্ত্র এমনভাবে নকশা করা যে, এটা ১২ মিটার (৩৯.৪ ফুট) উচ্চতায় পানি তুলতো, যাতে এই পানি সরবরাহ ব্যবস্থাতে পৌঁছাতে পারে। মাঝে ও শেষে: পিস্টনের নাড়াচাড়া পানিকে পিস্টন চেম্বারে তুলে এনে নির্গমন পাইপে সঞ্চালিত করে।

০৫ বাঁধ

সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বা পূর্ত প্রকৌশলের সর্ববৃহৎ স্থাপনাগুলোর মধ্যে বাঁধ অন্যতম এবং সভ্যতা বিনির্মাণে বাঁধের ভূমিকা অনস্বীকার্য। বাঁধ ব্যবস্থার অভাবে অত্যধিক বন্যা জমি প্লাবিত করে বিনাশ করতো, আর অসম্ভব করে তুলতো ব্যাপকভিত্তিক সেচ কার্যক্রম। বাঁধ নির্মাণ ব্যতীত জলবিদ্যুৎ স্থাপনা অসম্ভব ছিল, যা আজকের দিনে প্রতিনিয়ত শক্তি সরবরাহ করে যাচ্ছে।

বহু শতাব্দি পূর্বেই মুসলিমগণ নির্মাণ কাঠামো ও বৈচিত্রময় গঠনের মধ্য থেকে খিলানাকৃতির বাঁধ, উপাশ্রয় বাঁধ ও বেড়িবাঁধের মতো বহু বাঁধ নির্মাণ করেছিল। নকশা ও নান্দনিকতার বিচারে এসব বাঁধের মাঝে ৯ম শতাব্দিতে তিউনিসের আগলাবী রাজবংশ কর্তৃক তাদের রাজধানী আল-কায়রাওয়ানের নিকট নির্মিত বাঁধটি সবচেয়ে দৃষ্টিনন্দন। ১১শ শতাব্দির দক্ষিণ স্পেনের ভূগোলবিদ ও ঐতিহাসিক আল-বাকরী বাঁধটির বিবরণ এভাবে দেন, "আকৃতিতে বৃত্তাকার এবং আয়তনে বিশাল এই বাঁধ। বাঁধের একেবারে কেন্দ্রে অষ্টভুজের একটি টাওয়ার দাঁড়ানো, যা চার দরজাবিশিষ্ট প্যাভিলিয়ন কক্ষকে বেষ্টন করে আছে। উভয়পাশে খিলানে ঢাকা তোরণের লম্বা সারি এবং এগুলো জলাধারের দক্ষিণ অংশে একটি অপরটির উপর হেলান দিয়ে আছে।"

ইরানের কিবার বাঁধটি এখন পর্যন্ত সবচেয়ে প্রাচীন বাঁধ হিসেবে পরিচিত, যা প্রায় ৭০০ বছরের মতো পুরোনো। এ ধরনের নকশার অন্যান্য বাঁধের মতো এই বাঁধের মর্টার বা হামানদিস্তাতে অসমান, এবড়ো-থেবড়ো পাথরকুচির শাঁসের সমষ্ঠি রয়েছে। এক প্রকার স্থানীয় মরু লতাগুল্মের ছাইয়ের সাথে চূর্ণ-বিচূর্ণ করা চুনাপাথর দিয়ে মর্টার তৈরি হতো, যেন তা ফাটল মুকাবিলায় আরও বেশি শক্ত, অটল ও অভেদ্য হয়। এরপরের প্রাচীন বাঁধের তালিকায় রয়েছে দৃষ্টিনন্দনভাবে বাঁকানো কুসাইবা বাঁধ, যা ৩০ মিটার (৯৮.৪ ফুট) উঁচু এবং ২০৫ মিটার (৬৭৩ ফুট) দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট। বাঁধটি বর্তমান সৌদি আরবের মদীনার নিকটে অবস্থিত।

আজকের আফগানিস্তানে তিনটি সুপ্রাচীন বাঁধ রয়েছে, যা ১১শ শতাব্দিতে গজনীর সুলতান মাহমুদ নিজ সাম্রাজ্যের রাজধানীর নিকট নির্মাণ করেন। এর মধ্যে একটি বাঁধ তার নামে নামকৃত, যা কাবুল থেকে ১০০ কিলোমিটার (৬২ মাইল) দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। বাঁধটি উচ্চতায় ৩২ মিটার (১০৫ ফুট) এবং দৈর্ঘ্যে ২২০ মিটার (৭২২ ফুট)।

১৭শ শতাব্দিতে সাফাভী রাজবংশের দ্বিতীয় শাহ আব্বাস কর্তৃক নির্মিত ইরানের ইস্পাহান নগরীর জায়ান্দেহ নদীতে অবস্থিত খাজু সেতু, যা একটি বাঁধও বটে। সেতুটি পাথরের প্লাটফর্মের উপর অবস্থিত এবং অনেকগুলো জলকপাট (পানি প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে পানির উচ্চতা নিয়ন্ত্রণে ব্যবহৃত কপাট) দ্বারা বিভক্ত। এই জল-কপাটগুলো নদীর পানি প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে।

"সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ইতিহাসবেত্তাগণ মুসলিম সময়কে একেবারে বাদই দিয়ে দিয়েছেন, আর বিশেষভাবে বলতে গেলে বাঁধ নির্মাণের ঐতিহাসিকগণ তো মুসলিম আমলের বিষয়টি একদম চেপে গেছেন, এমনকি তারা এই দাবী করে বসেছেন যে, উমাইয়া ও আব্বাসীদের সময়ে বাঁধ নির্মাণ, সেচ ও অন্যান্য প্রকৌশলের কাজ উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পায় এবং শেষমেশ তা বিলুপ্ত পর্যন্ত হয়। এ ধরনের কথা নিতান্তই অন্যায় ও অসত্য।"

– নরম্যান স্মিথ, *History of Dams*, ১৯৭১

মুসলিম স্পেনে অতিকায় আকৃতির বাঁধ নির্মাণ করা হতো এবং গাঁথুনি হিসেবে তারা সেখানে এক প্রকারের সিমেন্ট ব্যবহার করতো, যা পাথরের চেয়েও শক্ত। তুরিয়া নদীতে অবস্থিত ৮-টি বাঁধের প্রতিটির ভিত্তি নদীগর্ভের ১৫ ফুট গভীর পর্যন্ত নিমজ্জিত, অধিকন্তু সারি সারি কাঠের পাইল (*pile*) দিয়ে ভিত্তিগুলোকে আরও সুরক্ষা প্রদান করা হতো। নদীর অস্বাভাবিক আচরণের জন্যই এমন কঠিন ও শক্ত ভিত্তির ব্যবস্থা করা হতো। কেননা বন্যাকালীন সময়ে এই প্রবাহ স্বাভাবিকের চেয়ে শতগুণে বেড়ে যেত। দশ শতাব্দির অধিক সময় পার হওয়ার পরও অতিরিক্ত সংস্কার ছাড়াই বাঁধগুলো আজও ভেলেন্সিয়ার সেচ চাহিদাকে পূরণ করে যাচ্ছে।

কর্ডোবা শহরের গোয়াদেলকুইভার নদীর বাঁধটি সম্ভবত দেশটিতে টিকে থাকা সর্বপ্রাচীন ইসলামী বাঁধ। ১২শ শতাব্দির ভূগোলবিদ আল-ইদরিসীর মতে, বাঁধটি কিবতীয়্যা পাথরের তৈরি এবং এতে মার্বেলের স্তম্ভ রয়েছে। বাঁধটি নদীতে আঁকাবাঁকা পথ ধরে অগ্রসর হয়েছে। এ ধরনের আঁকাবাঁকা আকৃতি থেকে এটা বুঝা যায় যে, নির্মাতাগণ ঢেউয়ের চূড়াকে উদ্দেশ্য করে এমনটি করেছেন, যেন বাঁধের প্লাবিত হওয়ার ক্ষমতা বাড়ানো যায়। এই বাঁধের অবশিষ্টাংশ নদীগর্ভের কয়েক ফুট উপরে আজও দৃশ্যমান।

এ ধরনের অতিকায় স্থাপনা নির্মাণে মুসলিম প্রকৌশলীগণ ভূমি জরিপের অত্যাধুনিক কৌশল ও উপকরণসমূহ ব্যবহার করেছেন, যেমন: আস্তুর্লাব এবং সেইসাথে ত্রিকোণমিতিক হিসেব। অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে কাটা পাথরখণ্ড দিয়ে বাঁধগুলো নির্মিত হতো। ইস্পাতের পেরেক দিয়ে এই পাথরখণ্ডগুলো সংযুক্ত করা হতো এবং পেরেকগুলো বসানোর ফলে সৃষ্ট গর্ত গলিত সীসা দিয়ে পূর্ণ করা হতো। কারিগরি শিল্প-নৈপুণ্যের মাত্রা ও নকশার উৎকর্ষ এতটাই অর্জিত হয়েছিল যে, ৭ম ও ৮ম শতাব্দিতে নির্মিত বাঁধগুলোর এক-তৃতীয়াংশ আজও অক্ষত। আর অবশিষ্ট দুই-তৃতীয়াংশ চেঙ্গিস খান ও মোঙ্গল বাহিনী থেকে শুরু করে তাইমুর লঙ্গের সুবিশাল সৈন্যদলের শতাব্দিব্যাপী যুদ্ধবিগ্রহে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

কল-কারখানাতে সঞ্চিত পানি ব্যবহার করে শক্তি উৎপাদনের মাধ্যমে মুসলিমগণ নবায়নযোগ্য প্রাকৃতিক শক্তিতে (*Green energy*) বিনিয়োগের নজির স্থাপন করেছিল। খুজিস্তানের আবি গারার প্রণালীতে দেয়া পুল-ই-বলাইতী বাঁধের প্রত্যেক কিনারার প্রাচীর কেটে ভূ-গর্ভস্থ সুড়ঙ্গে কারখানা স্থাপন করেছিল, যা জলশক্তি ব্যবহার করে শক্তি উৎপাদনের অন্যতম প্রাচীন দৃষ্টান্ত। ডিজফুলের সেতু-বাঁধ এমনই আরেক দৃষ্টান্ত, যা ৫০ হাত ব্যাসের বৃহৎ জলচালিত চাকা চালানোর ক্ষমতা রাখতো এবং চাকাটি ওই শহরের সকল গৃহে পানি সরবরাহ করতো। পানি ব্যবহার করে শক্তি উৎপাদনের এমন বহু দৃষ্টান্ত আজও বহুস্থানে দৃশ্যমান।

৯ম শতাব্দিতে আগলাবীদের দ্বারা নির্মিত তিউনিসের কায়রাওয়ানের নিকটবর্তী ওয়াদী মার্জ আল-লীলে অবস্থিত জলাধার। মুসলিম বিশ্বে টিকে থাকা জলাধারের মাঝে এটিই সবচেয়ে প্রাচীন।

০৬ বায়ুকল (উইন্ডমিল)

যেকোন কিছু প্রস্তুত ও উৎপাদন করতে শক্তির প্রয়োজন এবং তেলচালিত যন্ত্রের পূর্বে টেকসই উৎসসমূহ হতে শক্তির যোগান আসতো। ইসলামী বিশ্বে যোগানকৃত শক্তির কিছু অংশ আজ থেকে প্রায় হাজার বছর পূর্বে পানি দিয়ে মেটানো হতো, যেখানে পানির সাহায্যে শক্তি উৎপাদনে সক্ষম ক্র্যাংক-দণ্ড নির্ভর যন্ত্রসমূহ নগরবাসীর পানির চাহিদা মেটাতে পানিকে বেশ উঁচু স্থান ও কৃত্রিম নালাতে সরবরাহ করতো। জলচালিত যাঁতাকলগুলো গম চূর্ণ-বিচূর্ণ করলেও ইসলামী বিশ্বের অপেক্ষাকৃত শুষ্ক এলাকাগুলোতে পর্যাপ্ত পানি না থাকায় বিকল্প শক্তির উৎস খুঁজতে তারা বাধ্য হয়।

মৌসুমি জলপ্রবাহগুলো শুকিয়ে গেলেও আরবের বৃহত্তর মরুভূমিগুলোর একটা জিনিস ছিল – বাতাস। এসব মরুভূমির বাতাসের প্রবাহের একটা নির্দিষ্ট দিক ছিল এবং বাতাস প্রতিনিয়ত একই স্থান দিয়ে বয়ে যেত। উইন্ডমিলগুলো বেশ সাদামাটা হলেও এগুলোর উপযোগিতা এতটাই কার্যকর ছিল যে, খুব অল্প সময়ের মধ্যেই ৭ম শতাব্দির পারস্যে উদ্ভাবিত উইন্ডমিল গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। অধিকাংশ ঐতিহাসিক মনে করেন, ক্রুসেডারদের মাধ্যমে ১২শ শতাব্দিতে উইন্ডমিল ইউরোপে প্রবশে করে।

৬৩৪ খ্রিস্টাব্দ হতে ১০ বছর শাসন পরিচালনাকারী দ্বিতীয় খলীফা উমর (রা.)-এর নিকট পারস্যের এক লোক এসে দাবী করে যে, সে এমন এক কল বানাতে সক্ষম, যা বাতাস দিয়ে চালিত হবে। এটা শুনে খলীফা তাকে একটা কল বানানোর আদেশ করেন। এরপরই, গম ও বিভিন্ন শস্য চূর্ণ-বিচূর্ণ করতে যাঁতাকল চালানো এবং সেচের পানি উত্তোলনে বায়ুশক্তির ব্যবহার ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পায়। পারস্যের সিস্তান প্রদেশে প্রথম এই রেওয়াজের সূচনা ঘটে এবং ১০ম শতাব্দির আরব ভূগোলবিদ আল-মাসউদী এই এলাকাকে 'বাতাস ও বালুর নগর' হিসেবে আখ্যায়িত করেন। তিনি লিখেন, "এই এলাকার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এখানকার বাগানে পানি সরবরাহের জন্য বায়ুশক্তি ব্যবহার করে পাম্প চালানো হতো।"

শুরুর দিকের উইন্ডমিলগুলো দ্বিতল ভবনবিশিষ্ট হতো এবং দুর্গ, পর্বত বা উঁচু প্রাসাদের মিনারে এগুলো স্থাপন করা হতো। উপরের তলাতে যাঁতাকল ছিল এবং নিচের তলায় একটি চাকা থাকতো, যা কাপড়ে মোড়ানো ৬ বা ১২-টি পাখার সাহায্যে চালিত হতো। এগুলো উপরের যাঁতাকল ঘোরাতো। অন্যদিকে নিচের প্রকোষ্ঠের দেয়ালগুলোকে ভেতরের দিকে ক্রমশ সরু হওয়া চারটি ঢালা দিয়ে ভেদ করা হতো। এই ঢালাগুলো বাতাসকে উইন্ডমিলের পাখার দিকে ধাবিত করতো এবং সেগুলোর আবর্তন গতি বাড়িয়ে দিতো।

ওই সময় থেকে উইন্ডমিলের বিবরণ দেয়ার সময় কাঠের সিলিন্ডারের শেষপ্রান্তে সংযুক্ত যাঁতাকলের বর্ণনাও অন্তর্ভূত থাকতো। অর্ধ মিটার (১.৬ ফুট) প্রস্থ এবং ৩.৫ থেকে ৪ মিটার (১১.৫ থেকে ১৩.১ ফুট) উচ্চতার এই সিলিন্ডার উত্তর-পূর্বে উন্মুক্ত উঁচু মিনারে খাড়াভাবে দণ্ডায়মান থাকতো, যেন ওই দিক থেকে আসা বাতাসের নাগাল পাওয়া যায়। সিলিন্ডারটির পাখা লতাগুল্মের আঁটি বা তাল পাতা দিয়ে তৈরি এবং তা অক্ষদণ্ডের হাতলের সাথে সংযুক্ত। মিনারে বয়ে যাওয়া বাতাস পাখাগুলোকে ধাক্কা দিতো এবং এরফলে হাতল ও যাঁতাকল ঘুরতে শুরু করতো।

মধ্যযুগীয় প্রকৌশল বিজ্ঞানে উইন্ডমিলের আবির্ভাব বড় ধরনের প্রভাব সৃষ্টি করে এবং এটা নয়া বাণিজ্যের আগমনী বার্তা ঘোষণা করে।

> "খেয়াল করো! কতই না বিশাল আমি!
> *আছি আমি আমার মিনারের চূড়ায়;*
> আমার গ্রানাইটের চোয়াল গোগ্রাসে গিলছে
> *ভুট্টা, গম ও রাইয়ের সব দানা*
> চূর্ণ করে বানাচ্ছি তাদের ময়দায়।
> *ফসলের জমির দিকে তাকাই আমি তুচ্ছভাবে;*
> শস্যের মাঠে আমি কেবল দেখি
> *কর্তিত ফসল,*
> বাতাসে আমি সজোরে নিক্ষেপ করি আমার বাহুদ্বয়
> *কারণ, আমি জানি, এসব তো আমারই জন্যে।"*
> – হেনরি ওয়াডসওয়ার্থ লংফেলো রচিত "*The Windmill*" থেকে নেয়া
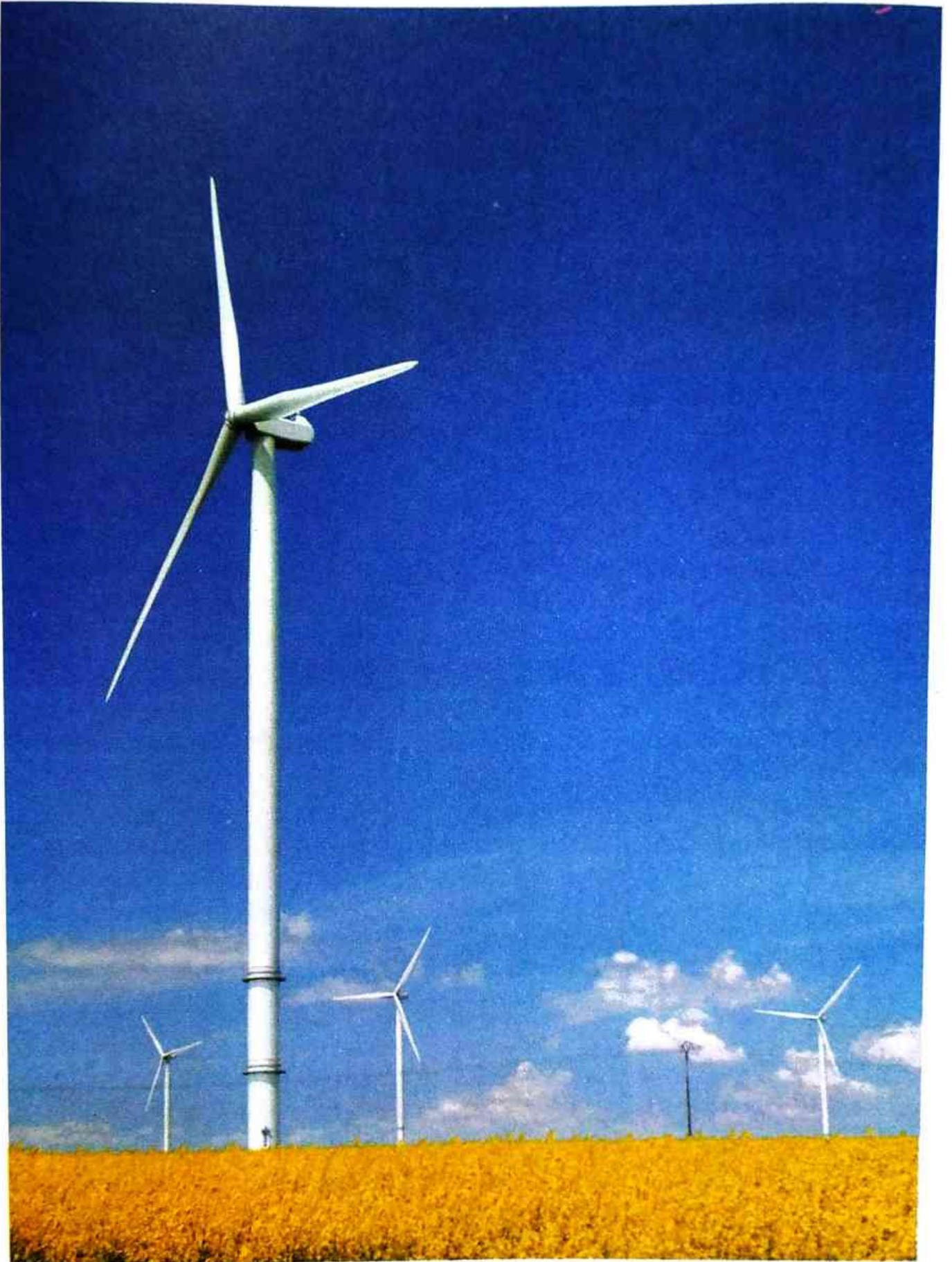
ফ্রান্সের রাইপসরিষা ক্ষেতে বায়ুচালিত টার্বাইন ঘূর্ণায়মান। পরিবেশবান্ধব শক্তি
ব্যবহারের এই প্রচেষ্টা বায়ুশক্তি ব্যবহারের দাবী পুনরুজ্জীবিত করেছে।

উইন্ডমিল (বায়ুকল)

বায়ুশক্তি

বায়ুকে শক্তি উৎপাদনে কাজে লাগানোর প্রাচীন ও আধুনিক পদ্ধতি

উল্লেখযোগ্য পরম্পরা: যেকোন সময়ের চেয়ে শক্তির বিকল্প উৎস হিসেবে বায়ুশক্তি আজ সর্বাধিক জনপ্রিয়

অবস্থান: সিস্তান, পারস্য

তারিখ: ১০শ শতাব্দি হতে বর্তমান

উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব: ভূগোলবিদ আল-মাসউদী (১০ম শতাব্দি) এবং আল-দিমাশক্বী (১৪শ শতাব্দি) কর্তৃক রচিত ও অঙ্কিত নথি।

এক হাজার বছর পূর্বে ভূগোলবিদ আল-মাসউদী ইরানের সিস্তান প্রদেশে এবং আজকের আফগানিস্তানের পশ্চিমাঞ্চলের বাগানগুলোতে সেচ কাজে পানির পাম্পে উইন্ডমিলের ব্যবহার প্রত্যক্ষ করেন এবং তা লিপিবদ্ধ করেন। এই অঞ্চলের নদীতে যখন পর্যাপ্ত পানি থাকতো না বা শুকিয়ে যেত, তখন পানি উত্তোলন যন্ত্রগুলো বন্ধ হয়ে যেত। এমন পরিস্থিতি সুরাহাকল্পে মুসলিম শাসকগণ বছরের চার মাস বহমান থাকা মরুভূমির বাতাস ব্যবহার করে উইন্ডমিল তৈরির আদেশ করেন। আর এ ধারাবাহিকতায় সর্বত্র উইন্ডমিলের ছড়াছড়ি শুরু হয়।

বাতাসের নাগাল ঠিক মতো পাওয়ার জন্য মধ্য এশীয় উইন্ডমিলগুলোতে খাড়া পাখা থাকতো, যা প্রথাগত ইউরোপীয় ডিজাইনের ব্যতিক্রম ছিল। দুর্গ বা প্রাসাদের চূড়া কিংবা পর্বতশৃঙ্গের শীর্ষদেশে স্থাপিত এসব উইন্ডমিল দোতলা হতো। প্রথম তলাতে যাঁতাকলের পাথর থাকতো, যার একটি কাঠের তৈরি খাড়া সঞ্চালন দণ্ডের সাথে সংযুক্ত ছিল। এই সঞ্চালন দণ্ডটি অপরতলা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, যেখানে কাপড়ে বা তাল গাছের পাতায় মোড়ানো ছয় থেকে বারটি উইন্ডমিলের পাখা খাড়াভাবে লাগানো থাকতো। বাতাসের নাগাল পাওয়ার জন্য উত্তরপূর্ব দিকে উইন্ডমিলের কাঠামো উন্মুক্ত রাখা হতো।

শস্য গুঁড়া করা বা নিজেদের জমিতে সেচের পানি সরবরাহের মতো কাজে কৃষকদের উইন্ডমিল ব্যবহার করতে আল-মাসউদী প্রত্যক্ষ করেন। শক্তির যোগান সমস্যার সমাধানে এটা ছিল চমৎকার ও পরিবেশবান্ধব এক সমাধান। অতীতে বায়ুশক্তিকে নানা উপায়ে কাজে লাগানো হতো, যেমন: দ্রুত প্রবহমান বাতাসের সাহায্যে প্রাকৃতিক বায়ুচলন বা ভেন্টিলেশনের নিশ্চিত করা।

ঘরোয়া ও শক্তি সাশ্রয়ী পারিবারিক ঘর হিসেবে ব্যবহারের জন্য আজ থেকে ৪,৫০০ বছর আগে উঠানসহ বাড়ি নির্মাণের ঐতিহ্য চালু হয়। কয়েকটি পরিবারে ভাগ করা যৌথ দেয়ালে নির্মিত উঠানসহ এসব বাড়ির ডিজাইনে গৃহকে কীভাবে প্রাকৃতিকভাবে ঠাণ্ডা রাখতে হয়, তার কৌশল অন্তর্ভূত ছিল। বায়ুকল এর মধ্যে অন্যতম, যেটা বহমান বাতাসকে ছাদের উঁচু চত্বর থেকে দেয়ালের মধ্য দিয়ে ঘরের অভ্যন্তরের কামরাগুলোতে প্রবেশের পথ করে দিতো।

পরিকল্পিত উঠানবিশিষ্ট বাড়ির মেঝের বিভিন্ন স্তরে ভেতরের দিকে মুখ-করা বিভিন্ন কক্ষ ও খালি জায়গার ব্যবস্থা ছিল, যেন তা বিভিন্ন মৌসুমের সাথে মানিয়ে নেয় এবং বাড়ির নির্জনতা ও গোপনীয়তা বৃদ্ধি করে।

গরমের মৌসুমে আজ বিদ্যুৎচালিত এয়ার কন্ডিশনার সাদরে গ্রহণ করা হলেও – এটাকে আরও বেশি পরিবেশবান্ধব করার ক্ষেত্রে বায়ুশক্তির মাঝেই একমাত্র সমাধান নিহিত। বিভিন্ন স্থানে বায়ুচালিত টার্বাইনের আকারে নতুন ধরনের উইন্ডমিলের বিস্তৃতি ঘটেছে, যেগুলো বিভিন্ন ধাচের অসংখ্য যন্ত্রের সমন্বয়ে গঠিত মূল মেশিন চালাতে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে।

আফগানিস্তানের হেরাতে আজও পুরাতন এই উইন্ডমিল দাঁড়িয়ে আছে।

আল-দিমাশক্বী রচিত ১৪শ শতাব্দির একটি পাণ্ডুলিপি, যেখানে একটি নমুনা বায়ুকল বা উইন্ডমিলের প্রস্থচ্ছেদ প্রদর্শিত হয়েছে। উইন্ডমিলের খাড়া সঞ্চালক দণ্ডকে কেন্দ্র করে এর খাড়া পাখাটি আবর্তন করে।

০৭ বাণিজ্য

বাণিজ্য ইসলামের সুদীর্ঘকালের ঐতিহ্য। নবী মুহাম্মদ (ﷺ) ও তার অনেক সাহাবীই ব্যবসায়ী ছিলেন। বাণিজ্য ইসলামী জিন্দেগীর গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক বিধায় বাণিজ্যকে সুচারুভাবে পরিচালনার জন্য চুক্তি, লেনদেন, ঋণ ও বাজার নীতিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে সুসংহত আইনের ধারা।

মানসিক ঔদার্যসম্পন্ন ব্যবসায়ী ও রুচিশীল পণ্যের আশীর্বাদে মুসলিম সাম্রাজ্য জুড়ে বিস্তৃত বাণিজ্যের সুবিশাল নেটওয়ার্ক গড়ে উঠে। স্বর্ণ ও সাদা স্বর্ণ হিসেবে পরিচিত লবণ আফ্রিকার সাহারা থেকে উত্তর ও পশ্চিমে ভ্রমণ করে মরক্কো, স্পেন ও ফ্রান্সে পৌঁছে যায় এবং অল্প পরিমাণে এসব পণ্য গ্রীস, তুরস্ক, মিশর ও সিরিয়াতে পৌঁছায়। ১৪শ শতাব্দিতে মুদ্রা হিসেবে ব্যবহৃত হওয়া এসব সামগ্রী কড়ির খোলসের মতো করে মালদ্বীপ থেকে আফ্রিকাতে পৌঁছায়। মৃৎশিল্প ও কাগুজে মুদ্রা চীন থেকে পশ্চিমে আসলেও কাগুজে মুদ্রা মিশরে তেমন জনপ্রিয়তা লাভ করেনি। দরবেশ, সুলতান, পণ্ডিত ও হজ্জযাত্রীদের সাথে বিভিন্ন পণ্য সামগ্রীসহ বণিকদের এক সমারোহ তখন বয়ে যেত।

সিল্ক মহাসড়ক ও তার চারিপাশকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠা ভূ-বাণিজ্য ছিল মুসলিম অর্থনীতির হৃৎপিণ্ড। সমুদ্র বাণিজ্য প্রধানত আফ্রিকা ও ইউরোপের ভূমধ্যসাগরীয় উপকূলীয় অঞ্চল ঘিরে চলতো। দক্ষিণ স্পেনের মালাগা বন্দর ছিল বাণিজ্যের এক মহামিলন কেন্দ্র, যেখানে প্রায় সব দেশ বিশেষ করে ইতালির বণিকপ্রজাতন্ত্র থেকে অধিকহারে ব্যবসায়ীরা আসতো, যেমন: জেনোয়াবাসী বণিকগণ। ইবনে বতুতা জেনোয়াবাসীদের নৌকা করে আনাতোলিয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন, কারণ তারা এ অঞ্চলের বাণিজ্যে আধিপত্য বিস্তার করে রেখেছিল এবং এ সম্পর্কে তিনি বলেন, "খ্রিস্টানরা আমাদের সম্মানের সাথে গ্রহণ করে নেয় এবং তারা আমাদের কাছ থেকে ভ্রমণের জন্য তারা এক পয়সাও গ্রহণ করেনি।"

সেলজুক সরাইখানা (Caravanserai) তুরস্কের কোনিয়াতে আজও দাঁড়িয়ে আছে। বাণিজ্য-কাফেলা মূলত এক ধরনের দাতব্য প্রতিষ্ঠান, যা মুসাফিরদের খাদ্য-পানীয়, আশ্রয় থেকে শুরু করে নানা ধরনের সুবিধা প্রদান করতো। এগুলো ছিল তৎকালীন যুগের 'রাজপথের সেবাকেন্দ্র'।

মালাগার জনবহুল ঘাটসমূহে বণিকগণ রেশম, অস্ত্রসস্ত্র, অলংকার ও সোনালি রঙের মাটির তৈরি সামগ্রী থেকে শুরু করে স্পেনের সুস্বাদু ফলসহ প্রতিটি দেশের পণ্য লেনদেন করতো।

ভূমধ্যসাগরে উন্মুক্ত হয়ে থাকা নীলনদের ব-দ্বীপের (*Nile Delta*) মুখে অবস্থিত আলেকজান্দ্রিয়া বন্দরটি অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ। মসলা বাণিজ্যের যাত্রাপথে এটা ছিল ভারত সাগর থেকে লোহিত সাগর ও নীলনদ হয়ে মালামাল ইউরোপে নিয়ে যাওয়ার প্রবেশ দ্বার। ফেরোস দ্বীপ দ্বারা বিভক্ত এ বন্দরে দুটো পোতাশ্রয় রয়েছে, যার পশ্চিমেরটি মুসলিমরা এবং পূর্বেরটি খ্রিস্টানরা ব্যবহার করতো। এছাড়া এর প্রকাণ্ড বাতিঘর বর্তমানে বিশ্বের অন্যতম আশ্চর্য হিসেবে স্বীকৃত।

রাস্তার চারপাশে বিশ্রামের জন্য গড়ে উঠা সরাইখানাগুলো বাণিজ্য সমৃদ্ধিতে অন্যতম নিয়ামক ছিল। সরাইখানা এক ধরনের দাতব্য প্রতিষ্ঠান, যা মুসাফিরদের তিনদিনের জন্য বিনামূল্যে আশ্রয় ও খাবার সরবরাহ করতো, আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিনোদনেরও ব্যবস্থা করতো। এই সরাইখানাগুলো গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য যাত্রাপথে প্রতি ৩০ কিলোমিটার (১৮.৬ মাইল) অন্তর অন্তর অবস্থিত ছিল।

বণিকরা তাদের পণ্য দুনিয়ার একপ্রান্ত থেকে আরেকপ্রান্তে নিয়ে যাওয়ার সময় সাথে করে ইসলামকেও নিয়ে যেত। গোয়াংজু (আজকের ক্যান্টন) চীনা উপকূলে ৮ম শতাব্দিতে মুসলিম ও ইহুদী ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে গড়ে উঠে। মুসলিম বণিকগণ আফ্রিকাতে ছড়িয়ে পড়ে এবং প্রাথমিক দিকে বার্বার বণিক সম্প্রদায় সাহারা অঞ্চলে ইসলাম বার্তা নিয়ে যায়। লোহিত সাগরের সাথে নীলনদকে যুক্তকারী উত্তর-পূর্ব আফ্রিকার বাণিজ্য যাত্রাপথসমূহের যাযাবর গোষ্ঠীগুলো অতি অল্প সময়ের মধ্যেই মুসলিম হয়ে যায়।

বাণিজ্যিক লেনদেনের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ স্থানে অবস্থানের প্রেক্ষিতে কিছু বাণিজ্যি কেন্দ্র ইসলামী বিশ্বে বেশ সমৃদ্ধশালী সমাজের জন্ম দেয়। তিউনিসের আল-কায়রাওয়ান ও মরক্কোর সিজিলমাসা সম্পর্কে ১০ম শতাব্দির পর্যটক ইবনে হাওক্বাল তার "*মাসালিক ওয়া মামালিক*" (যাত্রাপথ ও রাজ্য) গ্রন্থে বলেন, "পশ্চিমের সবচেয়ে বড় শহর আল-কায়রাওয়ান বাণিজ্য, ধন-দৌলত ও এর বাজারের সৌন্দর্যে বাকি শহরগুলোকে ছাড়িয়ে গেছে। আমি সরকারি কোষাগারের প্রধান আবুল হাসা-কে বলতে শুনেছি যে, পশ্চিমের সকল প্রদেশ ও জনপদের আয়ের পরিমাণ সাত থেকে আট কোটি দিনারের মাঝামাঝি।"

> "গ্যাসকোনির উপসাগরীয় এলাকা থেকে সিন্ধু ছাড়িয়ে এক বিশাল সাম্রাজ্যের শাসক আরবগণ বাল্টিক ইউরোপ থেকে আফ্রিকাব্যাপী বাণিজ্যিক শিল্পোদ্যোগে জড়িয়ে পড়ে, যা ইতিহাসে প্রথমবারের মতো পূর্ব ও পশ্চিমকে একত্র করেছিল।"
>
> – রবার্ট লোপেজ, মধ্যযুগ পরবর্তী বাণিজ্যিক সম্প্রসারণ বিষয়ক ঐতিহাসিক

ইসলামী বিশ্ব হতে ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকা ব্যাপকহারে পণ্য আমদানি করে, যার মধ্যে রয়েছে: এনামেল-সজ্জিত কাচপণ্য, চামড়ার তৈরি সব ধরনের পণ্য, টাইলস, মৃৎসামগ্রী, কাগজ, কার্পেট, খোদাইকৃত হাতির দাঁত, সচিত্র পাণ্ডুলিপি, ধাতব শিল্পকর্ম – যেমন: দামেস্কের তরবারি, পানপাত্র, মিহি তুলার কাপড় এবং দামী রেশমের বস্ত্রাদি।

মুসলিমদের তৈরি বস্ত্রাদি, ধাতব পণ্য, কাচ খণ্ড এবং সাবান বেশ চড়া দামের হতো। কৃষ্ণসাগরের উত্তর উপকূল ও একইসাথে স্ক্যান্ডিনেভীয় অঞ্চল, হ্যানসেটিক বন্দরসমূহ এবং হল্যান্ডের ম্যাস্ট্রিক্টে প্রত্নতত্ত্ব বিশেষজ্ঞগণ মামলুক আমলে নির্মিত অত্যন্ত বিলাসী পণ্য আবিষ্কার করেন। পণ্যগুলো যে অত্যন্ত নিবিড় ও নিরবিচ্ছিন্ন শ্রমের ফসল, তা সহজেই অনুমেয়।

মুসলিম সরাইখানা

মুসলিম সরাইখানাগুলো ছিল পণ্য, জীবজন্তু এবং লোকজনের বিশাল এক শোভাযাত্রা, যা মাইলের পর মাইল পাড়ি দিয়ে দূরান্তে পৌঁছে যেত। তাদের উদ্দেশ্য থাকতো হজ্জ পালন, আর না হয় বাণিজ্য। এই ব্যবসায়ীগণ তাদের বাণিজ্য-কাফেলা নিয়ে সুদূর চীন পর্যন্ত চলে যেত, যা ভারত, পারস্য, সিরিয়া ও মিশরের মতো বিশাল দূরত্বকে একই সীমায় নিয়ে আসতো।

কিছু কিছু উটের কাফেলা এতো বিশাল হতো যে, আপনি যদি নিজের অবস্থান ছেড়ে আসেন, তবে বিপুল সংখ্যক মানুষের কারণে হয়তো আর সে অবস্থান খুঁজে পাবেন না। বিশালাকার ধাতুর তৈরি কড়াইয়ে খাবার রান্না করা হতো এবং তা গরীব হজ্জযাত্রীদের মাঝে বিতরণ করা হতো। যারা হাঁটতে পারতো না, খালি উটগুলো তাদের বহন করতো। ভেড়া ও ছাগল কাফেলার সাথে থাকতো, যাতে সেগুলো থেকে দুধ, পনির ও মাংসের জোগান পাওয়া যায়। উটের দুধ ও মাংস খাওয়া হতো এবং এসব পশুর উচ্ছিষ্ট শুকনো গোবর ক্যাম্পফায়ার তথা তাঁবুর আগুন জ্বালানোর কাজে ব্যবহৃত হতো। যাত্রাপথে ময়দা, লবণ ও পানি দিয়ে চ্যাপ্টা রুটি ও পিঠা বানানো হতো। ছাগল ও মহিষের চামড়ায় তৈরি থলেতে পানি বহন করা হতো এবং জলাধারগুলো তৃপ্তির স্থান হিসেবে বিবেচিত হতো। দিনের বেলায় মরুভূমির তীব্র উত্তাপ এড়াতে কাফেলাগুলো রাতের বেলায় ভ্রমণ করতো এবং যাত্রাপথ আলোকিত করতে মশাল ব্যবহার করতো। আর এতে অন্ধকার মরুভূমি আলোর আভায় ছেয়ে যেত এবং রাত পরিণত হতো দিনে।

০৮ বস্ত্রশিল্প (টেক্সটাইল)

মধ্যযুগীয় বাণিজ্যের বড় একটা অংশ নিয়ন্ত্রণ করেছে বস্ত্রশিল্প এবং এ শিল্প বৈশ্বিক অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। এমনটি অনুমান করা হয় যে, বস্ত্র উৎপাদন ও বিক্রয় বাণিজ্যই বর্তমান কর্মজীবী মানুষের অধিকাংশকে কর্মমুখর রেখেছে।

৯ম শতাব্দির মাঝামাঝিতে মুসলিম স্পেনে উৎপাদিত বস্ত্রের সুখ্যাতি আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ছড়িয়ে পড়ে, এমনকি তিন শতাব্দি পরেও সোনালি কিনারা ও অলংকারখঁচিত স্পেনের রেশমি কাপড় পর্তুগালের রাণী বিয়াট্রিসের বিয়েতে ব্যবহৃত হয়।

চীনা দক্ষ কারিগরদের মতো স্পেনের মুসলিমগণ তাদের কাজে বেশ সূক্ষ্ম ও পারদর্শী হিসেবে সুপরিচিত ছিল। কেবল কর্ডোবাতেই কার্পেট, গদি, রেশমের গদি, শাল, হেলান দেয়ার নরম আসন বানানোর জন্য ৩০০০-এর মতো তাঁতি ছিল এবং কর্ডোবার চামড়া ইউরোপের চর্মকার তথা জুতা প্রস্তুতকারীদের জন্য অতি মূল্যবান ছিল, কেননা এ চামড়ায় তৈরি জুতার আগ্রহী ক্রেতা সবখানেই পাওয়া যেত। এছাড়াও স্পেনের কুয়েংকা প্রদেশের মুসলিম কারিগরগণ অত্যন্ত চমৎকার পশমি সামগ্রী, বিশেষভাবে পশমের মোটা কম্বল এবং দেয়াল বা আসবাবপত্র ঢাকার রঙিন পশমি সুতার চিত্রযুক্ত কাপড় তৈরিতে বেশ প্রসিদ্ধ ছিল। এগুলো জায়নামাজ এবং সেইসাথে তাদের সুন্দর গৃহে টেবিল ও মেঝে সজ্জিতকরণে ব্যবহৃত হতো।

আন্দালুসে প্রাচ্যদেশীয় কাপড় উৎপাদনে মালাগা ও আলমেরিয়া শহর বিশেষভাবে মনোযোগী ছিল। এ শহরগুলোতে বন্দর থাকায়, যেকোন নতুন স্টাইল এবং পদ্ধতি গ্রহণের ক্ষেত্রে এরা বেশ অগ্রগামী ছিল। মুসলিম স্পেন থেকে মিহি বস্ত্রশিল্প ইউরোপে ব্যাপকহারে ছড়িয়ে পড়ে।

দূর প্রাচ্য ও সেইসাথে ভূমধ্যসাগরের উপকূলীয় অঞ্চলে প্রধানত পারিবারিক সাজসরঞ্জাম তৈরি ও কাপড় উৎপাদনে বস্ত্রশিল্পের ভূমিকা প্রসিদ্ধ ছিল। যাযাবর নারীগণ তাঁবুর ফিতা, ঘোড়ার পিঠে চড়ানো জিন, দোলনা এবং তাদের ভ্রাম্যমান জীবনের ব্যবহার্য সামগ্রী হিসেবে নানা ধরনের জাঁকালো পোশাক বানাতো। এমনকি নগরের মিলনকেন্দ্র ও প্রাসাদগুলোতেও সজ্জার উপকরণ হিসেবে প্রধানত কার্পেট, পর্দা এবং বিভিন্ন ধরনের ঝুলন্ত বস্তু ব্যবহৃত হতো। চেয়ারের পরিবর্তে মানুষ কাপড়ে মোড়ানো নানা ধরনের গদি ও হেলান দেয়ার কোল বা পাশ-বালিশ ব্যবহার করতো। কাপড়ের মান ও উৎকর্ষ থেকে ব্যবহারকারীর আর্থিক সঙ্গতি প্রতিফলিত হতো।

বস্ত্র একইসাথে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক হাতিয়ারও বটে। বিলাসবহুল কূটনৈতিক উপহার বানিয়ে সেগুলো উচ্চপদস্থ ব্যক্তিবর্গ ও অন্যান্য সুধীদের নিয়মিত বিরতিতে উপহার পাঠানো সাধারণ একটা রেওয়াজ ছিল এবং বিশেষ দিন উপলক্ষ্যে শাসকদের নিজ প্রাসাদেই সম্মানসূচক আলখাল্লা, পাগড়ি ও অন্যান্য পোশাক-পরিচ্ছদ বোনা হতো। ১২৫০ খ্রিস্টাব্দে মামলুক সুলতান কর্তৃক নতুন *কিসওয়া* তথা অত্যন্ত মূল্যবান সজ্জায় সজ্জিত আবরণ দিয়ে মক্কা নগরীর কাবাঘর ঢেকে দেয়ার রেওয়াজ চালুর পর থেকে প্রতি বছর নতুন *কিসওয়া* দিয়ে কাবাগৃহ আবৃতের রেওয়াজ খলীফাদের এক বিশেষ প্রাধিকারে পরিণত হয়।

বামে: মুসলিম রেশম ইউরোপের নতুন মধ্যবিত্ত সমাজে এতটাই জনপ্রিয়তা লাভ করে যে, স্থানীয় রেশমশিল্প হুমকির মুখে পড়ে; যার ফলশ্রুতিতে ১৭০০ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার মুসলিম রেশমের আমদানি নিয়ন্ত্রণে বাধ্যতামূলক আইনের প্রবর্তন করে। ডানে: আধুনিক তুরস্কের এক কার্পেট কারখানাতে রেশমগুটি বা গুটিপোকা তুঁত গাছের ডালে বসে আছে। ১৬২০ খ্রিস্টাব্দের দিকে ইংল্যান্ডের রাজা প্রথম জেমস পারস্যের রেশমি কাপড়ে এতটাই বিমোহিত হন যে, তিনি তার নিজস্ব রেশম কারখানা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ পর্যন্ত হাতে নিয়েছিলেন।
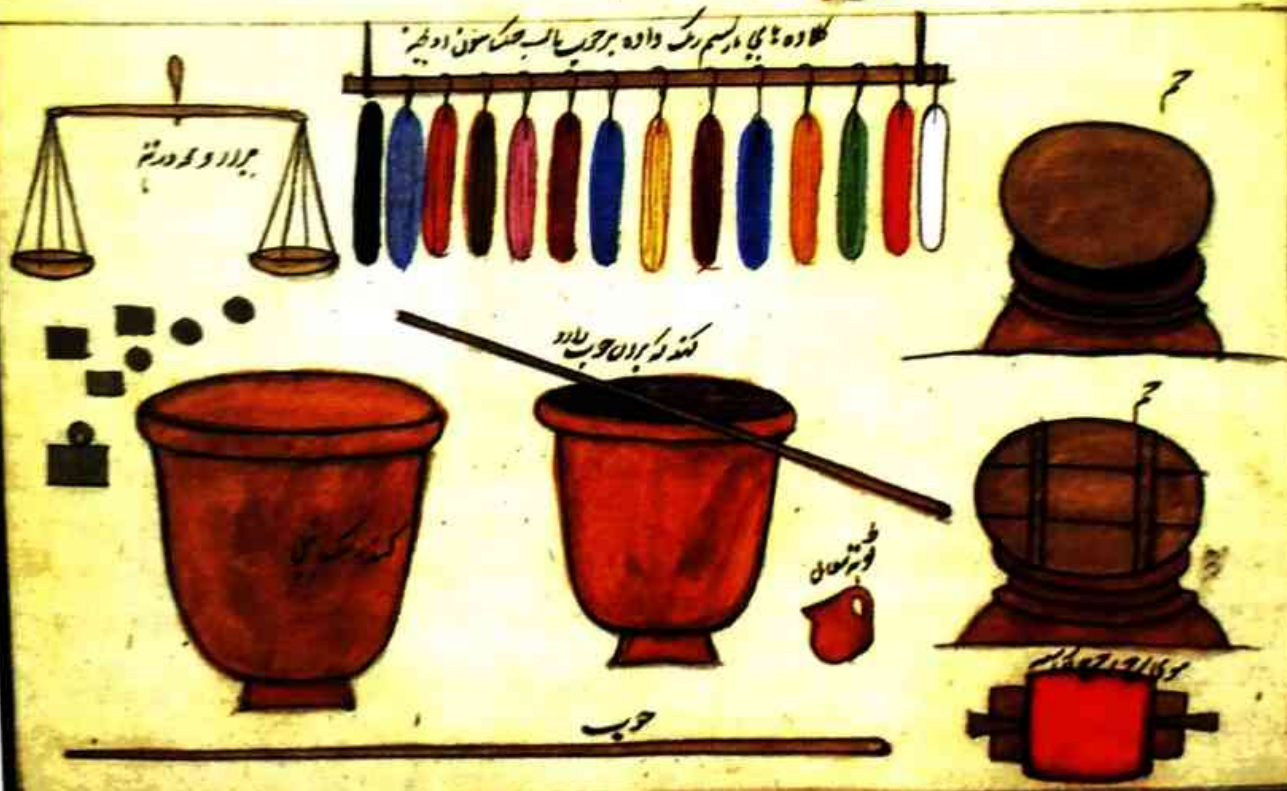
কাপড় রঙকারী রঞ্জক কাপড়ে রঙ করছে – এই দৃশ্য চিত্রায়িত হয়েছে
"কাশ্মীরী বাণিজ্যের অ্যালবাম" শিরোনামের ১৯ শতকের পাণ্ডুলিপিতে ।

ইসলামী বিশ্বে বিস্তৃত পরিসরে বস্ত্রাদির কোনো অভাব ছিল না। ইরান থেকে স্পেন পর্যন্ত পশমি সুতা ও শণের কাপড় দিয়ে ব্যাপকহারে পোশাক প্রস্তুত করা হতো। উপরন্তু, শণের কাপড়ের বাড়তি যোগান নিশ্চিতের জন্য তা আমদানি পর্যন্ত করা হতো, যেহেতু এটা বেশ জনপ্রিয় ছিল। মুসলিম সভ্যতার সমৃদ্ধির পরপর ভারতীয় আদি জাতের তুলাই সমগ্র ভূমধ্যসাগরীয় এলাকায় ব্যাপকহারে উৎপন্ন হতো। এই তুলা সিরিয়া ও ফিলিস্তিনেও উৎপন্ন হতো এবং দক্ষিণ স্পেন হয়ে এটা ইউরোপে প্রবেশ করে। চামড়া বেশ গুরুত্বপূর্ণ একটা শিল্প ছিল এবং ১২শ শতাব্দির আলমোহাদ রাজবংশের যুগে মানসূরের শাসনামলে ফেযে ৮৬-টি ট্যানারি (চামড়া পাকা করার কারখানা) এবং ১১৬-টি বস্ত্র রঙ করার কারখানা ছিল।

কিছু শহর ও নগর তাদের পণ্যের জন্য আন্তর্জাতিকভাবে বেশ প্রসিদ্ধ ছিল। শিরাজ ছিল এর পশমি কাপড়ের জন্য বিখ্যাত: বাগদাদ সিংহাসনের ঝুলন্ত আচ্ছাদন ও ধূসর-বাদামী ডোরাকাটা রেশমি কাপড়ের জন্য; খুজিস্তান উট বা ছাগলের চুল থেকে তৈরি বস্ত্রের জন্য; খোরাসান সোফার চাদরের জন্য; তায়ার কার্পেটের জন্য; বুখারা জায়নামাজ এবং রেশম স্বর্ণের কারুকার্যখচিত রেশমি বস্ত্রের জন্য বিখ্যাত ছিল। কালের নিষ্পেষণ ওই সময়ের এসব পণ্যের কোনো নমুনা অবশিষ্ট না রাখলেও পশ্চিমা জাদুঘর ও প্রাচ্যের শিল্প-সংগ্রহশালাগুলোতে অন্য সময়ের বস্ত্রাদির টুকরো পাওয়া যায়। এসবের মধ্যে ১৪শ শতাব্দির টিকে থাকা মিশরীয় মামুলক সুলতানের আস্তিনবিহীন রেশমি জামার অংশ সবচেয়ে মূল্যবান, যাতে খোদাই করে লেখা রয়েছে, 'জ্ঞানবান সুলতান'। এটা দানজিগ শহরের সেন্ট মেরি চার্চে পাওয়া গেছে।

মুসলিম বস্ত্রাদির প্রতি ইউরোপের এই মোহের সূচনা ঠিক মধ্যযুগ থেকেই, যখন এসব বস্ত্র ক্রুসেডার ও বণিকদের দ্বারা এসব অঞ্চলে আমদানি করা হতো। এগুলোকে এতটাই মূল্য দেয়া হতো যে, পোপ দ্বিতীয় সিলভেস্টারকে পারস্যের অত্যন্ত দামী রেশমি কাপড়ে সমাহিত করা হয়। রাজা প্রথম এডওয়ার্ডের কাস্তালিয় নববধূ রাণী এলিনর ১২৫৫ খ্রিস্টাব্দে নিজের বিয়ের যৌতুক হিসেবে আন্দালুসের কার্পেট ইংল্যান্ডে আনেন।
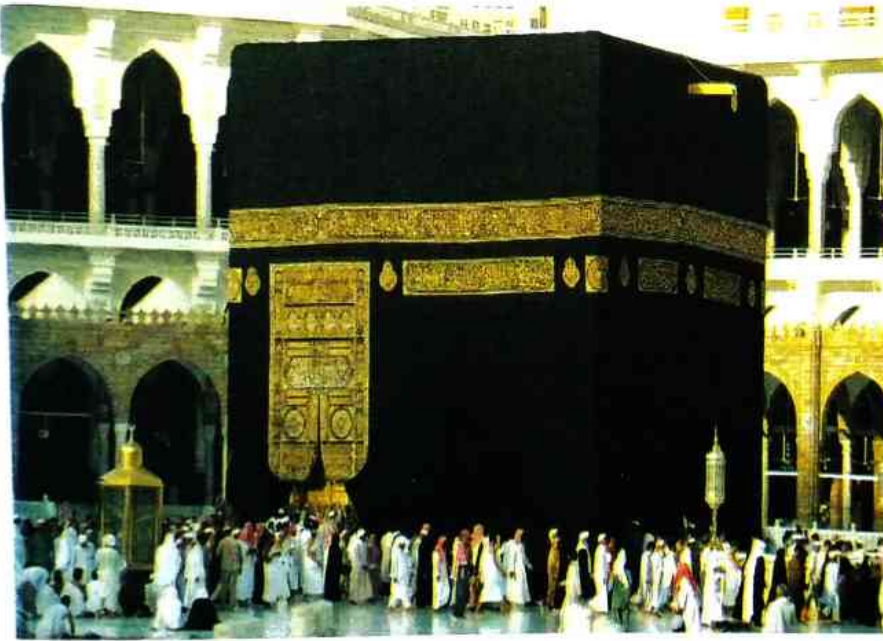
সৌদি আরবের মক্কায় অবস্থিত কাবাঘর কিসওয়া তথা সোনালি ক্যালিগ্রাফির সাথে উন্নত নকশা দিয়ে সজ্জিত কাপড়ে আবৃত। প্রতিদিনের সালাত আদায়ের সময় গোটা দুনিয়ার মুসলিমগণ এই দিকে মুখ করেন। চার দেয়ালের এই ঘর সাধারণত কিসওয়া দিয়ে ঢাকা থাকে। কাবাঘরের প্রবেশ পথ বামে অবস্থিত। নবী আদম (আ.)-এর প্রথম ইবাদতের স্থানে নবী ইব্রাহীম (আ.) ও তার পুত্র ইসমাঈল (আ.) কাবাঘর প্রথম নির্মাণ করেন। নবী মুহাম্মদ (ﷺ)-এর পূর্বে আরবরা এটাকে তাদের দেবতাদের মূর্তির ঘর হিসেবে ব্যবহার করতো, কিন্তু ইসলামের আবির্ভাবের পর এসব মূর্তি ধ্বংস করা হয় এবং বর্তমানে কাবাঘরের ভেতরে এসবের কোনো নিশানা নেই। প্রতি বছর রাজা ও তার অতিথিদের দ্বারা ঘরটি পরিষ্কার করা হয় এবং তখন কাউকে ভেতরে প্রবেশ করতে দেয়া হয় না। ঘরের বামে থাকা লণ্ঠনটিকে নবী ইব্রাহীম (আ.)-এর পদচিহ্ন মনে করা হয়। ইবাদতের অংশ হিসেবে মুসলিমগণ আল্লাহর তাওহীদের আওয়াজ করতে করতে ৭-বার কাবাঘর তাওয়াফ প্রদক্ষিণ করে।

১৭শ শতাব্দির দিকে ইংল্যান্ডের সাথে পারস্যের বাণিজ্য বেশ রমরমা হয়ে উঠে, আর ঠিক এ সময়ে পারস্যের বস্ত্র বাণিজ্য তার শিখরে পৌঁছায়। ১৬১৬ খ্রিস্টাব্দে পারস্যের শাহ বাণিজ্যে উৎসাহ বৃদ্ধির জন্য ইংল্যান্ডকে ৩০০০ বস্তা রেশমি পোশাক ধারে প্রদান করেন; এবং এরপরেই পারস্যের রেশমি বস্ত্র আমদানির একেবারে শীর্ষে উঠে আসে। তিন বছর পরে রয়াল অ্যান (*Royal Anne*) নামের জাহাজ সুরাত হয়ে পারস্য থেকে রেশমি সুতায় তৈরি ১১ বস্তা পণ্য ইংল্যান্ডে নিয়ে আসে। ইংল্যান্ডের তৎকালীন রাজা প্রথম জেমস পারস্যের রেশমি বস্ত্রে এতটাই মোহমুগ্ধ হন যে, তিনি

ইংল্যান্ডে রেশম কারখানা প্রতিষ্ঠার বিষয়টি পর্যন্ত বিবেচনা করেন। তিনি রেশমগুটি বা গুটিপোকা সংগ্রহ করেন এবং নিজের অধিকৃত ভূ-সম্পত্তি ও হোয়াইট হলের বাগানগুলোতে এসব পোকার উপযুক্ত বিকাশ ও বৃদ্ধি নিশ্চিতের জন্য বিশেষ পদক্ষেপ নেন। তিনি রাজকীয় রেশমশিল্পের ব্যবস্থাপক ফ্রান্সের অধিবাসী জন বোনিলকে রেশম চাষ বিষয়ে একটি গবেষণামূলক নিবন্ধ লিখতে আদেশ করেন, যা ১৬২২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

সমসাময়িক সময়ে ভারতের সাথে ইংল্যান্ডের বাণিজ্য বেশ জমজমাট হয়ে উঠে এবং আসবাবপত্রের আচ্ছাদনে ব্যবহৃত ভারতীয় ছিট কাপড় ইংল্যান্ডে পরিচিত করে তোলার পিছনে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সক্রিয় ভূমিকা ছিল। নানা ধরনের মুসলিম নকশা ও চিত্রে চিত্রায়িত এসব সুতি কাপড় ইউরোপীয় সুতি কাপড় এবং একইসাথে দেয়াল-কাপড় (ওয়ালপেপার) উৎপাদনে আদর্শ নমুনায় পরিণত হয়।

১৭শ শতাব্দির দিকে মুসলিম বিশ্ব থেকে আমদানিকৃত বস্ত্রাদি ইউরোপের মধ্যবিত্ত শ্রেণির নিকট বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠে এবং এরফলে স্থানীয় বাজার হুমকির সম্মুখীন হয়। ১৬৮৫ খ্রিস্টাব্দে স্থানীয় রেশম তাঁতিরা অভিযোগ উত্থাপন করে। অন্যদিকে ব্রিটিশ ও ফরাসি রেশম ও পশম ব্যবসায়ীগণ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির উপর নিষোধাজ্ঞা আরোপের দাবী জানায়, কেননা তারা ভিনদেশী বস্ত্রশিল্পের সাথে প্রতিযোগিতায় নেমে ক্ষতিগ্রস্থ হতে ইচ্ছুক ছিল না।

ব্রিটিশ সরকার মুসলিম এলাকা থেকে রেশম আমদানির উপর বাধ্যতামূলক নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে ১৭০০ খ্রিস্টাব্দে আইন জারি করে, যার অধীনে একইসাথে ভারতীয় ছিট কাপড় এবং পারস্য ও চীনা বস্ত্র আমদানিও নিষিদ্ধের আওতায় অন্তর্ভূত হয়।

"মাক্বামাতে হারিরী"র একটি চিত্রকর্ম, যেখানে ইরাকের বাগদাদের এক বালিকার ঘূর্ণায়মান চাকা নিয়ে কাজ করার কিংবা সুতা গুটানোর যন্ত্রে কাজের দৃশ্য চিত্রায়িত হয়েছে।

মিহি রেশম যে কেবল পারস্য থেকেই আসতো বিষয়টি এমন নয়, বরং তুরস্কের বস্ত্র কারখানাতেও মিহি রেশমের উৎপাদন হতো। বুরসার রেশমি পণ্য মানের দিক দিয়ে বেশ নজরকাড়া ছিল, সেখানকার রেশম তাঁতিরা অপূর্বসুন্দর নকশাদার কাপড় প্রস্তুত করতো, যা ইযনিক এলাকার লতাগুল্মের পুনরাবৃত্তিময় নকশা দিয়ে সজ্জিত ছিল। মৃৎশিল্প অধ্যায়ে এ ব্যাপারে আপনি আরও পড়তে পারবেন। এখান থেকেই রেশম ও মখমল (এক প্রকার নরম ও মোটা কাপড়) সুলতানদের পরিবারের নিকট পৌঁছাতো। অটোমানদের পারিবারিক সোফা, হেলান দেয়ার নরম আসন ও পর্দাতে এগুলো ব্যবহৃত হতো এবং এগুলো ক্রমশ অভ্যন্তরীণ সজ্জার অপরিহার্য উপাদানে পরিণত হয়। লেডি মন্টাগু (যার ব্যাপারে আপনি হাসপাতাল বিভাগের ভ্যাকসিন অধ্যায়ে আরও তথ্য পাবেন) তুরস্কের বস্ত্রশিল্পের খ্যাতির বিষয়টি উল্লেখ করেন এবং নিজে পরিধানের মাধ্যমে তিনি তুর্কি পোশাক স্টাইলের ভূয়শী প্রশংসা করেন।

তুর্কি বস্ত্র ও পোশাকের প্রতি উৎসাহী আরেক ব্যক্তি হলেন: সুইজারল্যান্ডের প্রভাবশালী শিল্পী জিন ইটিয়েন লিওটার্ড, যিনি ইস্তাম্বুলে ৫ বছর বসবাস করেন এবং সেখানে থাকাকালে তিনি স্থানীয় তুর্কিদের মতো পোশাক পরতেন। ইউরোপ জুড়ে তুর্কি পোশাক পরিধানের কালচার বিস্তৃতির পিছনে তার অংকিত '*en Sultane*' চিত্রকর্মের নারী মডেলসমূহ বড় ধরনের ভূমিকা পালন করে।

আজকের দিনেও এমন বহু পণ্য রয়েছে, যেগুলো মুসলিম নাম বহন করে, যেমন: মসলিন এসেছে ইরাকের মাওসুল শহরের নাম থেকে, মূলত এ শহরেই পণ্যটি প্রথম প্রস্তুত করা হয়; দামাস্ক (*damask*) এসেছে দামেস্ক থেকে, বাল্ডাসীন (*baldachin* – সিংহাসনের আচ্ছাদন) এসেছে বাগদাদীয়া হতে ('বাগদাদে প্রস্তুতকৃত'), গোজ (*gauze* – তুলা বা রেশমের তৈরি কাপড় বিশেষ) এসেছে গাজা শহরের নাম থেকে, কটন (*cotton* – তুলা) এসেছে আরবী কুতন শব্দ হতে (যার অর্থ: কাঁচা তুলা) এবং স্যাটিন (*satin* – রেশমি বস্ত্র) এসেছে জায়তুনী শব্দ থেকে: বস্তুত সিঙ্গুয়ান কোয়ানের চীনা বন্দর থেকে আমদানি করার পর মুসলিমগণ এটার এই নাম রাখেন।

০৯ কাগজ

আজকের দিনে কাগজ খুবই সাধারণ একটি পণ্য হলেও আধুনিক সভ্যতার ভিত্তি নির্মাণে কাগজের ভূমিকা অপরিহার্য। ম্যাগাজিন, টিভিসূচি, সংবাদপত্র থেকে কাগজের তোয়ালে ও শুভেচ্ছা কার্ড – এগুলোতে প্রতিদিন কী পরিমাণ কাগজ ব্যবহৃত হচ্ছে, তা চিন্তা করলেই কাগজের গুরুত্ব সহজেই অনুমেয় হবে।

৭৫১ খ্রিস্টাব্দে তালাসের যুদ্ধে চীনা যুদ্ধবন্দীদের আটকের পর থেকেই প্রায় ১১শ বছর পূর্বে বাগদাদের মুসলিমগণ কাগজ উৎপাদনে সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে। যুদ্ধবন্দীদের আটককারী মুসলিম সেনারা কাগজ উৎপাদনের চীনা গুপ্ত প্রক্রিয়া জেনে নেয় এবং অতিসত্বর এসব প্রক্রিয়াতে ব্যাপক উৎকর্ষ আনার পাশাপাশি বাগদাদের কারখানা থেকে শুরু করে সুদূর পশ্চিমের দামেস্ক, তাইবেরিয়াস ও সিরিয়ার ত্রিপলী পর্যন্ত কাগজের ব্যাপক উৎপাদন শুরু হয়। উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে কাগজের মূল্যও কমতে থাকে এবং গুণগত মানে তা উন্নত থেকে উন্নত হতে থাকে। দামেস্কের কারখানাগুলোই ছিল ইউরোপে কাগজ সরবরাহের অন্যতম প্রধান উৎস।

সিরিয়ার কারখানাগুলো শণ উৎপাদনে সক্ষম হওয়ায় কাগজ উৎপাদনে তারা বেশ সুবিধা পায়। শণ দৈর্ঘ্য ও মানের দিক দিয়ে শক্ত তন্তুর বিশেষ কাঁচামাল, যা উৎকৃষ্ট মানের কাগজ তৈরিতে ব্যবহৃত হতো। বর্তমানে শণে তৈরি কাগজ পুনরায় ব্যবহারযোগ্য ও পরিবেশবান্ধব হিসেবে সমাদৃত। শণ দিয়ে কাগজ উৎপাদন বেশ সাশ্রয়ী, এমনকি তা কাঠে উৎপাদিত কাগজের উৎপাদন মূল্যের অর্ধেকের চেয়েও কম।

শণের পাশাপাশি মুসলিমগণ লিনেন নামক তন্তুর প্রচলন ঘটায় এবং কাগজ উৎপাদনে কাঁচামালা হিসেবে এটা চীনাদের ব্যবহৃত তুঁতগাছের বাকলের স্থান দখল করে নেয়। লিনেনের কাপড় টুকরো করে পানিতে ভিজিয়ে রেখে খামির বানানো হতো। এরপর এগুলো সিদ্ধ করে ক্ষারধর্মী অবশেষ ও ময়লা অপসারণ করা হতো। পরিচ্ছন্ন কাপড়ের টুকরোগুলোকে ভারী মুগুর দিয়ে পিটিয়ে মণ্ডে পরিণত করার মতো যুগান্তকারী প্রক্রিয়ার সূত্রপাত মুসলিমদের হাত ধরেই ঘটে।

মুসলিমগণ বিভিন্ন কাঁচামাল ব্যবহার করে তুলা দিয়ে কাগজ বানানোর পরীক্ষা-নিরীক্ষা পর্যন্ত চালায়। মাদ্রিদের এসকোরিয়াল লাইব্রেরিতে ১১শ শতাব্দির একটি মুসলিম পাণ্ডুলিপি আবিষ্কৃত হয়, যেখানে এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা রয়েছে।
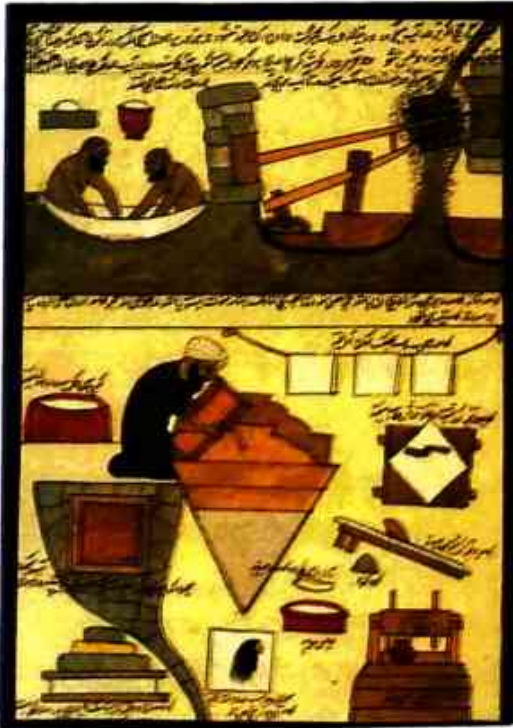
৮০০ খ্রিস্টাব্দের দিকে কাগজ উৎপাদন মিশর পর্যন্ত পৌঁছায় এবং খুব সম্ভবত কাগজে লিখিত কুরআনের সবচেয়ে প্রাচীন পাণ্ডুলিপি দশম শতাব্দির হবে। মিশর হয়ে কাগজ আরও পশ্চিমে যাত্রা করে উত্তর আফ্রিকা থেকে মরক্কো পর্যন্ত পৌঁছে যায়। অন্যান্য বহু বিষয়ের মতো এটাও সেখান থেকে প্রণালী পাড়ি দিয়ে ৯৫০ খ্রিস্টাব্দের দিকে মুসলিম স্পেনে পৌঁছায়। আন্দালুসের মুসলিমগণ এখান থেকেই কাগজ উৎপাদন কৌশল রপ্ত করে নেয় এবং ভ্যালেন্সিয়ার নিকটস্থ জাটিভা শহর *শাতিবী* নামে পরিচিত সরু, মসৃণ ও উজ্জ্বল কাগজ উৎপাদনে ব্যাপক সুখ্যাতি লাভ করে। বাগদাদের কারখানায় উৎপাদন চালু হওয়ার ২০০ বছরের মধ্যে কাগজের ব্যবহার গোটা ইসলামী বিশ্বে সাধারণ একটা বিষয়ে পরিণত হয়।

উপরে: ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের দিকে ভারতের কাশ্মীরে একজন শ্রমিক কাগজের পাত প্রস্তুতে ব্যস্ত আছেন – এটা কাগজের পাত তৈরির প্রাচীন পদ্ধতি। নিচে: ১৭শ শতাব্দির পাণ্ডুলিপিতে কাগজ উৎপাদন প্রক্রিয়ার চিত্র প্রদর্শিত হয়েছে।

এর মানেঃ বই প্রস্তুত আগের তুলনায় বেশ সহজ হওয়ার পাশাপাশি খরচের দিক দিয়ে বেশ সাশ্রয়ী হয়ে উঠে এবং সেইসাথে প্যাপিরাস ও লেখার উপযোগী পশুচর্মের ন্যায় দামী ও সহজলভ্য নয়, লেখার এমন উপকরণের জায়গা কাগজ দখল করে নেয়। এটা বইয়ের উৎপাদন বহুগুণে বাড়িয়ে দেয়। কাগজের পূর্বে বই প্রস্তুত করা বেশ জটিল ও ব্যাপক কারিগরি নৈপুণ্যের উপর নির্ভরশীল ছিল। অনুলিপিকারদের শ্রমের মাধ্যমে বই বানানো হতো বলে কাজটি বেশ জটিল এবং দক্ষ হাতের ছোঁয়া থাকায় কাজটিতে কারিগরি নৈপুণ্যের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম ছিল। কাগজের বদৌলতে বই প্রস্তুতে যে পরিমাণ শ্রম দিতে হতো, তা হ্রাস পেলেও কারিগরি নৈপুণ্যের বিষয়টি অপরিবর্তিত থাকে। ফলে মুসলিম বিশ্বে শত শত নয়, বরং হাজার হাজার তথ্যসমৃদ্ধ বই-পুস্তক সহজলভ্য হয়ে পড়ে, যা সমৃদ্ধশীল বই বাণিজ্য ও শেখার সংস্কৃতিকে দারুণভাবে চাঙ্গা করে। স্পষ্টত, বই প্রস্তুত শিল্পে উৎকর্ষের চূড়ান্ত বিপ্লব আরও পরে সংঘটিত হয়, যখন ইউরোপে ছাপাখানার ব্যবহার শুরু হয়।

কাগজ উৎপাদনের ব্যাপক বিস্তৃতি একইসাথে রঞ্জক, কালি উৎপাদন, পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতকরণের মতো নানা পেশা সৃষ্টির পিছনে বড় অবদান রাখার পাশাপাশি ক্যালিগ্রাফি শিল্পের মতো বিদ্যাগুলোও এর দ্বারা বেশ উপকৃত হয়। ১১শ শতাব্দির তিউনিসের ইবনে বাদীসের ন্যায় চিন্তানায়কের রচিত "*উমদাতুল কুত্তাব*" (লিপিকারদের সহায়ক হাতিয়ার) শীর্ষক গ্রন্থে ছিলঃ কলমের মাহাত্ম, বিভিন্ন রঙের কালির প্রস্তুতপ্রণালী, রঞ্জক ও বিভিন্ন মিশ্রণ দিয়ে রঙকরণ, লেখার সূক্ষ্ম কৌশল এবং কাগজ প্রস্তুতের নানা আলোচনা।

খ্রিস্টান ইউরোপে ১২৯৩ খ্রিস্টাব্দে সর্বপ্রথম বলোনিয়া শহরে কাগজকল প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৩০৯ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডে সর্বপ্রথম কাগজ ব্যবহারের নজির মেলে। কাগজ ও বেশ সস্তায় প্রস্তুতকৃত বইয়ের সমাহার ইউরোপের আনাচে-কানাচে জ্ঞানের বিকাশকে আরও বেগবান করে।

ডেনিশ ঐতিহাসিক ইয়োহান পিডারসেন বলেন, ব্যাপকভিত্তিতে কাগজ উৎপাদনে মুসলিমগণ "কেবল ইসলামী বইয়ের ইতিহাস নয়, বরং গোটা বিশ্বের বইয়ের ইতিহাসে এক তাৎপর্যপূর্ণ কৃতিত্বের আসন অলংকৃত করে আছে।"

কাগজ সজ্জিতকরণ

কাগজ সজ্জিতকরণে মুসলিমরা নানা কলা-কৌশল উদ্ভাবন করে, যা আজকের দিনেও বিভিন্ন লেখার কাগজ ও বইয়ে দেখা যায়। কাগজকে মার্বেলের মতো সাজ দেয়াটা এমনই এক কায়দা, যেটা কাগজকে শিরাযুক্ত কাপড়ের রূপ দেয়; এ ধরনের কাগজ গুরুত্বপূর্ণ পাণ্ডুলিপি আবৃত করতে ব্যবহৃত হতো।

কাগজকে মার্বেলের মতো সাজ দেয়ার এই কৌশল তুর্কি ভাষায় ইব্রু (অর্থঃ মেঘলা) অথবা আব্রু (অর্থঃ পানিমুখ) নামে পরিচিত। ইব্রু শব্দটি এসেছে প্রাচীন মধ্য এশীয় ভাষা হতে, যার অর্থঃ 'শিরাযুক্ত কাপড় বা কাগজ'। এর আদি উৎস সম্ভবত চীনে মিলবে এবং সিল্ক রোড যোগে কাগজকে মার্বেলের মতো সাজ দেয়ার এই কৌশল ইরানে প্রবেশ করে, অতঃপর তা আনাতোলিয়ার দিকে অগ্রসর হয়ে ইব্রু নাম ধারণ করে।

১৬শ শতাব্দির শেষের দিকে আনাতোলিয়া থেকে আগত বণিক, কূটনৈতিক ও পর্যটকগণ কাগজকে মার্বেলের মতো সাজ দেয়ার এই শিল্পকে ইউরোপে নিয়ে আসে এবং ১৫৫০ খ্রিস্টাব্দের দিকে এটা বইপ্রেমীদের পরম আকাঙ্ক্ষিত বস্তুতে পরিণত হয়, যা 'তুর্কি কাগজ' বা 'কাগজকে মার্বেলের মতো সাজ দেয়ার তুর্কি কৌশল' নামে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করে। পরবর্তীতে ইতালি, জার্মানি, ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডে এর ব্যাপক ব্যবহার ছড়িয়ে পড়ে।

ইব্রু নিয়ে নানা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়, যেমনঃ ১৬৬৪ খ্রিস্টাব্দে আথানাসিয়াস কার্চার *Discourse on Decorating Paper in the Turkish Manner* (তুর্কি নিয়মে কাগজের সজ্জাকরণ) নামে গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ১৭শ শতাব্দির এই জার্মান পণ্ডিত রোমে কাগজকে মার্বেলের মতো সাজ দেয়ার এই শিল্পের বিকাশে অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন।

মার্বেলের মতো সাজ দেয়া কাগজ, যেটাকে ১৬শ শতাব্দির ইউরোপীয়রা পরম আকাঙ্ক্ষিত বস্তু মনে করতো এবং এটাকে তারা তুর্কি কাগজ নামে ডাকতো।

১০ মৃৎশিল্প
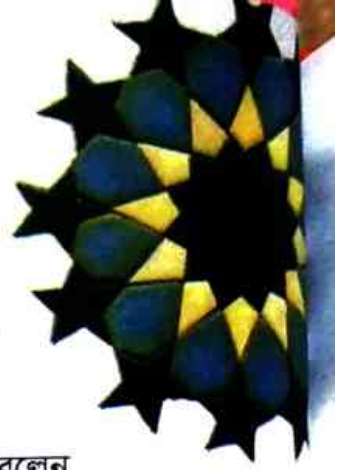
প্রায় হাজার বছর ধরে মুসলিম এলাকাগুলো বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সিরামিক এবং মাটির সামগ্রী প্রস্তুত করেছে। শোভাবর্ধক বা অলঙ্কার হিসেবে এগুলোর কেনা-বেচা হতো। রান্নাবান্না, আলোকসজ্জা ও ধোয়া-মোছার মতো গৃহস্থালীর কাজে এগুলোর ছিল ব্যাপক ব্যবহার। এক সহস্রাব্দ পরে, এই পাত্রগুলো বিভিন্ন ইউরোপীয় প্রত্নতাত্ত্বিক খননে পুনরুদ্ধার হচ্ছে।

পাত্র নির্মাণ বস্তুত বড় ধরনের বাণিজ্য। ১৪শ শতাব্দির শেষার্ধের ঐতিহাসিক আল-মাক্বুরিযী বলেন, কায়রোতে "প্রতিদিন যে পরিমাণ ময়লার স্তুপ জমা হতো ... তার মূল্যমান কয়েক হাজার দিনারের সমান। লাল পোড়ামাটির পরিত্যক্ত এসব অবশিষ্টাংশের মাঝে দুধ বিক্রেতাগণ তাদের দুধ রাখতো, পনির বিক্রেতাগণ তাদের পনির রাখতো এবং গরিবেরা রাখতো তাদের রেশন, যা তারা রান্নার দোকানে দাঁড়িয়েই খেয়ে নিতো।"

প্রাচ্যের মৃৎশিল্পের কেন্দ্রগুলো ইরাকের বাগদাদ ও সামার্‌রাতে বিকাশ লাভ করে। সামার্‌রাতে চালানো খননকার্যে দেখা যায় যে, ৮৩৭ থেকে ৮৮৩ খ্রিস্টাব্দব্যাপী খলীফাদের ব্যবহৃত বাসভবনে কাচের মতো চকচকে প্রলেপ দেয়া ও প্রলেপহীন পাত্র, খোদাই ও মোহরাঙ্কিত পাত্র ছিল এবং এগুলো প্রধানত তিন প্রকারের ছিল। প্রথমটি, সাদা রঙবিশিষ্ট এবং কোবাল্টের নীলের উপর ফোটা ফোটা দাগ বা কৃত্রিম ক্যালিগ্রাফির পুনরাবৃত্তিময় নকশা দিয়ে সজ্জিত। দ্বিতীয়টি, ৭ম ও ৮ম শতাব্দির চীনা তাং আমলে পাথরের বাসনপত্র দিয়ে প্রভাবিত দ্বৈত আভার ডোরা কাটা নকশা এবং বিভিন্ন রঙের সংমিশ্রণে সজ্জিত। তৃতীয় ধরনের পাত্রের বিশেষ ধরনের দীপ্তি ছিল, যে সজ্জার কারণে এটাকে অনেকটা ধাতব মনে হতো।

অত্যন্ত দক্ষতার সাথে আজকের দিনের আধুনিক কুমোরের চাকের মতো করে এই পাত্রগুলো তৈরি হতো এবং এরপর সেগুলো শুকিয়ে চুল্লিতে পোড়ানো হতো। এগুলো দুষ্প্রাপ্য বস্তুর সংগ্রাহকদের সংগ্রহ (*collectors' items*) এবং সৌন্দর্য ও শিল্পের অমূল্য রত্নে পরিণত হয়। কেননা মুসলিমগণ এক্ষেত্রে পূর্ববর্তীদের ছাড়িয়ে যায় এবং মাটির তৈরি জিনিসপত্রের চাকচিক্য, রঙ এবং সজ্জাকরণে ব্যাপক সমৃদ্ধি আনার পাশাপাশি তারা এসবে নিয়ে আসে নতুন ভাবনা ও কৌশলের ছোঁয়া।

মিশরসহ ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে রোমানরা প্রধানত লালচে রঙের সাথে উজ্জ্বল সবুজ বা হলদে বাদামি রঙের মিহি প্রলেপের পোড়া মাটির বাসনপত্রের বিস্তৃতি ঘটায়। এসবের সাথে সীসা যোগ করে মুসলিমগণ আরও বেশি মসৃণ ও চমৎকার কারুকার্যের নিখুঁত পাত্র তৈরিতে সফল হয়, যা পানীয় রাখার পাত্র হিসেবে বেশ যুৎসই।

আব্বাসী আমলের মৃৎশিল্পীগণ সীসার স্বচ্ছ প্রলেপের এই কৌশল লুফে নেয় এবং এর সাথে টিন-অক্সাইড যোগ করে, যেহেতু তারা অত্যন্ত দামী বৈচিত্রময় চীনা বাসনপত্রের মতো করে সাদা রঙের নিখুঁত পালিশ-সমৃদ্ধ সিরামিক সামগ্রী তৈরির একটা পথ খুঁজছিল। ইরাক ও চীনের কাঁচামাল সম্পূর্ণ ভিন্ন হওয়ায় কাঁচামালের সঠিক ব্যবহারে পটু মুসলিম মৃৎশিল্পীগণ টিন-অক্সাইডের আস্তরণের প্রচলন ঘটায়। এটা আলোনিরোধক গুণকে উল্লেখ্যযোগ্য হারে বৃদ্ধির পাশাপাশি বহুল কাঙ্ক্ষিত সাদা রঙের নিখুঁত পালিশের কৌশলটিও তাদের সামনে হাজির করে।

নকশার ক্ষেত্রে তৃপ্ত নয়, এমন মৃৎশিল্পীগণ তাদের উদ্ভাবন শৈলীকে কাজে লাগিয়ে 'সাদার উপর নীল' সজ্জা কৌশল উদ্ভাবন করেন, পরবর্তীতে এগুলো চীনে পুনরায় আমদানী হয়ে সেখানে তুমুল জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং খোদ চীনেই তা ব্যাপক বিস্তৃত হয়। সাদার উপর নীল নকশার বাসনপত্রগুলো আব্বাসী মৃৎশিল্পীগণের গর্বের বস্তু ছিল এবং তারা তাদের

উপরে: আন্দালুসীয়ার জ্যামিতিক টালির খণ্ডিতাংশ।
নিচে: সিসিলির ত্রাপানিতে পাওয়া ১৪শ শতাব্দির মামলুক আমলের ফ্রিট (বালু ও অন্যান্য উপাদানের দক্ষ মিশ্রণে তৈরি) চকচকে পাত্র।

বেশিরভাগ কর্মেই নিজেদের নামের স্বাক্ষর সংযুক্ত করে দিতেন। নিজের নামের স্বাক্ষর যুক্ত করে দেয়া এমন এক মৃৎশিল্পী হলেন: আবাওয়াই, যিনি নিজেকে *'সানি' আমিরুল মুমিনীন'* হিসেবে তুলে ধরতেন, যেটা বলে দিচ্ছে যে, তিনি খলীফার একজন কারিগর। হস্তশিল্প এবং বিশেষভাবে মৃৎশিল্পের প্রতি খলীফাদের যে উৎসাহ ও আর্থিক আনুকূল্য ছিল, এটা মূলত তারই দৃষ্টান্ত।

৮ম শতাব্দিতে ইরাকে কর্মরত মৃৎশিল্পীগণ *'আল-বারীক আল মা'দিনী'* (*luster* - দীপ্তিময় মিহি স্বচ্ছ প্রলেপ শৈলী) নামে পরিচিত এক রহস্যময় কৌশলের বিকাশ ঘটায়। এই প্রক্রিয়াতে বিভিন্ন সামগ্রীতে "অসাধারণ ধাতব ঔজ্জ্বল্য আনয়ন করা যেত, যা কার্যকারিতার দিক দিয়ে অন্যসব মূল্যবান ধাতুর সাথে পাল্লা দেয়ার মতো ছিল; বস্তুত এটা ছিল মাটির বস্তুকে সোনায় বদলে দেয়ার এক কর্মযজ্ঞ" টেলিভিশন উপস্থাপক আমানি যেইন বিবিসি'র *What the Ancients Did for Us: The Islamic World* শীর্ষক প্রামাণ্যচিত্রে বিষয়টি এভাবে তুলে ধরেন।

দীপ্তিময় মিহি স্বচ্ছ প্রলেপ শৈলী (*luster*) বিভিন্ন সামগ্রীতে চকচকে বৈশিষ্ট্য আনার প্রয়োজনীয় উপকরণ সস্তায় ও গ্রহণযোগ্য পন্থায় সরবরাহে ব্যাপক ভূমিকা রাখে, যেহেতু ইসলাম সোনা ও রুপার তৈরি সামগ্রী ব্যবহারে অনুমোদন দেয় না।

এই প্রক্রিয়াতে মাটির কোনো মাধ্যম যেমন গিরিমাটির সাথে সিলভার বা কপার-অক্সাইড মিশানো হতো, অতঃপর প্রভাবক হিসেবে ভিনেগার বা আঙ্গুরের রস যোগ করা হতো। ৮ম শতাব্দির ইরাকী মৃৎশিল্পীগণ আবিষ্কার করেন যে, তারা যদি মৃৎসামগ্রীর পালিশ করা প্রলেপের উপর এই মিশ্রণ দিয়ে নকশা অঙ্কন করে ওই আর্দ্র পাত্র চুল্লিতে ধোঁয়াময় ও তীব্র আগুনে পোড়ানোর জন্য দ্বিতীয়বার রাখে, তবে সেখানে ধাতব পাতলা আস্তরণ থেকে যায়। ছাইভস্ম ও ধূলো পরিষ্কারের পর সেখান থেকে রংধনুর ন্যায় রঙিন এক আভা বেরিয়ে আসে।

বস্তুত, আগুনে পোড়ানোর সময় কপার ও সিলভার-অক্সাইড পৃথক হয়ে যায় এবং ধাতুর উপরিতলে টিনের প্রলেপ হিসেবে পাতলা আবরণী রেখে আসে। সিলভার সেখানে আবছা হলদে বা সোনালি এবং রুপালি আভা সৃষ্টি করে, অন্যদিকে কপার সৃষ্টি করে গাঢ় কালো, রক্তিম ও চুনি রঙের আবহ। আলো কী মাত্রায় পড়ছে, তার উপর ভিত্তি করে রংধনুর ন্যায় রঙিন আভার মাত্রা নির্ভর করে। এক-রঙা বা সোনালি, সবুজ, বাদামি, হলুদ ও লাল থেকে শুরু করে প্রায় শত রঙের তরল আভা এই প্রক্রিয়াতে বানানো সম্ভব।

সজ্জিত টাইলসও এই প্রক্রিয়াতেই বানানো হতো। বর্গাকৃতির এই গঠনগুলোর বৈচিত্রময় রঙ ও তাদের সামঞ্জস্যময় বিন্যাস মসজিদ ও প্রাসাদগুলোতে এনে দিতো রাজকীয় জৌলুস।

দীপ্তিময় মিহি স্বচ্ছ প্রলেপ শৈলী বাগদাদ হতে গোটা মুসলিম বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে এবং সেইসাথে ৯ম শতাব্দির তিউনিসিয়ার কায়রাওয়ানে শুরু হয় চকচকে টাইলসের উৎপাদন। আরেক শতাব্দি পার হলে এটা পৌঁছে যায় স্পেনে। কর্ডোবার নিকটে খিলাফতের শহর *মাদীনাতুয যাহরার* প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনে বিপুল সংখ্যক মৃৎ-সামগ্রী আবিষ্কৃত হয়, যেগুলোর অঙ্কিত রেখাগুলো বাদামি বর্ণের ম্যাঙ্গানিজ এবং রঙিন পৃষ্ঠতল সবুজ বর্ণের কপারের নকশা দিয়ে তৈরি। কয়েক শতাব্দি পর আন্দালুস তার নিজস্ব উৎপাদন কেন্দ্র গড়ে তোলে, যেমন: মালাগাতে প্রস্তুত হতো সোনালি বর্ণের দীপ্তিময় আভার বাসন এবং 'আল-হামরা' জগের মতো বিশালাকার জগ।

বাগদাদ ও সামার্‌রাতে দক্ষ কারিগরগণ আজকের দিনের আধুনিক পদ্ধতি ব্যবহার করে মৃৎ-সামগ্রী প্রস্তুত করতেন।

টেলিভিশন উপস্থাপক আমানি যেইন বিবিসি'র *What the Ancients Did for Us: The Islamic World* শীর্ষক প্রামাণ্যচিত্রে বলেন, "আল-হামরার দৃষ্টিনন্দন এই জগগুলো প্রকৃতপক্ষে তেল ও খাদ্যশস্য সংরক্ষণের জন্য ব্যবহৃত হতো। কিন্তু খলীফাদের প্রাসাদে এই পাত্রগুলোর নকশা এক অনন্য সুন্দর আভা ধারণ করতো। যারা এগুলো দেখতো, তারা ধরেই নিতো যে, এগুলো নিশ্চিতভাবে কোনো না কোনো মূল্যবান ধাতুর তৈরি।"

মুসলিম মৃৎশিল্প

"চীনা মৃৎশিল্পীদের সাথে সাথে আরব বিশ্বের মৃৎশিল্পীগণ এমনকিছু অনন্য সুন্দর কারুকার্যমণ্ডিত মৃৎসামগ্রী তৈরিতে সম্পৃক্ত ছিলেন, যেগুলো গোটা মধ্যযুগে ব্যাপক জনপ্রিয় ছিল। আরবের এসব পণ্য যখন পশ্চিমা খ্রিস্টান এলাকাতে পৌঁছে, তখন সেগুলোর মূল্য বহুগুণে বৃদ্ধি পায় এবং তা বিলাসী সামগ্রী হিসেবে বিবেচিত হতে থাকে।"

– ইংল্যান্ডের ক্যান্টারবারির লংমার্কেটে পরিচালিত খননকার্যে পাওয়া ইসলামী মৃৎসামগ্রী নিয়ে খ্যাতনামা প্রত্নতত্ত্ববিদ জন কটারের বিবরণ

উত্তর আফ্রিকার বাজারের একটি স্টলে মৃৎসামগ্রী প্রদর্শিত হচ্ছে।

সাধারণ মানুষের জন্য দৈনন্দিন ব্যবহার্য পাত্রের প্রয়োজন ছিল এবং স্পেনে এ ধরনের পাত্রের মাঝে *ক্বাদুস* নামের পাত্রটি সবচেয়ে জনপ্রিয় ছিল। পাত্রটি জলচালিত চাকা *নাউরগুলোতে* পানি বহনে ব্যবহৃত হতো, এই বিভাগের পানি সরবরাহ অধ্যায়ে এ সম্পর্কে আপনি বিস্তারিত তথ্য পাবেন। এই সম্প্রতি টিন এটার জায়গা দখলের আগ পর্যন্ত চকচকহীন ব্যবহার্য পাত্র হিসেবে এর কদর ছিল সার্বজনীন এবং এটা ছিল গ্রামীণ মৃৎশিল্পের অন্যতম প্রধান অবলম্বন।

"আরবরা এমন কৌশল উদ্ভাবন করে, যা মাটির পাত্রকে দেয় শিল্পের মর্যাদা।"

– *What the Ancients Did for Us: The Islamic World* শীর্ষক প্রামাণ্যচিত্রে ঔজ্জ্বলকরণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিবিসি'র উপস্থাপক আমানি যেইনের মন্তব্য

পানি বহনের প্রয়োজনীয় পাত্র তৈরির সাথে সাথে স্পেনের মুসলিমরা ১২শ শতাব্দির গোড়ার দিকে টাইলস ও *আজুলিজসের* মাধ্যমে বাইযান্টিন মোজাইকের বাজার দখল করে নেয়। নীল-সাদার এসব চমৎকার টাইলস জ্যামিতিক, লতাগুল্ম ও ক্যালিগ্রাফির নকশা দিয়ে সজ্জিত থাকতো। চকচকে চিত্রযুক্ত চীনা মাটির এসব টাইলস আজও মালাগাতে জনপ্রিয়। আমরা জানি, কোবাল্ট অক্সাইডের নীল আভা দিয়ে সজ্জিত *আজুলিজস* প্রাচ্য থেকে মালাগাতে প্রবেশ করে এবং সেখান থেকেই এটা ছড়িয়ে পড়ে মুর্সিয়া হয়ে ১৪শ শতাব্দির শুরুর দিকের খ্রিস্টান স্পেন ও ভ্যালেন্সিয়াতে, অতঃপর তা বার্সেলোনাতে পৌঁছায়।

মঙ্গোল আক্রমণ থেকে পালিয়ে আসা কারিগররা কোনিয়া শহরে জড়ো হয়, যার বদৌলতে মৃৎশিল্পে তুরস্ক পরিণত হয় সমৃদ্ধ এক কেন্দ্রে। ১৪শ শতাব্দির শুরুর দিকের কোনিয়া সালতানাতের পতন আনাতোলিয়ার সিরামিক উৎপাদনে স্থবিরতা নেমে আসে, কিন্তু অটোমান তুর্করা যখন ১৩২৬ খ্রিস্টাব্দে বুসরাকে তাদের রাজধানী বানায়, তখন এই সিরামিক শিল্প এক চমৎকার নবজাগরণ প্রত্যক্ষ করে। সিরামিকের টাইলসে সজ্জিত ভবন নিয়ে শহরটি আবার নতুনভাবে মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়।

উৎপাদনের দিক দিয়ে বুসরার চেয়েও ইযনিক শহর অধিক কর্মব্যস্ত ছিল এবং এটাই ছিল এ শিল্পের প্রধান কেন্দ্র। ১৪শ শতাব্দির শেষ হতে প্রায় দুই শতাব্দি পর্যন্ত এ শিল্প ব্যাপকহারে বিকশিত হয়। সাধারণ একটি ইযনিক সজ্জা অঙ্কন করা হতো অর্ধতরল কাদামাটির উপর কোবাল্টের নীল, সবুজাভ নীল রঙ ও (কপারের) সবুজের মাঝে এবং

তুরস্কের ইযনিক শহরের মৃৎশিল্পীগণ এই সর্পীল বাসন ১৬শ শতাব্দির গোড়ার দিকে তৈরি করেছিলেন।

অনিন্দ্য সুন্দর টমেটো লাল রঙের মুদ্রা-চিত্র দ্বারা কিনারার অংশ সজ্জিত হতো। আয়তাকার টাইলসগুলো মিলে যে নকশা দাঁড় করায়, তার সবগুলো ছিল লতাগুল্মের পুনরাবৃত্তিময় সাজ এবং প্রথাগতভাবে সেখানে চারটি ফুল থাকতো। চারটি ফুল ছিল: গোলাপ, জেসমিন, লাল রঙের পুষ্পবিশেষ – কার্নেশান এবং টিউলিপ।

মিহি স্বচ্ছ প্রলেপ (*Glaze*) এবং দীপ্তিময় মিহি স্বচ্ছ প্রলেপ শৈলীর কারিগরি দক্ষতায় মুসলিম মৃৎশিল্পীগণ দশ শতাব্দিরও অধিক সময় ধরে একচ্ছত্র আধিপত্য ধরে রাখার পাশাপাশি আজকের মৃৎশিল্প ওইসব কারিগরের অবদানের নিকট ব্যাপকভাবে ঋণী। স্পেন ও সিসিলির মৃৎশিল্পীদের থেকে নানা উপাদান ও হরেক রঙের মৃৎসামগ্রী উৎপাদনের নয়া ধরন ও কৌশল ইউরোপে প্রবেশ করে। টিনের মিহি স্বচ্ছ প্রলেপের কৌশলটি ৯ম শতাব্দিতে যখন মুসলিমদের মাধ্যমে স্পেনে প্রবেশ করে, তার আগ পর্যন্ত ইউরোপ এ সম্পর্কে একেবারে বেখবর ছিল।

মুসলিম মৃৎশিল্প যে স্পেনের বাহিরেও বিস্তৃত হয়েছিল, সে ব্যাপারে ব্যাপক তথ্য রয়েছে। যেমন, মালাগা শহরের মৃৎসামগ্রী ইংল্যান্ডে পাওয়া যায়, যেখানে ১৩শ শতাব্দির শেষার্ধ ও ১৪শ শতাব্দি সময়ের ৪৪-টি এবং ১৫শ শতাব্দির আরও ২২-টি দীপ্তিময় মিহি স্বচ্ছ প্রলেপের মুর আমলের মৃৎসামগ্রী রয়েছে। অতি সম্প্রতি, ক্যান্টারবারির কেন্দ্রস্থ লংমার্কেটে পরিচালিত ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দের খননকার্যে ইসলামী আমলের দীপ্তিময় মিহি স্বচ্ছ প্রলেপ এবং সবুজাভ নীল রঙের বিপুল পরিমাণ মৃৎসামগ্রী আবিষ্কৃত হয়েছে।

মুসলিম মৃৎশিল্পীদের তৈরি পাত্রগুলো কীভাবে ইংল্যান্ডে আসে, সে সম্পর্কে ক্যান্টারবারি অনুসন্ধানে কর্মরত জন কটার লিখেন, "কিছু পাত্র পবিত্রভূমি থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় ক্রুসেডারদের মালপত্রের সাথে ইংল্যান্ডে প্রবেশ করে ... পবিত্রভূমি বা স্পেনের কম্পোসটেলায় অবস্থিত সেন্ট জেমসের সমাধিমন্দির জিয়ারতের সময় মধ্যযুগীয় তীর্থযাত্রীরা স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে বিশেষ এসব ইসলামী পাত্র সাথে করে নিয়ে আসতো, এটাও সম্ভাব্য আরেকটি কারণ।" কদাচিৎ কিছু ক্ষেত্রে মুসলিম মৃৎশিল্পীদের তৈরি পাত্রগুলোর ইংল্যান্ডে অনুপ্রবেশ সরাসরি পথে ঘটতো। উদাহরণস্বরূপ, আমরা জানি যে, ১২৮৯ খ্রিস্টাব্দে রাজা প্রথম এডওয়ার্ডের স্পেন দেশীয় স্ত্রী, কাস্তালের ইলিয়েনর রাজকীয় গৃহস্থালীর জন্য *মালিক* অঞ্চলের চার হাজার পাত্র ক্রয়ের ফরমায়েশ করেন। এখানে *মালিক* অঞ্চল নিশ্চিতভাবে আন্দালুসের দীপ্তিময় মিহি স্বচ্ছ প্রলেপের মৃৎসামগ্রী উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র মালাগাকে নির্দেশ করে (মালাগা শহরের আরবী নাম *মালিকা*)।

লন্ডনের ব্লসম্‌স ইন নামে পরিচিত স্থানে ১৪শ শতাব্দির একটি দীপ্তিময় মিহি স্বচ্ছ প্রলেপের বাসন পাওয়া যায়, যা প্রাণবৃক্ষ এবং সেইসাথে কুফি খোদাইকার্য দিয়ে সজ্জিত ছিল। এগুলো ওই সময় আন্দালুস ও উত্তর আফ্রিকাতে বেশ জনপ্রিয় ছিল এবং এ ধরনের সজ্জা ব্যাপক হারে ইউরোপে নকল হতে থাকে। ১৩০৩ খ্রিস্টাব্দের কেন্ট শহরের স্যান্ডউইচ পোর্টে আমদানি ও রপ্তানিকৃত পণ্যের উপর নতুন করে যে শুল্ক আরোপ করে, তার হিসাব নথিতে আশ্চর্যজনকভাবে ইংল্যান্ডে এই বাসনের অনুপ্রবেশের বিবরণ পাওয়া যায়। বাসনটি বর্তমানে লন্ডনের গিল্ডহল জাদুঘরে রয়েছে।

আমাদের জন্য রেখে যাওয়া মুসলিম মৃৎশিল্পীদের আরেকটি সুপরিচিত সিরামিক ব্র্যান্ড হচ্ছে: তথাকথিত মায়োলিকা বাসনসামগ্রী। ১২৩০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মুসলিম শাসনে থাকা মেজরকা ও বালিয়ারিক দ্বীপের সাথে জড়িয়ে রয়েছে এই সিরামিক ব্র্যান্ডের সূচনার গল্প। জেনোয়া ও ভেনিসের ইতালীয় জাহাজগুলো টিনের মিহি স্বচ্ছ প্রলেপ দেয়া মৃৎসামগ্রী সংগ্রহ এবং মুরীয় মৃৎশিল্পীদের ভাড়া করতো; বস্তুত এরাই সিসিলিতে মেজরকীয় মৃৎশৈলীর আবির্ভাব ঘটায়। ধীরে ধীরে এটা প্রধান শৈলী হিসেবে নিজের আসন প্রতিষ্ঠা করে এবং পরিণত হয় 'মাজ্যোলিকা' বা 'মায়োলিকা' নামে সমধিক পরিচিত শৈলীতে।

আন্দালুস ও মিশরীয় কারিগরদের ব্যবহৃত উৎপাদন ও সজ্জাকরণ কৌশল অবলম্বন করে ১৫শ শতাব্দি হতে মায়োলিকা শৈলী পূর্ণতার এক বিস্ময়কর পর্যায়ে পৌঁছায়। পরবর্তীতে ইতালীয় শিল্পীগণ এটাতে নানা বৈচিত্র নিয়ে আসে, যেমন: গুবিও দীপ্তিময় মিহি স্বচ্ছ প্রলেপ শৈলী, যা মূলত সবুজাভ হলুদ, স্ট্রবেরির গোলাপি ও রুবির লাল আভার সংমিশ্রণ। এমনকি বর্তমান সময় পর্যন্ত এই মায়োলিকা নকশাশৈলী ইতালির সিরামিক ইন্ডাস্ট্রি মাতিয়ে রেখেছিল।

১১ কাচশিল্প

অতীতে কাচের ব্যবহার সম্পর্কে আমরা যা কিছু জানি, তার সবই এসেছে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন ও বিভিন্ন সময়ের পর্যটকদের দেয়া বিবরণ থেকে। সে সূত্রে আমরা অবগত যে, ১৩শ ও ১৪শ শতাব্দির সিরিয়ার আলেপ্পো ও দামেস্ক শহর ছিল এই সূক্ষ্ম উপাদানের প্রধান কেন্দ্র। ১৩০০ খ্রিস্টাব্দের দিকে এসব এলাকা ভ্রমণের সময় ইবনে বতুতা দামেস্ক শহরকে কাচ প্রস্তুতের কেন্দ্র হিসেবে অভিহিত করেন। কেবল সিরিয়া নয়, বরং মিশর, ইরাক ও আন্দালুস ৮ম শতাব্দি ও তৎপরবর্তী সময়ে বিপুল পরিমাণে কাচ ও কাচ পণ্য উৎপাদনে জড়িত ছিল। এক্ষেত্রে দুটো প্রন্থা মুখ্য ছিল – স্ফটিক থেকে কর্তন এবং ছাঁচে বাতাস প্রবেশ করিয়ে আকৃতি প্রদান।

সিরিয়া ও মিশরভিত্তিক রোমানদের রেখে যাওয়া কাচশিল্পের উত্তরাধিকার মুসলিমরা লাভ করে এবং সেইসাথে বিকাশ ঘটায় দ্বৈত সিলমোহরের নকশা (যেখানে সজ্জিত নকশার সিলমোহর উত্তপ্ত কাচের উপর চেপে ধরা হয়); সুতার সজ্জাসহ গলিত কাচে বাতাসের প্রবাহ ঘটিয়ে অনিয়মিত আকৃতি প্রদান (এটা রোমান ও বাইযান্টিনদের থেকে চলা আসা প্রথা); ছাঁচে বাতাস দিয়ে আকৃতি প্রদান (যেখানে কাচ প্রস্তুতকারীরা আগে থেকে বানানো ছাঁচে উত্তপ্ত তরল কাচ প্রবাহিত করে); এবং হাত ও চক্র দিয়ে কাচে নকশা খোদাই ও কর্তনের মতো বহু বিষয়ের। কাচ দিয়ে সজ্জার বিষয়ে মুসলিমগণ পূর্ণতা নিয়ে আসে এবং বোতল, ফ্লাস্ক, পাত্র ও কাপসহ বিভিন্ন ব্যবহার্য সামগ্রীতে তারা এসব সজ্জার বিস্তৃতি ঘটায়।

১৩শ শতাব্দির দিকে, সিরিয়ার কাচ এতটাই সূক্ষ্ম ছিল যে, গোটা দুনিয়ার ব্যবসায়ী ও ক্রেতাগণ সেসব নমুনা সংগ্রহে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে এবং সাম্প্রতিককালের খননে সুইডেন, দক্ষিণ রাশিয়া, এমনকি চীনেও এনামেলে সজ্জিত ৭০০ বছরের পুরোনো সিরীয় কাচপাত্র আবিষ্কার এটার সাক্ষ্য দেয়।

নিজস্ব কাচের জন্য ইরাকের সামার্‌রা ছিল বেশ প্রসিদ্ধ। খননকার্য থেকে আবিষ্কৃত জিনিসগুলোর মাঝে *মিলেফিওরি* বা মোজাইক কাচ সবচেয়ে দৃষ্টিনন্দন। বিশেষ রঙ ও নকশার জন্য এই কাচ তার পূববর্তী ধরন থেকে একেবারে ভিন্ন। ৯ম শতাব্দির ঈষৎ সাদাটে কাচে তৈরি সোজাপাত্র ছিল সামার্‌রাতে পাওয়া আরেক অতিবসুন্দর কাচপাত্র।

সুগন্ধির জন্য ব্যবহৃত ছোট ছোট বোতল বানানোর জন্যও সামার্‌রার কাচ প্রস্তুতকারীদের বেশ প্রসিদ্ধি ছিল। চার প্রান্ত ও সিলিন্ডারের ন্যায় গলাবিশিষ্ট নীল ও সবুজ কাচে বানানো কিছু পাত্র ছিল নাশপাতি ফলের আকৃতির মতো। এগুলো বেশ ভারী এবং বিভিন্ন টুকরো দিয়ে পুনঃপুন সজ্জিত ছিল। অত্যন্ত মজবুত নকশা দিয়ে সজ্জিত বিভিন্ন আকৃতিতে কাটা ৯ম শতাব্দির কাচ পাত্রের অত্যন্ত সুন্দর টুকরোগুলোও সামার্‌রাতে পাওয়া গেছে।

৬৪০ খ্রিস্টাব্দের দিকে গোড়াপত্তন হওয়া 'পুরাতন কায়রো' নামে পরিচিত আল-ফুসতাত শহরে পরিচালিত খননকার্যে ৮ম শতাব্দি থেকে মধ্যযুগ পরবর্তী সময়ের কাচ এত বেশি পরিমাণে আবিষ্কৃত হয়েছে যে, নিশ্চিতভাবে এটা কাচ উৎপাদনের একটা

উপরে: কাচের ব্যবহার্য সামগ্রী মুসলিম বিশ্বে ব্যাপক সমৃদ্ধি লাভ করে। নিচে: সোনালি ও এনামেল দিয়ে সজ্জিত ১৪শ শতাব্দির মিশরীয় বোতলে খোদাইকৃত অংশে লিখা রয়েছে: 'মহিমা আমাদের মালিকের, যিনি বিজ্ঞ ও ন্যায়বান রাজা।'

কেন্দ্র হয়ে থাকবে। এসবের মধ্যে মুদ্রাসদৃশ ভার সর্বাধিক প্রাচীন, যা ৭০৮ খ্রিস্টাব্দের এবং এগুলোতে শাসক বা সরকারি কর্মকর্তাদের সিলমোহর খোদাই করা থাকতো। কালো সবুজ, হালকা সবুজ ও সবুজাভ নীল থেকে শুরু করে সাদা ও রক্তবর্ণসহ বিভিন্ন রঙে এগুলো রঙিন ছিল। অত্যাধিক জটিল নকশার কিছু মিশরীয় কাচপাত্র দীপ্তিময় মিহি স্বচ্ছ প্রলেপ দিয়ে সজ্জিত করে উজ্জ্বল করা হতো, কখনো বস্তুর উপরিতলে কপার বা সিলভার অক্সাইড দিয়ে অঙ্কন করে ধাতব আভা প্রদান করা হতো, এরপর সেটা ৬০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস (১১১২ ডিগ্রি ফারেনহাইট) তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করা হতো।

কাচশিল্প কেবল প্রাচ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, মৃৎসামগ্রীর মতো আল-আন্দালুসেও কাচ সামগ্রীর সমান চাহিদা ছিল। দুই, চার বা আট হাতলবিশিষ্ট জগ এবং হাতল ও বাকানো বাটের পাত্রসহ সবই এখানে পাওয়া যেত। আলমেরিয়া, মুর্সিয়া ও মালাগা ছিল কাচ উৎপাদনের প্রধানতম কেন্দ্র এবং এক্ষেত্রে আলমেরিয়ার ছিল দুনিয়া জোড়া সুখ্যাতি। প্রাচ্যের কাচসামগ্রীর অনুসরণে এই তিন শহরে তৈরি হাতলবিহীন কাচপাত্রগুলো ১০ম শতাব্দির লিওনের অভিজাত শ্রেণির টেবিলে পর্যন্ত জায়গা করে নেয়।

বলা হয় যে, ৯ম শতাব্দিতে আন্দালুসের কর্ডোবাতে স্ফটিক কাটার পদ্ধতির প্রবর্তন করেন আব্বাস ইবনে ফিরনাস। অত্যন্ত দুর্বোদ্ধ সব পাণ্ডুলিপির পাঠোদ্ধারে পারদর্শী এই মনীষী তৃতীয় আব্দুর রহমান এবং প্রথম মুহাম্মদের রাজসভায় পণ্ডিত ও উদ্ভাবক হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন। কৃত্রিম পাখা লাগিয়ে তিনি উঁচু ভবন থেকে উড়বার চেষ্টা পর্যন্ত করেছিলেন। তিনি কাচের বৈজ্ঞানিক গঠনশৈলী ভালভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন এবং লেন্স ও ম্যাগনিফাইং (বিবর্ধক) কাচ ব্যবহার করে হস্তলিপিকে বড় করার প্রাথমিক দিকের পরীক্ষা-নিরীক্ষাগুলোতে বেশ ভাল অবদান রাখেন। এর পাশাপাশি তিনি খনি থেকে আহরিত পাথর দিয়ে আন্দালুসে প্রতিষ্ঠা করেন স্ফটিক ইন্ডাস্ট্রি।

তাই বলা যায়, সিরিয়া, মিশর, ইরাক ও আন্দালুসের চুল্লী হয়ে জ্ঞাত দুনিয়া ভ্রমণ, প্রয়োজনীয় ব্যবহার্য সামগ্রী হিসেবে ব্যবহৃত হওয়া এবং মানুষের টেবিল ও ঘরকে অপরূপভাবে সাজিয়ে দেয়ার মাধ্যমে কাচ তার ইতিহাসকে কেবল রঙিনই করেছে।

বামে: ইরাকের সামার্‌রা শহরের কাচসামগ্রী মুসলিম সভ্যতায় বিশেষভাবে জনপ্রিয় ছিল। মোজায়িক কাচপাত্রটি রঙিন নকশা প্রদর্শন করছে। ডানে: ইতালির ভেনিসে কাচে বাতাস দিয়ে আকৃতি প্রদান করতে একজনকে দেখা যাচ্ছে।
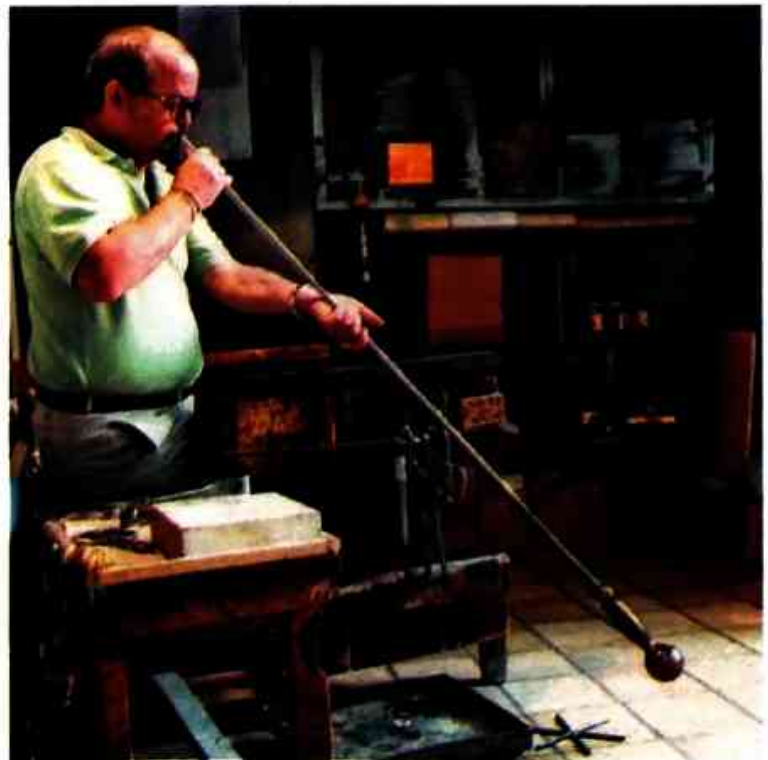
১২ অলংকার

কাচ, বস্ত্র, মৃৎ ও কাগজশিল্প রচনা করেছিল এক সফল সাম্রাজ্যের ভিত, যে সাম্রাজ্যের পণ্যের বাজার ছিল সুদূর চীন পর্যন্ত বিস্তৃত, যেমনটি ইতোমধ্যে জেনেছেন। অন্যসব গুরুত্বপূর্ণ ইন্ডাস্ট্রি গড়ে উঠেছিল খনি ও সমুদ্র থেকে আহরিত পণ্যের উপর ভর দিয়ে, যেমন: অলংকার ও মুক্তা। মিশরের উচ্চভূমিতে পান্না সংগ্রহ করা হতো, ফারগানা থেকে নেয়া হতো নীলকান্তমনি, বাদাখশানে পাওয়া যেত রুবি, ওদিকে ইয়ামেন ও স্পেনে পাওয়া যেত কারনেলিয়া (বাদামী-লাল রত্নপাথর) ও অনিক্স (অলংকারে ব্যবহৃত পাথরবিশেষ)।

স্পেনের আলমাদিনের সিনাবার খনিতে প্রায় হাজারের মতো কর্মী নিযুক্ত ছিল, কেউ খনিগহ্বরে পাথর কাটা, কেউ আকরিক গলানোর জন্য কাঠের পরিবহনে, কেউবা পাত্রকে গলানোর উপযুক্ত করতে, পারদের বিশোধনে এবং অগ্নিচুল্লিতে আগুনের প্রখরতা বৃদ্ধির কাজে নিয়োজিত ছিল।

ইয়ামেনের হাদরামাওত, ইস্পাহান, আর্মেনিয়া ও উত্তর আফ্রিকায় খনি হতে আহরিত দ্রব্যের মধ্যে সাদা স্বর্ণ নামে পরিচিত লবণ আশ্চর্যজনকভাবে মূল্যবান ছিল এবং উটের বিশাল কাফেলা এখানকার আহরিত লবণ বাণিজ্যের জন্য বয়ে বেড়াত। ১৬শ শতাব্দিতে আফ্রিকা ও ভূ-মধ্যসাগরীয় এলাকাতে ইতস্তত ঘুরে বেড়ানো লিও নামে পরিচিত আফ্রিকার এক ঐতিহাসিক ও ভূতাত্ত্বিক বলেন, "আফ্রিকার বৃহত্তর অংশজুড়ে লবণ পুরোপুরি খনি থেকে আহরিত পণ্য ছিল, যা মার্বেল বা জিপসামের মতো মূল্যবান বস্তু আহরণের ন্যায় কর্মী বাহিনী নিয়োগ করে ভূ-গহ্বর থেকে তোলা হতো।"

> "দুনিয়া সুন্দর স্ত্রীর মতো, যার রূপ-লাবণ্য বর্ধিত করার জন্য মানব সৃষ্ট কোনো রত্নালংকারের দরকার পড়ে না।"
>
> – খালীল জিবরান, লেবাননীয় লেখক

উপরে: ১৭শ শতাব্দির ভারতীয় স্বর্ণের গলার হার। এই হার সমানভাবে কর্তিত রুবি, পান্না এবং রুবির পত্রময় আবহের বিপরীতে উড়ন্ত পাখির নকশায় কাটা বড় মাপের হীরার অংশ দিয়ে সজ্জিত। নিচে: এই দানাগুলোর প্রতিটিতে আল্লাহর একটি করে নাম খোদাই করা আছে। কুরআনে আল্লাহর ৯৯ এবং ততোধিক নামের উল্লেখ রয়েছে।

নুবিয়া ও সিলনে পাওয়া মূল্যবান পাথরসমূহ সিরিশ গুঁড়া দিয়ে সজ্জিত ও পালিশ করা হতো। মিশর ও সুদান উভয় এলাকায় ফিটকিরি এবং মিশরের পশ্চিমাঞ্চল, বিশেষভাবে জনপ্রিয় ন্যাট্রন উপত্যকাতে ন্যাট্রন পাওয়া যেত, যা দিয়ে রুপার, সুতা, লিনেন জাতীয় কাপড় সাদা করা এবং চামড়া বিশোধন করা হতো। বস্ত্র রঙকারী, কাচ প্রস্তুতকারক, স্বর্ণকারদের মাঝে ন্যাট্রনের ব্যাপক চাহিদা ছিল। রুটি প্রস্তুতকারীরা তাদের ময়দার থালে এটা মিশাতো, অন্যদিকে মাংস নরম করতে বাবুর্চিরা এটা ব্যবহার করতো।

সমুদ্র থেকে আসতো অত্যন্ত সুন্দর মসৃণ মুক্তা, যা দিয়ে দুনিয়া জুড়ে বহু মানুষের গলা অলংকৃত হয়েছে। মুক্তা আহরণের জন্য ডুবুরিগণ পারস্য উপসাগরের উভয় পাশ, আরব সাগর, শিরাফ ও কিশ দ্বীপ এবং সেইসাথে দাহলাক দ্বীপসংলগ্ন বাহরাইনের উপকূল ও সিলনের সমুদ্র তীরে ডুব দিতেন।

মুক্তা আহরণের জন্য সমুদ্রে ডুব দেয়ার কৌশল নিয়ে ১৪শ শতাব্দির ইবনে বতুতা এভাবে মন্তব্য করেন, "ডুবুরি তার কোমরে দড়ি বেঁধে ডুব দেয়। সমুদ্রের তলদেশে সে ছোট ছোট পাথরের ভিড়ে লুকানো বালুতে গেঁথে যাওয়া খোলসগুলো খুঁজে বের করে। হাত দিয়ে সে এগুলো উঠিয়ে নেয় কিংবা এর জন্য নিয়ে আসা ছুরি দিয়ে সে এগুলো তুলে নেয় এবং গলাতে ঝুলতে থাকা চামড়ার থলেতে সেগুলো সংগ্রহ করে। দম ধরে রাখা যখন আর সম্ভব হয় না, তখন সে দড়িতে টান মারে, যেটা নৌকাতে দড়ি নিয়ে বসে থাকা ব্যক্তিকে ডুবুরিকে তুলে আনার সংকেত দেয়। চামড়ার থলে খুলে তারা সেসব খোলস-বের করে আনে এবং ছুরি দিয়ে ভিতর থেকে তারা মাংসের টুকরো বের করে আনতো।"

১৬শ শতাব্দির আরবী পাণ্ডুলিপিতে কৃত্রিম রুবি ও নীলকান্তমণি বানানোর জন্য তৈরি অগ্নিচুল্লি দেখা যাচ্ছে। এই চুল্লি কীভাবে কাজ করে পাণ্ডুলিপির আরবী লেখাগুলো তা বলে দিচ্ছে।

সিসিলি ও সারডিনিয়ার নিকটবর্তী উত্তর আফ্রিকা উপকূল জুড়ে ছিল বিস্তৃত প্রবাল প্রাচীর। ১২শ শতাব্দির ভূতত্ত্ববিদ আল-ইদরিসী প্রবাল সংগ্রহের একটি বিবরণ আমাদের জন্য এভাবে তুলে ধরেছেন, "প্রবাল এক প্রকারের উদ্ভিদ, যা বৃক্ষের মতো বেড়ে উঠে এবং পরবর্তীতে গভীর সমুদ্রের উঁচু পাহাড়ের মাঝে শিলার ন্যায় শক্ত রূপ ধারণ করে। দড়ি অনেকবার পেচিয়ে জাহাজের উঁচু পাটাতন থেকে ছিপ নিক্ষেপ করে মাছ ধরার ন্যায় এসব কোরাল সংগ্রহ করা হয়। নিক্ষেপ করা দড়ি যখন প্রবালের ডালপালার সাথে আটকে যায়, জেলেরা তখন ছিপ টেনে আনা শুরু করে এবং সেটা থেকে তারা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কোরাল সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়।"

কোরাল ও সেইসাথে মুক্তা যুদ্ধাস্ত্র, তাসবীহের দানা ও অলংকার সজ্জায় ব্যবহৃত হতো। অনেকগুলো দানা দিয়ে লম্বা কেশগুচ্ছের সাজ থেকে শুরু করে উঁচু করে নকশা খোদাই ও পিনের ন্যায় সাজ, এমন বহু ভঙ্গিতেই অন্যসব অলংকারের মতো কোরালেরও ব্যবহার রয়েছে। কিন্তু এই সামুদ্রিক সৌন্দর্যের জন্যে ৫০ মিলিমিটার (২ ইঞ্চি) ব্যাসের দানার জন্য আপনাকে ৫০,০০০ ডলার পর্যন্ত গুণতে হতে পারে। মূলত প্রবাল প্রাচীর ধ্বংস করা এবং অলংকার হিসেবে এর দুষ্প্রাপ্যতাই এর মূল্যকে করেছে আকাশচুম্বী।

১৩ মুদ্রা

অতীতে মুদ্রা জীবন্ত ছিল, কেননা তখন উট, গবাদি পশু বা ভেড়া ছিল পণ্যের 'বিনিময়' মাধ্যম। ১৪শ শতাব্দির মুসলিম পর্যটক ইবনে বতুতার সময় মালদ্বীপের জনগণের ব্যবহৃত মুদ্রা ছিল কড়ির খোলস এবং ওই সময় এটা ছিল বেশ মূল্যবান সম্পদ, যা উত্তর আফ্রিকার মালির ন্যায় দূরবর্তী স্থানেও পৌঁছে গিয়েছিল। গোটা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়া 'অদৃশ্য' ও অস্পৃশ্য মুদ্রার মাধ্যমে আর্থিক বাজারগুলো যে হারে ইলেকট্রনিক লেনদেন সম্পন্ন করছে, সেটার তুলনায় বর্তমানে আমাদের ব্যবহৃত ক্রেডিট কার্ড, কাগজের নোট ও মুদ্রা কিছুই নয়। ইবনে বতুতার সময়ের কড়ি আমাদের নিকট যেমন, হয়তো কোনো একদিন আমাদের ব্যবহৃত মুদ্রা ও নোটগুলো সেরূপ হয়ে উঠবে।

স্বাধীন সুলতানদের অধীনে থেকেও নামেমাত্র ঐক্যবদ্ধ ইসলামী খিলাফত স্বর্ণ ও রুপাকে আন্তর্জাতিক মুদ্রা হিসেবে ব্যবহারের মাধ্যমে নিজ সাম্রাজ্যের পাখা বিস্তৃত করেছিল। আমরা যদি দেশ-বিদেশ ভ্রমণকারী পর্যটক হই, তবে হয় আমাদের পর্যটক চেক বহন করতে হয়, নতুবা বিভিন্ন কারেন্সিতে ঠাসা থলে বয়ে বেড়ানোর ঝুঁকি নিতে হয়। কিন্তু ১৪শ শতাব্দিতে মুসলিম বিশ্বের পর্যটকরা ইসলামী সাম্রাজ্যের প্রতিটি বাজার চষে বেড়াতে পারতো, এমনকি রাজধানী থেকে শুরু করে প্রত্যন্ত অঞ্চলেও তারা দিনার ও দিরহাম দিয়ে লেনদেন করতে পারতো।

মুসলিম বিশ্বের বাহিরে লেনদেনের ছিল এক ভিন্ন চিত্র। চীনে আশ্চর্যজনক আর্থিক লেনদেনের অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিতে গিয়ে ইবনে বতুতা আবারও আমাদের সামনে প্রায় ৭০০ বছর আগেকার বিশ্বের বেশ কিছু খণ্ডচিত্র তুলে ধরেছেন, তিনি বলেন, "চীনের লোকেরা ... হাতের তালুর সমান কাগজের টুকরো দিয়ে কেনা-বেচা করে, যেখানে সুলতানের সিলমোহর খোদাই করা থাকে ... কেউ যদি রুপার দিরহাম বা দিনার নিয়ে বাজারে যায় ... তবে তা গ্রহণ করা হয় না এবং ওই ব্যক্তিকে উপেক্ষা করা হয়।"

৭ম ও ৮ম শতাব্দিতে স্বর্ণ ও রুপাই ছিল বহুল প্রচলিত মুদ্রা এবং মুসলিমগণ কুরআন মোতাবেক তাদের মুদ্রা বানাতো। কুরআনে বলা হয়েছে: "মাপার সময় তোমরা পূর্ণভাবে মেপে দাও এবং সঠিক দাঁড়িপাল্লায় ওজন করো" (সূরা ১৭:৩৫)। মুদ্রার পবিত্রতা ও ওজন ঠিক রাখার দায়িত্ব খলীফার উপর ন্যস্ত ছিল। সাত *মিসক্বাল* স্বর্ণ মুদ্রা রুপার দশটি মুদ্রার সমতুল্য, শরীয়তের এই আইনের মাধ্যমে ওজনের মানদণ্ড ঠিক করা হয়। এই ওজনের সমতুল্য নয়, এমন সকল মুদ্রা, বিদেশী মুদ্রা এবং পুরাতন মুদ্রাগুলো স্বর্ণ ও রুপার আদর্শ পিণ্ডসহ পরিশোধনের জন্য মুদ্রা প্রস্তুতের টাকশালে পাঠানো হতো, এরপর সেগুলো নতুন মুদ্রায় রূপান্তর করা হতো। মুদ্রা বানানোর সময় ধাতু উত্তপ্ত করার পূর্বে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে সর্বপ্রথম স্বর্ণ ও রুপার আদর্শ পিণ্ডগুলোর বিশুদ্ধতা নির্ধারণ করা হতো এবং প্রতিষ্ঠিত ধাতব মিশ্রণের মানদণ্ডের আলোকে মুদ্রা প্রস্তুত করা হতো।

শিল্পীর তুলিতে ১৪শ শতাব্দির বণিকদের বাণিজ্যিক কার্যক্রম ফুটে উঠেছে।

মুসলিম শাসকগণ দিনার ও দিরহাম দুটোই ব্যবহার করতো। ৬৮৩ থেকে ৭০৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত শাসন করা উমাইয়া খলীফা আব্দুল মালিক আল-মারওয়ান হলেন প্রথম শাসক, যিনি প্রথম নিজস্ব মুদ্রা চালু করেছিলেন। আরবী লেখা খোদাই করা এই দিনারগুলোই প্রথম, কেননা এরপূর্বে মুদ্রা হিসেবে সাসানীয় রৌপ্য মুদ্রা এবং বাইযান্টিনদের স্বর্ণ ও কপারের মুদ্রা প্রচলিত ছিল। ৬৯১ বা ৬৯২ খ্রিস্টাব্দে নিজস্ব মুদ্রা চালুর মাধ্যমে খলীফা আব্দুল মালিক নিজের শাসনকে বাইযান্টিনদের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক করার প্রয়াস পান এবং এক মুদ্রার অধীনে তিনি গোটা

মুসলিম উম্মাহকে ঐক্যবদ্ধ করেন।

বাম থেকে ঘড়ির কাটার অনুক্রমে: প্রতিটি মুদ্রার সম্মুখ ও পশ্চাৎ অংশ দেখা যাচ্ছে। (১-২) ৬৯১-৬৯২ খ্রিস্টাব্দের দুটো উমাইয়া মুদ্রা, নিচে থাকা মুদ্রাতে তিনটি ধাপের উপর স্থাপিত কলাম দেখা যাচ্ছে, যার শীর্ষে রয়েছে বৃত্তাকার অবয়ব, আর এভাবেই এটা বাইযান্টিন খ্রিস্টানদের ক্রুশ চিহ্নকে প্রতিস্থাপন করেছে। (৩) গ্রানাডার প্রথম মুহাম্মদের সময়ের রুপার নাসিরী দিরহাম। (৪) প্রথম দিকের ফাতিমীয় মুদ্রা, আল-মাহদীর আমল, ৯৪৯ খ্রিস্টাব্দ। (৫) গ্রানাডার দ্বাদশ মুহাম্মদের সময়ের রুপার নাসিরী দিরহাম। (৬) উমাইয়া রাজবংশের খলীফা আব্দুল মালিক আল-মারওয়ানের আমলের একটি স্বর্ণ দিনার (৬৯৬-৬৯৭ খ্রিস্টাব্দ)।

নতুন এই মুদ্রা বাইযান্টিন মুদ্রা সলিডাসের অনুকরণে বানানো হয়। আকার ও ওজনে এটা বাইযান্টিন মুদ্রার মতোই ছিল। হিরাকেল্‌স, হিরাক্লিয়াস কন্সট্যান্টিন ও হিরাক্লোনাসের প্রতিকৃতি সম্বলিত বাইযান্টিন মুদ্রার মতো এটার সম্মুখ অংশে তিনটি দাঁড়ানো প্রতিকৃতি ছিল। "*আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তিনি একক, কিছুই তার সমতুল্য নয় এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল*" ইসলামের এই কালেমা শাহাদাত বাক্যটি উভয় মুদ্রার মাঝে পার্থক্য করে দিতো, যা মুদ্রার উল্টো পাশের নকশা ঘিরে আরবী লিপিতে খোদাই করা ছিল।

বাইযান্টিন সম্রাট ঘটনার এতদূর বিস্তৃতি দেখে প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হন, যেহেতু নতুন মুদ্রা প্রতিযোগিতার আভাস দিচ্ছে। তিনি এই মুদ্রা মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানান এবং নতুন মুদ্রা বানিয়ে এটার জবাব দেন। এটা খলীফা আব্দুল মালিককে রাগিয়ে তোলে এবং প্রতিক্রিয়া হিসেবে তিনি তরবারি উঁচু করে আরব পাগড়ি পরিহিত খলীফার খাড়া প্রতিকৃতি সম্বলিত আরেকটি মুদ্রা প্রস্তুত করেন, যার বিপরীত পাশে ইসলামের কালেমা শাহাদাত ও তারিখ খোদাই ছিল। আরব-বাইযান্টিন দিনারের এমন আটটি নমুনা এখন পর্যন্ত টিকে আছে, যেগুলোতে ইসলামী বর্ষপঞ্জি বা ক্যালেন্ডার অনুসারে তারিখ লিখা ছিল।

মুদ্রা ছোড়াছুড়ির এই ধারা চলতে থাকে এবং প্রত্যাশিতভাবেই বাইযান্টিন সম্রাট আরেকটি মুদ্রার মাধ্যমে এর জবাব দেন এবং এ পর্যায়ে ৬৯৭ খ্রিস্টাব্দে খলীফা এটাকে যথেষ্ট ভাবেন এবং কোনো প্রতিকৃতি ছাড়াই প্রথম ইসলামী মুদ্রা চালু করেন। নতুন এই দিনারের উভয় পাশে কুরআনের আয়াত লিখিত ছিল, যা প্রতিটি মুদ্রাকে রূপ দিয়েছিল এক একটি ঈমানের বার্তাবাহক হিসেবে। এরপর তিনি গোটা উমাইয়া সাম্রাজ্য জুড়ে এটাকে একমাত্র ব্যবহার্য মুদ্রা হিসেবে সরকারি ফরমান জারি করেন। অবশিষ্ট সকল বাইযান্টিন ও আরব-বাইযান্টিন মুদ্রা গলিয়ে নতুন মুদ্রা বানানোর জন্য রাষ্ট্রীয় কোষাগারে পাঠানো হয় এবং যারা এই রাষ্ট্রীয় আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, তাদের কঠিন সাজা দেয়া হয়।

পৌরাণিক মুদ্রা

এক হাজার মোহর ও একশ মোহর নামের দুটো পৌরাণিক ইসলামী মুদ্রা ছিল। প্রথমটি ১২ কিলোগ্রাম (২৬.৫ পাউন্ড) ওজনের নিখুঁত স্বর্ণ এবং দ্বিতীয়টি ছিল নিছক ১০৯৪ গ্রাম ওজনের নিখুঁত স্বর্ণ, যেটা প্রথমটির তুলনায় নিহায়েৎ সামান্য। এদের বর্তমান আনুমানিক মূল্য যথাক্রমে ১০ মিলিয়ন এবং ৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

এই মুদ্রাগুলো প্রকৃতপক্ষে ১৬১৩ খ্রিস্টাব্দে মহামতি আকবরের পুত্র মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীর ও তার পুত্র শাহজাহানের জন্য প্রস্তুত করা হয়। শাহজাহান ১৬৩৯ খ্রিস্টাব্দে তাজমহলের ন্যায় মনোমুগ্ধকর স্থাপত্য কীর্তির জন্য সমধিক প্রসিদ্ধ। এই মুদ্রাগুলো উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের উপহার হিসেবে দেয়া হতো।

২০ সেন্টিমিটার (৮ ইঞ্চি) ব্যাসের এক হাজার মোহরটি ছিল বিশালাকার এবং উল্লেখ করা হয় যে, শতাব্দির পর শতাব্দি জুড়ে এরূপ চার বা পাঁচটি মোহর পারস্যের শক্তিশালী শাসকদের দূতদের জন্য সংরক্ষণ করে রাখা হয়। তুলনাযোগ্য এরূপ একটি মুদ্রার কথা ব্রিটিশ মিউজিয়ামের প্লাস্টারের ছাঁচ থেকে জানা যায় যে, এমন একটি দু'শ মোহর সর্বশেষ ১৮২০ খ্রিস্টাব্দে ভারতে দেখা যায় এবং এরপর থেকে তা হারিয়ে যায়। বিশালাকার স্বর্ণের এসব কিংবদন্তী মোহরের কোনটাই জানা মতে টিকে থাকেনি এবং ধারণা করা হয় যে, এগুলোর আদর্শ মানের জন্য এগুলো গলিয়ে ফেলা হয়। তথাপি আমরা জানি যে, এগুলো বিদ্যমান ছিল, কেননা পর্যটকগণ শাহজাহানের কোষাগারে থাকা বিশালাকার মুদ্রার বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন।

> "ফাতিমীয় মুদ্রা গুণগত মানে এতটাই উন্নত ও সহজলভ্য ছিল যে,
> এগুলো ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে সর্বাধিক বিস্তৃত জিনিসে পরিণত হয়।"
> – বিজদান আলী, বিজ্ঞানের ঐতিহাসিক

নতুন স্বর্ণ দিনারগুলো বাইযান্টিন সলিডাসের চেয়ে ওজনে কম ছিল এবং এসব দিনারে ব্যবহৃত স্বর্ণের বিশুদ্ধতার পাশাপাশি ওজন ঠিক আছে কিনা, তা রাষ্ট্র তদারকি করতো। উমাইয়াদের স্বর্ণ মুদ্রাসমূহ সাধারণত দামেস্কে প্রস্তুত হলেও রুপা ও কপারের মুদ্রাগুলো অন্যত্র বানানো হতো।

প্রথম এই মুদ্রার পর বিভিন্ন মানের আরও মুদ্রা প্রস্তুত করা হয়। উত্তর আফ্রিকা ও স্পেন বিজয়ের পর উমাইয়াগণ নতুন নতুন টাকশাল প্রতিষ্ঠা করে এবং প্রতিটি টাকশাল তাদের নিজ নিজ শহরের নাম ও তারিখসহ মুদ্রা প্রস্তুত করতো।

৭৬২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দিনার খিলাফতের প্রধান মুদ্রা হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে এবং খলীফা আল-মানসূর বাগদাদ শহরের গোড়াপত্তন করলে স্বর্ণের টাকশালও একইসাথে নতুন রাজধানীতে স্থানান্তরিত হয়। দিরহাম নামে পরিচিত রুপার মুদ্রাগুলোতে ওইসব লোকের নাম থাকতো, যারা সেগুলোর প্রস্তুতের সাথে জড়িত ছিল। কিন্তু এই রীতি বেশি দিন স্থায়ী হয়নি, কারণ পরবর্তী খলীফা হারুন উর-রশিদ ৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে ক্ষমতার মসনদে আসীন হলে তিনি এগুলো অচল বলে ঘোষণা দেন এবং মিশরের গভর্নরদের নামে দিনার প্রস্তুত করেন। এ কাজে তিনি দুটো সক্রিয় টাকশালের সহায়তা নেন, যার একটি বাগদাদে এবং অপরটি মিশরীয় গভর্নরের কেন্দ্র ফুসতাতে অবস্থিত।

৯০৯ থেকে ১১৭১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত শাসনকার্য চালানো ফাতিমীগণ তাদের দিনারগুলোতে কুফি নকশা ব্যবহার করতো। উন্নতমান ও পরিমাণে বিপুল হওয়ার কারণে এই মুদ্রাগুলো ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে সর্বাধিক প্রচলিত বাণিজ্যিক মুদ্রায় পরিণত হয়। ক্রুসেডাররা ফিলিস্তিন দখল করলে নিজেদের মুদ্রা বানানোর পরিবর্তে এগুলোর অনুকরণ শুরু করে, স্বাভাবিকভাবেই এসবের মাঝে কিছু অনুকরণ ছিল উৎকৃষ্ট মানের, আর কিছু ছিল নিতান্তই বাজে মানের।

আনুমানিক ৭১১ খ্রিস্টাব্দে আন্দালুস থেকে স্বর্ণ দিনার ইউরোপে প্রবেশ করে। অতঃপর, ১২৩৮ থেকে ১৪৯২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত গ্রানাডার নাসিরী শাসনামলে দিনার দিরহামে পরিণত হয়। বেশ ভারী এই মুদ্রাগুলো অত্যন্ত যত্নের সাথে প্রস্তুত করা হতো এবং এগুলো কুরআনের অনুচ্ছেদ ও শাসকদের বংশ-লতিকাসহ দীর্ঘ লৌকিক উপাখ্যান বহন করতো। নাসিরী আমলের কোনো মুদ্রাতে প্রস্তুতের সময়কাল উল্লেখ না থাকলেও সেগুলোতে থাকা '*লা গালিবা ইল্লাল্লাহ* – আল্লাহ ছাড়া কোনো বিজয়ী নেই' বাক্য যে তাদের রাজনৈতিক স্লোগান, তা সহজেই শনাক্ত করা যায়। একই সময়ে, উত্তরের খ্রিস্টান রাজ্যগুলো প্রায় ৪০০ বছর ধরে মুদ্রা হিসেবে কেবল আরব ও ফ্রেঞ্চ মুদ্রাই ব্যবহার করতো।

১৩শ শতাব্দির পর, মুসলিম খিলাফত একক খলীফা শাসন থেকে ছোট ছোট রাজবংশ দ্বারা শাসিত হতে শুরু করে এবং প্রতিটি অঙ্গরাজ্য তাদের নিজস্ব মুদ্রা ব্যবহার করে। আজকের দিনের মুদ্রার ন্যায় সেগুলো অর্ধ-স্বাধীন রাজ্যগুলোর বিভিন্ন গভর্নরদের নাম বহন করতো। এসব মুদ্রা স্বতন্ত্রভাবে তৈরি হলেও, এগুলোতে নামমাত্র খিলাফতের নেতৃত্বকে স্বীকৃতি প্রদান করা হতো।

আজকের ন্যায় মুদ্রা সর্বদা বিনিময়ের একমাত্র মাধ্যম ছিল না। প্রায় শতাব্দি পূর্বেই চেকের ব্যবহার ছিল। 'চেক' শব্দটি আরবী صَكٌّ (*সাক্কুন*) থেকে উৎসারিত। পণ্যদ্রব্য গন্তব্যে পৌঁছালে তার মূল্য পরিশোধের লিখিত অঙ্গীকারনামা এই চেক। ৯ম শতাব্দিতে হারুন উর-রশিদের শাসনামলে অত্যন্ত সমৃদ্ধ ব্যাংকিং ব্যবস্থা গড়ে উঠে, যার আওতায় একজন মুসলিম ব্যবসায়ী চাইলে বাগদাদে থাকা নিজের ব্যাংক একাউন্ট থেকে চীনের ক্যান্টন (বর্তমান গোয়াংজু) শহরে চেক ভাঙাতে পারতো। বৈধ আইনি মুদ্রা হিসেবে বিপুল পরিমাণ মুদ্রা স্থানান্তরে যে ধরনের ঝুঁকি ও বিপত্তি জড়িত রয়েছে, সেসব বিপত্তি ও ঝুঁকি এড়াতেই চেক বা *সাক্কের* প্রচলন ঘটে। ব্যাংকারগণ হুন্ডি, ঋণপত্র এবং প্রত্যর্থপত্র ব্যবহার করলেও কার্যত এগুলো চেক। হুন্ডি, সাক্ক বা চেক ব্যবহারের ধারণা জনপ্রিয় করার মাধ্যমে মুসলিমগণ বাণিজ্যে আর্থিক বিনিয়োগ ও আন্তমহাদেশীয় ব্যবসাকে সম্ভবপর করেছিল।

রাজা অফ্‌ফার রহস্য

১২শ বছর আগে যখন খলীফারা মুসলিম বিশ্ব শাসন করতো, তখন ইংল্যান্ড শাসন করতো রাজা অফ্‌ফা। তিনি তার রাজত্বে রুপার মুদ্রার প্রচলন ঘটান – এবং সেইসাথে ম্যানকাস স্বর্ণ নামের একটি স্বর্ণ মুদ্রা বানান, যা ৩০-টি রৌপ্যর মুদ্রার সমতুল্য। ম্যানকাস স্বর্ণ মুদ্রার উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে, এটা ১৫৭ হিজরী বা ৭৭৪ খ্রিস্টাব্দে তৈরি আব্বাসী খলীফা আল-মানসূরের আমলের একটি স্বর্ণ মুদ্রার নকল এবং এই মুদ্রার এক পাশে আরবী অক্ষরে খোদাই করে লেখা রয়েছে, "আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তিনি একক, অংশীদারহীন এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল।"

আসল দিনারের সাথে এই মুদ্রার উল্লেখ্য পার্থক্য হচ্ছে রাজা অফ্‌ফা এই মুদ্রার মধ্যস্থলে OFFA REX (অফ্‌ফা রেক্স) লেখাটি খোদাই করে দেন। পণ্ডিতগণ এটা ভেবে হয়রান যে, একজন ইংরেজ রাজা কেনইবা আরব মুদ্রার হুবহু নকল বানাতে যাবেন। কারো মতে, তিনি ইসলামে দীক্ষিত হয়েছিলেন, যদিও এর গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা হচ্ছে, তিনি ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে কিংবা আরব দেশগুলো পাড়ি দিয়ে তীর্থযাত্রায় যাওয়া তীর্থযাত্রীদের ব্যবহারের জন্য এমনটি করেছেন। এই মুদ্রা নিশ্চিতভাবে কোনো কারিগর দিয়ে তৈরি নয়, যেহেতু আরবীতে OFFA REX (অফ্‌ফা রেক্স) লেখার কোনো অর্থ নেই, তাছাড়া এই লেখা আরবী কুফি হস্তলিপির সাপেক্ষে উল্টোভাবে লেখা এবং 'বছর' শব্দটি ভুল আরবী বানানে লিখা। মুদ্রাটি খুব সম্ভবত কোনো অ্যাংলো-স্যাক্সন কারিগর নকল করেছে।

১২০০ বছর আগে আন্তর্জাতিক অর্থনীতি ও ব্যবসায়িক সম্পর্ক কেমন ছিল, সে সম্পর্কে আমাদের ধারণা নতুনভাবে ঝালাই করতে এ ঘটনা বেশ সহায়ক। ৮ম শতাব্দিতে ইসলামী মুদ্রা যে কতটা পথ পাড়ি দিয়েছে, রাজা অফ্‌ফার এই মুদ্রা তারই প্রমাণ। প্রত্নতত্ত্ববিদগণ আধুনিক সময়ের জার্মানি, ফিনল্যান্ড ও স্ক্যান্ডিনেভিয়াতে হাজারেরও অধিক মুসলিম মুদ্রা খুঁজে পেয়েছে, যা এই সাক্ষ্য আমাদের সামনে তুলে ধরছে যে, এসব মুদ্রা পরিবহন ও বাণিজ্যের সুবাদে মুসলিম দেশগুলো থেকে ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে।

রাজা অফ্‌ফাই একমাত্র অমুসলিম শাসক ছিলেন না, যিনি আরবীয় মুদ্রা প্রস্তুত করেছিলেন। ১১শ শতাব্দির স্পেনের ক্যাথলিক যুবরাজ, অষ্টম আলফোনসো নকশা খচিত মুদ্রা বানানোর আদেশ জারি করেন, যেখানে আরবী লেখা খোদাই ছিল। ওই মুদ্রাতে তিনি নিজেকে 'ক্যাথলিকদের আমির' এবং রোমের পোপকে 'খ্রিস্টীয় চার্চ বা গির্জার ইমাম' হিসেবে অভিহিত করেন।

ইংল্যান্ডের মার্সিয়ার রাজা অফ্‌ফা ১৫৭ হিজরী (তথা ৭৭৪ খ্রিস্টাব্দে) তৈরি আব্বাসী খলীফা আল-মানসূরের আমলের একটি স্বর্ণ মুদ্রার নকল তৈরি করেন। এটা হুবহু নকল, যেখানে মুদ্রার এক পাশে (ডানে) ঈমানের ঘোষণা খোদাই করা রয়েছে এবং অপর পাশে (বায়ে) রাজা অফ্‌ফার নাম খোদাই রয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়

"চিকিৎসা এমন এক বিজ্ঞান, যার সাহায্যে শিক্ষার্থী মানবদেহের হাল-হাকিকত জানে ... যেন এর দ্বারা সুস্থ অবস্থায় স্বাস্থ্য ধরে রাখা যায় এবং স্বাস্থ্যহানি ঘটলে তা পুনরুদ্ধার করা যায়।"

– ১১শ শতাব্দির ইবনে সীনা রচিত আল-কানুন গ্রন্থ হতে

হাসপাতাল

হাসপাতালের ক্রমবিকাশ • পূর্ণতার উপকরণ
সার্জারি • রক্ত সঞ্চালন • ইবনে সীনার হাড়ের জখম চিকিৎসা
চক্ষুরোগ বিশেষজ্ঞের নোটবই • ভ্যাকসিন • ভেষজ চিকিৎসা
ফার্মাসি • চিকিৎসা জ্ঞান

হাজার বছর পূর্বে বিনামূল্যে সবাইকে চিকিৎসা সেবা দেয়া হতো এবং সে সময়ের চিকিৎসা পদ্ধতিও ছিল অত্যাধুনিক। আধুনিক যুগের প্রেক্ষিতে হাসপাতাল বলতে যা বুঝায়, মধ্যযুগীয় ইসলামের হাসপাতালগুলো ঠিক সেটারই আদর্শ নমুনা ছিল। সেসব হাসপাতালে সর্বাপেক্ষা গ্রহণযোগ্য চিকিৎসা জ্ঞানই প্রচলিত ছিল এবং যারাই আসতো, তারাই সেখান থেকে বিনামূল্যে সেবা পেত। এমনটি বলা হয় যে, মধ্যযুগীয় ইসলামের এ হাসপাতাল ব্যবস্থাই যুক্তরাজ্যের জাতীয় স্বাস্থ্য সেবা (*National Health Service*)-এর অগ্রদূত। এ ব্যবস্থা ইসলামী শাসকদের আনুকূল্যে সতেজভাবে বেড়ে উঠে, যেহেতু তারা চাইতো চমকপ্রদ সব হাসপাতাল বানানোর প্রতিযোগিতায় একে অপরকে ছাড়িয়ে যেতে। কিছু হাসপাতাল ছিল বিশালাকার, আবার কিছু হাসপাতাল ছিল ফুল ও ফলের বাগানে পরিবেষ্টিত। অন্যদিকে, রোগীদের দেয়া সর্বাপেক্ষা অগ্রগণ্য সামাজিক সেবার মাঝে অন্যতম ছিল সঙ্গীতের মাধ্যমে সেবা-শুশ্রূষা বা মিউজিক থেরাপি।

তারা যেসব উপকরণ ব্যবহার করতো, তা প্রয়োজনমাফিক বানানো ছিল এবং তাদের ব্যবহৃত সার্জারি যন্ত্রগুলো ছিল অসাধারণ। প্রায় এক হাজার বছর পূর্বে মুসলিম সার্জনদের বানানো ফোরসেপস্ (চিমটা) এমন যন্ত্রের একটি উদাহরণ, যা আজও ব্যবহৃত হচ্ছে। চোখের ছানি অপারেশন, নিয়মিত ভ্যাকসিন গ্রহণ, অভ্যন্তরীণ সেলাই ও স্থানচ্যুত হাড় যথাস্থানে সংস্থাপনসহ অত্যাধুনিক চিকিৎসা কৌশল ছিল এসব হাসপাতালের আদর্শ চিকিৎসা অনুশীলনের একটি অংশ, যেমনিভাবে হাসপাতাল কলেজগুলোতে অবিরাম চলতো চিকিৎসা জ্ঞান প্রদানের মহাযজ্ঞ।

উল্টো পৃষ্ঠার চিত্র: সেরাফেদ্দীন সাবুনচুগলু রচিত "চেরাহিয়্যেত উল হানিয়ে" গ্রন্থে আঁকা ১৫শ শতাব্দির এসব ছোট ছোট অনুচিত্রে রোগীদের চিকিৎসা প্রদান এবং সার্জারির বিভিন্ন কার্যপ্রণালী চিত্রিত হয়েছে।

০১ হাসপাতালের ক্রমবিকাশ

রোগের আরোগ্য বিধান, অনাথের আশ্রয়, এমনকি কর্ম থেকে অবসর নেয়া নিঃসঙ্গ মানুষদের আবাসের ব্যবস্থাসহ বিস্তর সেবাদানের অভিপ্রায় নিয়ে এক হাজার বছর পূর্বে মুসলিম হাসপাতালগুলো বিকশিত হয়েছিল। রাজা কী প্রজা, ধনী কী গরিব, তারা সব ধরনের মানুষের দেখাশোনা করতো, কেননা অসুস্থ হয়ে যে বা যারাই তাদের কাছে যেত, তাদের সেবাদানে মুসলিমরা নৈতিকভাবে বাধ্য ছিল।

মুসলিম ইতিহাসের একেবারে শুরু থেকেই এসব হাসপাতাল *ওয়াক্‌ফ্‌* নামের ধর্মীয় দাতব্য সম্পত্তি দ্বারা পরিচালিত হতো, যদিও কিছু হাসপাতালের ব্যয় রাষ্ট্রীয় কোষাগার বহন করতো। বস্তুত এসব হাসপাতালের বিজ্ঞাননির্ভর চিকিৎসা সেবাকেন্দ্রে পরিণত হওয়ার পিছনে এ ধরনের আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতার ভূমিকা কোনো অংশে কম নয় এবং দু' শতাব্দিরও কম সময়ে এগুলো নগর জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়।

মুসলিমদের পূর্বে গ্রিকদের ছিল নিরাময় মন্দির। এসব স্বাস্থ্য সেবাকেন্দ্রে বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ ও অনুশীলনের পরিবর্তে রোগমুক্তির জন্য অনেকটা অলৌকিক শক্তির উপর নির্ভর করা হতো। কুষ্ঠরোগী, অকেজো ও গরিব মানুষদের সেবাদানকারী *জেনাডোকিয়ন* (আক্ষরিকভাবে ভ্রমণকারীদের সরাইখানা) নামের গ্রিক বাইযান্টিন দাতব্য সংস্থাকে অনেকটা হাসপাতাল বলা যেতে পারে। যেহেতু এর কার্যক্রম অনেকটা হাসপাতালের মতোই।

ইসলামী হাসপাতালগুলোর গোড়াপত্তন ৮ম শতাব্দির বাগদাদে এবং অনেক ক্ষেত্রে এগুলো বাইযান্টিন ভ্রমণকারীদের হোস্টেলের সাথে সাদৃশ্য রাখে, যেহেতু এখানেও কুষ্ঠরোগী, অকেজো ও অনাথ মানুষদের দেখাশোনা করা হতো। কিন্তু প্রথম সুবিন্যস্ত হাসপাতাল ৮৭২ ও ৮৭৪ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি কায়রোতে প্রতিষ্ঠিত হয়। আহমাদ ইবনে তুলুন নামের এই হাসপাতাল বিনামূল্যে চিকিৎসা ও ঔষধ সেবা দিতো। এ হাসপাতালে ছিল নারী ও পুরুষদের জন্য আলাদা দুটো স্নানাগার, সমৃদ্ধ লাইব্রেরি এবং মনোরোগ চিকিৎসার জন্য আলাদা বিভাগ। রোগীদের সেবার জন্য নির্ধারিত বিশেষ ওয়ার্ডের পোশাক এবং তাদের জন্য বরাদ্দকৃত শয্যাতে ভর্তি হওয়ার আগে রোগীরা তাদের জামা-কাপড় ও মূল্যবান সামগ্রী নিরাপদে রাখার জন্য হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের নিকট গচ্ছিত রাখতো।
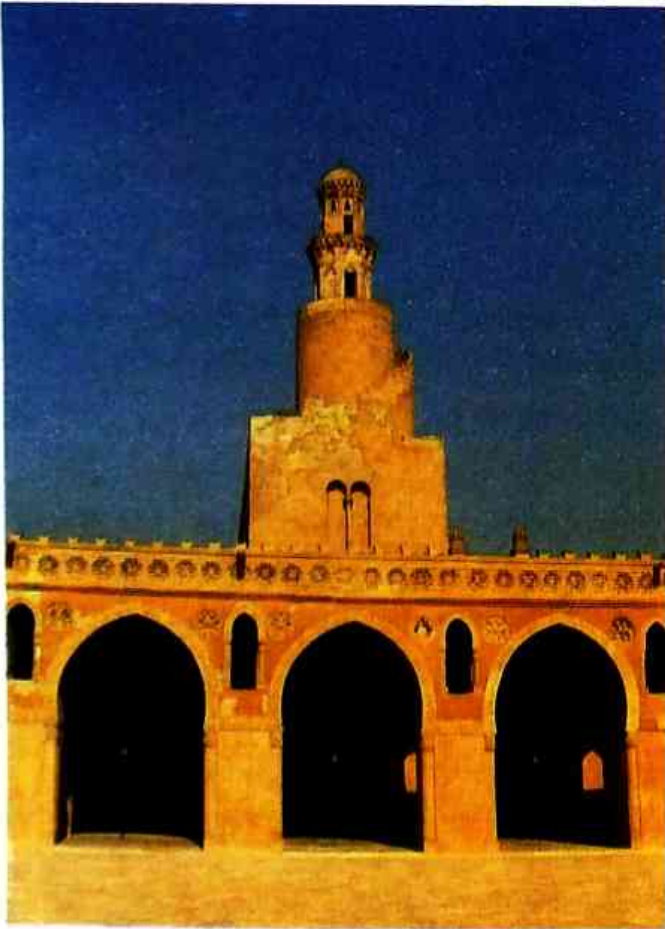
অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ হাসপাতালের মাঝে রয়েছে ৯৮২ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত বিশালাকার বাগদাদী হাসপাতাল, যেখানে সার্বক্ষণিক ২৪-জন চিকিৎসক নিয়োজিত ছিলেন। দ্বাদশ শতাব্দির দামেস্কের আন-নূরী হাসপাতাল এরচেয়েও বৃহদাকার ছিল। এখানে ঔষধ বিক্রেতা, নাপিত ও অস্থি চিকিৎসকদের চিকিৎসা নির্দেশনা দেয়া হতো এবং সেইসাথে চক্ষুরোগ বিশেষজ্ঞ ও চিকিৎসকগণ ঠিকভাবে চিকিৎসা সেবা দিচ্ছেন কিনা, সেটা যাচাইয়ের জন্য একজন 'বাজার পরিদর্শক' নির্ধারিত পাঠ্যক্রমের আলোকে পরীক্ষা নিতেন।

কায়রোতে মোট তিনটি সুবিশাল হাসপাতাল ছিল, যার মধ্যে আল-মানসূরী হাসপাতাল ছিল সুবিখ্যাত। ১৩শ শতাব্দির মিশরের মামলুক শাসক আল-মানসূর কালাউন রাজকুমার অবস্থায় একবার সিরিয়ায় সামরিক অভিযান পরিচালনাকালে মূত্রাশয়ের বেদনাতে আক্রান্ত হন। তিনি

মিশরের কায়রোর এই ইবনে তুলুন মসজিদই প্রথম সুবিন্যস্ত হাসপাতাল, যা রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা ও ঔষধ সেবা দিতো।

আল-কায়রাওয়ান হাসপাতাল
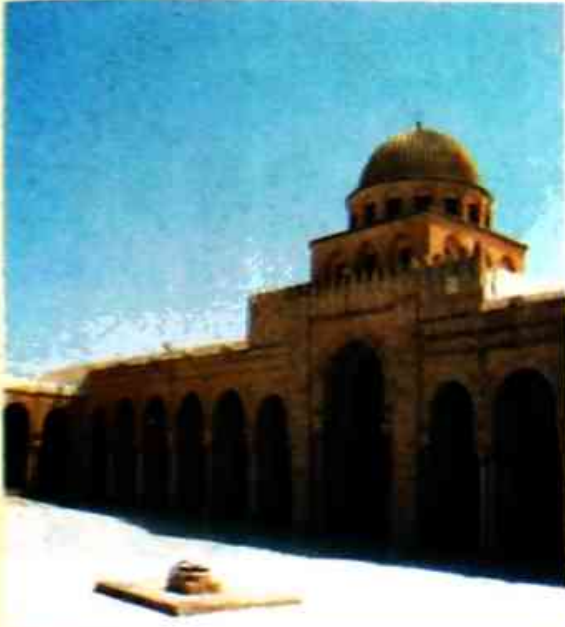
তিউনিসের কায়রাওয়ানের অবস্থিত আল-কায়রাওয়ান হাসপাতাল

৯ম শতাব্দির আল-কায়রাওয়ান ছিল অত্যাধুনিক চিকিৎসা উপকরণে সমৃদ্ধ এক হাসপাতাল। এই হাসপাতালে অত্যন্ত পরিকল্পিত উপায়ে নির্মিত অনেকগুলো হলঘর ছিল। সেখানে দর্শনার্থীদের জন্য ওয়েটিং রুম (অপেক্ষমান কামরা), সুদানের নারী নার্সদের থাকার কক্ষ, রোগীদের সালাত আদায় ও অধ্যয়নের জন্য মসজিদের ব্যবস্থা ছিল। নিয়মিত চিকিৎসকের পাশাপাশি একদল ইমামের সমন্বয়ে *ফুকাহা আল-বাদান* নামের চিকিৎসক দল গঠন করা হয়, যারা *bloodletting* (শিরা কেটে রক্ত মোক্ষণ বা শিঙ্গা লাগানো), *bone setting* (সরে যাওয়া হাড়ের যথাযথ বিন্যাস) এবং *cauterization* (ক্ষতের সংক্রমণ রোধে ধাতু বা লোহা দিয়ে ছেঁকা দেয়া)-এর মতো সেবা প্রদান করতো। গোটা বিশ্বে কুষ্ঠরোগকে যখন নিরাময়হীন ও শয়তানের নজর হিসেবে বিবেচনা করা হতো, সে রকম একটি সময়ে আল-কায়রাওয়ান হাসপাতালের সন্নিকটে *দারুল জুযামা* নামে কুষ্ঠরোগীদের জন্য আলাদা একটি ওয়ার্ড চালু করা হয়। হাসপাতালটি রাষ্ট্রীয় তহবিল এবং ওইসব লোকের উদার আর্থিক আনুকূল্যে পরিচালিত হতো, যারা চাইতো সকলে যেন সবচেয়ে সেরা চিকিৎসা সেবা পায়।

দামেস্কের আন-নূরী হাসপাতালে ভর্তি হন এবং সেখানে তিনি যে ধরনের সেবা লাভ করেন, তাতে বিমোহিত হয়ে এই সংকল্প করেন যে, ক্ষমতার মসনদে আরোহণ মাত্রই তিনি এমন একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করবেন। নিজের প্রতিজ্ঞা তিনি পুরো করেন এবং প্রতিষ্ঠা করেন কায়রোর বিখ্যাত আল-মানসূরী হাসপাতাল, আর ঘোষণা করেন, "এই *ওয়াক্ফ* সম্পত্তি আমি উৎসর্গ করছি, কী আমার সমতুল্য কী আমার অধস্তন, সৈনিক কী যুবরাজ, ধনী কী গরিব, স্বাধীন মানুষ কী দাস, নারী কী পুরুষ নির্বিশেষে সকল মানুষের কল্যাণের জন্য।"

চারটি প্রবেশদ্বার সম্বলিত আল-মানসূরী হাসপাতাল ১২৮৪ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়, যার একেবারে কেন্দ্রে একটি ঝরনা ছিল। খলীফা পর্যাপ্ত সংখ্যক চিকিৎসক এবং রোগীদের সেবার জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি ও সরঞ্জামাদির ব্যবস্থা নিশ্চিত করেছিলেন। পৃথক ওয়ার্ডে ভর্তি হওয়া নারী ও পুরুষ রোগীদের সেবার জন্য তিনি নারী ও পুরুষ সেবকের ব্যবস্থা পর্যন্ত করেন। হাসপাতালের শয্যাগুলোতে তোশক ছিল এবং বিশেষায়িত কক্ষগুলোতে প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রণ করা হতো। হাসপাতালের পুরো সীমানাতে প্রবহমান পানির সরবরাহ ছিল। ভবনের একটি অংশে প্রধান চিকিৎসকের জন্য কক্ষ বরাদ্দ ছিল, যেখানে তিনি শিক্ষাদান ও পাঠদান করতেন। কতজন রোগী চিকিৎসা সেবা পাবে, তার কোনো সংখ্যা নির্দিষ্ট ছিল না এবং হাসপাতালে অভ্যন্তরীণ ঔষধ বিপণন কেন্দ্র ছিল, যেখান থেকে রোগীরা বাসায় ঔষধ নিয়ে যেতে পারতো।

> "[হাসপাতালের] দায়িত্ব হচ্ছে: সেরে উঠা পর্যন্ত ধনী-গরিব, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করা। ক্ষমতাবান কী ক্ষমতাহীন, ধনী কী গরিব, রাজা কী প্রজা, সভ্য কী দস্যু বিবেচনায় না নিয়ে হাসপাতাল কোনো পারিশ্রমিক গ্রহণ ছাড়াই কেবলমাত্র রিযিকদাতা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য সকলের সেবা নিশ্চিতে বাধ্য থাকবে।"
>
> – কায়রোর আল-মানসূরী হাসপাতালের প্রতিষ্ঠাকালীন গঠনতন্ত্র

প্রথম দিকের এই প্রতিষ্ঠানগুলোর হাত ধরে হাসপাতাল উত্তর আফ্রিকা হয়ে সুদূর আন্দালুস খ্যাত স্পেন, সিসিলিসহ গোটা মুসলিম বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। এই পুরো ব্যবস্থা নিয়ে ইউরোপীয়রা বিমোহিত ছিল এবং এর দেখাদেখি পরবর্তীতে তারা অনুরূপ ব্যবস্থা চালু করে, যেমন: স্বদেশীদের চিকিৎসা প্রদানের জন্য ফরাসীরা প্রতিষ্ঠা করে *hospitaliers*

(হসপিটালিয়ারস), *fighters of the hospital* (হাসপাতালের যোদ্ধা) নামের হাসপাতাল। দক্ষিণ ইউরোপের হাসপাতালগুলোর ভিত্তি নির্মাণে মুসলিম চিকিৎসকগণ অসামান্য ভূমিকা পালন করেছিলেন, যেমন: দক্ষিণ ইতালির বিখ্যাত সালেরনো হাসপাতাল।

মুসলিম বিশ্বের হাসপাতালগুলো অত্যন্ত কার্যকরভাবে পরিচালিত হতো। উদাহরণস্বরূপ, ১২শ শতাব্দির পর্যটক ইবনে জুবায়ের আন-নূরী হাসপাতাল এবং এটা যেভাবে রোগীদের তত্ত্বাবধান তদারকি করে, তার ভূয়সী প্রশংসা করেন। খুব সম্ভবত এমন কার্যকর ব্যবস্থাসম্পন্ন হাসপাতালের মাঝে এটাই প্রথম। তিনি বলেন, "নতুন এই আন-নূরী হাসপাতাল দূর-দূরান্তের রোগীদের দ্বারা গুঞ্জরিত থাকে এবং এটা [দামেস্কের দুটো হাসপাতালের] মাঝে সর্ববৃহৎ। এটার দৈনিক বাজেট ১৫ দিনার এবং একজন পরিদর্শক রোগীদের নাম, প্রয়োজনীয় ঔষধ সরঞ্জাম, খাদ্য ও অনুরূপ জিনিসপত্রের ব্যয় বিবরণী নথিতে লিপিবদ্ধ করে। রোগীদের স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণের জন্য চিকিৎসকগণ সকাল সকাল হাসপাতালে চলে আসেন এবং প্রত্যেকটি রোগীর জন্য প্রয়োজনীয় ঔষধ ও খাবার প্রস্তুতের নির্দেশনা দেন।"

সুলতান কালাউন ভবনটি বর্তমানে মৃতদেহের শেষকৃত্য সম্পাদনের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে। পূর্বে এই ভবনে ছিল কায়রোর আল-মানসূরী হাসপাতাল।

> "গ্রন্থ ছাড়া যে চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করে, তার উপমা ওই ব্যক্তির ন্যায়, যে সম্পূর্ণ অজানা ও অজ্ঞাত এক সমুদ্র পানে যাত্রা করে, কিন্তু যে রোগী ছাড়াই চিকিৎসাশাস্ত্র চর্চা করে, সে তো আদৌও সমুদ্রে নামেনি।"
>
> – স্যার উইলিয়াম ওসলার, কানাডীয় চিকিৎসক (১৮৪৯-১৯১৯)

নিকট প্রাচ্য ভ্রমণের সময় ইবনে জুবায়ের তার ভ্রমণকৃত অধিকাংশ অঞ্চলের প্রতিটি শহরেই এক বা একাধিক হাসপাতাল দেখতে পান। এসব প্রত্যক্ষ করে তিনি অকপটে বলতে বাধ্য হন যে, হাসপাতাল হচ্ছে: "ইসলামের চূড়ান্ত গৌরবের অন্যতম একটি প্রমাণ।"

এই হাসপাতালগুলো কেবল দৈহিক ব্যাধি নিরাময়ে নিজেদের আটকে রাখেনি, বরং অগ্রগামী চিন্তাতেও নিজেদের শামিল রেখেছিল। ৯ম শতাব্দির বাগদাদ হাসপাতালে মানসিক রোগীদের চিকিৎসার জন্য স্বতন্ত্রভাবে নিবেদিত একটি ওয়ার্ড-ই ছিল। এই হাসপাতালে নিয়োজিত ছিলেন স্বনামধন্য চিকিৎসক আর-রাযী।

চিকিৎসাশাস্ত্র শিখতে আসা নতুন শিক্ষার্থীদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ভিত্তিক হাসপাতালগুলো ছিল উপযুক্ত প্রশিক্ষণ লাভের তীর্থভূমি, যেমনটি আজকের দিনেও সত্য। আটশত বছর পূর্বে, চিকিৎসার পাশাপাশি শিক্ষাদানে নিয়োজিত এসব হাসপাতাল শিক্ষার্থীদের ব্যবহারিক কর্মকাণ্ডের সাথে তাত্ত্বিক পাঠ দিতো।

জনাকীর্ণ এবং ছাত্র-শিক্ষকের মুখোমুখি অবস্থান – আজকের দিনের ন্যায় উভয় পদ্ধতিতেই পাঠদান চলতো। হাসপাতালের বৃহৎ হলঘরে ভাষণ দেয়া হতো। সাধারণত চিকিৎসাশাস্ত্রীয় কোনো পাণ্ডুলিপি থেকে উচ্চস্বরে পাঠ করে শোনানো হতো। যিনি এ কাজ করতেন, তাকে 'আবৃত্তিকার চিকিৎসক' (*আত-তাবিবুল ক্বারী*) বলা হতো। পড়া শেষ হলে প্রধান চিকিৎসক বা সার্জন প্রশ্ন করতেন এবং শিক্ষার্থীদের প্রশ্নের জবাবও তিনি দিতেন।

বহু শিক্ষার্থী সুপরিচিত চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে থেকে চিকিৎসাশাস্ত্রীয় পুস্তক অধ্যয়ন করতো এবং মুসলিম বিশ্বে কাগজের সহজলভ্যতা থাকায় 'ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য' সেগুলোতে ওই পুস্তকের পাণ্ডুলিপি নকল করে সংরক্ষণ করা হতো। অন্যদিকে, ইউরোপে এই পুস্তকগুলোর নকল বেশ দুর্লভ ছিল এবং নিতান্তই অল্প কিছু শিক্ষার্থীর নিকট তা পাওয়া যেত।

শিক্ষাদানের পাশাপাশি প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে স্বতন্ত্র ওয়ার্ডে কর্তব্যরত চিকিৎসক বা সার্জনের চারপাশে শিক্ষার্থীদের দল বেঁধে জড়ো হওয়া এবং চিকিৎসকের কার্যক্রম প্রত্যক্ষ করাকে খুবই গুরুত্ব দেয়া হতো। উচ্চতর শিক্ষার্থীগণ ডাক্তার কীভাবে রোগীর ইতিহাস টুকে এবং তাদেরকে কীভাবে পরীক্ষা করে, তা মনোযোগ দিয়ে দেখতো; উপরন্তু বর্হিবিভাগীয় রোগীদের জন্য তারা ডাক্তারের হয়ে প্রেসক্রিপশন বা ব্যবস্থাপত্র পর্যন্ত লিখে দিতো।

দামেস্কের আন-নূরী হাসপাতাল ছিল এমনই এক চিকিৎসা বিদ্যালয়। চিকিৎসক আবুল মাজিদ আল-বাহিলীর দিক-নির্দেশনায় ১২শ শতাব্দির শাসক নূরুদ্দীন যঙ্গি হাসপাতালটি প্রতিষ্ঠা করেন এবং তার নামেই এর নামকরণ করা হয়। খাদ্য ও ঔষধের পর্যাপ্ত সরবরাহের পাশাপাশি তিনি বিপুল সংখ্যক চিকিৎসাশাস্ত্রীয় পুস্তক হাসপাতালের জন্য দান করেন, যেগুলো বিশেষ হলঘরে অধ্যয়নের জন্য রেখে দেয়া হয়।

নিজের চিকিৎসা পেশাজীবন সমৃদ্ধ করার এক আদর্শ জায়গা ছিল এ হাসপাতাল। ১৩শ শতাব্দির শুরুর দিকে আল-দাখওয়ার নামের এক চিকিৎসক বেশ কম পারিশ্রমিকে আন-নূরী হাসপাতালে কাজ করলেও যখন তার খ্যাতি চারদিক ছড়িয়ে পড়ে, তখন তার ব্যক্তিগত চিকিৎসা অনুশীলন তাকে এতটা সম্পদশালী করে যে, তিনি ওই শহরে আলাদা একটি চিকিৎসা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। পেশাজীবনে সমৃদ্ধি অর্জনের এমন পথ আজকের দিনের বহু চিকিৎসকের নিকট বেশ পরিচিত।

স্বনামধন্য বহু চিকিৎসকই এই চিকিৎসা বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছিলেন এবং মাঝে মাঝে সুলতান নূরুদ্দীন যঙ্গি চিকিৎসা নিয়ে আলোচনার জন্য চিকিৎসক ও পেশাজীবীদের জমায়েত দরবারে বসাতেন। অন্য সময় হাসপাতালের পরিচালক আবুল মাজিদ শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে তিন ঘন্টা ধরে যে বক্তব্য দিতেন, তা তাদেরকে এ জমায়েতে শুনতে হতো। এই চিকিৎসা বিদ্যালয় থেকে শিক্ষাজীবন শেষ করেছেন, এমন স্বনামধন্য চিকিৎসকদের মাঝে ১৩শ শতাব্দির চিকিৎসাশাস্ত্রীয় ঐতিহাসিক ইবনে আবি উসাইবিয়া এবং ইবনে আন-নাফীস অন্যতম। ১৩শ শতাব্দিতে ইবনে আন-নাফীসের রক্তের স্বল্প মাত্রার সঞ্চালন আবিষ্কার মানবদেহ উপলব্ধিতে যোগ করে নতুন মাইলফলক।

বায়ে: শিল্পীর তুলিতে আঁকা ক্ষুদ্র প্রতিকৃতিতে উছমানী আমলের এক প্রধান চিকিৎসকের অবয়ব ফুটে উঠেছে। ডানে: সিরিয়ার দামেস্কে অবিস্থত নূরুদ্দীন বিমারীস্তান বা হাসপাতালের প্রবেশ পথ, এটার এমন বিন্যাস অনেকের মনে বেশ শক্ত অনুভূতির জন্ম দেয়। ভবনটি এখন আরব ঔষধ ও বিজ্ঞান জাদুঘর হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।
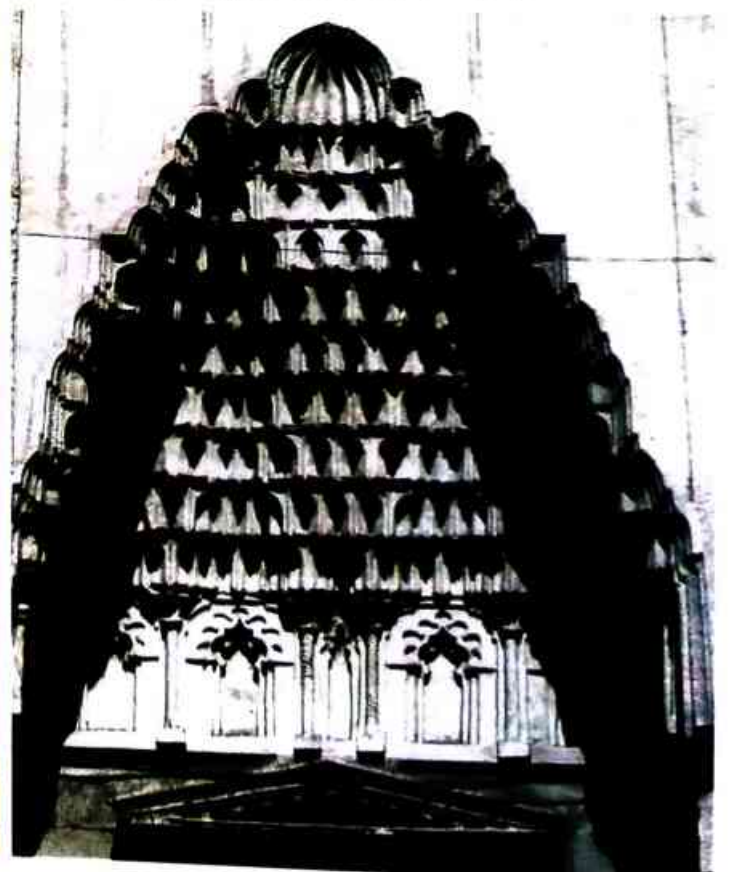
০২ পূর্ণতার উপকরণ

কেউ যদি আপনার সামনে এক হাজার বছর আগেকার সার্জারি যন্ত্রের একটি ট্রে উপস্থিত করে, আর আপনি যদি ধরতে না পারেন যে, এগুলো কি আধুনিক যন্ত্র না হাজার বছর আগেকার, তবে কেমন হবে বলুন তো? যদি ভেবে থাকেন, হাজার বছর আগেকার এসব যন্ত্র হয় এবড়ো-থেবড়ো হবে, না হয় ত্রুটিপূর্ণ হবে, তবে বিস্তারিত জানতে পড়ুন এবং অবাক হতে থাকুন।

আমরা যদি ১০ম শতাব্দির দক্ষিণ স্পেনে ফিরে যাই, তবে সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতিতে টইটুম্বুর আবুল ক্বাসিম খালাফ ইবনে আল-আব্বাস আয-যাহরাবী, পশ্চিমে *আবুলকাসিস* নামে পরিচিত সার্জনের কাঁধে ভর দিয়ে এক নয়া দিগন্তের দেখা পাবো। "*আত-তাসরীফ*" নামে ইতোমধ্যেই তিনি তার চিকিৎসা বিশ্বকোষ রচনা করে ফেলেছেন এবং তাতে রয়েছে সার্জারি নিয়ে স্বতন্ত্র অধ্যায়, অবাক করে দেয়ার বিষয় হচ্ছে, সেখানে তিনি ২'শরও বেশি সার্জারি যন্ত্রের বিবরণ পেশ করেছেন। প্রাচীন মিশরীয় সমাধিগুলোর এদিক-সেদিক অঙ্কিত কিছু নকশার কথা বাদ দিলে চিকিৎসাশাস্ত্রের ইতিহাসে খুব সম্ভবত এটাই প্রথম রচনা, যেখানে সার্জারি যন্ত্রের সচিত্র নকশা অঙ্কন করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, এই চিত্রায়নগুলো এতটাই নিখুঁত যে, এক সহস্রাব্দ পার হলেও এগুলোতে খুব সামান্যই পরিবর্তন এসেছে; উপরন্তু এই চিত্রায়নগুলোই ইউরোপে সার্জারির ভিত্তি দাঁড় করাতে অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করেছিল।

হাতে আঁকা নকশার মাধ্যমে আয-যাহরাবী প্রতিটি যন্ত্রের চিত্রায়নের পাশাপাশি ওই যন্ত্র কীভাবে ও কখন ব্যবহার করতে হয়, তারও বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরেছেন। উদাহরণস্বরূপ, *cauterization* (ক্ষত নিরাময়ে ছেঁকা) সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, "প্রাচীন চিকিৎসকদের মতানুসারে ছেঁকা দিয়ে ক্ষতের সংক্রমণ রোধে লোহার তুলনায় স্বর্ণের ব্যবহার সর্বোত্তম। আমাদের মতে, এক্ষেত্রে লোহার ব্যবহারই চটপটে ও অধিকতর নিরাপদ।"

নাকে হওয়া ফিস্টুলা (নলসদৃশ দীর্ঘ ক্ষত/ভগন্দর) চিকিৎসায় কীভাবে *scraper* (*মাজরাদ* – চাঁছনি) যন্ত্রের ব্যবহার করতে হবে, সে সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, "জনসাধারণ যেটাকে সজারুর কাঁটা বলে, ডাক্তাররা সেটার নাম দিয়েছেন 'ফিস্টুলা'। ইতোপূর্বে বর্ণিত পদ্ধতি মোতাবেক ছেঁকা বা দাহক দিয়ে চিকিৎসার পরেও যদি এটার উপশম না হয়, তবে একেবারে হাড় পর্যন্ত পৌঁছে, সেখান থেকে পেকে যাওয়া টিউমারটি কেটে সবটুকু পুঁজ বের করা ছাড়া এটা নিরাময়ের নির্দিষ্ট কোনো পথ নেই। যখন হাড় পর্যন্ত পৌঁছে যাবেন এবং পচা অংশ বা কালো জিনিস দেখতে পাবেন, তখন এই চিত্রে বর্ণিত যন্ত্র দিয়ে এটাকে একেবারে চেঁছে ফেলুন। এই যন্ত্রকে 'অসমতল মাথা' বলে এবং এটা ভারতীয় লোহা দিয়ে তৈরি। এটার মাথা বোতামের ন্যায় গোলাকার এবং ধাতু ঘষার যন্ত্র উখা বা রেতির ন্যায় নিশানা সমেত বেশ সূক্ষ্মভাবে খোদাই করা। আক্রান্ত হাড়ের স্থানে এটা স্থাপন করুন এবং এটাকে আপনার আঙ্গুলের মাঝে ঘুরিয়ে হাতের সাহায্যে কিছুটা নিচের দিকে চাপতে থাকুন, যতক্ষণ না নিশ্চিত হচ্ছেন যে, সবটুকু আক্রান্ত হাড় চেঁছে ফেলা হয়েছে। এমনটি কয়েকবার করার পর রক্তক্ষরণ রোধ করে এমন প্রতিষেধক দিয়ে ক্ষতস্থানে ড্রেসিং বা পট্টি বেঁধে দেন। ক্ষতস্থান যদি সেরে উঠতে থাকে এবং সেখানে মাংস গজাতে শুরু করে এবং ক্ষত থেকে পুঁজ পড়া বন্ধ হয়, এমনকি চল্লিশ দিন পার হওয়ার পরেও যদি সেগুলোর কোনো দেখা না মেলে এবং সেখানে কোনো ধরনের ফোলা বা কিছু বের হওয়া দৃশ্যমান না হয়, তবে আপনি ধরে নিতে পারেন যে, এটা পুরোপুরি সেরে গেছে।"

১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দের সিরিয়ার একটি স্মারক স্ট্যাম্প; শিল্পীর তুলিতে চিত্রায়িত হয়েছে ১০ম শতাব্দি স্পেনীয় মুসলিম সার্জন আয-যাহরাবীর প্রতিকৃতি।

> "নেতৃস্থানীয় পণ্ডিত হিসেবে আজও আয-যাহরাবী স্বমহিমায় ভাস্বর, যিনি ব্যবচ্ছেদ বিদ্যার জ্ঞান কাজে লাগিয়ে সার্জারিকে বিজ্ঞানের স্বতন্ত্র একটি শাখায় রূপান্তর করেছেন। বিভিন্ন যন্ত্রকে তিনি যে অভিনব ও সৃজনশীল কায়দায় চিত্রায়িত ও অঙ্কন করতেন, তা আজও তার অবদানকে জীবন্ত রেখেছে। আর যারাই তার পরে এসেছে, তাদের কর্মে তিনি বজায় রেখেছেন তার চলমান প্রভাব।"
>
> – এল. লুকল্যারক, ১৯শ শতাব্দির ফরাসি চিকিৎসাশাস্ত্রীয় ইতিহাসবেত্তা

মূত্রনালীর পাথর অপসারণে তার গবেষণালব্ধ ফলাফল বিবৃত হয়েছে বহু পাতা জুড়ে। আয-যাহরাবী মূত্রনালীর এসব পাথর চূর্ণ করার জন্য *'আল-মিশ'আব'* (ড্রিল) নামের একটি যন্ত্র প্রস্তুত করেন। তিনি বলেন, "ত্রিকোণাকার ধারালো প্রান্তবিশিষ্ট ইস্পাতের একটি রড নেন ... এবং পাথরের সমান আকারের সুতা এটার সাথে বাঁধুন, যেন এটা পিছনে না যায়। আলতোভাবে এটা প্রবেশ করাতে থাকুন, যতক্ষণ না পাথরের নাগাল পাচ্ছে, অতঃপর ছিদ্র করতে এটাকে ঘুরাতে থাকুন ... তাৎক্ষণিকভাবে প্রস্রাব বেরিয়ে আসবে, বাহির থেকে পাথরের উপরের চাপ প্রয়োগ করুন এবং নিজের হাত দিয়ে তা উপড়ে ফেলুন, তখন সেগুলো চূর্ণ হবে এবং প্রস্রাবসহ বেরিয়ে আসবে। যদি সফল না হন, তবে কেটে ফেলতে পারেন।"

আয-যাহরাবীর গ্রন্থের সাম্প্রতিককালের অনুবাদক জেফরি লুইস ও মার্টিন স্পিংক এই যন্ত্রের মৌলিকত্ব আলোচনা করতে গিয়ে এভাবে মন্তব্য করেন, "আধুনিক যুগের বহু শতাব্দি আগেই আবুলকাসিসের এই যন্ত্র তো প্রকৃত প্রস্তাবে *lithotripter* (মূত্রনালীর পাথর চূর্ণবিচূর্ণকারী যন্ত্র), অথচ বিষয়টি অনেকেরই চোখ এড়িয়ে গেছে, দুর্ভাগ্যক্রমে আধুনিক যুগের প্রখ্যাত সার্জন ফ্রাংকো ও প্যারে এবং যৌনাঙ্গ-মূত্রনালী সার্জারির ভিন হিসেবে খ্যাত প্যারেরা কোমিথি পর্যন্ত বিষয়টি একবারের জন্য উল্লেখও করেননি।"

১২শ শতাব্দির সেভিলের চিকিৎসক ইবনে যুহর ইস্পাত রডের শেষপ্রান্তে হীরা সংযুক্ত করে এ যন্ত্রকে আরও কার্যকর করেন। ড্রিল বা ছিদ্রকরণ যন্ত্রের পাশাপাশি আয-যাহরাবী *cystolithotomy* (মূত্রাশয় থেকে পাথর অপসারণ)-এর জন্য একটি ছুরিও প্রস্তুত করেছিলেন।

১৫৩২ খ্রিস্টাব্দের কাঠ-খোদাইয়ে ছেঁকা দিয়ে ক্ষত নিরাময়ের একটি চিত্র চিত্রায়িত হয়েছে। আয-যাহরাবীর "আত-তাসরীফ" গ্রন্থের লাতিন অনুবাদে চিত্রটি রয়েছে।

আয-যাহরাবীর আলোচিত অন্যান্য যন্ত্রের মাঝে বিভিন্ন আকার ও আকৃতির *cauterization* বা ছেঁকা দিয়ে ক্ষত নিরাময় যন্ত্র, *scalpels* (হালকা ছুরি): বিভিন্ন ধরনের ছেদন কাজে ব্যবহৃত খুবই ধারালো ছুরি, *hooks* (হুক, বড়শির ন্যায়): বেশ ধারালো বা ভোঁতা বৈশিষ্ট্যের অর্ধবৃত্তাকার প্রান্তবিশিষ্ট এ যন্ত্র আজও ব্যবহৃত হয় এবং এভাবেই এটা পরিচিত (ভোঁতা হুক রক্তের পিণ্ড পরিষ্কারের জন্য, ধারালো হুক সামান্য পরিমাণ টিস্যু ধরে রাখা ও উঠানোর কাজে লাগে; এতে টিস্যুর নির্যাস নেয়া এবং ক্ষতের প্রান্ত গুটিয়ে নেয়া যায়); *forceps* (চিমটা): বিচ্ছিন্ন করা, টেনে তোলা ও টিস্যু ধরে রাখার ন্যায় চিকিৎসা অপারেশনে দু' হাতলবিশিষ্ট এ ধাতব যন্ত্র ব্যবহৃত হয়; [*crushing forceps* – চূর্ণকারী এই চিমটার দুটো চোয়াল মূত্রাশয়ের পাথর চূর্ণবিচূর্ণ ও অপসারণের কাজে লাগে এবং *delivery forceps* – প্রসব কাজে সহায়ক এ চিমটাতে একটি অর্ধবৃত্তাকার প্রান্ত এমনভাবে যুক্ত থাকে, যা মায়ের গর্ভ থেকে ভ্রূণ অপসারণে বেশ কার্যকর এবং এ যন্ত্র আজও ব্যবহৃত হয়]।

মুসলিম সভ্যতার এসব সার্জারি যন্ত্র মামুলি ও সাদামাটা – এ ধরনের মন্তব্য সম্পূর্ণ বাস্তবতা বিরোধী, বরং আজকের দিনে আমাদের ব্যবহৃত যন্ত্রের সাথে রয়েছে এগুলোর অবাক করা সাদৃশ্য।

চিকিৎসা উপকরণ

সার্জারি যন্ত্রের নিপুণতা

আজকের দিনেও সমানভাবে কার্যকর জীবন রক্ষাকারী যন্ত্র

উল্লেখযোগ্য পরম্পরা: ২'শরও অধিক যন্ত্র নির্মাণ, যার অধিকাংশই আধুনিক চিকিৎসায় ব্যবহৃত হচ্ছে

স্থান: কর্ডোবা, স্পেন
তারিখ: ১০ম থেকে ১১শ শতাব্দি
আবিষ্কারক: আয-যাহরাবী, সার্জন

Scalpels (হালকা ছুরি) ও ছুরি, *saw* (অপারেশনে ব্যবহৃত করাত) ও *scraper* (চাঁছনি), ড্রিল বা তুরপুন ও *forceps* (চিমটা)। সার্জারি যন্ত্রে বিগত হাজার বছরে আশ্চর্যজনকভাবে বেশ সামান্যই বদলেছে। মুসলিম সভ্যতার সোনালি যুগে স্পেনে বসবাসরত সার্জন ও পণ্ডিত আয-যাহরাবী যেসব নথিপত্র রেখে গেছেন, সেগুলো এটা প্রদর্শন করে যে, তিনি দু'শরও বেশি চিকিৎসা উপকরণ নির্মাণ ও ব্যবহার করেছিলেন, যার অধিকাংশই আমরা আজকের দিনেও ব্যবহার করছি।

পশ্চিমে আবুলকাসিস নামে পরিচিত আয-যাহরাবী ৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে কর্ডোবাতে জন্ম নেন। স্বনামধন্য এই চিকিৎসক তার চিকিৎসা জীবনে শতাধিক অপারেশন ও চিকিৎসা কার্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি চিকিৎসার বহু নতুন নিয়ম ও কৌশল উদ্ভাবন করেছিলেন, যা তার রোগীদের প্রত্যাশাকে বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়েছিল।

আয-যাহরাবী তার ও তার সহকর্মীদের কাজের চাক্ষুষ বিবরণসমূহ তার "আত-তাসরীফ" নামের ৩০ খণ্ডের সুবিশাল গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন, যেখানে চিকিৎসার বিভিন্ন দশা, দন্ত্য চিকিৎসা ও সার্জারির নানা কলা-কৌশল নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে। খনিজ ও ভেষজ উপাদান, এমনকি প্রাণিজ দ্রব্য ব্যবহার করে কীভাবে প্রতিষেধক ঔষধ প্রস্তুত করতে হয়, সে ব্যাপারেও তিনি পর্যাপ্ত বিবরণ তুলে ধরেছেন।

এই গ্রন্থে প্রথমবারের মতো সার্জারি যন্ত্রের চিত্রায়ন, সেগুলোর গঠনশৈলীর নকশা এবং প্রতিটি যন্ত্র কীভাবে ও কখন ব্যবহার করতে হবে, তার বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে। আজকের দিনেও সার্জারি বেশ বিপজ্জনক ও কষ্টসাধ্য কাজ, তথাপি উপযুক্ত যন্ত্রের সহায়তায় হাড়ের রোগ, টিউমার, মূত্রশয়ের পাথর, বিভিন্ন ক্ষতে আক্রান্ত রোগীদের যন্ত্রণা উপশম এবং শিশুজন্মে সহায়তার মতো কাজগুলো সাফল্যের সাথে সম্পাদন করা যায়।

আয-যাহরাবীর গ্রন্থে *Scalpels* (হালকা ছুরি), ধারালো ও ভোঁতা হুক, *saw* (অপারেশনে ব্যবহৃত করাত) এবং *scraper* (চাঁছনি)-এর মতো যন্ত্রের হাতে আঁকা নকশা রয়েছে, যার অধিকাংশই আমাদের নিকট সুপরিচিত এবং অন্যগুলো আজ আরও সমৃদ্ধ হয়েছে। ১২শ শতাব্দিতে ইবনে যুহর নামের সেভিল নিবাসী এক ডাক্তার আয-যাহরাবীর একটি যন্ত্রে হীরার ডগা যুক্ত করে সেটাকে আরও উন্নত ও কার্যক্ষম করেছিলেন।

স্থানচ্যুত কাঁধ ঠিক করা, সরে যাওয়া হাড় যথাস্থানে বহাল রাখতে প্লাস্টারের ছাঁচের ব্যবহার, নকল দাঁত দিয়ে ক্ষয়ে যাওয়া দাঁতের প্রতিস্থাপন এবং ক্যান্সারের মতো রোগের চিকিৎসার চেষ্টাসহ বহু বিষয় আয-যাহরাবী তার "আত-তাসরীফ" গ্রন্থে আলোচনা করেছেন। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সমৃদ্ধ ঝুলি তাকে তার রোগীদের প্রয়োজনের সময় পাশে দাঁড়াতে বিপুলভাবে সহায়তা করেছিল।

অল্পতেই উত্তেজিত হন, এমন রোগীদের স্বাভাবিক রাখার জন্য সংবেদনশীল প্রকৃতির একটি ছুরি নির্মাণ করেন, যাতে ব্লেড লুকানো ছিল।

আয-যাহরাবীর সার্জারি উপকরণের সচিত্র বিবরণের একটি পাণ্ডুলিপি, তিনি হাড়ের সার্জারিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন আকার ও আকৃতির saw বা মিনশার এবং scraper বা মাজরাদ নিয়ে আলোচনা করেছেন।

শিল্পীর তুলি আয-যাহরাবীর সার্জারি কার্যক্রম উপস্থাপন করেছে। চিকিৎসাশাস্ত্র সম্পর্কে আয-যাহরাবী যা জানতেন, তিনি তার সবটুকু ৩০-খণ্ডে সমাপ্ত চিকিৎসা বিশ্বকোষ "আত-তাসরীফ"-এ জমা করেছেন। দু'শরও বেশি চিকিৎসা উপকরণ তিনি এঁকেছেন এবং সেগুলোর বিবরণও দিয়েছেন, হাজার বছরের ব্যবধানে সেগুলোতে বেশ সামান্যই পরিবর্তন এসেছে।

রোগীর শয্যাপাশের রীতিনীতি এবং চিকিৎসাতে উদ্ভাবনকুশলের প্রয়োগ তাকে তৎকালীন স্পেনের মুসলিম শাসকের রাজকীয় চিকিৎসকে পরিণত করেছিল।

সার্জারির পর রোগীর দেহের অভ্যন্তরে সেলাইয়ের জন্য সুনিপুণভাবে *catgut* (প্রাকৃতিক ফাইবার বা তন্তু থেকে প্রস্তুতকৃত এক ধরনের কর্ড বা তন্ত্রী)-এর ব্যবহার আয-যাহরাবীর অন্যতম আরেকটি স্মরণীয় উদ্ভাবন – যা সার্জনগণ আজও ব্যবহার করেন। এটা ছাড়াও আয-যাহরাবীর প্রস্তাবিত বহু প্রস্তাবনা আজকের দিনে চিকিৎসা বিজ্ঞান যেভাবে কাজ করে, তার সাথে নিবিড় সাদৃশ্য বহন করে।

হাসপাতাল, চিকিৎসা কৌশল এবং সার্জারি – এসবের মাধ্যমে আধুনিক বিশ্বের স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা ব্যবস্থা নিজের শিকড়কে অতীতের অগণিত সূত্রের সাথে আটকে রেখেছে। প্রাথমিক দিকের মুসলিম সমাজে বিশেষ ধরনের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়, যা সার্জারি, হাসপাতাল এবং প্রাচীন জ্ঞান ও নয়া গবেষণার ভিত্তিতে প্রাপ্ত ব্যাপক ঔষধ সরবরাহ আমাদের দিয়েছে চিকিৎসা বিজ্ঞানে আলোর দেখা।

ক্রিমোনার জেরার্ড যখন আয-যাহরাবীর *"আত-তাসরীফ"*-এর লাতিন অনুবাদ করেন, তখন থেকেই এই মুসলিম সার্জনের উদ্ভাবন ও গবেষণা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়া শুরু করে এবং তা রেনেসাঁর সময় পর্যন্ত চিকিৎসা অনুশীলনে ব্যাপক প্রভাব রাখতে সমর্থ হয়। মুসলিম সভ্যতার অন্যান্য চিকিৎসা পুস্তকের সাথে এটা বহু শতাব্দির ধরে ইউরোপের চিকিৎসা বিদ্যালয়গুলোতে ম্যানুয়েল গ্রন্থ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

০৩ সার্জারি

উৎকর্ষ ও সমৃদ্ধির চরম শিখরে পৌঁছা আধুনিক সার্জারি বস্তুত কয়েক শতাব্দির উদ্ভাবনকুশলের চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ, যা সম্ভব হয়েছে জীবন বাঁচাতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ একদল আত্মনিয়োগকারী মানুষের বদৌলতে। জীবন বাঁচানোর এই নৈতিক দাবী এক হাজার বছর পূর্বে দক্ষিণ স্পেনের মুসলিমদের অন্তরে গেঁথে ছিল এবং সেখানের মুসলিমরা তিন ধরনের সার্জারি চর্চা করতো: রক্তনালী, সাধারণ ও অস্থিবিষয়ক।

ইসলামী সভ্যতা যখন তার উৎকর্ষের চরমে পৌঁছায়, তখন স্পেনের কর্ডোবাতে বাস করতেন সর্বাধিক পরিচিত মুসলিম সার্জনদের একজন। আয-যাহরাবী বা *আবুলকাসিস* তার কাছে আসা প্রতিটি রোগীর বিষয় দক্ষতা ও উদ্ভাবনকুশলের সাথে বেশ গুরুত্ব দিয়ে দেখতেন এবং যথাসম্ভব প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতেন। এ ব্যাপারে তিনি এতটাই সৃজনশীলতার পরিচয় দেন যে, তৎকালে বিশিষ্ট সার্জন হিসেবে তার খ্যাতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে এবং তিনি আন্দালুসের শাসক আল-মানসূরের রাজকীয় চিকিৎসকে পরিণত হন।

নয়া সব কৌশল, দু'শরও বেশি সার্জারি উপকরণ উদ্ভাবন এবং এর পাশাপাশি দাঁত, ঔষধ ও ওই সময়ের সার্জারি বিদ্যার সাথে সম্পৃক্ত বিষয়াদির বিস্তারিত বিবরণ প্রদানের মাধ্যমে তিনি সার্জারিতে নিয়ে আসেন বৈপ্লবিক উপাখ্যান। প্রতিটি চিকিৎসা অনুশীলনের করণীয় ও বর্জনীয় বিষয়ে গুরুত্বারোপে মাধ্যমে তার রচিত "*আত-তাসরীফ*" ব্যবহারিক চিকিৎসাশাস্ত্রীয় নিয়মনীতির ভিত দাঁড় করায়।

বহু যন্ত্র আয-যাহরাবী প্রথম উদ্ভাবন করেন বিধায় তার নামের সাথে অনেকগুলো 'প্রথম' তকমা জুড়ে আছে এবং তার জীবন-বৃত্তান্তও বেশ উপভোগ্য। অভ্যন্তরীণ সেলাইয়ে তিনি ক্যাটগাট (*catgut*)-এর প্রচলন ঘটান, যা আজকের দিনে নিতান্ত সাধারণ থেকে শুরু করে জটিল, সব ধরনের সার্জারিতে সমানভাবে ব্যবহৃত হয়। ক্যাটগাট (*catgut*) একমাত্র প্রাকৃতিক বস্তু, যা নিমেষেই দেহে মিশে যায় এবং দেহও সেটা ভালভাবে গ্রহণ করে।

সার্জারিতে ক্যাটগাট (*catgut*)-এর প্রচলনের সূত্রপাত আয-যাহরাবীর হাত ধরে হলেও আর-রাযীই প্রথম ব্যক্তি, যিনি সেলাইয়ের সুতাতে প্রাণিজ অন্ত্র ব্যবহার করেন। সার্জারি কাজে আয-যাহরাবী সুরেলা বাদ্যযন্ত্রের স্ট্রিং বা তারের পাকানো তন্তুও ব্যবহার করতেন।

প্রতিটি চিকিৎসা অনুশীলনে উদ্ভাবনকুশলের প্রয়োগ ঘটিয়ে চিকিৎসা পদ্ধতিতে তিনি বৈপ্লবিক ছোঁয়া নিয়ে আসেন, যেমন: ক্ষয় বা পড়ে যাওয়া দাঁতের বেলায় হাড়ের প্রতিস্থাপন প্রয়োগ; সোনা বা রুপার পাত্র দ্বারা নড়ে যাওয়া দাঁত কীভাবে সুস্থ দাঁতের সাথে সংযুক্ত করতে হবে – তার বিবরণ প্রদান; অসমভাবে ঝুলে যাওয়া নারীদের স্তন স্বাভাবিক অবস্থায় আনতে সার্জারি চিকিৎসা দেয়া; রক্তপাত বন্ধে প্রথম ব্যক্তি হিসেবে তুলার ব্যবহার; শ্বাসনালীর অস্ত্রোপচার, সরে যাওয়া হাড় যথাস্থানে বহাল রাখতে প্লাস্টারের ছাঁচের ব্যবহার এবং মূত্রনালীর পাথর অপসারণে মূত্রনালীর পথ দিয়ে সূক্ষ্ম ড্রিল বা ছিদ্রকরণ যন্ত্র অনুপ্রবেশের পদ্ধতি চালু করা।

উপরে: দশম শতাব্দিতে আয-যাহরাবী অভ্যন্তরীণ সেলাইয়ে ক্যাটগাট (catgut)-এর প্রচলন ঘটান, যা আজও ব্যবহৃত হয়; নিচে: বর্তমানের অপারেশন থিয়েটারে যে ধরনের আধুনিক সার্জারি উপকরণ ব্যবহৃত হয়, সেগুলো আয-যাহরাবী উদ্ভাবিত উপকরণ থেকে খুব সামান্যই ভিন্ন। তুরস্কের আমইয়াসার

চিকিৎসক সেরাফেদ্দীন সাবুনচুগলু তার রচিত ১৫শ শতাব্দির "চেরাহিয়্যেত উল হানিয়্যে" গ্রন্থে বিভিন্ন সার্জারি নিয়ম ও কৌশলের বিবরণ তুলে ধরেছেন।

নিজের বানানো যন্ত্র দ্বারা চূর্ণ-বিচূর্ণকরণের মাধ্যমে কীভাবে মূত্রাশয়ের পাথর অপসারণ করতে হয়, তার পূর্ণাঙ্গ বিবরণও তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন। নাকের ফোড়া অপসারণের ন্যায় সাধারণ সার্জারি বিবরণ প্রদানের পাশাপাশি নিজস্ব উদ্ভাবিত বিশেষ চিমটার সাহায্যে মৃত ভ্রূণ অপসারণের ন্যায় জটিল বিষয়ও তার আলোচনা থেকে বাদ পড়েনি। ব্যথা নাশের জন্য চামড়াকে ছেঁকা দেয়া এবং যথাস্থান থেকে বিচ্যুত হাড়কে স্বাভাবিক স্থানে আনার মতো বিষয়ও তিনি সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন।

এতসব উদ্ভাবন সত্ত্বেও রোগীদের সুবিধা-অসুবিধার কথা তিনি বেমালুম ভুলে যাননি, বরং পুঁজযুক্ত ফোড়া উন্মুক্ত করতে তিনি তার সার্জারি অপারেশনের জন্য লুকানো ছুরিযুক্ত বিশেষ ধরনের যন্ত্র উদ্ভাবন করেন, এতে করে তার রোগীরা অযথা ভয় থেকে নির্ভার থাকতো। টনসিল অপসারণে তিনি জিহ্বাকে ধরে রাখার জন্য জিহ্বাকে চাপ দেয়, এমন যন্ত্র ব্যবহার করেন এবং স্ফীত টনসিলকে হুকের সাহায্যে ধরে রেখে কাঁচির মতো যন্ত্রের সাহায্যে কেটে ফেলতেন। যন্ত্রটিতে আড়াআড়িভাবে যুক্ত ব্লেড ছিল, যা লালাগ্রন্থিকে কেটে দিতো এবং কণ্ঠনালী থেকে সরিয়ে ফেলার জন্য এটা ধরে রাখতো, যেন রোগী শ্বাসরোধ অনুভব না করে।

ঝুঁকিপূর্ণ এবং অত্যধিক ব্যথাদায়ক অপারেশন সম্পাদনে আয-যাহরাবী সচেতন ও মানবিক উভয়ভাবেই অনাগ্রহী ছিলেন, কেননা এগুলো রোগীদের যে কী পরিমাণ যন্ত্রণার সম্মুখীন করে, তিনি তা ভালোভাবেই অবগত ছিলেন। সার্জন ও রোগীর সম্পর্ক কেমন হবে, এটা ছিল সে ব্যাপারে এক অভূতপূর্ব অর্জন।

আয-যাহরাবীর বদৌলতে চিকিৎসাশাস্ত্রীয় পুস্তকে প্রথমবারের মতো নারীদের মূত্রাশয়ে থেকে কীভাবে পাথর সরাতে হয়, তার উপর স্বতন্ত্র একটি অধ্যায় লিপিবদ্ধ হয়, যা তার সার্জারি বিষয়ক গ্রন্থের ৬১-তম অধ্যায়। যে ৩০-টি খণ্ডের সমন্বয়ে "*আত-তাসরীফ*" গঠিত, সেখানে সার্জারি কেবল একটি অংশ মাত্র, যা থেকে খুব সহজে অনুমান করা যায় যে, কী পরিমাণ কাজ তিনি সেখানে জমা করেছেন।

পুরুষের মূত্রাশয় থেকে পাথর অপসারণে তিনি তার নিজস্ব পদ্ধতি বর্ণনা করেন, যা হিন্দু চিকিৎসাশাস্ত্রের উপর লিখিত "*সুশ্রুত সংহিতা*" গ্রন্থে বর্ণিত পদ্ধতির উল্লেখযোগ্য পরিমার্জনের ফসল। মূত্রথলিতে যেন কোনো ধরনের ফুটো বা ছিদ্রের সৃষ্টি না হয়, সেজন্য ছেদক বা ছিত্তির অভ্যন্তরীণ অংশ আবশ্যিকভাবে তার বাহিরের অংশ থেকে ছোট হবে, এ ব্যাপারে আর-রাযী ও আয-যাহরাবী উভয়ে বেশ জোর দিয়েছেন।

মূত্রাশয়ের পাথর টেনে বের না করে চিমটার সাহায্যে বের করতে হবে, যদি পাথর বড় হয়, তবে তা ভেঙে ফেলতে হবে এবং একটু একটু করে বের করে আনতে হবে। টিস্যুর ক্ষতি ও মাত্রাতিরিক্ত রক্তপাত এড়ানো এবং নতুন করে মূত্রাশয়ে ফিস্টুলার আবির্ভাব যাতে না হয়, সে ব্যাপারে তাদের সচেতনতার মাত্রা এখান থেকে সহজেই অনুমেয়।

এক হাজার বছর পূর্বে হাসপাতালে রোগীরা ঠিক সেভাবেই স্বাস্থ্য সেবা পেতেন, যেভাবে তারা আজ পাচ্ছেন।

আয-যাহরাবী আরও বলেন যে, প্রতিটি পাথর টুকরোকে সরাতে হবে, কেননা মূত্রাশয়ে একটি টুকরো থাকার মানেই হলো, তা আবার আকারে বড় হবে। আজকের দিনেও এই উপদেশ বেশ জোরের সাথে দেয়া হয়।

> "যখনই সার্জনরা ছুরি হাতে নেবে, অত্যধিক সতর্ক হওয়াটা তাদের জন্য আবশ্যক! কেননা তাদের সূক্ষ্ম ছেদন কার্য জীবনরূপ আসামীকে প্রতিনিয়ত ভয়ে আঁতকে দেয়।"
>
> – এমিলি ডিকিনসন, মার্কিন কবি

গাইনি বা প্রসূতিবিদ্যাতে তৎকালীন অন্যসব মুসলিম সার্জনের সাথে তার কাজও ছিল পথিকৃতের ন্যায়। অকাল গর্ভপাত এবং সন্তান প্রসব পরবর্তী করণীয় বিষয়ে তিনি ধাত্রীদের প্রশিক্ষণ দিতেন। যোনিপথ ফাঁক রাখে, এমন যন্ত্রও তিনি তৈরি করেন এবং সেটার প্রচলন ঘটান।

মুসলিম বিশ্বে এমন বহু ডাক্তার ও সার্জন ছিলেন, যারা বহু যুগান্তকারী কাজের নায়ক ও স্বপ্নদ্রষ্টা, যেমনঃ বর্তমান উজবেকিস্তানে জন্ম নেয়া ১১শ শতাব্দির ইবনে সীনা। তিনি তার "*আল-কানুন ফীত তীব*" গ্রন্থে ঔষধের এক বিস্তৃত ফিরিস্তি দেন এবং ইবনে সীনার হাড়ের জখম চিকিৎসা অধ্যায়ে আপনি এ ব্যাপারে আরও তথ্য পাবেন।

ইবনে সীনার মতানুসারে, ক্যান্সার (আরবীতে السَّرَطَانُ – *আস-সারাতান*) এক ধরনের শীতল টিউমার, যা প্রদাহ বা জ্বালা সৃষ্টি করে না এবং প্রথমদিকে ব্যথাহীন থাকে। বিশেষ কিছু ধরনে ব্যথা থাকে এবং উচ্চতর পর্যায়ে পৌঁছালে তা অনারোগ্য ব্যাধিতে রূপ নেয়। তিনি বলেন, সামুদ্রিক কাঁকড়ার পায়ের প্রসারণের ন্যায় ক্যান্সার কেন্দ্র থেকে ছড়িয়ে পড়ে এবং এখান থেকেই এর আরবী নামকরণ হয় (আরবী سَرَطَانٌ দ্বারা কাঁকড়াও বোঝায়)। অভ্যন্তরীণ ক্যান্সার আক্রান্ত রোগীর অজান্তেই বেড়ে উঠে এবং ব্যথা থাকা সত্ত্বেও রোগী এটা নিয়ে দীর্ঘ সময় বেঁচে থাকতে পারে। 'সীমাবদ্ধ ক্যান্সার' হলো ক্যান্সারের এমন এক ধরন যেখানে সার্জনের হস্তক্ষেপ করার সুযোগ থাকে। এসব ক্ষেত্রে কর্তন প্রক্রিয়াকে বেশ নিখুঁত হতে হয়, যেন টিউমারের সবটুকু অংশ বেরিয়ে আসে। তথাপি এসব ক্ষেত্রে সার্জারিই শেষ কথা নয়, কারণ ক্যান্সার আবার ফিরে আসতে পারে। প্রকৃতপক্ষে, ইবনে সীনা নারীদের স্তন ব্যবচ্ছেদের বিপক্ষে উপদেশ দিয়ে থাকেন, কেননা এটা রোগের বিস্তৃতির পথ সুগম করে। বরং তিনি কপার বা লেড অক্সাইড ব্যবহারের পরামর্শ দিতেন, এগুলো ক্যান্সার নিরাময়ে অক্ষম হলেও রোগের বিস্তৃতি রোধে বেশ কার্যকর।

আয-যাহরাবীর ন্যায় ইবনে সীনা বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোকপাত করেছেন। মূত্রাশয়ের পাথরের কারণে মূত্রত্যাগে অক্ষম হওয়ার ব্যাপারে তিনি এভাবে মন্তব্য করেন, "রোগী তার পিঠের উপর ভর দিয়ে শুয়ে থাকলে তার পাছার একাংশ উঁচু করে তাকে ঝাঁকানো হবে, এতে করে মূত্রনালীর পথ থেকে পাথর সরে গিয়ে ... প্রস্রাব বেরিয়ে আসবে; মলদ্বারে আঙ্গুল প্রবেশ করানো সম্ভবত পাথর সরানোর সহজ একটি পন্থা হবে ... এটা কাজ না করলে *catheter* (মূত্রনিষ্কাশক নল) দিয়ে পাথর সরানো যেতে পারে ... এটা প্রবেশ করানো কঠিন কাজ, তাই তা প্রবেশ করানোর জন্য সজোরে ধাক্কা দেয়া যাবে না।" পশ্চাদদেশে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী মূত্রাশয়ের পাথর অপসারণে আধুনিক মূত্ররোগ বিশেষজ্ঞগণ যে পন্থা অবলম্বন করেন, এটা তারই অনুরূপ। তারা এটা *catheter* (মূত্রনিষ্কাশক নল) বা এন্ডোস্কপির মাধ্যমে পিছনে প্রবেশ করান।

১৩শ শতাব্দির সিরীয় চিকিৎসক ইবনুল কুফের মতে, সার্জারির মাধ্যমে মূত্রাশয়ের ছোট পাথর অপসারণের চেয়ে বড় পাথর অপসারণ অধিকতর সহজ, কেননা বড় পাথরগুলো হয় মূত্রনালীতে আটকে থাকবে, নয়তো মূত্রাশয়ের গহ্বরে থাকবে এবং সেখানে খুব সহজেই তাদের উপস্থিতি অনুভব করা যায়।

এসব কিছু এটাই প্রমাণ করে যে, এক হাজার বছর পূর্বে হাসপাতালগুলোতে অত্যন্ত যত্নের সাথে রোগীদের চিকিৎসা সেবা দেয়া হতো। বর্তমানের মতো, কতজন লোক সেরে উঠেছেন, তার পরিসংখ্যান হয়তো আমাদের কাছে নেই, তবে ওই সময়ের মহান সার্জনদের লিখে যাওয়া অঢেল নোট আমাদের সামনে রয়েছে। চিকিৎসা অনুশীলন ও গবেষণার এসব নোট সার্জারি ধারণাকে আমূল বদলে দিয়েছে। সবার কল্যাণের জন্য নিবেদিত এসব অবদান একবিংশ শতাব্দির মানুষদেরও স্পর্শ করেছে।

০৪ রক্ত সঞ্চালন

প্রাচীন গ্রিকরা মনে করতো, শিরার মাধ্যমে খাদ্য পাকস্থলি থেকে মলদ্বার পর্যন্ত বিস্তৃত অন্ত্র পরিপাক হয়ে লিভার বা যকৃতে পৌঁছায় এবং এই লিভারই রক্তের উৎপত্তিস্থল। হৃদপিণ্ডে যাত্রা শুরুর পূর্বে রক্ত 'প্রাকৃতিক শক্তি' দ্বারা লিভারে পূর্ণ হয়।

দ্বিতীয় শতাব্দিতে গ্রিক চিকিৎসক ও পণ্ডিত গ্যালেন এ ব্যাপারে আরও গবেষণা করেন। তিনি বলেন, রক্ত হৃদপিণ্ডের ডান পাশে পৌঁছে অদৃশ্য সূক্ষ্মরন্ধ্র বা ছিদ্রের সাহায্যে হৃদপিণ্ডের প্রাচীর ভেদ করে হৃদপিণ্ডের বাম পাশে পৌঁছায়। এখানে এসে রক্ত বাতাসের সাথে মিশে শক্তি উৎপন্ন করে, এরপর তা সারা দেহে বণ্টিত হয়।

১৭শ শতাব্দির ইউরোপে রক্ত সঞ্চালন এবং হৃদপিণ্ডের কার্যপ্রণালী নিয়ে উইলিয়াম হার্ভের যুগান্তকারী গবেষণার আগ পর্যন্ত শতাব্দির পর শতাব্দি এই ব্যাখ্যা সত্য হিসেবে বিবেচিত হতে থাকে। হার্ভে যুক্তি দেখান যে, হৃদপিণ্ড [রক্ত] সঞ্চালন ব্যবস্থার কেন্দ্রস্থল: এর মাধ্যমে তিনি আমাদের দেহে রক্তের পরিভ্রমণ ক্রিয়া ব্যাখ্যায় সক্ষম হন। এই আবিষ্কার তাকে এনে দেয় বিশ্বজোড়া খ্যাতি।

কিন্তু ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে গুরুত্বপূর্ণ এক পাণ্ডুলিপি আবিষ্কৃত হয় এবং মিশরীয় চিকিৎসক ড. মুহিউদ্দীন আত-তাতাবী তা দুনিয়ার কাছে তুলে ধরেন। এই আবিষ্কার হার্ভের বহুকাল পূর্বে দেয়া পালমোনারি বা ফুসফুসীয় সঞ্চালনের প্রথম বর্ণনা দুনিয়াবাসীর সামনে উন্মোচন করে।

"শরহ্ তাশরীহ আল-কানুন লি ইবনে সীনা" (ইবনে সীনার আল-কানুনের ব্যাখ্যা) নামের এই পাণ্ডুলিপি ১২১০ খ্রিস্টাব্দে সিরিয়ার দামেস্কে জন্ম নেয়া মুসলিম পণ্ডিত ইবনে আন-নাফীস কর্তৃক রচিত, যিনি বিখ্যাত আন-নূরী হাসপাতাল থেকে শিক্ষাগ্রহণ করেছিলেন। 'স্নাতক' শেষ করলে মিশরের সুলতান তাকে সালাউদ্দীনের প্রতিষ্ঠিত নাসিরী হাসপাতালে অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালনের জন্য কায়রোতে আমন্ত্রণ জানান।

চিকিৎসক এবং আইন বিশেষজ্ঞ হিসেবে ব্যস্ত কর্মজীবন পার করার পাশাপাশি ইবনে আন-নাফীস বিভিন্ন বিষয়ের উপর গ্রন্থ রচনা করেন, যার মধ্যে "ইবনে সীনার আল-কানুনের ব্যাখ্যা" অন্যতম।

আভিসিনা নামে পরিচিত ইবনে সীনা বহুবিদ্যায় পারদর্শী একজন পণ্ডিত ছিলেন, যিনি দর্শন, আইন এবং চিকিৎসাশাস্ত্রে চরম উৎকর্ষ হাসিল করেছিলেন। "ইবনে সীনার আল-কানুনের ব্যাখ্যা" নামে ইবনে আন-নাফীস যে গ্রন্থ রচনা করেন, সেটা তার নিজস্ব ক্ষেত্রে ছিল এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ। এ গ্রন্থে ইবনে আন-নাফীস অত্যন্ত নিখুঁতভাবে পালমোনারি বা ফুসফুসীয় সঞ্চালনের বিবরণ দেন, হৃদপিণ্ড ও ফুসফুসের কার্যপ্রণালী ব্যাখ্যা করেন এবং শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে দেহের বাহির থেকে আগত বাতাসের সংস্পর্শে এসে রক্ত ফুসফুসে পরিশোধিত হয়, এ ব্যাপারে তিনি বেশ জোর দেন।

রক্তের ফুসফুসীয় সঞ্চালনের ব্যাখ্যায় ইবনে আন-নাফীস বলেন, এই ব্যবস্থা হৃদপিণ্ডের এক প্রকোষ্ঠ থেকে ফুসফুসে রক্তের চলাচল এবং এরপর হৃদপিণ্ডের ভিন্ন প্রকোষ্ঠে রক্তের পুনর্প্রবাহের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। তার মতে, অপরিহার্য শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে আগত ফুসফুসীয় বাতাস দ্বারা রক্তের প্রবাহ বৃদ্ধি পায় এবং ধমনীর মাধ্যমে তা পুরো দেহে ছড়িয়ে পড়ে। তার উদ্ভাবন হচ্ছে: এটা বলা যে, হৃদপিণ্ডের ডান নিলয় (*right ventricle*) থেকে আগত শিরাস্থ রক্ত বাম নিলয়ে প্রবেশের পূর্বে সেটাকে ফুসফুস অতিক্রম করতে হয় এবং এই পর্যায়ে এটা ধমনীতে ধমনীবাহিত রক্ত হিসেবে প্রবেশ করে।

তার ভাষায় বললে, "হৃদপিণ্ডের ডান প্রকোষ্ঠ থেকে রক্তকে অবশ্যই এর বাম প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করতে হবে, কিন্তু এ দুটোর মধ্যে সরাসরি কোনো পথ নেই। হৃদপিণ্ডের পুরু প্রাচীর ছিদ্রযুক্ত নয় এবং কিছু লোকের ধারণা মোতাবেক না এতে কোনো দৃশ্যমান সূক্ষ্ম ছিদ্র আছে, আর না গ্যালেনের চিন্তা অনুযায়ী অদৃশ্য সূক্ষ্ম ছিদ্র আছে। ডান প্রকোষ্ঠ হতে রক্ত অবশ্যই ফুসফুসীয় ধমনীর মাধ্যমে ফুসফুসে প্রবাহিত হবে এবং এ প্রবাহের সময় রক্ত তার সারবস্তুগুলোকে ছড়িয়ে দিয়ে বাতাসের সাথে মিশ্রিত হয়ে ফুসফুসীয় শিরা অতিক্রম করে হৃদপিণ্ডের বাম প্রকোষ্ঠে পৌঁছাবে।"

উপরে: চিকিৎসক গ্যালেনের কাজের অনুবাদ হিসেবে প্রকাশিত গ্রন্থের প্রচ্ছদ। গ্যালেনের ন্যায় গ্রিক পণ্ডিতদের কাজগুলো কেবল আরবী মাধ্যমেই টিকে আছে।

> "হৃদপিণ্ডের পুরু প্রাচীর ছিদ্রযুক্ত নয় এবং কিছু লোকের ধারণা মোতাবেক না এতে কোনো দৃশ্যমান সূক্ষ্ম ছিদ্র আছে, আর না গ্যালেনের ভাবনা মোতাবেক রয়েছে কোনো অদৃশ্য সূক্ষ্ম ছিদ্র।"
>
> – ইবনে আন-নাফীস, মুসলিম পণ্ডিত

আধুনিক ভাষায়, এই অনুচ্ছেদের রূপান্তর হবে এমন: বর্জ্যবাহিত দূষিত রক্ত *vena cava* (ভ্যানাকাভা) নামের মহাশিরার মাধ্যমে ডান অলিন্দে *(right atrium)* প্রবেশ করে। বর্জ্যবাহিত দূষিত রক্ত দিয়ে পূর্ণ হবার পর ডান অলিন্দ সংকুচিত হয়ে একমুখী কপাটিকা দিয়ে রক্তকে ডান নিলয়ে *(right ventricle)* পাঠাতে থাকে। ফলে ডান নিলয় পূর্ণ হয়ে সংকুচিত হয় এবং তা রক্তকে ফুসফুসের সাথে সংযুক্ত ফুসফুসীয় ধমনীতে পাঠাতে শুরু করে। এখানে কৈশিক জালিকা *(capillaries)*-র মধ্যে কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও অক্সিজেনের আদান প্রদান ঘটে। রক্ত এখন অক্সিজেনসমৃদ্ধ, যেহেতু তা ফুসফুসীয় শিরাতে প্রবেশ করেছে এবং বাম অলিন্দ হয়ে এ রক্ত হৃদপিণ্ডে পুনরায় ফিরে আসে। বাম অলিন্দ পূর্ণ হয়ে অক্সিজেনসমৃদ্ধ রক্তকে একমুখী কপাটিকা দিয়ে বাম নিলয়ে পাঠিয়ে দেয়। বাম নিলয় সংকুচিত হয়ে রক্তকে মহাধমনীতে সজোরে পাঠিয়ে দেয়, যেখান থেকে পুরো দেহে রক্তের পরিভ্রমণের সূচনা ঘটে।

৩০০ বছর পর্যন্ত এ পর্যবেক্ষণ ইউরোপের নিকট পরিচিত ছিল না এবং ১৫৪৭ খ্রিস্টাব্দে বেলুনো শহরের আন্দ্রেয়া আলপাগো কর্তৃক ইবনে আন-নাফীসের কিছু লেখার লাতিন অনুবাদের মাধ্যমে এ ধারণা ইউরোপে প্রবেশ করে। পরবর্তীতে, রক্ত সঞ্চালনের এই প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যাদানের কিছু প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়, যেমন: ১৫৫৩ খ্রিস্টাব্দে মাইকেল সার্ভেটাস তার *Christianismi Restitutio* গ্রন্থে এবং ১৫৫৯ খ্রিস্টাব্দে রিয়াল্ডো কলোম্বো তার *De re Anatomica* গ্রন্থে চেষ্টা চালান। অবশেষে, ১৬২৮ খ্রিস্টাব্দে স্যার উইলিয়াম হার্ভে এটার যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম হন এবং এর মাধ্যমে তিনি রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়ার আবিষ্কারকের কৃতিত্ব লাভ করেন। যদিও ইবনে আন-নাফীস ছিলেন 'স্বল্প মাত্রা' বা ফুসফুসীয় সঞ্চালনের পথিকৃৎ।

ইবনে আন-নাফীসের মৃত্যুর ৭০০ বছর পর, ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে এই আবিষ্কারের কৃতিত্ব তাকে দেয়া হয়।

রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়া

১৩শ শতাব্দিতে ইবনে আন-নাফীস ফুসফুসীয় রক্ত সঞ্চালন তথা ফুসফুস কর্তৃক অক্সিজেনবিহীন রক্তের অক্সিজেনসমৃদ্ধ হওয়ার প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা করেন। হৃদপিণ্ডের ডান নিলয় অক্সিজেনবিহীন রক্তকে ফুসফুসীয় শিরার মাধ্যমে ফুসফুসে চালিত করে এবং এখানেই রক্ত অক্সিজেনসমৃদ্ধ হয়ে ফুসফুসীয় ধমনীর মাধ্যমে বাম অলিন্দে পুনরায় প্রবেশ করে।

১৭শ শতাব্দিতে উইলিয়াম হার্ভে হৃদপিণ্ড থেকে দেহের প্রান্তসীমা পর্যন্ত রক্ত সঞ্চালনের পূর্ণ প্রক্রিয়া আবিষ্কার করেন।
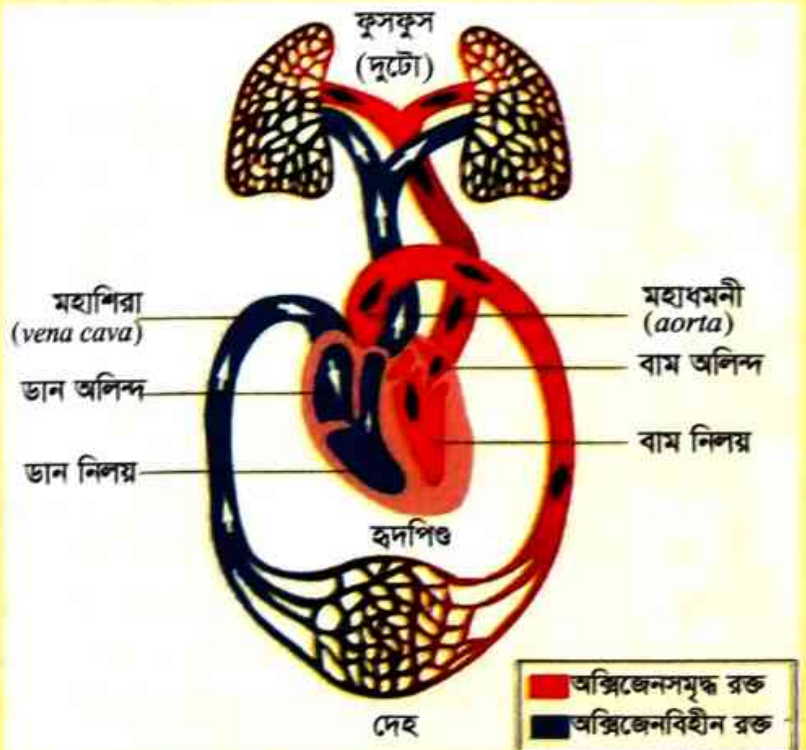
০৫ ইবনে সীনার হাড়ের জখম চিকিৎসা

আবিসিনা নামে পশ্চিমে পরিচিত ইবনে সীনা এতটাই গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব যে, প্রাচীন গ্রিক চিকিৎসক গ্যালেনের সাথে তার তুলনা হয় এবং তিনি ইসলামের গ্যালেন নামেই সমধিক পরিচিত। তার এই চরম সুখ্যাতির কারণে অনেক দেশই তার জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপনের প্রতিযোগিতায় নেমেছিল এবং ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে ইবনে সীনার মৃত্যুর ৯০০ বছর পর তুরস্ক এ কাজে প্রথম হয়।

দর্শন ও চিকিৎসাশাস্ত্রের সমৃদ্ধিতে তার অবদানের মূল্যায়ন ও স্বীকৃতি হিসেবে ইউনেস্কোর সকল সদস্য ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে তার জন্মের এক সহস্রাব্দ পূর্তি উদ্‌যাপন করে।

বর্তমান উজবেকিস্তানের আফশানা গ্রামে জন্ম নেয়া ইবনে সীনা ২১ বছর বয়সে নিজ শহর ত্যাগ করেন এবং জীবনের বাদবাকি সময় তিনি পারস্যের বিভিন্ন শহরে কাটান এবং পরিণত হন জগদ্বিখ্যাত দার্শনিক ও চিকিৎসকে। গোটা জীবনে তিনি ২৭৬-টির মতো গ্রন্থ ও পুস্তক রচনা করেন, যার অধিকাংশই আরবী হলেও অল্প কিছু ছোট বই তার মাতৃভাষা ফারসিতে লেখা। দুঃখজনকভাবে, তার অধিকাংশ কাজ হারিয়ে গেলেও এখনও ৬৮-টির মতো পুস্তক টিকে আছে, যেগুলো প্রাচ্য ও পশ্চিমের বিভিন্ন গ্রন্থাগারে পাওয়া যায়।

বিজ্ঞানের প্রায় প্রতিটি শাখায় কলম ধরলেও দর্শন ও চিকিৎসাশাস্ত্র ছিল তার বিশেষ আগ্রহ। যার কারণে বর্তমান কিছু ঐতিহাসিক তাকে যতটা না চিকিৎসক, তার চেয়ে বেশি দার্শনিক মনে করেন। আর অন্যরা তাকে মধ্যযুগের 'চিকিৎসকদের যুবরাজ' হিসেবে আখ্যা দেন।

তার বেশিরভাগ রচনাই চিকিৎসাশাস্ত্রীয়। ৪৩-টি রচনা এ শাস্ত্রের উপর, ২৪-টি রচনা দর্শন, ২৬-টি পদার্থবিদ্যা, ৩১-টি ধর্মতত্ত্ব, ২৩-টি মনোবিজ্ঞান, ১৫-টি গণিত, ২২-টি যুক্তিবিদ্যা এবং ৫-টি রচনা কুরআনের তাফসীর নিয়ে। অধ্যাত্মবাদ, প্রেম ও সঙ্গীত নিয়েও তার রচনা রয়েছে এবং এর পাশাপাশি তিনি বেশকিছু গল্পও লিখেছিলেন।

"*আল-কানুন ফীত তীব*" (চিকিৎসাশাস্ত্রের নিয়ম-কানুন) তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কর্ম এবং ইংরেজিতে এটা *কানুন* নামে পরিচিত। আরবীতে রচিত এই গ্রন্থ অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিকিৎসা পাঠ্যপুস্তক হিসেবে বিবেচিত, কেননা এটা ছিল তার সময় পর্যন্ত বিভিন্ন সভ্যতা থেকে আহরিত চিকিৎসা জ্ঞানের এক পূর্ণাঙ্গ বিশ্বকোষ।

> "চিকিৎসাশাস্ত্র অনুপস্থিত ছিল, যবে না হিপোক্রেটাস তা সৃজন করেন;
> এটা ছিল মৃত, যবে না গ্যালেন তাতে নয়াজীবন আনেন;
> এটা ছিল ছত্রভঙ্গ, যবে না রাযী তা সুসংহত করেন;
> আর এটা ছিল অসম্পূর্ণ, যবে না ইবনে সীনা তা পূর্ণ করেন।"
>
> – ডি পিওরে, ইউরোপীয় চিকিৎসক

চিকিৎসা ধারণাগুলোর সহজ উপলব্ধির মানসে ১২শ শতাব্দির দিকে আল-কানুনের গুরুত্বপূর্ণ অংশসমূহের সংক্ষেপায়ন এবং বিষয়বস্তুর জটিলতা নিরসনে ব্যাখ্যাগ্রন্থ লেখা শুরু হয়। এসবের মাঝে "*আল-মু'জিয ফীত তীব*" (সংক্ষেপিত চিকিৎসাশাস্ত্র) নামক সংক্ষেপায়নটি সর্বাধিক জনপ্রিয় ছিল, যা ১২৮৮ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণকারী ইবনে আন-নাফীস সিরিয়াতে অবস্থানকালে রচনা করেছিলেন।

আল-কানুন ৫ খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ড – সাধারণ চিকিৎসা মৌলনীতি, দ্বিতীয় খণ্ড – ঔষধ বিজ্ঞান, তৃতীয় খণ্ড – দেহের নির্দিষ্ট অঙ্গকেন্দ্রীক রোগ, চতুর্থ খণ্ড –জ্বর এবং হাড় ও হাড়ের গিঁটের ভাঙন ও বিচ্যুতির ন্যায় নির্দিষ্ট অঙ্গকেন্দ্রীক নয়, এমন ব্যাধির আলোচনা নিয়ে নিবেদিত। আর শেষ খণ্ড বিভিন্ন যৌগিক প্রতিষেধকের প্রস্তুতপ্রণালী নিয়ে রচিত।
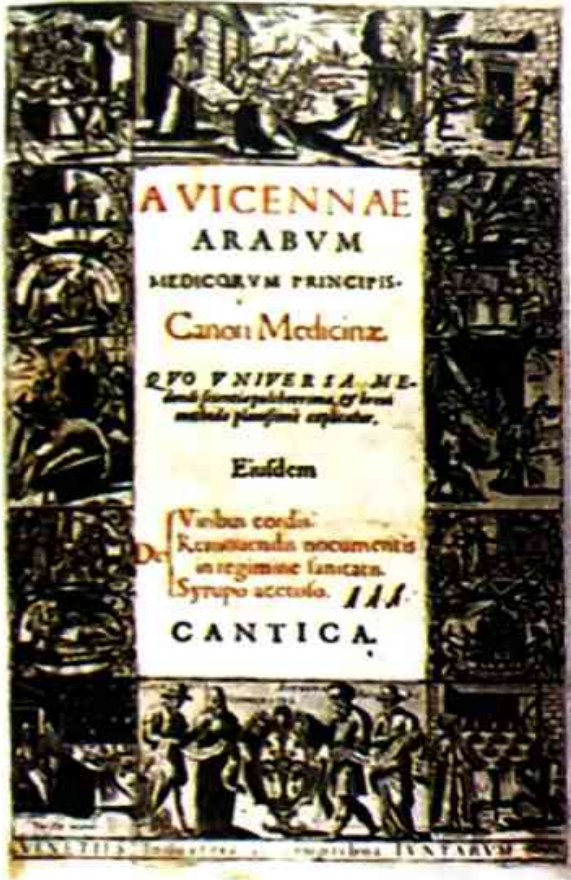
ইবনে সীনার "আল-কানুন ফীত তীব" গ্রন্থের লাতিন অনুবাদের প্রচ্ছদ পাতা।

চতুর্থ খণ্ড দুটো প্রবন্ধ নিয়ে গঠিত, প্রথমটি 'জখম নিয়ে সামগ্রিক আলোচনা' এবং দ্বিতীয়টি 'প্রতিটি হাড়ের স্বতন্ত্র জখম' শিরোনামের।

'জখম নিয়ে সামগ্রিক আলোচনা' শীর্ষক প্রবন্ধে জখমের কারণ, প্রকার, ধরন, চিকিৎসা পদ্ধতি, জখমের সাথে সম্পৃক্ত নানা জটিলতা, অর্থাৎ জখমে বিষয়ক যাবতীয় তথ্যাদি আলোচিত হয়েছে। অন্যদিকে 'প্রতিটি হাড়ের স্বতন্ত্র জখম' শিরোনামের প্রবন্ধে তিনি প্রতিটি হাড়ের স্বতন্ত্র জখমের বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা করেন। ইবনে সীনা ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের যে পন্থা অবলম্বন করেছিলেন, তা আধুনিক চিকিৎসা পাঠ্যপুস্তকের সাথে বেশ সামঞ্জস্যশীল।

হাড় জখম হলে বা ভেঙে গেলে তাৎক্ষণিকভাবে সেটাকে যথাস্থানে এনে পট্টি না বাঁধার প্রয়োজনীয়তার দিকে তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং এটাকে তিনি পঞ্চম দিন পর্যন্ত মুলতবি রাখার পরামর্শ দেন। বর্তমানে, এটা বিলম্বে পট্টি বাঁধার থিওরি নামে বেশি পরিচিত এবং লন্ডনের সেন্ট থমাস হাসপাতালে কর্মরত প্রফেসর জর্জ পার্কিন্স (১৮৯২-১৯৭৯)-কে এ তত্ত্বের পথিকৃৎ হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

> "কেউ যদি ভাল ডাক্তার হতে চায়, তাকে অবশ্যই ইবনে সীনার অনুসারী হতে হবে।"
>
> – প্রাচীন ইউরোপীয় প্রবাদ

বেনেটের প্রায় এক হাজার বছর পূর্বে ইবনে সীনা এমন একটি বিষয়ে আলোকপাত করেছিলেন, আজ যা 'বেনেটের জখম ১৮৮২ (*Bennett's fracture 1882*)' নামে সুপরিচিত। শ্রেণিবিন্যাস, রোগের কারণ, মহামারী, লক্ষণ ও আলামত, চিকিৎসা এবং পূর্বাভাস নিয়ে আধুনিক যুগের চিকিৎসা পাঠ্যপুস্তকগুলোর বিন্যাস কাঠামো ইবনে সীনার আল-কানুনের বিন্যাস, ব্যাপকতা ও ব্যাখ্যার পদ্ধতির সাথে বেশ সাদৃশ্য বহন করে। এসব কারণে আল-কানুন মুসলিম ও ইউরোপের উভয় মহাদেশে সর্বাধিক ব্যবহৃত চিকিৎসা পুস্তকের আসনে অধিষ্ঠিত হয়। ক্রিমোনার জেরার্ডের লাতিন অনুবাদের বদৌলতে আল-কানুন ইউরোপীয়দের নিকট ১২শ শতাব্দি থেকেই পরিচিত ছিল। ১৭শ শতাব্দি পর্যন্ত লিউভেন ও মন্টেপেলিয়ারের চিকিৎসা বিদ্যালয়গুলোতে এটা পাঠ্যপুস্তক হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছিল এবং ইউনেস্কোর জার্নাল মোতাবেক, 'আধুনিক চিকিৎসার' যুগেও এটা বেশ গৌরবের সাথে ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ব্রাসেলস বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্যপুস্তক হিসেবে স্বীকৃত ছিল।

ইবনে সীনা রচিত আল-কানুনের ১৪শ থেকে ১৫শ শতাব্দির লাতিন অনুবাদের পাণ্ডুলিপিতে সালেরনোর চিকিৎসা বিদ্যালয়ের চিত্র চিত্রায়িত হয়েছে।

আল-কানুন ফীত তীব (চিকিৎসা নিয়ম-কানুন)

ডাক্তারের সংকেত

বহু সভ্যতার চিকিৎসা জ্ঞানের ভাণ্ডার জমা যে গ্রন্থে

উল্লেখযোগ্য পরম্পরা: ১৯শ শতাব্দি পর্যন্ত চিকিৎসা অনুশীলনে অভূতপূর্ব প্রভাব বজায় রাখা

স্থান: পারস্য

তারিখ: ১০ম থেকে ১১শ শতাব্দি

আবিষ্কারক: ইবনে সীনা, আবিসিনা নামে পরিচিত, ডাক্তার এবং বহুবিদ্যায় পারদর্শী (পলিম্যাথ)

১১শ শতাব্দির পণ্ডিত ইবনে সীনা চিকিৎসা, দর্শন এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞান নিয়ে বিস্তৃত পরিসরে লিখেছেন এবং পাঠ দিয়েছেন। পশ্চিমে আবিসিনা নামে পরিচিত এই মহামনীষীর সর্বাধিক সাড়া জাগানিয়া লেখা "*আল-কানুন ফীত তীব*", যা *Code of Laws in Medicine* (চিকিৎসা নিয়মনীতির সংকেত) নামে অনুদিত হলেও *the Canon* (আল-কানুন) নামেই সমধিক পরিচিত।

আল-কানুনে ইবনে সীনা বিভিন্ন সভ্যতা থেকে প্রাপ্ত চিকিৎসা জ্ঞান জড়ো করে পূর্ণাঙ্গ এক বিশ্বকোষ তৈরি করেন। পাঁচ খণ্ডে সমাপ্ত এই গ্রন্থ চিকিৎসা মৌলনীতি, ঔষধ, দেহের বিভিন্ন অঙ্গের অসুখ, সাধারণ রোগব্যাধি এবং বিভিন্ন মানসিক ব্যাধি নিয়ে বিস্তর আলোচনায় সমৃদ্ধ।

রোগের কারণ, ধরন, জখমের সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন জটিলতা এবং সেগুলো চিকিৎসার বিভিন্ন পন্থা নিয়ে ইবনে সীনা বিস্তৃত পরিসরে আলোচনা করেন। জখম বা ভেঙে যাওয়া হাড় তাৎক্ষণিকভাবে যথাস্থানে এনে পট্টি না বাঁধার পক্ষে বলে তিনি সেটাকে পাঁচদিন বিলম্ব করার পরামর্শ দেন – যা বর্তমানে সার্বজনীনভাবে গৃহিত। তিনি তার লেখায়, প্রতিটি হাড়ের স্বতন্ত্র জখমের বিষয়টি উপলব্ধিকরণে বিস্তারিত নির্দেশনা অন্তর্ভুক্ত করেন, এমনকি পণ্ডিত বেনেটের কয়েক শতাব্দি পূর্বেই তিনি বৃদ্ধাঙ্গুলির চোট নিয়ে ব্যাপক আলোচনা করেন, যা আজ 'বেনেটের জখম *(Bennett's fracture)*' হিসেবে সুপরিচিত।

আল-কানুনে ইবনে সীনা ১৪২-টি ভেষজ প্রতিষেধকের গুণাগুণ লিপিবদ্ধ করেন। মিশর, মেসোপটেমিয়া, চীন ও ভারতের সাথে ঐতিহাসিক যোগসূত্র রাখা ঔষধি বৃক্ষ ও লতাগুল্ম প্রাচীন গ্রিক ও রোমান সমাজগুলোর স্বাস্থ্য সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। ক্রমবর্ধমান ভ্রমণ ও বাণিজ্যের বদৌলতে শুরুর দিকের মুসলিম সভ্যতা নতুন নতুন লতাগুল্ম, উদ্ভিদ, বীজ এবং মশলার সরবরাহে ঠাসা হওয়ার পাশাপাশি ভেষজ চিকিৎসায় নয়া নয়া প্রতিষেধকের বিপুল সম্ভাবনা নিয়ে হাজির হয়েছিল।

আল-কানুন গ্রন্থটি বেশ ব্যাপক – কিন্তু এক হাজার বছর পূর্বে ইবনে সীনা যখন গ্রন্থটি লেখেন, তখন তিনি কি আদৌ জানতেন যে, কতটা যুগ ধরে এটার প্রজ্ঞা ও সৃজনশীলতা দাপটের সাথে রাজ করে যাবে? ১২শ শতাব্দিতে ক্রিমোনার জেরার্ডের লাতিন অনুবাদের বদৌলতে ইউরোপের পুরো চিকিৎসক সমাজের হাতে হাতে গ্রন্থটি পৌঁছে যায় এবং তাদের পূর্ববর্তী মুসলিম সভ্যতার চিকিৎসকদের ন্যায় তারাও ব্যাপক হারে এটার ব্যবহার শুরু করে। ১৩শ শতাব্দিতে আল-কানুনের জটিল বিষয়বস্তু সহজে বোঝার নিমিত্ত ব্যাখ্যাগ্রন্থ প্রকাশের পাশাপাশি এটার সংক্ষিপ্ত লাতিন সংস্করণও প্রকাশ পেতে থাকে। ১৮শ শতাব্দি পর্যন্ত কিছু ডাক্তার চিকিৎসার জন্য আল-কানুন ব্যবহার করতেন।

ইবনে সীনা তার গোটা জীবনে বিভিন্ন বিষয়ে অসংখ্য পুস্তক রচনা করেছেন। চিকিৎসাশাস্ত্রীয় গ্রন্থের পাশাপাশি পদার্থবিদ্যায় ২৬-টি, ধর্মতত্ত্বে ৩১-টি, মনোবিজ্ঞানে ২৩-টি, গণিতে ১৫-টি, যুক্তিবিদ্যায় ২২-টি এবং দর্শনের উপর তিনি বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এমনকি প্রেম ও সঙ্গীত নিয়ে পুস্তক লেখারও সময় তার হয়েছিল।

মুসলিম সভ্যতার অনেক পণ্ডিতের ন্যায় ইবনে সীনা কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিভিন্ন বিশ্বাস নিয়ে প্রশ্ন তোলেন এবং প্রাকৃতিক ব্যবস্থা কীভাবে কাজ করে, তার একটা বুদ্ধিগ্রাহ্য উপলব্ধি দাঁড় করানো প্রয়াস চালান। তিনি তার লেখনীতে পানির উৎস এবং মেঘের গঠন নিয়ে লিখেছেন, এমনকি তার সুবিখ্যাত "*আশ-শিফা*" (আরোগ বিধান) গ্রন্থ থেকে খনিজবিদ্যা, আবহাওয়াবিজ্ঞান, পর্বত গঠন, ভূতাত্ত্বিক সময়ের ধারণা এবং ভূমিকম্প সৃষ্টির কারণসমূহের মতো জটিল বিষয়গুলোও বাদ পড়েনি।

"আল-কানুন ফীত তীব"-এর ১৫শ শতাব্দির পাণ্ডুলিপিতে এর প্রথম খণ্ডের প্রথম পাতা দেখা যাচ্ছে। এটার রচয়িতা ইবনে সীনা পশ্চিমে আবিসিনা নামে পরিচিত, ১১শ শতাব্দি থেকে ১৯শ শতাব্দির শেষ অবধি মুসলিম ও ইউরোপের দেশগুলোর চিকিৎসা অনুশীলন ও চিকিৎসা ধারণাতে যার সীমাহীন প্রভাব সুস্পষ্ট।

০৬ চক্ষুরোগ বিশেষজ্ঞের নোটবই

হাজার বছর পূর্বের প্রায় প্রতিটি মুসলিম চিকিৎসা গ্রন্থে চক্ষুরোগের কোনো না কোনো দিক আলোচিত হতো। এ ব্যাপারে তাদের গবেষণা কিছুটা সীমাবদ্ধ ছিল, যেহেতু তারা মানুষের চোখের বদলে প্রাণিদের চোখ ব্যবহার করতো। ওই সময় মানবদেহের ব্যবচ্ছেদকে বেশ অসম্মানের চোখে দেখা হতো। তথাপি এটা চোখের গঠনের সবচেয়ে প্রাচীন ছবি অঙ্কনে তেমন বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি।

১০ম থেকে ১৩শ শতাব্দির মুসলিম চক্ষু সার্জন কিংবা চক্ষু বিশেষজ্ঞগণ তাদের পরিচালিত অপারেশন, ব্যবচ্ছেদ, নতুন আবিষ্কার ও কোনো বিষয়ে তাদের পাওয়া নতুন গবেষণা তথ্য পাঠ্যপুস্তক ও তথ্যবহুল গ্রন্থাদিতে লিপিবদ্ধ করে রাখতেন। প্রখ্যাত জার্মান চিকিৎসা অধ্যাপক জুলিয়াস হির্শবার্গের মতে, ওই সময় ৩০-টির মতো চক্ষুবিজ্ঞান বিষয়ক পাঠ্যপুস্তক লেখা হয়েছিল, যার মধ্যে ১৪-টি এখনও টিকে আছে।

Conjunctiva (কনজাংক্টিভা – চোখের কর্নিয়ার পাতলা স্বচ্ছ আবরণ), কর্নিয়া (অক্ষিগোলকের স্বচ্ছ আবরণ), *uvea* (ইউভিয়া – চোখের মধ্যবর্তী স্তর) এবং রেটিনা (অক্ষিপট)-এর ন্যায় আধুনিক পরিভাষাগুলো তখনও ব্যবহারে ছিল। ট্রকোমার ন্যায় চোখের পাতার অসুখের অপারেশন তখন সাধারণ চিকিৎসা অনুশীলন ছিল, এ রোগে সাধারণত চোখের পাতার ভেতরের অংশ শক্ত ও কঠিন হয়ে উঠে। 'চোখের পিউপিল বা তারারন্ধ্রের ব্যথা' শিরোনামে গ্লুকৌমা বা চোখের তরলের ক্রমবর্ধমান চাপ সৃষ্টির ন্যায় রোগের চিকিৎসা বহুল প্রচলিত ছিল। কিন্তু চোখের ছানি চিকিৎসা ছিল চক্ষুবিজ্ঞানে মুসলিমদের রাখা সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য একক অবদান।

ছানি পরিভাষার আরবী: *নুযুলুল মায়ি ইলাল আ'ইনি*, যার অর্থ: চোখে পানির আগমন, এটা চোখের লেন্সে পানি জমে যাওয়াকে নির্দেশ করে। এমনটি হলে চোখ পানিতে ভারী হয়ে আসে এবং তা ঝাপসা দেখতে শুরু করে।

১০ম শতাব্দির ইরাকের আল-মাওসিলী দৃষ্টিশক্তি পুনরুদ্ধারে ফাঁপা সুচ নির্মাণ করেন, যা তিনি কর্নিয়া ও কনজাংক্টিভার সংযোগস্থল *limbus* (লিম্বাস – স্বচ্ছ কর্নিয়া ও অস্বচ্ছ সাদা অংশের মধ্যস্থ সীমানা)-এর মধ্য দিয়ে প্রবেশ করিয়ে চোষণের মাধ্যমে ছানি অপসারণ করতেন। এভাবে চোখের ছানির অপারেশন আজও করা হয়, তবে তাতে আধুনিক কিছু পন্থা যুক্ত করা হয়, যেমন: চোষণের পূর্বে লেন্সকে ঠাণ্ডা করা।

তিনি তার নিজস্ব গবেষণা ও অনুশীলনের ভিত্তিতে রচনা করেন: "*কিতাবুল মুনতাখাব ফী এ'লাজি আমরাধিল আ'ইন ওয়া ইলালিহা ওয়া মুদাওয়াতিহা বিল হাদীদ*" (চক্ষু রোগের চিকিৎসাশাস্ত্রীয় নির্বাচিত পুস্তক), যেখানে তিনি চোখের ৪৮-টি রোগের আলোচনা করেছেন। স্পেনের মাদ্রিদে অবস্থিত এস্কোরিয়াল লাইব্রেরিতে এটার পাণ্ডুলিপি (নম্বর: ৮৯৪) পাওয়া যাবে।

বিংশ শতাব্দি পর্যন্ত আল-মাওসিলীর রচনা কেবল আরবীতে এবং ১৩শ শতাব্দির একটি হিব্রু অনুবাদেই সহজলভ্য ছিল। এইতো ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে অধ্যাপক হির্শবার্গ এটার জার্মান সংস্করণ প্রকাশ করেন, যিনি আল-মাওসিলী সম্পর্কে লিখেছেন, তিনি ছিলেন "গোটা আরবী সাহিত্যের ইতিহাসের সবচেয়ে চতুর চক্ষু সার্জন।"

বর্তমান চিকিৎসকদের ন্যায় মুসলিম সভ্যতার পণ্ডিতগণও চোখের অসুখকে বেশ গুরুত্বের সাথে আমলে নিতেন।

চোখের গঠনশৈলীর সচিত্র বিবরণ সম্বলিত ১২শ শতাব্দির এ পাণ্ডুলিপিতে ৯ম শতাব্দির বাগদাদের খ্রিস্টান পণ্ডিত হুনাইন ইবনে ইসহাকের চক্ষুবিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তকের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। মুসলিম সভ্যতার সোনালি যুগে মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকল পণ্ডিত একসাথে কাজ করতেন।

১০ম শতাব্দির বাগদাদ নিবাসী এবং আল-মাওসিলীর সমসাময়িক আলী ইবনে ঈসা ছিলেন ইসলামের চক্ষুরোগ বিশেষজ্ঞদের মাঝে সর্বাধিক পরিচিতের একজন। তিনি "*তাযকিরাতুল কাহ্হালিন*" (চক্ষুরোগ বিশেষজ্ঞের নোটবই) শিরোনামে গ্রন্থ রচনা করেন, যা ছিল চক্ষুরোগের উপর লিখিত সর্বাধিক পূর্ণাঙ্গ পাঠ্যবই। গ্রন্থটি লাতিন ভাষায় অনূদিত হয়ে ১৪৯৭ খ্রিস্টাব্দে ভেনিসে প্রকাশিত হয়। আবারও অধ্যাপক হির্শবার্গ ও তার সহযোগী চক্ষু সার্জন জে. লিপার্ট ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে এটার জার্মান অনুবাদ প্রকাশ করেন এবং মার্কিন চক্ষুরোগ বিশেষজ্ঞ ও শিক্ষাবিদ ক্যাসি উড ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে এটার ইংরেজি সংস্করণ প্রকাশ করেন।

১৩০-টি চক্ষুরোগের বিবরণ প্রদান এবং ট্রেকোমা এবং চক্ষুপ্রদাহ বা চোখ-উঠা রোগের বিভিন্ন প্রকার নিয়ে বিস্তারিত আলোচনাসমৃদ্ধ ইবনে ঈসার "*তাযকিরাতুল কাহ্হালিন*" গ্রন্থটি বহু শতাব্দি ধরে চক্ষুবিজ্ঞানের প্রামাণ্য পাঠ্যবই হিসেবে সমাদৃত ছিল।

অন্ধত্ব প্রতিরোধ

"১০০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে অন্ধত্ব প্রতিরোধে মুসলিম চিকিৎসকদের প্রচেষ্টা বেশ অগ্রগামী ছিল। আর-রাযী ছিলেন প্রথম ডাক্তার, যিনি চোখের পিউপিলের প্রতিবর্তী ক্রিয়া (*reflex action*)-এর বর্ণনা দেন।

অন্যদিকে প্রায় একই সময়ে ... আল-মাওসিলী ফাঁপা সুচ ব্যবহার করে চোষণ প্রক্রিয়ায় চোখের ছানি অপসারণ পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন।"

– *Optometry Today,* মার্চ ২৮, ১৯৮৭

ইংল্যান্ডের *The Association of Optometrists*-এর একটি প্রকাশনা

এটা চক্ষুবিজ্ঞানে মুসলিমদের করা কোনো কাজের সবচেয়ে প্রাচীন পাণ্ডুলিপি, যা পূর্ণাঙ্গ এবং যা এখনো তার আসল অবস্থায় টিকে আছে। বিংশ শতাব্দির চিকিৎসা ঐতিহাসিক ড. সিরিল এলগুড লিখেছেন, "প্রথম অংশে চোখের গঠনশৈলী, দ্বিতীয় অংশে সাধারণ দেখায় নজরে পড়ে না, চোখের এমনকিছু বাহ্যিক অসুখ নিয়ে আলোচনা রয়েছে ... প্রাথমিক স্তরের ছানি যতটা [অন্য অসুখের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া], ঠিক তেমনি ত্রুটিপূর্ণ দৃষ্টিশক্তিও পাকস্থলি বা মস্তিষ্কের কোনো ব্যাধির পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া, চিকিৎসা অনুশীলকারীরা যেন বিষয়টি ভালোভাবে উপলব্ধি করে, সে ব্যাপারে তিনি যেভাবে জোর দিয়েছিলেন, সেটা চক্ষুরোগ বিষয়ে আধুনিক ধারণার সবচেয়ে নিকটতর।"

"মধ্যযুগীয় ইউরোপ যখন অন্ধকারের অতলে, তখন মুসলিমরাই – স্পেনের গোয়াদেলকুইভার থেকে মিশরের নীলনদ এবং রাশিয়ার অক্সাস নদী পর্যন্ত – বিজ্ঞানের আলো জ্বালিয়েছিল এবং তারাই আমাদের চক্ষুবিজ্ঞানের বাতিগুলো সচল রেখেছিল। মধ্যযুগীয় ইউরোপে তারাই ছিল চক্ষুবিজ্ঞানের সত্যিকার বিশেষজ্ঞ।"

– আমেরিকান মেডিকেল এসোসিয়েশনে দেয়া অধ্যাপক জুলিয়াস হির্শবার্গের সমাপ্তিসূচক ভাষণ, জুলাই ১৯০৫

চোখের অসুখ অন্যান্য রোগেরও আলামত, ইবনে ঈসাই যে এ ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণকারী একমাত্র চক্ষু সার্জন, ব্যাপারটি এমন নয়। ১০৮৮

খ্রিস্টাব্দে পারস্য নিবাসী আল জুরজানী নামে পরিচিত আবু রূহ মুহাম্মদ ইবনে মানসূর ইবনে আব্দুল্লাহ "নূরুল উ'য়ুন" (চোখের জ্যোতি) নামে গ্রন্থ রচনা করেন, যার একটি অধ্যায় এমন অসুখ নিয়ে আলোচনা করেছে, যা লুকানো কিন্তু তবে আলামত চোখ ও দৃষ্টিশক্তিতে বেশ ভালোভাবে দৃশ্যমান, যেমনঃ তৃতীয় স্নায়ু তথা অকুলোমোটরের বিকলাঙ্গতা, হৃদের ব্যাধি ও বিষাক্ততা।

দক্ষিণ স্পেনের কর্ডোবাতে আবক্ষ বা বুক পর্যন্ত বানানো ভাস্কর্যের মাধ্যমে যে চক্ষুরোগ বিশেষজ্ঞকে অমর করে রাখা হয়েছে, তিনি হলেনঃ মুহাম্মদ ইবনে ক্বাসূম ইবনে আসলাম আল-গাফিক্বী। কর্ডোবা নিবাসী এবং সেখানে চিকিৎসা অনুশীলনে রত এই মহামনীষী *"আল-মুরশিদ ফীল কাহাল"* (চক্ষুরোগ প্রতিকারে অভিজ্ঞ পরামর্শক) শিরোনামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন, যা কেবল চক্ষুরোগেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং একইসাথে মাথা ও মস্তিষ্কের নানা রোগের বিস্তারিত বিবরণে পূর্ণ। রিপোর্টার রাগেহ উমর বিবিসি নির্মিত প্রামাণ্য চিত্র *An Islamic History of Europe*-এ বলেন, আল-গাফিক্বী যে পন্থায় ট্রকোমার ন্যায় চক্ষুরোগের চিকিৎসা করতেন, তা প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত অনুসরণ করা হতো। ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে এই মহামনীষীর ৮০০-তম মৃত্যুবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে কর্ডোবার পৌর হাসপাতালে তার আবক্ষ-ভাস্কর্য স্থাপন করা হয়।

যুক্তরাজ্যে যাদের বয়স পঞ্চাশের অধিক, তাদের অন্ধত্ববরণের অন্যতম প্রধান কারণঃ চোখে ছানি পড়া। কিন্তু *Royal College of Ophthalmologists* এ সুসংবাদ দিচ্ছে যে, "ছানির সার্জারি বেশ সন্তোষজনক এবং তা রোগীদের জীবনে বড় ধরনের পরিবর্তন এনে দেয়।" যুক্তরাজ্যে প্রতি বছর শত শত ছানির অপারেশন হয় এবং এটা সেখানের সর্বাধিক ঐচ্ছিক অপারেশনগুলোর অন্যতম। কেইবা জানতো, আল-মাওসিলীর কর্ম এমন এক সার্জারির ভিত দাঁড় করাবে, যা একবিংশ শতাব্দিতে এসে অবিশ্বাস্য রকমের জনপ্রিয়তা লাভ করবে।

১৩শ শতাব্দির চক্ষু সার্জনগণ ইতোমধ্যেই চোখের গঠন পর্যবেক্ষণ শুরু করে দিয়েছেন এবং চোখের বিভিন্ন রোগ প্রতিকারে নয়া সব পদ্ধতির উদ্ভাবনে বেশ সক্রিয় হয়ে উঠেছেন।

০৭ ভ্যাকসিন

আজকের দিনেও ভ্যাকসিন বিতর্কের জালে আটকে আছে। প্রায় ৩০০ বছর পূর্বে তুরস্ক থেকে প্রথমবারের মতো ইংল্যান্ডে ভ্যাকসিন আনা হলে সেটাও বিতর্কের তোপে পড়ে প্রত্যাখ্যাত হয়। ভ্যাকসিন প্রদানের পদ্ধতি সম্পর্কে আনাতোলিয়ার অটোমান তুর্করা বেশ দক্ষ ছিল। ভ্যাকসিনের এ পদ্ধতিকে তারা আশী বা অভ্যন্তরে প্রবেশ করানোর প্রক্রিয়া বলতো। মূলত নিজেদের আদি তুর্কি গোত্রগুলো থেকে তারা এ জ্ঞান হাসিল করেছিল।

ভ্যাকসিন এমন এক প্রক্রিয়া, যেখানে রোগ সৃষ্টিকারী অঙ্গের দুর্বল বা অক্ষম অংশ কারো দেহে ডোজ বা এক মাত্রা ঔষধ হিসেবে প্রয়োগ করা হয়। এটা দেহের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে উত্তেজিত করে ওই নির্দিষ্ট রোগ মুকাবিলায় শরীরে এন্টিবডি সৃষ্টি করে। নতুন ভ্যাকসিন তৈরিতে বর্তমানে আট থেকে বার বছরের মতো সময় লাগে এবং যেকোন নতুন ভ্যাকসিন নিরাপদ হিসেবে গ্রহণের পূর্বে সেটাকে কঠোর পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে যেতে হয়।

তুর্কিরা এটা আবিষ্কার করে যে, গবাদি পশুর স্তন থেকে নেয়া গো-বসন্ত যদি শিশুদের মাঝে ভ্যাকসিন হিসেবে প্রয়োগ করা হয়, তবে শিশুরা গুটিবসন্তে আক্রান্ত হয় না। ১৭১৬ ও ১৭১৮ খ্রিস্টাব্দের মাধামাঝি সময়ে তুরস্কে থাকা ইংল্যান্ডের রাষ্ট্রদূতের স্ত্রী এবং বিখ্যাত ইংরেজি পত্র-লেখিকা লেডি মন্টাগু এ ধরনের ভ্যাকসিন এবং তা প্রয়োগের অন্যসব পদ্ধতির সাথে ইংল্যান্ডের পরিচয় ঘটান। তিনি ভ্যাকসিন প্রদানের এ তুর্কি পদ্ধতির সংস্পর্শে আসেন এবং দূতাবাসের সার্জন চার্লস মাইটল্যান্ড কর্তৃক তার পুত্রের দেহে গুটিবসন্তের ভ্যাকসিন প্রদানে সম্মতি দেয়ার পর থেকে গুটিবসন্তের ভ্যাকসিন নিয়ে তিনি বেশ আগ্রহী হয়ে উঠেন।

উপরে: লেডি মেরি ওয়ার্টলি মন্টাগু (১৬৮৯-১৭৬২) তুরস্ক থেকে ইংল্যান্ডে গুটিবসন্তের ভ্যাকসিনের প্রচলন ঘটান। নিচে: ১৮০২ খ্রিস্টাব্দে জেমস গিলারের আঁকা 'গো-বসন্ত' ব্যঙ্গচিত্র। ডাক্তার জেনার সেন্ট প্যানক্রাস গুটিবসন্ত ও ভ্যাকসিন দেয়ার হাসপাতালে রোগীদের ভ্যাকসিন দিচ্ছেন।

ইস্তাম্বুলে অবস্থানকালে লেডি মন্টাগু পুরো প্রক্রিয়ার বিবরণ দিয়ে একগুচ্ছ পত্র ইংল্যান্ডে পাঠান। ইংল্যান্ডে ফেরার পর তিনি ভ্যাকসিন দেয়ার তুর্কি পদ্ধতির বিস্তৃতি ঘটান এবং নিজের বহু আত্মীয়কে তিনি গুটিবসন্তের ভ্যাকসিন নিতে সহায়তা করেন। এ কাজ করতে গিয়ে তিনি যে শুধু বরাবরের মতো সব ধরনের ভ্যাকসিন কর্মসূচি বিরোধী গির্জা কর্তৃপক্ষের তীব্র বিরোধিতার শিকার হয়েছিলেন, বিষয়টি এমন নয়, বরং বহু চিকিৎসকেরও বাধার সম্মুখীন হয়েছিলেন। কিন্তু তার অদম্য মানসিকতার কারণে ভ্যাকসিন প্রক্রিয়া ক্রমশ চারদিক ছড়িয়ে পড়ে এবং তা বিপুল সাফল্যের মুখ দেখে।

> "গণস্বাস্থ্যের সুরক্ষায় দু'শ বছরের অধিক সময় ধরে ভ্যাকসিন অপ্রতিদ্বন্দ্বি ভূমিকা পালন করে আসছে ... পোলিও, হাম, ডিপথেরিয়া (কণ্ঠনালীর সংক্রমক রোগ), হুপিং কাশি, রুবেলা, মাম্পস, টিটেনাস, হিমোফিলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা টাইপ বি (*Hib*)-এর ন্যায় কত শত মরণব্যাধি, যা সবার মাঝে ভয় ছড়িয়ে দিতো, আজ তা ভ্যাকসিনের বদৌলতে আমাদের নিয়ন্ত্রণে, যা থেকে একজন ভ্যাকসিনের অলৌকিক মর্যাদা আঁচ করতে পারে।"
>
> – রিচার্ড গ্যালাহার, সম্পাদক, ইন্টারন্যাশনাল ম্যাগাজিন এবং *The Scientist* ওয়েবসাইট

ইস্তাম্বুলে মন্টাগু পরিবারের পারিবারিক ডাক্তার ইমানুয়েল তিমোনি যখন ভ্যাকসিন প্রক্রিয়ার বৈজ্ঞানিক বিবরণ ১৭২৪ খ্রিস্টাব্দে রয়েল সোসাইটিতে জমা দেন, তখনই ভ্যাকসিনের ইতিহাসে যোগ হয় নতুন মাত্রা। ত্রিপলির রাষ্ট্রদূত কাসেম আগা এ ব্যাপারে আরও শক্ত যুক্তি উপস্থাপনের পাশাপাশি ভ্যাকসিনের বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং ত্রিপলি, তিউনিস, আলজিয়ার্স এলাকায় ভ্যাকসিন পরবর্তী সফলতার বিষয়টিও তুলে ধরেন। মূলত মুসলিম দেশগুলোর ভ্যাকসিন প্রক্রিয়া এবং সেটার সাফল্যের দীর্ঘ ইতিহাস ভ্যাকসিনের যৌক্তিকতা তুলে ধরতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ কারণে ১৭২৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি রয়েল সোসাইটির সদস্য মনোনীত হন। তখন থেকে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স ভ্যাকসিন কর্মসূচিকে সাদরে গ্রহণ করে নেয়, যা ভ্যাকসিনের আবিষ্কারক হিসেবে পরিচিত এডওয়ার্ড জেনারের অর্ধ শতাব্দি পূর্বের ঘটনা।

বর্তমানে এটা মানা হয় যে, ১৭৯৬ খ্রিস্টাব্দে জেনার এটা 'শুনতে' পান যে, গো-বসন্ত নাকি গুটিবসন্ত মুকাবিলায় দেহের প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে সক্রিয় করতে সক্ষম। সারাহ নেলম্‌স নামের এক গোয়ালিনীর হাতের ক্ষত থেকে গো-বসন্তে আক্রান্ত আট বছরের জেমস ফিপস নামের বালকের অবস্থা পর্যবেক্ষণের সময় তিনি এটা প্রত্যক্ষ করেছিলেন।

১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে তুরস্ক গুটিবসন্তের প্রথম ভ্যাকসিন দেয়ার ২৫০-তম বার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে স্মারক স্ট্যাম্প জারি করে, যেখানে দেখা যাচ্ছে, একটি শিশুকে ভ্যাকসিন দেয়া হচ্ছে। স্ট্যাম্প জুড়ে রয়েছে ইসলামী গম্বুজ এবং নিচের দিকে রয়েছে সার্জনদের ছুরি।

০৮ ভেষজ চিকিৎসা

হাজার বছর পূর্বে বাগান ছিল বৈজ্ঞানিক গবেষণার একটি 'ক্ষেত্র', যা স্বনামধন্য বিজ্ঞানী দ্বারা পরিচালিত হতো, যারা বিভিন্ন উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য নিয়ে ম্যানুয়েল গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। ভেষজ চিকিৎসাকে তখন বিকল্প চিকিৎসা হিসেবে দেখা হতো না, বরং তা ছিল চিকিৎসা অনুশীলনেরই একটি অংশ। এ কারণে বহু হাসপাতালে ঔষধ হিসেবে ব্যবহারের জন্য বাগানভর্তি ঔষধি বৃক্ষ থাকতো এবং এগুলো থেকে নিত্য-নতুন ঔষধ আবিষ্কার এবং সেগুলোর পরিচর্যা ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করা হতো।

এ ধরনের ঔষধি বৃক্ষের আবিষ্কার মানব সভ্যতার একেবারে সূচনা থেকেই জারি ছিল। এমনকি লেখন রীতি আবিষ্কারের বহু আগেই মিশর, মেসোপটেমিয়া, চীন ও ভারতীয় সংস্কৃতিতে ঔষধি বৃক্ষের বহুল ব্যবহার ছিল। বিভিন্ন ঔষধি বৃক্ষের তালিকা এবং সেগুলোর বৈশিষ্ট্য বর্ণনায় সমৃদ্ধ "হারবাল" শিরোনামের গ্রন্থটি ছিল প্রথম গ্রিক প্রচেষ্টা, যা কারিয়াস্টাসের ডিয়োক্লিস কর্তৃক খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দিতে রচিত এবং প্রথম খ্রিস্টাব্দের পণ্ডিত ক্রাটিউস সে ধারা অব্যাহত রাখেন। ভেষজ উদ্ভিদের গুণাগুণ নিয়ে *De Materia Medica* (ডি ম্যাটেরিয়া মেডিকাস) নামে যে কর্মটি আজ অবধি টিকে আছে, তা ৬৫ খ্রিস্টাব্দে ডায়াসোক্রাইডস কর্তৃক রচিত। গ্রিক ও রোমান ভেষজ বিশেষজ্ঞদের মাঝে কেবল ডায়াসোক্রাইডসের নামই জানা যায়।

মুসলিম সাম্রাজ্যের পরিসর বৃদ্ধির সাথ সাথে বণিক ও পর্যটকগণ এমনসব বিচিত্র লতাগুল্ম, বৃক্ষ, বীজ ও মশলার সাথে পরিচিত হন, যা পূর্বে তাদের নিকট অপরিচিত ছিল। এগুলোর কাঁচামালের বিপুল সরবরাহ নিশ্চিতের পাশাপাশি কীভাবে এগুলো ব্যবহার করতে হয়, তার প্রয়োজনীয় জ্ঞানও তারা সংগ্রহ করেছিল। এ কাজে তারা পুরো দুনিয়া চষে বেড়ায়, রূঢ় আবহাওয়া এমনকি এশিয়ার বিস্তৃত প্রান্তর থেকে পিরিনীয় পর্বতমালার ন্যায় দূরত্বও তাদের দমিয়ে রাখতে পারেনি। কাগজ আবিষ্কার এবং এর বহুল ব্যবহারের কল্যাণে তারা তাদের ভ্রমণের বিশদ বিবরণ ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তাৎক্ষণিক লিখে ফেলতেন।

উদ্ভিদবিদ্যা নিয়ে লিখিত ১৫শ শতাব্দির আরবী পাণ্ডুলিপির একটি সচিত্র পাতা।

বিপুল পরিমাণ তথ্য-উপাত্তের সাথে চিকিৎসা বিজ্ঞানের জ্ঞান একত্র হয়ে নতুন প্রতিষেধকের পাশাপাশি ভেষজ ঔষধের উল্লেখ্যযোগ্য যোগান সহজলভ্যকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এতসব আবিষ্কারের বদৌলতে তথ্যের এক ভাণ্ডার গড়ে উঠে, যা শেষমেশ বিশ্বকোষ তুল্য গ্রন্থে নিজেদের স্থান খুঁজে নেয়।

১০০২ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণকারী ইবনে সামাজুন ভেষজ লতাগুল্ম ও ঔষধি গুণসমৃদ্ধ বৃক্ষ এবং সেগুলো থেকে ঔষধ বানানোর নিয়ম সম্বলিত একখানা গ্রন্থ রচনা করেন, যাতে তিনি বিভিন্ন উদ্ভিদের শ্রেণিবিন্যাস এবং সেগুলোর ঔষধি বিশেষত্ব আলোচনাভুক্ত ছিল। ১১শ শতাব্দিতে ইবনে সীনা তার *আল-কানুনে* ভেষজ প্রতিষেধকের ১৪২-টি রেসিপির বিবরণ দেন।

ওই সময়ে উদ্ভিদের বৈজ্ঞানিক গবেষণা তথা উদ্ভিদবিজ্ঞান এবং চিকিৎসাতে উদ্ভিদের ব্যবহার ছিল একইসূত্রে গাঁথা। উদ্ভাবন ও সৃজনশীলতায় ওই যুগ এতটাই বিচিত্র ছিল যে, একদিকে 'আধুনিক উদ্ভিদবিজ্ঞানের জনক' হিসেবে পরিচিত আবু হানিফা আদ-দিনাওয়ারী *"কিতাবুন নাবাত"*-সহ তার লেখা নানা গ্রন্থে

ঘড়ির কাটা অনুযায়ী উপরের বাম থেকে: (১) ১৫শ শতাব্দির একটি আরবী গবেষণা প্রবন্ধ থেকে নেয়া লতাগুল্মের চিত্র; (২) ডায়াসোক্রাইডস কর্তৃক রচিত *De Materia Medica* গ্রন্থের একটি চিত্রে দেখা যাচ্ছে, একজন চিকিৎসক তার ছাত্রের নিকট অত্যন্ত কার্যকর ঔষধি গুণসমৃদ্ধ মান্দ্রাগোরার মূল হস্তান্তর করছে; (৩) মালাগার ইবনুল বাইতারের গবেষণা প্রবন্ধের একটি উদ্ভিদ প্রজাতি; (৪) ১৫শ শতাব্দির পারসীয় পাণ্ডুলিপিতে গন্ধতরু থেকে নির্যাস সংগ্রহের চিত্র চিত্রায়িত হয়েছে।

১৩শ শতাব্দির মালাগার ইবনুল বাইতারের "মুফরাদাত" প্রবন্ধ বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদের চিত্র তুলে ধরেছে – উদাহরণস্বরূপ, বামের চিত্র আল-কাফি সংস্করণের পাণ্ডুলিপি এবং ডানের চিত্র আল-ফিলাহা সংস্করণের পাণ্ডুলিপি থেকে নেয়া। গবেষণা প্রবন্ধে উদ্ভিদের শরীরবৃত্ত, তাদের বীজ বপন পরিবেশ এবং সেইসাথে পরিচর্যার বিষয় আলোচিত হয়েছে।

বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদের বিস্তৃত তালিকা তৈরিতে ব্যস্ত তো অপরপ্রান্তে ১০ম শতাব্দির চিকিৎসা পণ্ডিত আর-রাযী গেঁটেবাতের চিকিৎসায় ঔষধ হিসেবে কলচিকাম (*colchicum*) ব্যবহার করে বেশ ভালো সাড়া পেতে শুরু করেছেন।

উদ্ভিদবিজ্ঞানের তাত্ত্বিক রূপান্তরের সাথে সাথে রসায়নশাস্ত্র দ্রুত গতিতে উৎকর্ষের চরম শিখরে পৌঁছায় এবং উভয় শাস্ত্রের এমন সমৃদ্ধি ভেষজ চিকিৎসাকে মূলধারায় উন্নীত করতে জোরদার ভূমিকা রেখেছিল। পানি উত্তোলনে উন্নত যন্ত্রের ব্যবহার এবং নয়া সেচ কৌশল একত্র হয়ে ১০ম শতাব্দিতে গবেষণাধর্মী বাগান সৃষ্টি এবং ভেষজ বৃক্ষের ব্যাপক আবাদে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছিল।

আন্দালুস নামে পরিচিত মুসলিম স্পেন ছিল ভেষজ চিকিৎসা বিকাশের আঁতুড়ঘর। ১১শ শতাব্দিতে টলেডো, স্পেন এবং পরবর্তীতে সেভিলের মাধ্যমে ইউরোপ প্রথমবারের মতো রাজকীয় উদ্ভিদ উদ্যান বা বোটানিকাল গার্ডেনের সাথে পরিচিত হয়। রাজকীয় এই উদ্যানগুলো মধ্যপ্রাচ্য থেকে আনা বিভিন্ন উদ্ভিদ ইউরোপের পরিবেশে মানিয়ে নিতে পারছে কিনা, তা যাচাইয়ে ব্যবহৃত হতো।

মালাগার ইবনুল বাইতারের ব্যাপারে ফার্মাসি অধ্যায়ে আপনি আরও তথ্য পাবেন, তথাপি এখানে বলতে হয় যে, ঔষধ প্রস্তুত ও ব্যবহার বিষয়ে "*আল-জামিউল মুফরাদাত আল-আদবিয়াত ওয়াল আগযিয়াত*" (ভেষজ ঔষধ ও খাদ্য বিষয়ক অভিধান) নামে তিনি যে প্রকাণ্ড বিশ্বকোষ রচনা করেছেন, সেটা তার উদ্ভিদবিজ্ঞানে পারদর্শীতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বহন করে। উক্ত গ্রন্থে তিনি বিভিন্ন প্রজাতির প্রায় ৩০০০ উদ্ভিদ নিয়ে গবেষণা এবং তাদের ঔষধি গুণাগুণ লিপিবদ্ধ করেছেন।

ভেষজ চিকিৎসার অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থটি লিখেছেন ১১৬৫ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণকারী আল-গাফিক্বী এবং তার এ গ্রন্থ "*কিতাব আল-আদবিয়াতুল মুফরাদাত*" (ভেষজ ঔষধ বিষয়ক পুস্তক) নামেই পরিচিত। বিস্ময়করভাবে গ্রন্থটি বেশ নিখুঁত বর্ণনায় সমৃদ্ধ এবং এটা ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে মিশরে ম্যাক মেয়াহফ কর্তৃক পুনরায় প্রকাশিত হয়।

১০ম শতাব্দিতে ইবনে জুলজুল ডায়াসোক্রাইডস কর্তৃক রচিত *De Materia Medica* গ্রন্থের আরবী অনুবাদের পাশাপাশি এটার ব্যাখ্যাগ্রন্থ লেখেন, যেখানে তেঁতুল, কর্পূর, চন্দনকাঠ এবং এলাচের ন্যায় বহু নতুন জিনিসের বিবরণ তিনি সংযুক্ত করেন। নতুন নতুন উদ্ভিদ চিহ্নিতকরণের পাশাপাশি বিভিন্ন রোগ নিরাময়ে এসব উদ্ভিদের ঔষধি গুণের বিবরণসহ এদের নানাবিধ বৈশিষ্ট্য তিনি এতে লিপিবদ্ধ করেছিলেন।

ঔষধি লতাগুল্ম ও বৃক্ষ কীভাবে রোগীর স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ফেলে, সেটার পর্যবেক্ষণ ছিল ভেষজ চিকিৎসায় মুসলিমদের রাখা সাধারণ ও একইসাথে যুগান্তকারী অবদান। এটা আজকের দিনে বেশ সাধারণ মনে হলেও তৎকালে পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিটি কেবল মুসলিমরাই ব্যবহার করতো এবং এর উপর নির্ভর করতো।

অন্যদিকে, মধ্যযুগীয় ইউরোপে ভেষজ চিকিৎসাগ্রন্থ কেবল দুর্লভই ছিল না, বরং তা স্বল্পসংখ্যক পণ্ডিতের মাঝে সীমাবদ্ধ ছিল। এমনকি ১৫শ শতাব্দির শেষ অবধি অনেক ইউরোপীয় চিকিৎসক আরবী পাঠ্যপুস্তক ও গ্রিক গ্রন্থসমূহের আরবী সংস্করণের লাতিন অনুবাদ ব্যবহার করতো। ১৫০০ এবং ১৬০০ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে গ্রিক পণ্ডিত ডায়াসোক্রাইডসেরই প্রায় ৭৮-টি সংস্করণ সহজলভ্য ছিল।

"এবং তাদের পানীয় হবে আদামিশ্রিত।"

– কুরআন, (৭৬:১৭), এই আয়াতে আদাকে জান্নাতবাসীদের অন্যতম একটি পানীয় হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। বর্তমানে আদা বমি-বমি ভাব উপশম ও বমি বন্ধে ব্যবহৃত হয়।

মুসলিম উদ্ভিদবিজ্ঞানীদের থেকে ইউরোপীয়রা কতটা ধার করেছে এবং ডায়াসোক্রাইডসকে কীভাবে কতটা প্রাসঙ্গিক বানানো যায়, তার ভিত্তিতে ইউরোপীয় পণ্ডিতদের সাফল্য মাপা হতো, কিন্তু পরিস্থিতি সব সময় ঠিকঠাক যায় না। গ্রিক, লাতিন এবং আরবী ভাষায় পর্যাপ্ত পারদর্শীতার অভাবে একবার তো সালেরনোর মহাবিদ্যালয় বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। এই ভাষাগুলোতে দক্ষতার অভাবে গ্রিক পাঠ্যপুস্তক উপলব্ধিতে তাদের বেশ বেগ পেত হতো, যেহেতু এগুলো ছিল একাধিক অনুবাদের অনুবাদ।

অজ্ঞতা, অপচিকিৎসা এবং পূর্ববর্তী বাজে গ্রিক অনুবাদের ভুল-ভ্রান্তি এবং সেইসাথে প্রয়োজনীয় উপকরণের বিবরণ আঞ্চলিক ভাষায় লিখিত হওয়ায় এবং সেগুলো ঠিকভাবে শনাক্ত করতে ব্যর্থ হওয়ায় ইউরোপীয় উদ্ভিদ বিশেষজ্ঞগণ নিদারুণ হতাশায় পড়েন। এসব কারণে ১৬শ শতাব্দির ইংরেজ কূটনৈতিক ও পণ্ডিত স্যার থমাস ইলিয়ট তার পাঠকদের জানিয়ে দেন যে, (এ বিষয়ে) তিনি প্রাচীনদের থেকে জ্ঞান হাসিল করেননি, যেহেতু ওই জ্ঞান "কারো স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য তেমন কার্যকরী নয়।"

সৌভাগ্যজনকভাবে, ভেষজ চিকিৎসায় বাচ্চা প্রসব করা মায়ের রক্ত ব্যবহারের নীতি চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়, যা মধ্যযুগে বিশেষ কিছু ইউরোপীয় চিকিৎসা রেসিপিতে ব্যবহৃত হতো। বর্তমানে যুক্তরাজ্যে ৫-জন ইংরেজ নাগরিকের মধ্যে ১-জন সম্পূরক চিকিৎসা নেয়। সাম্প্রতিক এক জরিপে উঠে এসেছে, দশ জনে একজন ভেষজ বা হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার দারস্থ হয়।

বহু সংখ্যক ভেষজ চিকিৎসকের আবির্ভাবে মুসলিমদের মাঝে ভেষজ চিকিৎসা আবারও তার গুরুত্ব ফিরে পেতে শুরু করেছে, যদিও গ্রাম ও গ্রামীণ জনপদে ভেষজ চিকিৎসা এখনো তাদের ঐতিহ্যের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে টিকে আছে।

০৯ ফার্মাসি

প্রতিটি বাণিজ্যিক সড়ক ও অধিকাংশ সুপারমার্কেটে একটি ফার্মাসি অবশ্যই খুঁজে পাওয়া যাবে। কিন্তু এটা কোনো আধুনিক ধারণা নয়, কেননা প্রায় হাজার বছর পূর্বে বাগদাদে ঘটেছিল ফার্মাসির বিকাশ।

৯ম শতাব্দির গোড়ার দিকে ফার্মাসিস্ট বা ঔষধ প্রস্তুতকারী বিশেষজ্ঞগণ স্বাধীন পেশাজীবী ছিলেন, যারা তাদের নিজস্ব ফার্মাসি চলাতেন। পরিবার চালিত এসব ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন বাজারে তাদের কার্যক্রম চালাতো এবং সময়ে সময়ে (বিশেষত ১২শ ও ১৩শ শতাব্দির দিকে) রাষ্ট্র কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত বাজার পরিদর্শক - *আল-মুহতাসিব* ও তার সহযোগীরা এসব ফার্মাসি পরিদর্শন করতো। ওজন ও পরিমাণ ঠিক আছে কিনা, তা যাচাইয়ের পাশাপাশি ব্যবহৃত ঔষধগুলোর বিশুদ্ধতাও পরখ করে দেখা হতো। ভণ্ড ও হাতুড়ে ডাক্তারদের কার্যক্রম প্রতিরোধে অপমানজনক দৈহিক শাস্তির হুমকি সবার জন্য বলবৎ ছিল।

এক হাজার বছর পূর্বের হাসপাতালগুলোর ছিল নিজস্ব ঔষধ বিপণী, যেখানে বিভিন্ন ধরনের ঔষধ প্রস্তুত করা হতো। আর এভাবেই সাবূর ইবনে সাহল, আর-রাযী, ইবনে সীনা এবং আল-কিন্দীর ন্যায় পণ্ডিতদের হাত ধরে ফার্মাকোলজি বা ঔষধবিজ্ঞানের ব্যবহারিক দিকটি বেশ ভালোভাবেই বিকশিত হতে থাকে। নবম শতাব্দির সাবূর ইবনে সাহল হলেন প্রথম চিকিৎসক, যিনি রোগ নিরাময়ে বিভিন্ন প্রকারের ঔষধ ও প্রতিষেধকের বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করেন। আর-রাযী চিকিৎসাশাস্ত্রে রাসায়নিক যৌগ বা সংমিশ্রণের প্রচলন ঘটান, ইবনে সীনা ৭০০-এর মতো ঔষধের প্রস্তুতপ্রণালী, সেগুলোর বৈশিষ্ট্য, কার্যকারিতা এবং ব্যবহার নির্দেশিকা প্রদান করেন এবং আল-কিন্দী যথাযথ মাত্রায় ঔষধ ব্যবহার বিধি নির্ধারণ করেন, যা চিকিৎসা সংহিতা বা নির্দেশাবলীর ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করে।

প্রভাবশালী চিকিৎসা পণ্ডিতদের মাঝে রয়েছেন স্পেনের আয-যাহরাবী, যিনি উর্ধ্বপাতন ও পাতনের সাহায্যে ঔষধ প্রস্তুত করে ১০ম শতাব্দিতে অগ্রনায়কের ভূমিকা পালন করেছিলেন। তার এ যুগান্তকারী ভূমিকার বদৌলতে নতুন ঔষধ প্রস্তুতের এক বিস্তৃত দুয়ার খুলে যায়। অভ্যন্তরীণ সেলাইয়ে তিনি ক্যাটগাট ব্যবহার করতেন, যেমনটি আমরা ইতোমধ্যেই জেনে এসেছি, এর পাশাপাশি তিনি গিলে খাওয়ার উপযোগী করে ক্যাটগাটে নির্মিত খোলসে ঔষধ জমা করার কৌশল উদ্ভাবন করেন। তাই ক্যাপসুল জাতীয় কোনো ঔষধ ব্যবহার করতে গেলে ভুলে যাবেন না যে, এটার অগ্রনায়ক প্রায় এক হাজার বছর পূর্বের এক মানুষ ছিলেন।

আয-যাহরাবীর অনবদ্য সৃষ্টি "*আত-তাসরীফ*" লাতিন ভাষায় *Liber Servitoris* শিরোনামে অনুদিত হয় এবং গ্রন্থটি একক উপাদান থেকে শুরু করে একাধিক উপাদানের সংমিশ্রণে ঔষধ প্রস্তুতের প্রক্রিয়া ও কৌশল পাঠকদের সামনে তুলে ধরে। এছাড়াও তিনি লিথারেজ (মুদ্রাশঙ্খ) বা লেড মনোক্সাইড, সাদা লেড (সীসা), লেড সালফাইড (পোড়া সীসা), পোড়া কপার, ক্যাডমিয়াম, মার্কাসাইট আয়রন সালফাউড, হলুদ আর্সেনিক এবং চুনসহ অসংখ্য গন্ধক ও লবণের প্রস্তুতপ্রণালীর বিবরণ প্রদান করেছেন। আবুল মানসূর মুওয়াফ্ফাক "*কিতাবুল আবনিয়াতু আ'ন হাকায়িক আল-আদবিয়াতুল*" (প্রতিষেধক ঔষধের প্রকৃত বৈশিষ্ট্যাবলীর ভিত্তি) শীর্ষক পুস্তক রচনার মাধ্যমে ১০ম শতাব্দিতে ঔষধবিজ্ঞানে এক নয়া আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন। গ্রন্থটি আর্সেনিয়াস অক্সাইডের বিবরণ প্রদান করে এবং এর রচয়িতা আবুল মানসূর সিলিকিক এসিড সম্পর্কে অবগত ছিলেন। বর্তমানে এই এসিডের একটি ব্যবহার ওই পিলগুলোতে দেখা যায়, যা সহজে জ্বালাপোড়ায় কাবু হয়, এমন পাকস্থলিতে সুরক্ষা ঝিল্লি তৈরিতে সহায়তা করে। তিনি সোডিয়াম কার্বনেট এবং পটাশিয়াম কার্বনেটের মাঝে যে পার্থক্য রয়েছে, তা স্পষ্ট করার পাশাপাশি কপারের যৌগ বিশেষভাবে কপার ভিট্রিয়ল ও লেডের যৌগগুলো যে বিষাক্ত, সে ব্যাপারে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

উপর থেকে: ১২শ শতাব্দির পারসীয় ফার্মাসি জগ। শুষ্ক ঔষধি লতাগুল্ম, খনিজ পদার্থ ও অন্যান্য ঔষধ সংরক্ষণে ঔষধ বিক্রেতাগণ এটা ব্যবহার করতেন। ঔষধ রাখার এ জগের উপরিতল বেশ চকচকে হওয়ায় তা সহজেই পরিষ্কার করা যেত। নিচে: ডায়াসোক্রাইডস রচিত De Materia Medica-এর আরবী সংস্করণের চিত্রে ফার্মাসিতে কর্মরত একজন ঔষধ প্রস্তুতকারীকে ঔষধ প্রস্তুত করতে দেখা যাচ্ছে।

ঔষধবিদ্যা বিষয়ক সারণী সম্বলিত একটি আরবী পাণ্ডুলিপি, যা ১৩শ শতাব্দির ইবনুল বাইতারের রচনা বলে ধরা হয়। এই সারণীতে রোগের লক্ষণ, পীড়ার অবস্থান, ঔষধের প্রয়োগ এবং কত মাত্রায় ডোজ নিতে হবে, তার বিবরণ রয়েছে।

১১শ শতাব্দিতে আল-বিরুনী *"কিতাবুস সায়দালাতু ফীত তীব"* (ঔষধবিদ্যা বিষয়ক পুস্তক) শিরোনামে এই শাস্ত্রে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি গ্রন্থ রচনা করেন, যেখানে বিভিন্ন ঔষধের বৈশিষ্ট্য বর্ণনার পাশাপাশি তিনি ফার্মাসি এবং একজন ফার্মাসিস্টের দায়িত্ব ও ভূমিকার রূপরেখাও সবিস্তারে তুলে ধরেছেন। ফার্মাসিস্টের প্রধান লক্ষ্য হবে, তার কাজ সুচারুভাবে বিন্যস্ত করা এবং তার কাজ যেন ঔষধ প্রস্তুতকারক, বিক্রেতা ও চিকিৎসা অনুশীলনকারীদের নিকট সর্বাধিক কার্যকর প্রমাণিত হয়, তা নিশ্চিত করা। যার ফলে দ্রুত তথ্যনির্দেশ ও তাৎক্ষণিক ব্যবহারের সুবিধার্থে বর্ণানুক্রমিক ছকে তারা ঔষধের তালিকা প্রস্তুত করে, আর এ সুবাদে পূর্ণাঙ্গ কাজ হিসেবে কিংবা বিশেষায়িত কোনো চিকিৎসা বিষয়ের উপর বিশ্বকোষ ও অভিধান রচনা বেশ সহজ হয়ে উঠে।

ঔষধ প্রস্তুত এবং তার প্রয়োগবিধির গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সম্বলিত এসব প্রবন্ধ ইউরোপে প্রবেশ করে ইয়োহান সেন্ট আমান্ডো এবং ১৩০৬ থেকে ১৩১৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ইতালির পাদোভায় অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত পিয়েত্রো ডিআবানার ন্যায় ১৩শ শতাব্দির বহু ইউরোপীয় ফার্মাসিস্টকে প্রভাবিত করে। ইউরোপ ভ্রমণের এমন অভিজ্ঞতা যেসব গ্রন্থের কপালে জুটেছে, সেগুলোর মাঝে স্পেনের ইবনুল ওয়াফিদের গ্রন্থসমূহের কথা উল্লেখ করার মতো। লাতিন ভাষায় অনূদিত হয়ে তার গ্রন্থগুলো ৫০-এরও অধিকবার প্রকাশিত হয়। *"কিতাব আল-আদবিয়াতুল মুফরাদাত"* (ভেষজ ঔষধ) নামের গ্রন্থটি তার প্রধান কর্ম এবং ৫০০ পৃষ্ঠার গ্রন্থটি সংকলন করতে তার প্রায় ২৫ বছর সময় লেগেছিল। লাতিন ভাষায় অনূদিত *De medicamentis simplicibus* হলো তার কাজের সামান্য প্রতিফলন মাত্র।

১৩শ শতাব্দির মালাগা নিবাসী মুসলিম মনীষী ইবনুল বাইতার অন্যতম প্রভাবশালী উদ্ভিদবিজ্ঞানী হওয়ার পাশাপাশি রচনা করেছেন ঔষধবিজ্ঞান বিষয়ক সর্ববৃহৎ বিশ্বকোষ, যা আমাদের সময় পর্যন্ত টিকে আছে। *"আল-জামিউল মুফরাদাত আল-আদবিয়াত ওয়াল আগযিয়াত"* নামের এ বিশ্বকোষে বর্ণানুক্রমিকভাবে ৩০০০-এরও অধিক উদ্ভিদ নমুনার বিস্তারিত বিবরণ আলোচিত হয়েছে। লাতিন সংস্করণ ১৭৫৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় এবং ১৮৪২ খ্রিস্টাব্দে এটার প্রথম পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ প্রকাশ পায়।

ইউরোপীয় ফার্মাসিস্টগণ এসব কর্ম দ্বারা ব্যাপকভাবে অনুপ্রাণিত হন এবং এর প্রেক্ষিতে অভিধানতুল্য বহু গ্রন্থ প্রকাশ পেতে থাকে। ১৫শ শতাব্দির চিকিৎসক অসলোর সালাদীনের সংকলিত সাত খণ্ডে বিভক্ত *Compendium aromatariorum* নামের এই অভিধান এটারই এক দৃষ্টান্ত, যেখানে বিষয়বস্তুর বিন্যাসে পূর্ববর্তী মুসলিম ধারাকে হবহু অনুসরণ করা হয়েছে।

ফ্লোরেন্টাইন কলেজ অব ফিজিসিয়ান্সে কর্মরত চিকিৎসক লুডুভিকো ডাল পোজ্জো টসকানেলি *London Dispensatory* (লন্ডন ডিসপেনসেটরি)-এর একটি ১৭শ শতাব্দি সংস্করণ প্রস্তুত করেন, যেখানে উদ্ভিদ, লতাগুল্ম, খনিজ পদার্থ, অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক ব্যবহারের জন্য এক ও একাধিক উপাদানে তৈরি ঔষধ, বিভিন্ন ধরনের তেল, পিল এবং পুলটিস (ক্ষতে লাগানোর উষ্ণ মলম বা গরম প্রলেপ)-এর মতো বিষয় আলোচিত হয়েছে, যা এসবের সাথে মুসলিম যোগসূত্রের সম্ভাব্যতার বিষয়টি আরও জোরালো করে।

মার্কিন ঐতিহাসিক মার্টিন লিভে সাম্প্রতিককালে মুসলিম ফার্মাসি নিয়ে ব্যাপক আগ্রহের সঞ্চার করেছেন। ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণের পূর্বে তিনি বহু আরবী পাণ্ডুলিপি অনুবাদ করেন এবং রোগনিরাময় কৌশলের বিস্তৃত ফিরিস্তি মাটি খুঁড়ে উদ্ধার করেন, যেখানে একাধিক উপাদানে তৈরি ঔষধ, পিল, চুষে খাওয়ার সুগন্ধি বড়ি, পাউডার, সিরাপ, তেল, লোশন এবং টুথপেস্টের মতো বিষয়গুলো আলোচিত হয়েছে।

১০ চিকিৎসা জ্ঞান

হাজার বছর পূর্বের মুসলিম চিকিৎসকগণ যদি জানতেন যে, তাদের মৃত্যুর কয়েক দশক বা কয়েক শতাব্দি পরে তাদের রেখে যাওয়া কাজ লাতিন ভাষায় অনূদিত হয়ে গোটা ইউরোপ দাপিয়ে বেড়াবে, তবে তারা যে ভীষণ আনন্দিত হতেন, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

৮৩০ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত আল-কায়রাওয়ানের ন্যায় আলো ছড়ানো হাসপাতালের বদৌলতে তিউনিস পরিণত হয় চিকিৎসা জ্ঞানের লালনভূমিতে। চিকিৎসা অনুশীলনের পাশাপাশি আল-কায়রাওয়ানের ছিল এমনকিছু মেধাবী চিকিৎসা বিশেষজ্ঞ, চিকিৎসা জ্ঞানের উপর যাদের ছিল এমনসব মোটা গ্রন্থ, যেগুলো কন্সট্যান্টিন দ্য আফ্রিকানের মতো বিচক্ষণ মানুষ ইউরোপে নিয়ে আসেন।

> "উৎসগতভাবে ইউরোপীয় চিকিৎসা ব্যবস্থা কেবল আরবীয় নয়, বরং অবকাঠামোর দিক দিয়েও আরবীয়। আরবরাই ছিলেন ইউরোপীয়দের বুদ্ধিবৃত্তিক ঐতিহ্যের পূর্বপুরুষ।"
>
> – ড. ডোনাল্ড ক্রামবেল, বিংশ শতাব্দির আরব চিকিৎসাশাস্ত্রের ইতিহাসবেত্তা

১১শ শতাব্দিতে তিউনিসের এই খ্রিস্টান পণ্ডিত চিকিৎসা বিশ্বকোষ লাতিন ভাষায় অনুবাদ করেন, যেন তা লাতিনভাষী ইউরোপীয়দের মাঝে সহজলভ্য হয়। ইউরোপের চিকিৎসা অধ্যয়নে বিপ্লব আনয়নের পাশাপাশি এটা চিকিৎসা বিষয়ে শিক্ষা দিতে পারে, এমন কিছু প্রখ্যাত পণ্ডিতের একটি প্রজন্ম গড়ে তোলে। কন্সট্যান্টিনের সর্বাধিক পরিচিত লাতিন অনুবাদের মাঝে রয়েছে: ১০ম শতাব্দির চিকিৎসক আলী ইবনে আব্বাস আল-মাজূসীর *"কিতাবুল মালাকী"* (রাজকীয় পুস্তক)। এই আলী ইবনে আব্বাস আল-মাজূসী লাতিনে *Pantegni* (পানতেগনি) নামে সমধিক পরিচিত। কন্সট্যান্টিনের লাতিন অনুবাদটি ফ্রান্সের লিওনে ১৫১৫ খ্রিস্টাব্দে এবং সুইজারল্যান্ডের বাসেলে ১৫৩৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

আল-কায়রাওয়ান হাসপাতাল থেকে শিক্ষা লাভ করা এবং সেখানেই চিকিৎসা অনুশীলনে রত চিকিৎসক ইবনুল জাযারের লেখা *"যাদুল মুসাফির"* (দূর দেশে বের হওয়া ভ্রমণকারীদের পথনির্দেশিকা বা ভ্রমণকারীদের পাথেয়) নামের গ্রন্থটি ছিল তৎকালের চিকিৎসাশাস্ত্রীয় বেস্ট-সেলার (বহুল বিক্রিত গ্রন্থ)।

ইবনুল জাযার ৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে ৮০ বছরেরও বেশি বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তিনি ২৪,০০০ দিনার এবং চিকিৎসা ও অন্যান্য শাস্ত্রের উপর লেখা ২৫ কুইন্টার (১ কুইন্টার = ৪৫ কিলোগ্রাম)-এর সমপরিমাণ ওজনের বই-পুস্তক রেখে যান। তার এসব কীর্তির মাঝে নারীদের ব্যাধি ও তার প্রতিকার শিরোনামে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এ ধরনের লেখা তাকে এনে দেয় সীমাহীন যশ ও খ্যাতি এবং মধ্যযুগের পশ্চিমা ইউরোপে তিনি পরিণত অন্যতম প্রভাবশালী মনীষীতে।

কন্সট্যান্টিন *Viaticum peregrinantis* শিরোনামে *যাদুল মুসাফির* গ্রন্থের লাতিন অনুবাদ সম্পন্ন করেন, অন্যদিকে সেনিসিয়োস *Zedat ha-derachim* শিরোনামে এটার গ্রিক ও হিব্রু অনুবাদ প্রকাশ করেন, যা এটাকে আন্তর্জাতিক বেস্ট সেলার এবং সর্বাধিক পঠিত গ্রন্থের কাতারে নিয়ে আসে। *যাদুল মুসাফির* ছিল অত্যন্ত সুবিন্যস্ত এবং পূর্ণাঙ্গ চিকিৎসাশাস্ত্রীয় গ্রন্থ, যা সালেরনো, মন্টেপেলিয়ার, বলোনিয়া, প্যারিস ও অক্সফোর্ডের চিকিৎসা বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালসমূহের জন্য নির্ধারিত *Articella* বা *Ars medicinae* নামের চিকিৎসা পাঠ্যক্রমে স্থান করে নেয়। ইবনুল জাযারের এই গ্রন্থে রয়েছে গুটিবসন্ত ও হামরোগের অসাধারণ বিবরণ।

১৬শ শতাব্দির সচিত্র পাণ্ডুলিপিতে দেখা যাচ্ছে, কন্সট্যান্টিন দ্য আফ্রিকান সালেরনোর বিদ্যালয়ে ভাষণ দিচ্ছেন। কন্সট্যান্টিন দ্য আফ্রিকান ১১শ শতাব্দির এক তিউনিসীয় খ্রিস্টান পণ্ডিত, যিনি বেশ কয়েকটি চিকিৎসা বিশ্বকোষ অনুবাদ করেছিলেন।

আরবী অনূদিত এসব গ্রন্থ খুব দ্রুতই সালেরনোসহ জ্ঞানের সবগুলো কেন্দ্রে বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করে। সালেরনো ছিল এক্ষেত্রে বেশ গুরুত্বপূর্ণ, কারণ চিকিৎসা বিদ্যালয়সহ শহরটি ছিল ইউরোপের জ্ঞান-বিজ্ঞান শিখার তীর্থভূমি।

অন্য যেসব চিকিৎসা গ্রন্থ ইউরোপে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিল, তার মাঝে 'চিকিৎসকদের যুবরাজ' নামে পশ্চিমে পরিচিত ইবনে সীনার কর্মগুলো অন্যতম। তার লেখা ১১শ শতাব্দির আল-কানুন ছিল আরেকটি বৃহদাকার চিকিৎসা বিশ্বকোষ, যা প্রায় ছয় শতাব্দি জুড়ে গোটা বিশ্বব্যাপী নিজের দাপট বেশ শক্তভাবে ধরে রেখেছিল। তার বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ও ধর্মতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি আলবার্টাস ম্যাগনাস, সেন্ট থমাস একুইনাস, ডান্স স্কোটাস এবং রজার বেকনের মতো বহু গুরুত্বপূর্ণ চিন্তানায়কের উপর দারুণ প্রভাব বিস্তার করেছিল।

ইবনে আত-তাহাবী নামে পরিচিত আল-আযদীর রচিত *"কিতাব আল-মায়ু"* (পানি বিষয়ক পুস্তক)-ই হলো প্রথম গ্রন্থ, যেখানে বর্ণানুক্রমিক শ্রেণিবিন্যাস অনুসারে চিকিৎসা পরিভাষা, রোগের নাম, ঔষধ, দেহতাত্ত্বিক প্রক্রিয়া এবং চিকিৎসা কৌশলের বিবরণ প্রদান করা হয়েছে। গ্রন্থটির প্রথম অন্তর্ভুক্তি আল-মায়ু (পানি) হওয়ায় এটার নাম *"কিতাব আল-মায়ু"*।

আর-রাযীর ২০ খণ্ডে সমাপ্ত *"কিতাবুল হাভি"* (সামগ্রিক পুস্তক) শিরোনামের গ্রন্থটি চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রায় প্রতিটি শাখা নিয়েই আলোচনা করেছে এবং লাতিন ভাষায় এটা *Liber Continens* নামে অনূদিত হয়। সম্ভবত এটা ছিল কয়েক শতাব্দি জুড়ে পশ্চিমা বিশ্বে সর্বাধিক ব্যবহৃত ও বিপুলভাবে সমাদৃত চিকিৎসা পাঠ্যপুস্তক। এটা ছিল নয়টি গ্রন্থের একটি, যেগুলো ১৩৯৫ খ্রিস্টাব্দের প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা অনুষদের পুরো গ্রন্থাগার দখল করে রেখেছিল।

১০০০ খ্রিস্টাব্দ সময়ের দক্ষিণ স্পেনের কর্ডোবার অপ্রতিদ্বন্দ্বি চিকিৎসক আয-যাহরাবীর কাজগুলো ছিল অনন্য সাধারণ উচ্চতার। *"আত-তাসরীফ"* নামে তার রচিত ৩০-খণ্ডের অতুলনীয় চিকিৎসা বিশ্বকোষের সার্জারি অংশটুকু ক্রিমোনার জেরার্ড কর্তৃক লাতিনে অনূদিত হয় এবং এটার বিভিন্ন সংস্করণ ১৪৯৭ খ্রিস্টাব্দে ভেনিস, ১৫৪১ খ্রিস্টাব্দে বাসেল এবং ১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দে অক্সফোর্ডে প্রকাশিত হয়। সালেরনো এবং মন্টেপেলিয়ারের ন্যায় ইউরোপের অধিকাংশ মধ্যযুগীয় চিকিৎসা বিদ্যালয়সমূহে এটা সার্জারি ম্যানুয়েল গ্রন্থে পরিণত হয় এবং কয়েক শতাব্দি জুড়ে এটা ছিল এসব চিকিৎসা বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

সবশেষে, ১২৮৮ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণকারী সিরিয়া নিবাসী চিকিৎসক ইবনে আন-নাফীসের কীর্তির দিকে নজর দিলে দেখি, তিনি আমাদের জন্য রেখে গেছেন ৮০-খণ্ডে সমাপ্ত *"আশ-শামিল ফীস সানা'আতি তিবিয়্যাতি"* (সামগ্রিক চিকিৎসাশাস্ত্র) নামের এক অনবদ্য গ্রন্থ। বিশালাকার এ গ্রন্থের পাণ্ডুলিপির অংশবিশেষ দামেস্ক, আলেপ্পো, বাগদাদ ও অক্সফোর্ডের সংগ্রহশালায় পাওয়া যাবে। অন্যদিকে ক্যালিফোর্নিয়ার পালো আল্টোর সংগ্রহশালায় ইবনে আন-নাফীসের স্বহস্তে লেখা পাণ্ডুলিপির সর্ববৃহৎ অংশ সংরক্ষিত রয়েছে।

মুসলিম চিকিৎসকদের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শের বদৌলতে অধিকাংশ চিকিৎসা জ্ঞান ইউরোপে প্রবেশ করে, উদাহরণস্বরূপ, ক্রুসেডের কথা উল্লেখ করা যায়, যেখানে মুসলিম চিকিৎসকগণ বহু ক্রুসেড যোদ্ধার চিকিৎসা করেছিলেন। এমনকি রিচার্ড দ্য লায়নহার্টও সালাউদ্দীনের ব্যক্তিগত চিকিৎসক থেকে চিকিৎসা নিয়ে ছিলেন।
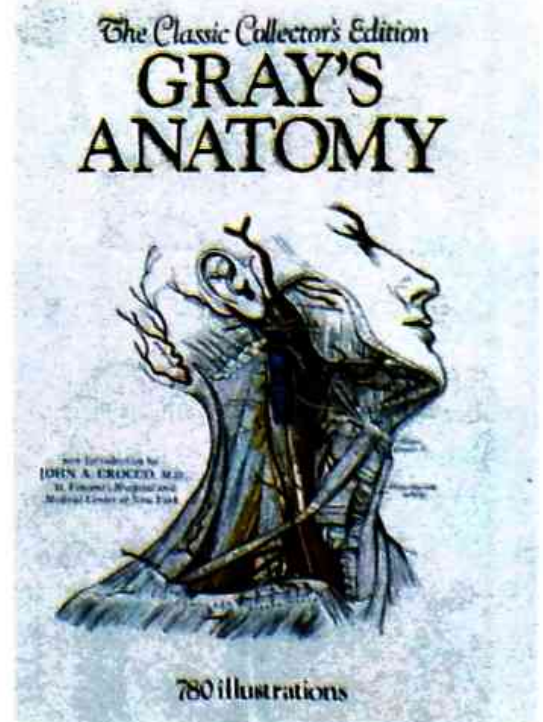
১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত Gray's Anatomy (গ্রের শরীরবিদ্যা) বর্তমানের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় চিকিৎসা বিশ্বকোষ। চিকিৎসা বিশ্বকোষ রচনার যে ঐতিহ্য মুসলিমরা চালু করেছিল এবং যাদের রচিত গবেষণা প্রবন্ধসমূহ সমানভাবে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাদৃত হয়েছিল, এটা মুসলিমদের রেখে যাওয়া সেই ঐতিহ্য ও কর্মেরই ধারাবাহিকতা।
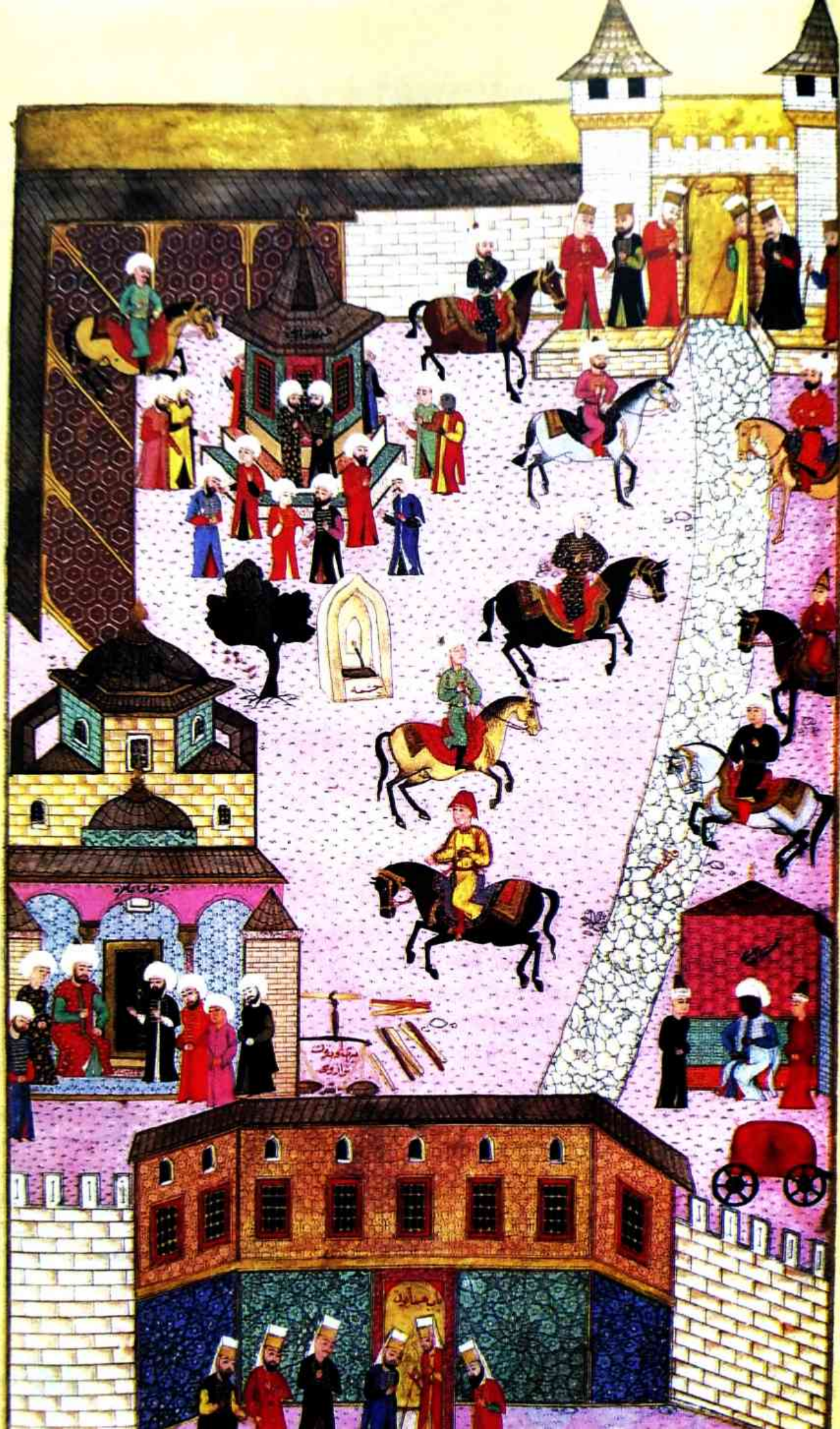
ষষ্ঠ অধ্যায়

"আল্লাহ ওয়াদা করেছেন ... এমন বাগানের – যার তলদেশ দিয়ে বয়ে চলে নদী এবং সেখানে থাকবে মুমিনগণ চিরকাল; (এবং তাঁর আরও প্রতিশ্রুতির মধ্যে রয়েছে) অমরত্বের বাগানে থাকা পবিত্র উদ্যানের।"

– কুরআন (৯:৭২)
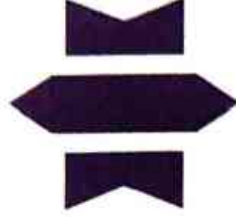
নগর

নগর পরিকল্পনা • স্থাপত্যশিল্প • খিলান
ধনুকাকৃতি ছাদ • গম্বুজ • মোচা-সদৃশ চূড়া • প্রভাবশালী ধ্যান-ধারণা
দুর্গ এবং দুর্গে থাকা বৃহৎ টাওয়ার • স্নানাগার • তাঁবু
শামিয়ানা ঢাকা দোকান থেকে কাচে ঘেরা কক্ষ • বাগান • ঝরনা

৯ম ও ১০ম শতাব্দির স্পেনের কর্ডোবা এবং ইরাকের বাগদাদের শহুরে জীবন ছিল আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতায় ঘেরা। এটা ছিল উন্নতির চরমে পৌঁছা সভ্যতার এক নমুনা, যেখানে বিনামূল্যে শিক্ষা ও চিকিৎসা সেবার ব্যবস্থা ছিল এবং সেইসাথে শহরবাসীদের জীবনকে সহজ ও আনন্দময় করে তোলার জন্য ইটের আস্তরণে বাঁধা রাস্তার দু'ধারে ছিল সারিসারি স্নানাগার, বই বিপণী এবং গ্রন্থাগার। দুই চাকার গাধার গাড়ি করে প্রতিনিয়ত ময়লা ও আবর্জনা সংগ্রহ করা হতো এবং কোথাও কোথাও ছিল ভূ-গর্ভস্থ পয়ঃনিষ্কাশণ সুবিধা।

দু'ধারে উন্মুক্ত প্রধান সড়ক, তার থেকে কিছুটা দূরত্বে আছে সংকীর্ণ রাস্তা, রাস্তাগুলো বাতাস আর ছায়ায় ঘেরা, এরপর এ রাস্তাগুলো গিয়ে মিশেছে প্রধান সড়কে, ওদিকে এলাকার মসজিদ থেকে আযান শোনা যায়, এমন দূরত্বে ছিল বাড়িগুলো – এভাবে রাস্তা ও বাড়ির সমন্বয়ে গড়ে উঠা পাড়া ও মহল্লাগুলো বেশ শান্ত ও নিরিবিলি ছিল। ব্যবসা ও কারবারগুলো ছিল প্রধান সড়ক ও গণচত্বর কেন্দ্রিক। ব্যক্তিগত ও সরকারি উভয় বাগানগুলো জান্নাতের কুরআনী বর্ণনার আলোকে সাজানো হতো এবং সেগুলো ছিল মনোযোগ ও পরিচর্যার আকর্ষণ বিন্দু। সময়ের অতীতে ফিরে গেলে দেখা যাবে, নদী থেকে বিশালাকার জল-উত্তোলক যন্ত্রের সাহায্যে আবাদি জমি ও শহরগুলোতে পানির চাহিদা মেটানো হচ্ছে। স্পেনের গ্রানাডাতে অবস্থিত আল-হামরা প্রাসাদের ঝরনা আজও মুসলিম প্রকৌশলীদের উদ্ভাবিত ৬৫০ বছরের পুরোনো জল-ব্যবস্থা ব্যবহার করে যাচ্ছে।

স্থাপত্যশিল্পের অগ্রগতির বদৌলতে আমরা ওই সময় মুসলিম সভ্যতাতে নির্মিত হতে দেখি বিশালাকার মসজিদ এবং পাহাড়ের ফাটলে গড়ে উঠা বিস্তৃত সেতুর অবকাঠামো। গম্বুজ ও মিনারগুলো দিগন্তজুড়ে রাজ করতে শুরু করে এবং এগুলো খ্রিস্টান ক্রুসেডারদের এতটাই মোহগ্রস্থ করে যে, তারা এসবের নকশা, এমনকি মুসলিম স্থাপত্যশিল্পীদের সাথে করে ইউরোপে নিয়ে যায়, যেন এগুলোর সাহায্যে ইউরোপের রোমান স্থাপত্য কর্মগুলোতে সমৃদ্ধি ও নতুনত্বের ছোঁয়া আনা যায়।

উল্টো পৃষ্ঠার চিত্র: হুনেরনামা নামের এই ১৬শ শতাব্দির পাণ্ডুলিপিতে ইস্তাম্বুলের তোপকাপি প্রাসাদের লোকজনের দৈনন্দিন চিত্র চিত্রায়িত হয়েছে।

০১ নগর পরিকল্পনা

চত্বর, গির্জা এবং পার্কের সুবিধা নিয়ে যেভাবে ঐতিহ্যবাহী ইউরোপীয় নগরগুলোর সূচনা হয়েছিল, ঠিক সেভাবে আবহাওয়া ও ভূমি বিন্যাস, ধর্মীয় ও সামাজিক রীতিনীতি, শরিয়ত এবং সামাজিক ও নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী – এই চার প্রধান বৈশিষ্ট্য এবং স্থানীয় মানুষজনের চাহিদার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছিল মুসলিম নগরসমূহ।

এসব শহরের অধিকাংশেরই আবহাওয়া বেশ উষ্ণ ছিল, তাই এগুলোতে প্রয়োজন ছিল পর্যাপ্ত ছায়ার। এমনটি নিশ্চিত করতে সংকীর্ণ রাস্তা, অভ্যন্তরীণ উঠান, সমতল থেকে উঁচুতে অবস্থিত একই রকমের বাড়ির সারি এবং বাগানের সমন্বয়ে নগরগুলো নির্মিত হয়।

ধর্ম সাংস্কৃতিক জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হওয়ায় মসজিদ ছিল মুসলিম নগরগুলোর সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। মসজিদের আশেপাশে গজিয়ে উঠতো সরু, বাতাসময় নিরিবিলি রাস্তা, যা জনসাধারণের কোলাহল থেকে একজনকে নিয়ে যেত কানাগলি ও গৃহের অন্তরঙ্গ জীবনে একাকিত্বে।

সামাজিক ও আইনি বিষয়াদি ধর্মীয় কর্তৃপক্ষ তত্ত্বাবধান করতো এবং প্রধান সরকারি প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা পালনকারী জামে মসজিদের নিকটবর্তী কেন্দ্রীয় স্থানগুলোতে ধর্মীয় কর্তৃপক্ষ বাস করতো। উদাহরণস্বরূপ, দেয়ালের উচ্চতা কতটুকু হবে, তা এরাই নির্ধারণ করে দিতেন এবং এক্ষেত্রে আইন ছিল, দেয়ালের উচ্চতা উট আরোহীর উচ্চতার চেয়ে বেশি হবে, যেন আরোহী বাড়ির অভ্যন্তর দেখতে সমর্থ না হয়।

কোথায় ও কীভাবে লোকজন বসবাস করবে, সেটা নির্ধারিত হতো পরিবার, একই পরিবারের বিভিন্ন শাখা, সমজাতীয় নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী ও সামাজিক রীতিনীতির ভিত্তিতে। প্রতিটি গোষ্ঠীর জন্য *আহইয়া* নামে পৃথক আবাসিক এলাকা নির্ধারিত ছিল, যার প্রেক্ষিতে আমরা উত্তর আফ্রিকার মাগরিবে আরব, মুর, ইহুদি, খ্রিস্টান এবং অন্যান্য গোষ্ঠী যেমন: আন্দালুসী, তুর্কি, বার্বারদের জন্য পৃথক পৃথক আবাসিক এলাকার দেখা পাই। উত্তর আফ্রিকার কিছু শহর মুসলিম, ইহুদি ও খ্রিস্টান আবাসিক এলাকায় বিভক্ত ছিল। সাধারণভাবে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হলেও এগুলো কখনো একচেটিয়া ছিল না। এসব আবাসিক এলাকার লোকদের মাঝে আত্মীয়তাসুলভ সংহতি, প্রতিরক্ষা, সামাজিক বিন্যাস এবং সমজাতীয় ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান বিদ্যমান ছিল।

আকাশ থেকে তোলা স্পেনের কর্ডোবার যুহেরসে অবস্থিত এক আন্দালুসীয় গ্রামের দৃশ্যপট।

এ ধরনের পৃথক নিবাস তাদের সামাজিক আদান-প্রদানে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেনি, যেহেতু এ ব্যাপারে কুরআনের দৃষ্টিভঙ্গি এরূপ: "হে মানুষ, আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যেন তোমরা একে অপরকে জানতে পারো। প্রকৃতপক্ষে, তোমাদের মাঝে আল্লাহর নিকট সেই সর্বোত্তম, যে সবচেয়ে তাকওয়াবান। আল্লাহ সর্বজ্ঞ এবং সবকিছুর খবর তিনি রাখেন।" (কুরআন, ৪৯:১৩)

জামে মসজিদের নিকটে ছিল সামাজিক সমাবেশের কেন্দ্রীয় চত্বর, এরপর ছিল সূক বা বাজার, এরপর আবাসিক এলাকা ঘিরে থাকা প্রতিরক্ষা দেয়ালের নিকটে ছিল নগরদুর্গ। এগুলো চারদিক বিস্তৃত রাস্তার নেটওয়ার্ক দ্বারা বহিঃস্থ দেয়ালের সাথে মিলিত হতো।

মশলা, স্বর্ণ, মাছ, আতর ও অন্যান্য সামগ্রীর ভিত্তিতে বাজার বিভিন্ন শাখাতে বিভক্ত ছিল। মোমবাতি ও ধূপের মতো সামগ্রী মসজিদের নিকটে বিক্রি হতো, আর মসজিদের নিকটে থাকতো বই বিপণী ও গ্রন্থ বাঁধাইকারগণ।

পশ্চিমা দুর্গের মতো নগরদুর্গ ছিল গভর্নরের থাকার প্রাসাদ এবং এর ছিল নিজস্ব দেয়াল। নিজস্ব মসজিদ, প্রতিরক্ষা বাহিনী, অফিস ও বাসিন্দাসহ এটা ছিল স্বতন্ত্র এক পরিষদ। নগরদুর্গের অবস্থান সাধারণত শহরের বহিঃস্থ দেয়ালের নিকটবর্তী কোনো উঁচু জায়গাতে হতো।

কর্ডোবা শহরের সরু রাস্তার চিত্র শিল্পীর তুলিতে ফুটে উঠেছে। মূলত সরু রাস্তা ছিল প্রাচীন মুসলিম নগর পরিকল্পনার সাধারণ বৈশিষ্ট্য।

পাড়া ও মহল্লাগুলো মসজিদের চারপাশ ঘিরে গুচ্ছভাবে বিস্তৃত ছিল এবং সেগুলো এমন দূরত্বে থাকতো, যা থেকে সহজেই সালাতের জন্য মুয়াযযিনের দেয়া আযান তাদের কানে পৌঁছে যেত। নিজস্ব মসজিদ, বিদ্যালয়, বেকারি বা রুটিঘর ও দোকানপাটসহ প্রতিটি এলাকা নিবিড়ভাবে পূর্ণ ছিল। এসব মহল্লার নিজস্ব প্রবেশদ্বার ছিল, যা সচরাচর রাতে বন্ধ হয়ে যেত।

এসব কিছু অত্যন্ত মজবুতভাবে নির্মিত প্রতিরক্ষা প্রাচীর দিয়ে ঘেরা ছিল এবং এ প্রাচীরে বেশ কয়টি ফটক থাকতো। এই প্রাচীরের বাহিরে ছিল মুসলিম, খ্রিস্টান ও ইহুদিদের কবরস্থান। প্রধান ফটকের পাশেই ছিল ব্যক্তিগত বাগান ও মাঠ এবং সেখানে সাপ্তাহিক বাজার বসতো; পশুপাখি বিক্রয়ের স্টল ছিল এই বাজারের প্রধান আকর্ষণ।

তৎকালীন সময়ের সবচেয়ে পরিকল্পিত শহর এবং ৯ম শতাব্দির নিউইয়র্ক ছিল কর্ডোবা। "(কর্ডোবার) গঠনশৈলী সবার কাছে তুলে ধরে উদ্ভাবনকুশলী ও সৃজনশীল মুসলিম সমাজের পরিচয়। তারা অতীতকে পাল্টে দেয়ার মোহ নিয়ে নেমেছিল, যেন শহরটিকে আধুনিক রূপে সজ্জিতের পাশাপাশি রাজা-প্রজা নির্বিশেষে সকলের জন্য বসবাসের উপযোগী উত্তম আবাসে বদলে দেয়া যায় ... সেখানে ছিল কয়েক ডজন গ্রন্থাগার, অবৈতনিক বিদ্যালয় এবং বাসা-বাড়িগুলোতে ছিল প্রবহমান পানির ব্যবস্থা; এখানেই শেষ নয়, ইট বা পাথরে বাঁধানো রাস্তা এবং রাতের বেলায় সেগুলোতে ছিল বাতির ব্যবস্থা; এমনসব সুযোগ-সুবিধা তো পরবর্তী সাতশত বছরে লন্ডন ও প্যারিসেও দেখা যায়নি" – রিপোর্টার রাগেহ উমর বিবিসি নির্মিত প্রামাণ্যচিত্র *An Islamic History of Europe*-এ এই মন্তব্য করেন।

সড়কের বাতিগুলো ছিল: তেলনির্ভর কুপি এবং লণ্ঠন; সূর্য ডোবার সাথে সাথে এগুলো জ্বালানো হতো এবং এগুলো তদারকির জন্য প্রতিটি শহর পরিষদের নিজস্ব লোক নিয়োজিত ছিল। ময়লা-আবর্জনা গাধার পিঠে করে সংগ্রহ করা হতো এবং সেগুলো শহরের প্রতিরক্ষা দেয়ালের বাহিরে বিশেষভাবে নির্মিত আস্তাকুড়ে ফেলে দেয়া হতো। চমৎকার ও কার্যকর পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার সুবিধাসহ শহরের রাস্তাগুলো নির্মিত ছিল এবং প্রতিদিন সেগুলো পরিষ্কার করা হতো।

মনোরম জীবন

মুসলিম সভ্যতার নগরগুলোর আয়েশী জীবন

উল্লেখযোগ্য পরম্পরা: প্রাচীন কিছু নগরের পুরাতন রাস্তাগুলো আজও আগের মতো অক্ষত, যা তুলে ধরে
১০০০ বছর আগেকার জীবনের এক ঝলক

অবস্থান: কর্ডোবা থেকে দামেস্ক এবং বাগদাদ

তারিখ: ৮ম থেকে ১৬শ শতাব্দি

আপনি যদি অতীতে ফিরে এক হাজার পূর্বের কোনো শহরে পা রাখতে চান, দেখতে চান এক হাজার বছর পূর্বে কেমন ছিল ওই শহর, তবে বলতে হয়, আপনি বেশ ভাগ্যবান। স্পেনের কর্ডোবা ও সেভিলের ন্যায় শহরগুলো এখনো তাদের প্রাচীন অংশটুকু অক্ষত রেখেছে, যেখানে আপনি পাবেন মুসলিম শাসনের অধীনে বহু শতাব্দি পূর্বের নগরজীবনের ঝলক।

ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনে মসজিদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার প্রেক্ষিতে মুসলিম সভ্যতার নগর পরিকল্পনা ছিল মসজিদ কেন্দ্রীক। এর আশেপাশেই ছিল বাজার, যেখানে খাদ্য, মশলা, মোমবাতি ও সুগন্ধি কেনা-বেচা হতো। ব্যবসা পরিষদগুলোতে অন্তর্ভুক্ত ছিল: বই বিপণী, গ্রন্থাগার এবং স্বাস্থ্য সেবাকেন্দ্র।

বস্তুত, মুসলিম সমাজে হাসপাতালগুলোর ভূমিকা তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। চিকিৎসা সেবা ও নিরাময় পরবর্তী পরিচর্যা প্রদানের পাশাপাশি মানসিক রোগীদের জন্য এটা ছিল এক প্রকারের আশ্রয়স্থল। হাসপাতালগুলো অবসর পরবর্তী নিবাস বিশেষকরে দরিদ্র লোকদের আবাস হিসেবে ব্যবহৃত হতো। মুসলিম সভ্যতার প্রথম হাসপাতাল ছিল দামেস্ক ও বাগদাদে, যার পরম্পরায় ৮৭২ থেকে ৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে মিশরের কায়রোতে প্রতিষ্ঠিত হয় আহমাদ ইবনে তুলুন হাসপাতাল।

প্রতিটি শহরেই স্নানাগার বা হাম্মামখানার ব্যবস্থা ছিল এবং মূল্যবান টাইলসে ঢাকা দেয়াল, ঝরনা এবং সুসজ্জিত জলাধার বিশিষ্ট বিস্তৃত ভবনগুলোতেই সাধারণত এ সুবিধার দেখা মিলতো। স্নানাগারে গিয়ে সেখানের বাষ্পীয় কামরার উষ্ণ গোসল এবং ঠাণ্ডা জলাধারগুলোতে গা ডুবানো ছিল প্রতিটি মুসলিমের নিত্যদিনের রুটিন।

নারী ও পুরুষের জন্য স্নানাগারে যাতায়াতের সময় আলাদা ছিল এবং এগুলো ছিল সংবাদ আদান-প্রদান থেকে শুরু করে বন্ধুদের সাথে সময় কাটানোর ন্যায় নানা সামাজিক অভিজ্ঞতায় ভরপুর।

সরু রাস্তা ধরে কর্মচঞ্চলতায় ভরা এসব কেন্দ্র থেকে আপনি আবাসিক এলাকার পথ খুঁজে পাবেন। অভ্যন্তরীণ উঠান, সমতল থেকে উঁচুতে থাকা সারি সারি কক্ষের বাসা-বাড়িগুলো এতটা উঁচু দেয়ালে ঘেরা ছিল যে, পথচারী ও উট আরোহী মুসাফিরদের নজর দেয়া থেকে এগুলো ছিল পুরোপুরি নিরাপদ। ইট বা পাথরে বাঁধানো রাস্তা, আবর্জনা সংগ্রহশালা, এমনকি ঢাকা পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা নিয়ে তৎকালীন সময়ে অন্যসব ইউরোপীয় শহরের তুলনায় এসব শহর ছিল সময়ের চেয়েও এগিয়ে।

১০ম শতাব্দির কর্ডোভা ছিল বিশ্বের অত্যাধুনিক শহরগুলোর অন্যতম, যেখানে তেলনির্ভর কুপি বা লণ্ঠনের সাহায্যে সূর্যাস্তের পরপর শহরের রাস্তাগুলো আলোকিত করা হতো। মুসলিম সীমানার আরও পূর্বে কায়রোর মতো শহরে ছিল বহুতল ভবন ও ছাদ-বাগানের ন্যায় দৃষ্টিনন্দন সব কারবার।

১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে আঁকা এই চিত্রে ৯৭২ খ্রিস্টাব্দে মিশরের কায়রোতে প্রতিষ্ঠিত আল-আযহার মসজিদের চিত্র ফুটে উঠেছে। মসজিদ মুসলিমদের দৈনন্দিন জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। শহরের একেবারে কেন্দ্রে ছিল এর অবস্থান এবং ব্যবসায়িক দোকান ও ঘর-বাড়িগুলো মসজিদ থেকে ডালপালা মেলার মতো করে বিভিন্ন দিকে নির্মিত হতো।
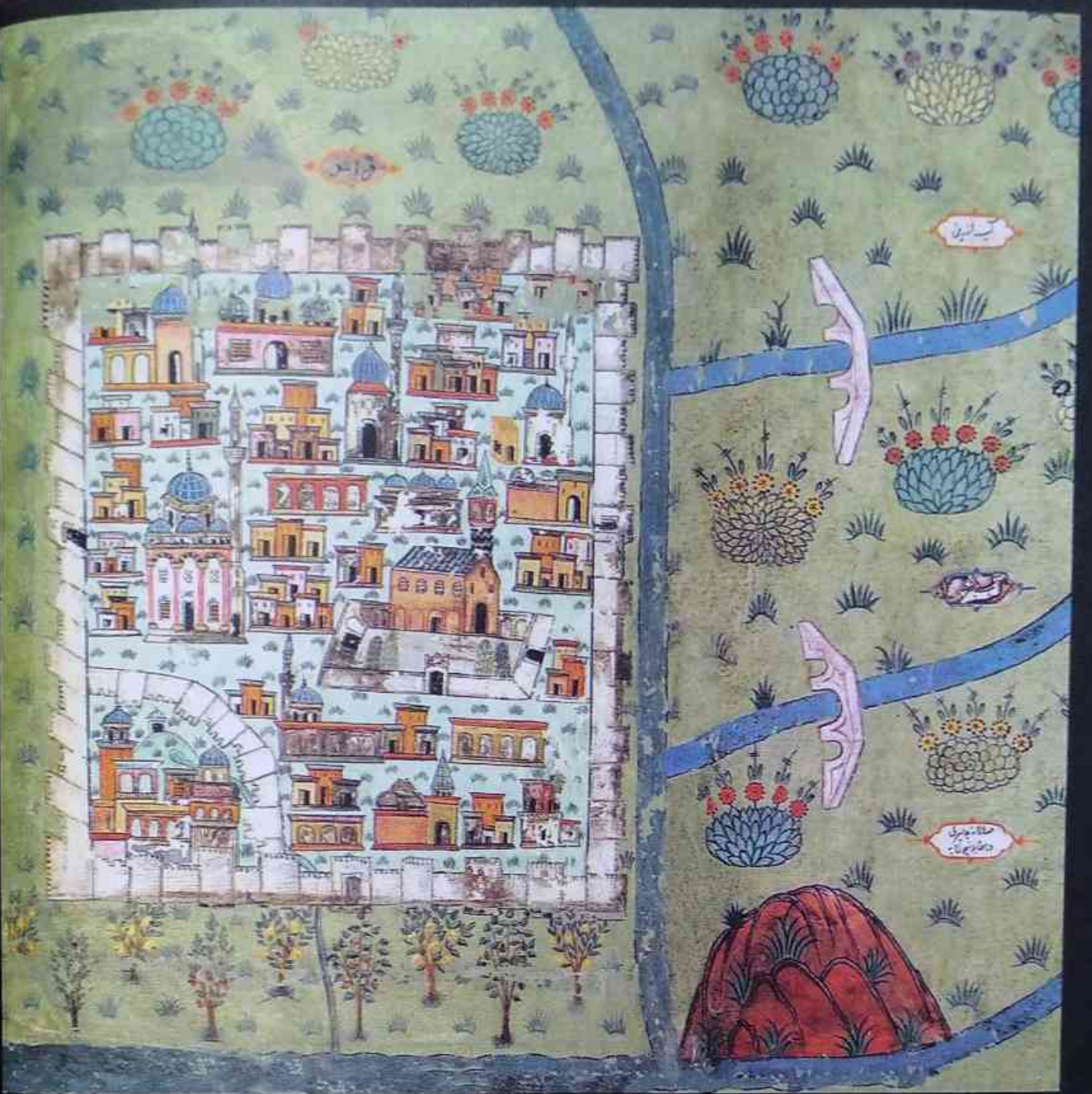
১৬শ শতাব্দির পাণ্ডুলিপিতে দক্ষিণ তুরস্কের দিয়ারবাকিরের নগর পরিকল্পনা চিত্রায়িত হয়েছে।

মুসলিম সভ্যতায় বাগান অনেকের কাছে পার্থিব জান্নাতের প্রতীক ছিল। গভীর উপলব্ধি ও পর্যবেক্ষণের ধারণা সাথে নিয়ে ৮ম শতাব্দির পরপর সুদূর স্পেন থেকে ভারত পর্যন্ত বিস্তৃত মুসলিম বিশ্বে বাগান করার কালচারের বিস্তৃতি ঘটে। রান্নাঘরে খাদ্য সরবরাহের পাশাপাশি সবুজে ঘেরা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যধারী এই বাগানগুলোর প্রভাব বর্তমানের বাগান নকশাতেও দৃশ্যমান।

জ্যামিতিক নকশার ফুলের কেয়ারি, সরু নালা ও ঝরনা ছিল ৯ম শতাব্দির বাগানের নতুন কিছু বৈশিষ্ট্য। স্পেনের আল-হামরা এবং ভারতের তাজমহলে আজও আপনি এ ধরনের বাগানের দেখা পাবেন। এদিকে ইউরোপে এমন বৈশিষ্ট্যধারী বাগানের দেখা মেলে কয়েক শতাব্দি পর।

মুসলিম বিশ্বের প্রাসাদ এবং মসজিদে ঝরনা ও বাগানের প্রবহমান পানির ধারণাটি বেশ জনপ্রিয়তা পায়। মুসলিম বিশ্বের উষ্ণ এলাকাগুলোতে পানি যদিও তেমন সহজলভ্য ছিল না, তথাপি ৯ম শতাব্দির উদ্ভাবনকুশলী প্রকৌশলীগণ নিজেদের মেধা ও দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে একে একে বানিয়েছেন অবিশ্বাস্য সব ঝরনা। তাদের এমন জলপ্রদর্শনীতে যোগ হয়েছে প্রতিনিয়ত আকৃতি বদলানো ফোয়ারা এবং সময় বলে দেয়ার কলা-কৌশল।

০২ স্থাপত্যশিল্প

গম্বুজ, কারুকার্য শোভিত প্রধান গির্জার চক্রাকার জানালা, রেল স্টেশনের খিলান এবং গির্জার ধনুকাকৃতি ছাদ – স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের প্রতিনিধিত্বকারী এসব নির্মাণশৈলী ধারণ করে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে ইউরোপের বহু ভবন। কিন্তু এটা জেনে অনেকের মতো আপনিও অবাক হবেন যে, এসব স্থাপত্য নকশা ও কৌশলের অধিকাংশই মুসলিমদের হাতে সমৃদ্ধ ও পূর্ণতা লাভ করেছিল এবং দক্ষিণ স্পেন ও সিসিলি হয়ে এগুলো প্রায় এক হাজার বছর পূর্বে ইউরোপে প্রবেশ করেছিল। জেরুজালেমগামী পণ্ডিত, ক্রুসেডার ও তীর্থযাত্রীদের বদৌলতে এসব ভবন নকশা ও স্থাপত্য ধারণা ইউরোপে আমদানি হয়, যেহেতু জেরুজালেমে পৌঁছানোর জন্য তাদেরকে পাড়ি দিতে হয় স্থলপথে কর্ডোবা, কায়রো এবং দামেস্কের মতো মুসলিম শহরগুলো। রোমান নকশায় এসবের প্রয়োগ যেমন সেগুলোর উন্নয়ন ঘটিয়েছিল, ঠিক তেমনি জন্ম দিয়েছিল জমকালো সব ফিউশনের।

মুসলিমদের জন্য স্থাপত্যশিল্প বেশ তাৎপর্যময়, যেমন: কারো কাছে তা আল্লাহ তাআ'লার অসীম ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশের একটি নমুনা, যা পুনরাবৃত্তিময় জ্যামিতিক বিন্যাস ও আরবীয় নকশার মাঝে ফুটে উঠে। মানুষ ও জীবজন্তুর আকৃতি এসব শোভা বর্ধনে বেশ বিরল ছিল, কেননা আল্লাহর কর্ম ছিল সাদৃশ্যহীন। আর এ কারণে অত্যন্ত নিখুঁত শৈলীর পত্রসম্ভার এবং পুনরাবৃত্তিময় ফুলের নকশা ব্যবহৃত হতো। ক্যালিগ্রাফির কারুকার্যখচিত কুরআনের আয়াতের শৈল্পিক প্রকাশ ভবনের সৌন্দর্যে এনে দিতো পূর্ণতার ছোঁয়া। অন্যদিকে বিশালাকার গম্বুজ, টাওয়ার এবং বাড়ির উঠানগুলো এনে দিতো মহাশূন্য ও রাজকীয় ক্ষমতার অনুভূতি।

এসব ভবনের শোভাবর্ধন প্রধানত দৃশ্যমান নান্দনিকতার উপর অধিক জোর দিতো, কারণ অযথা ব্যয়ে ইসলামের বিরোধিতা থাকলেও আল্লাহর বেঁধে দেয়া সীমার মাঝে থেকে জীবনকে উপভোগ্য ও আরামদায়ক করে তোলাতে ইসলামের কোনো বাধা ছিল না। অর্থাৎ ইসলাম চায় না, তার অনুসারীগণ দুর্দশাগ্রস্থ জীবনযাপন করুক। "পার্থিব জীবনের জন্য এমনভাবে চেষ্টা করো, যেন তুমি এখানে চিরকাল থাকবে এবং আখিরাতের জন্যও চেষ্টা করো, যেন তুমি আগামীকাল মারা যাবে" – এই মুসলিম জ্ঞানোপদেশ স্থাপত্যশিল্পে মুসলিম আচরণকে দারুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছে। যদি কিছু বানাতে যান, তবে তা যেন মার্জিত ও সুন্দর হয়, এটাই ইসলামের চাহিদা।

কারুকার্য শোভিত চক্রাকার জানালা (*Rose window*) প্রায় প্রতিটি গির্জার সম্মুখভাগে দেখা যাবে এবং সৌন্দর্যবর্ধনের পাশাপাশি এগুলো কীভাবে প্রধান ফটকের দেয়ালের শোভাবর্ধন করে, সত্যই তা দেখার মতো। ইতিহাসবেত্তাগণ এমন চক্রাকার জানালার উৎস ইসলামে খুঁজে পেয়েছেন এবং *খিবরাত আল-মাফজার* নামের উমাইয়া প্রাসাদের বহিঃস্থ দেয়ালে থাকা ছয়-লতি বিশিষ্ট গোলাপাকৃতি ব্যাজ এবং অষ্টভুজের জানালাই এ ধরনের নকশার আদি উৎস। জর্ডানে এই প্রাসাদ ৭৪০ থেকে ৭৫০ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত হয়েছিল।

৭৪০ থেকে ৭৫০ খ্রিস্টাব্দে জর্ডানে নির্মিত খিবরাত আল-মাফজার প্রাসাদের চক্রাকার জানালা। যুক্তরাজ্যের ডুরহাম ক্যাথিড্রালের স্বচ্ছ রঙমিশ্রিত কাচের কারুকার্য শোভিত চক্রাকার জানালার নকশাটি প্রকৃতপক্ষে খিবরাত আল-মাফজারের অনুকরণে নির্মিত।

মহান স্থপতি সিনান

গোটা তুরস্কের সবচেয়ে ভূমিকম্প সহনশীল মিনারগুলোর মাঝে এড্রিনের সালিমিয়া মসজিদ সর্বাধিক উচ্চতার খেতাব দখল করে আছে। মিনারটি দীর্ঘযুগ সাফল্যের সাথে কাজ করা মহান অটোমান স্থপতি সিনানের কীর্তি। ১৬শ শতাব্দিতে তিনজন তুর্কি সুলতানের অধীনে নিজের দীর্ঘ কর্মজীবনে চোখ ধাঁধানো ৪৭৭-টি ভবনের নকশা এবং সেগুলোর নির্মাণ কাজ তিনি সমাপ্ত করেছিলেন। ভূমি বিন্যাসের সাথে সামঞ্জস্য রেখে স্থাপনা নির্মাণে তিনি অত্যধিক জোর দিতেন এবং ধারণাটি ১৬শ শতাব্দির আগ পর্যন্ত ইউরোপের কোথাও দৃশ্যমান হয়নি।

গম্বুজ নির্মাণে তার তুর্কি নকশাগুলো বড় ধরনের বিপ্লব নিয়ে আসে। এতে করে বৃহদাকার ও বেশ উঁচু স্থাপনা নির্মাণ বেশ সহজ হয়ে উঠে। এসব নকশা সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ যুগান্তকারী পদক্ষেপ ছিল এবং এগুলো পরবর্তীতে পরিণত হয় তার ট্রেডমার্কে।

তুরস্কের এড্রিনে অবস্থিত সালিমিয়া মসজিদ

ক্রুসেডাররা এটা দেখে ইউরোপের গির্জাগুলোতে এই নকশার প্রচলন ঘটাতে শুরু করে। প্রথমদিকে, ১১শ থেকে ১২শ শতাব্দির রোমান স্থাপত্যকীর্তি, যেমনঃ ডুরহাম ক্যাথিড্রালে এটার ছাপ দেখা যায় এবং পরবর্তীতে গথিক স্থাপত্যশিল্পেও এটার প্রচলন শুরু হয়।

স্রষ্টার চোখের প্রতীকী রূপায়নের পাশাপাশি কারুকার্য শোভিত চক্রাকার জানালা দিয়ে আলো সহজে ভিতরে প্রবেশ করে। অন্যদের দাবী, এ ধরনের স্থাপত্য ধারণা রোমের প্যানথিয়নের গম্বুজে থাকা বৃত্তাকার জানালা নামে পরিচিত রোমান অকুলাস থেকে উদ্ভূত, কিন্তু দৃশ্যত তা ছাদ ভেদ করা বৃত্তাকার খোলা পথ ছাড়া আর কিছুই নয়।

মুসলিম স্থাপত্যশিল্পের বৈচিত্রময় দুনিয়া এবং কয়েক শতাব্দি ধরে এর ভবন এবং স্থাপনাশৈলী কীভাবে বাকি বিশ্বে আধিপত্য বজায় রেখেছিল, সে সম্পর্কে সামনের অধ্যায়গুলোতে যত বর্ণনা রয়েছে, এতক্ষণের বিবরণ তার সামান্য কিছু নমুনা।

মুসলিম স্থাপত্যশিল্পে পরিবেশ বান্ধব সচেতনতা লক্ষ্য করার মতো। হাজার হাজার মোমবাতি ও তেলনির্ভর বাতির দহনে সৃষ্ট ধোঁয়া কমাতে স্থপতি সিনান ইস্তাম্বুলের সুলেমানিয়া মসজিদের অভ্যন্তরের নকশা এমনভাবে করেন, যেন দহনে সৃষ্ট ধোঁয়ার কালি বায়ুর সাথে মিশে শহরে নির্গত হওয়ার পূর্বে আলাদা একটি ছাঁকনি কক্ষে প্রবেশ করে। দহনে সৃষ্ট ধোঁয়ার কালি পানির ঝরনাতে ফেলে প্রয়োজনীয় উপাদানের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে সেখান থেকে প্রস্তুত করা হতো উচ্চমানের কালি, যা ক্যালিগ্রাফির কাজে বেশ উপযোগী ছিল। এই কালি ছারপোকা ও উইপোকার বিতাড়নে বেশ কার্যকর থাকায় তা যেকোন পাণ্ডুলিপির আয়ু বাড়িয়ে দিতে বেশ কার্যকর ছিল।

স্থপতি সিনানের নকশা করা সুলেমানিয়া মসজিদটি (নির্মাণকাল: ১৫৫০ থেকে ১৫৫৭ খ্রিস্টাব্দ) সপ্ত পাহাড়ের শহর হিসেবে খ্যাত ইস্তাবুলের পাহাড়ের মুকুট হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে। মাদরাসা, হাসপাতাল, খাবার ঘর, সরাইখানা, স্নানাগার, সেবাসদন এবং বিপণন কেন্দ্র অন্তর্ভুক্ত ছিল বৃহদাকার এই স্থাপনায়। পরিবেশ বান্ধব এই স্থাপনায় একটি ছাঁকনি কক্ষ ছিল, যেখানে মোমবাতি ও তেলনির্ভর কুপির দহনে সৃষ্ট ধোঁয়ার কালি বাতাসে মিশে পরিবেশে ছড়িয়ে পড়ার পূর্বে পরিষ্কার করা হতো।

০৩ খিলান

স্থাপত্যশিল্পে খিলান বেশ গুরুত্বপূর্ণ, যেহেতু প্রকাণ্ড ভার বহনের পাশাপাশি এগুলো অনেকটা জায়গা জুড়ে থাকে। যত শক্ত ও নমনীয় হবে, এগুলোকে তত বড় ও প্রশস্ত বানানো যাবে। দোকানপাট থেকে সেতু – বর্তমানে আমরা সর্বত্র এগুলোর উপস্থিতি দেখতে পাই। আজ অতি সাধারণ স্থাপত্য বিষয়ে পরিণত হওয়ায় এক হাজার বছর পূর্বে তখনকার যুগের প্রেক্ষিতে এগুলো যে কতটা অগ্রগামী ছিল, তা ভুলে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়।

খিলানে চাপ অনুভূত হয় প্রধানত খিলানের উপরে থাকা পাথরগুলোর ভার এবং খিলানে থাকা কীলক বা ইটগুলোর গাদাগাদি অবস্থানের প্রেক্ষিতে সৃষ্ট পুঞ্জীভূত ক্রিয়া থেকে। এটা খিলানকে 'নমনীয়তা' প্রদান করে এবং এটার তুলনা ঝুলানো ভারবাহী শিকল – যেহেতু 'ভারবাহী শিকলের ন্যায় খিলানও দাঁড়িয়ে থাকে।' 'খিলান কখনো ঘুমায় না' এই উক্তিই বলে দেয় যে, খিলানের এই নীরব সক্রিয়তার বিষয়টি মুসলিম বিশ্বে অজানা ছিল না। অন্যসব পূর্ববর্তীর ন্যায় মুসলিমরাও খিলান নির্মাণ ও এর খুঁটিনাটি বিষয়ে বেশ পারদর্শী ছিল। তালগাছের ন্যায় তারা এই শিল্পকে বেশ পছন্দ করেছিল, যার দরুন খিলান নির্মাণে তারা তালগাছের স্বাভাবিক গড়নের শাখাগুলোর বাঁকানো ভঙ্গির অনুকরণ করেছিল। মহাবিশ্বের গোলাকার ধরনও খিলানের এমন গঠনশৈলীর অনুপ্রেরণা ছিল।

জ্যামিতি ও স্থিতিবিদ্যার জ্ঞান কাজে লাগিয়ে মুসলিমরা নিয়ে আসে বিভিন্ন প্রকারের খিলান। কাঠামোগতভাবে মুসলিমরা এক্ষেত্রে যে অবদান রেখেছে, তা হচ্ছেঃ খিলানের চাপকে হ্রাস করে সেটাকে কেবল শীর্ষ ও কিনারার ন্যায় অল্প কিছু বিন্দুতে সীমাবদ্ধ রাখা। অন্য অংশগুলোকে ভারবহন থেকে মুক্তি দিয়ে এই কৌশল সহজেই খিলানের ভারবহন ক্ষমতাকে আরও বাড়িয়ে দিতো, যার ফলে ভবনের অন্যান্য উপাদান রক্ষায় হালকা প্রকৃতির দেয়াল ও ধনুকাকৃতি ছাদ নির্মাণ বেশ সহজ হয়ে উঠে। মিশরীয় ও গ্রিকরা চৌকাঠ (*lintel*) ব্যবহার করতো, যেখানে রোমান ও পরবর্তীতে বাইযান্টিনরা শক্ত মার্বেল পাথরের প্রাচুর্যের কারণে অর্ধবৃত্তাকার খিলান নির্মাণ করতো। রোমানরা বেজোড় সংখ্যায় খিলান ইট বা কীলক ব্যবহার করতো, যেখানে খিলানের মাঝের পাথরটি সবচেয়ে উঁচুতে থাকতো। এ ধরনের খিলান বেশ সাদামাটা হলেও খুব একটা মজবুত নয়। এগুলোর পার্শ্বদেশ বর্হিদিকে স্ফীত হয়ে উঠে, বিধায় এগুলোকে স্বাভাবিক রাখার জন্য পাথর ও চুনসুরকির কাজের সহায়তা নিতে হয়।

বায়েঃ চতুর্থ সম্প্রসারণের পর (৯৬১-৯৭৯ খ্রিস্টাব্দ) কর্ডোবা জামে মসজিদের পশ্চিম টিলার একটি অংশ নিম্নের কতগুলো জিনিস প্রদর্শন করছেঃ (১) প্রবেশদ্বারের ঠিক উপরে আছে সমতল খিলান (lintel – চৌকাঠ) (২) এর উপরে রয়েছে চৌকাঠকে ভারমুক্তকারী অর্ধবৃত্তাকার নাল আকৃতির খিলান (৩) প্রবেশদ্বারের প্যানেলের উপরে রয়েছে জানালার পর্দাসদৃশ আড়াআড়ি খিলান এবং (৪) জানালার উপরে রয়েছে পাঁচ লতিযুক্ত (বা পঞ্চমুখী পত্রের) খিলান। ডানেঃ লন্ডনের ওয়েস্টমিনিস্টার প্রাসাদের বিগ বেনের ক্লক টাওয়ার (The clock tower)-এ পাঁচ লতিযুক্ত খিলানের একটি সিরিজের ব্যবহার দেখা যাচ্ছে।

খিলানের এই পূর্ববর্তী ধরনগুলো কালের পরম্পরায় মুসলিমদের হস্তগত হয় এবং তাদের মানসপটে ছিল মসজিদ ও প্রাসাদের জন্য মহা-স্থাপত্য পরিকল্পনা। এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে তাদের প্রয়োজন ছিল অনেকটা স্থান জুড়ে থাকা বেশ শক্ত খিলানের। তাই তারা নাল আকৃতি, একাধিক পাত, সূচাগ্র এবং ওউগি (*Ogee*)-এর ন্যায় খিলানের অনেকগুলো নতুন ধারার উদ্ভাবন ঘটায়, যার সবই স্থাপত্যশিল্পের সমৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হিসেবে কাজ করেছে।

■ নাল আকৃতির খিলান

অর্ধবৃত্তাকার খিলানের উপর ভিত্তি করে নাল আকৃতির খিলানের উদ্ভব হলেও এটা অর্ধবৃত্তাকারের চেয়ে খানিকটা প্রশস্ত। এটা এতটা মজবুত না হলেও দেখতে বেশ চমকপ্রদ এবং মুসলিমদের প্রথম খিলানের ব্যবহার, যা ৭০৬ থেকে ৭১৫ খ্রিস্টাব্দব্যাপী নির্মিত দামেস্কের উমাইয়া জামে মসজিদে ব্যবহৃত হয়। কাঠামোগতভাবে নাল আকৃতির খিলান সনাতন অর্ধবৃত্তাকার খিলানের চেয়ে উঁচু হতো। ইউরোপের জমিনে নাল আকৃতির খিলানের প্রথম দেখা কর্ডোবার জামে মসজিদে পাওয়া যায়, যেটার নির্মাণকার্য ৭৫৬ খ্রিস্টাব্দে শুরু হয়ে দীর্ঘ ৪০ বছরে শেষ হয়। মোজারাব নামে পরিচিত আন্দালুসে বসবাসরত স্পেনীয় খ্রিস্টান উপজাতীর মাধ্যমে এই খিলান উত্তরে পৌঁছায়। স্পেনের দক্ষিণ ও উত্তর অংশে যাতায়াত থাকা স্পেনীয় খ্রিস্টান উপজাতীর অনেকেই ছিল শিল্পী, পণ্ডিত, নির্মাতা ও স্থপতি।

এ ধরনের খিলানসমূহের নকশার পূর্ণ বিবরণ মোজারাবদের আঁকা স্থপতিদের ম্যানুয়েল হিসেবে সমাদৃত বৃহদাকার সচিত্র পাণ্ডুলিপিগুলোতে পাওয়া যাবে। ম্যাগিন্স রচিত *Beatus of Lebana* এমনই এক সচিত্র পাণ্ডুলিপি, যার রচয়িতা লিওনের নিকটবর্তী সেন্ট মিগুয়েল ইসাকান্ডা আশ্রমে কাজ করতো। নাল আকৃতির খিলানের ব্যবহারসহ এটা ছিল মুরদের অনুকরণে নির্মিত বৃহদাকার ধর্মীয় স্থাপনা, যা ৯১৩ খ্রিস্টাব্দে কর্ডোবা ফেরত সন্ন্যাসীদের দ্বারা নির্মিত হয়েছিল।

ব্রিটেনে মুরদের খিলান নামে পরিচিত নাল আকৃতির এই খিলান ভিক্টোরিয়ান যুগে বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং লিভারপুল ও ম্যানচেস্টারের রেলওয়ে স্টেশনের প্রবেশিকার ন্যায় বৃহদাকার ভবনগুলোতে ব্যবহৃত হতে থাকে। ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে জন ফস্টার এগুলোর নকশা করেন এবং এই দুটো স্থাপনার খিলানগুলো ছিল কায়রো ফটক বা প্রবেশদ্বারের অনুরূপ। ম্যানচেস্টারে অবস্থিত চিতাম হিল সিনাগগের (নির্মাণকাল: ১৮৭০ খ্রি:) সম্মুখ ফটকে আপনি নাল আকৃতির খিলান দেখতে পাবেন।

৯৯৮ ও ১০০০ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝিতে নির্মিত বাব মারদুম মসজিদে পরস্পরছেদী খিলানের ব্যবহার দেখা যাচ্ছে। বর্তমানে মসজিদটি ক্রিস্টো ডে-লা-লুজ নামের গির্জায় রূপান্তরিত হয়েছে।

■ পরস্পরছেদী (*Intersecting*) খিলান

মুসলিমরা খিলান নির্মাণে এতটাই পারদর্শী হয়ে উঠে যে, এর আকার ও গঠনশৈলী নিয়ে উল্লেখযোগ্য কিছু পরীক্ষণ চালাতে তারা পিছ পা হয়নি। আর এভাবেই পরস্পরছেদী খিলানের সূচনা ঘটে, যা অতিরিক্ত কাঠামোর সুবিধা প্রদান করে। এতে করে

খিলানকে আরও বড় ও উঁচু করা এবং প্রথম বা নিম্নস্তরের খিলানগুলোর উপর দ্বিতীয় আরেকটি খিলানের সারি বসানো সম্ভব হয়। পরস্পরছেদী খিলানের এই নমুনা কর্ডোবার বিখ্যাত মসজিদে দেখা যাবে।

■ সূচ্যগ্র খিলান

সূচ্যগ্র খিলানের প্রধান সুবিধা হচ্ছে: এটা ধনুকাকৃতির ছাদের চাপকে সংকীর্ণ খাড়া একটি অংশে কেন্দ্রীভূত করতে পারে, যে অংশকে থাম থেকে দেয়াল পর্যন্ত প্রলম্বিত ঠেকনা দিয়ে ধরে রাখা হয়। কোনো কিছুকে থাম থেকে দেয়াল পর্যন্ত প্রলম্বিত ঠেকনা দিয়ে ধরে রাখার কৌশলটি ইউরোপীয় গথিক স্থাপত্যশিল্পের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। এতে করে স্থপতিরা দেয়াল এবং উপস্তম্ভের বোঝা লাঘব করতে সক্ষম হয়, পূর্বে যেখানে অর্ধবৃত্তাকার খিলান ধরে রাখতে প্রয়োজন হতো বেশ ভারী দেয়াল ও উপস্তম্ভের। এটার অন্যান্য সুবিধার মাঝে রয়েছে: স্থাপনার মূলভিত্তির উপর পার্শ্বীয় চাপ কমিয়ে এনে ধনুকাকৃতির ছাদের খিলানের মাথায় মুকুট হিসেবে অন্যান্য অবকাঠামো বসানো সম্ভব করা এবং এটা যেকোন দালানের সর্বনিম্ন তলের নকশার উপযোগী ছিল।

অনেকে হয়তো বলতে পারেন যে, রোমান ধনুকাকৃতির ছাদের সমস্যা সমাধান করতে গিয়ে ইউরোপীয়দের হাতেই গথিক স্থাপত্যশিল্পের মূলভিত্তি সূচ্যগ্র খিলানের উদ্ভাবন ঘটেছিল। কিন্তু বাস্তবতা হলো সূচ্যগ্র খিলান আমালফির বণিকদের মাধ্যমে কায়রো থেকে সিসিলি হয়ে ইউরোপে আসে। ১০০০ খ্রিস্টাব্দের দিকে এই বণিকরা ব্যবসার উদ্দেশ্যে মিশরে গেলে সেখানেই তারা সুদৃশ্য ইবনে তুলুন মসজিদে সূচ্যগ্র খিলানের শক্তির গরিমা প্রত্যক্ষ করেছিল। ইউরোপে এটার প্রথম ব্যবহার ১০৭১ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত মন্টে ক্যাসিনো আশ্রমের বারান্দাতে দেখা যায়, যে আশ্রম নির্মাণে আমালফির বণিকরা উদারহস্তে দান করেছিল।

১১শ শতাব্দির শেষার্ধে মন্টে ক্যাসিনো পরিণত হয় তিউনিসীয় খ্রিস্টান পণ্ডিত কন্সট্যান্টিন দ্য আফ্রিকানের অবসরকালীন নিবাসে। কন্সট্যান্টিন দ্য আফ্রিকান নামের এই খ্রিস্টান পণ্ডিত সম্পর্কে বিদ্যালয় বিভাগের জ্ঞানের অনুবাদ অধ্যায়ে আপনারা ইতোমধ্যেই অনেকটা জেনেছেন। চিকিৎসক, অনুবাদক এবং গণিত, বিজ্ঞান ও ধর্মতত্ত্বের বিশিষ্ট এই পণ্ডিত উত্তর আফ্রিকার ফাতিমীয় মুসলিমদের থেকে মুসলিম স্থাপত্য কৌশল সম্পর্কে ব্যাপক অভিজ্ঞতা হাসিল করেছিলেন। মন্টে ক্যাসিনো নির্মাণে কন্সট্যান্টিন তার অভিজ্ঞতা থেকে যে মূল্যবান দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন, এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই।

দক্ষিণ ফ্রান্সের ক্লানি আশ্রমের অধ্যক্ষ সেন্ট হগ ১০৮৩ খ্রিস্টাব্দে মন্টে ক্যাসিনো ভ্রমণে আসলে তিনি তার সাথে করে সূচ্যগ্র খিলানের ধারণাটি উত্তরে নিয়ে আসেন। পাঁচ বছর পরে ক্লানির তৃতীয় গির্জার নির্মাণ কাজ শুরু হয়, যার করিডোরে সর্বমোট ১৫০-টি সূচ্যগ্র খিলান বসানো হয়। ১৮১০ খ্রিস্টাব্দে এই গির্জা ধ্বংস হলেও এই খিলানের অগ্রযাত্রা থেমে থাকেনি, কেননা এই ভ্রমণ পরম্পরার পরবর্তী ব্যক্তি ছিলেন অ্যাবোট সুগার, যিনি ১১৩৫ থেকে ১১৪৪ খ্রিস্টাব্দের মাঝে ক্লানি এসেছিলেন। তিনি ও তার স্থপতিগণ নির্মাণ করেছিলেন প্রথম গথিক স্থাপনা সেন্ট ডেনিস গির্জা।

ক্লানি ও মন্টে ক্যাসিনোর মতো ইউরোপের প্রভাবশালী দুটো গির্জাতে সূচ্যগ্র খিলানসহ অন্যান্য মুসলিম স্থাপত্যশৈলীর এমন ব্যবহার বাদবাকি খ্রিস্টান ইউরোপকে এসব মুসলিম স্থাপত্য কৌশল অবলম্বনে দারুণভাবে উদ্বুদ্ধ করেছিল। নতুন ফ্যাশনের মতো অত্যন্ত দ্রুত গতিতে এটা ফ্রান্স বিশেষভাবে ফ্রান্সের দক্ষিণে, এরপর ১২শ শতাব্দির মাঝামাঝিতে জার্মানি এবং শেষমেশ বাদবাকি ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। ব্রিটেনের প্রায় সবগুলো ধর্মীয় স্থাপনাতে এই খিলানের ব্যবহার প্রত্যক্ষ করার মতো।

১২শ শতাব্দিতে প্রতিষ্ঠিত যুক্তরাজ্যের বোল্টন আশ্রমের স্থাপনাগুলোতে সূচ্যগ্র খিলানের ব্যবহার দেখা যাচ্ছে। ইউরোপে সূচ্যগ্র খিলানের এই প্রচলনের আদি উৎস খুব সম্ভবত ৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে কায়রোতে প্রতিষ্ঠিত ইবনে তুলুন মসজিদ।

বায়ে: দিল্লীর বাহিরে অবস্থিত ১৬শ শতাব্দিতে নির্মিত হুমায়নের সমাধিসৌধে চারমুখী সূচ্যগ্র খিলানের একটি ইন্দো-ইসলামী সংস্করণ দেখা যাবে। মাঝে: কর্ডোবা জামে মসজিদের অভ্যন্তরে বা-দিকে একটির উপর আরেকটি স্থাপিত খিলান এবং ডানদিকে একাধিক পাতের খিলান দেখা যাচ্ছে। অষ্টম ও দশম শতাব্দি পরম্পরায় এগুলো নির্মিত হয়। ডানে: ইউরোপে গথিক খিলান নামে পরিচিত একটি সাধারণ ওউগি খিলান।

■ একাধিক বা বহু-পাতের (*Multi-foil*) খিলান

ইরাকের সামার্‌রা শহরে একাধিক পাতবিশিষ্ট খিলানের প্রথম নকশা করা হয় এবং সেখান থেকেই এই খিলানের ধারণা স্পেন, সিসিলিসহ গোটা মুসলিম বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে, অতঃপর তা ইউরোপে পৌঁছায়। ৮৪৮ এবং ৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে সামার্‌রাতে প্রতিষ্ঠিত আল-মুতাওয়াক্কিল মসজিদের জানালাতে সর্বপ্রথম এটার ব্যবহার দেখা যায়। এই জানালাগুলো দেয়ালে অবস্থিত এবং পঞ্চমুখী পত্রসদৃশ খিলানের সাহায্যে প্রসারিত।

একাধিক পাতের খিলান উত্তর আফ্রিকা ও আন্দালুসে পৌঁছে সেখানে বেশ জনপ্রিয় হয় এবং সুবিখ্যাত কর্ডোবা মসজিদসহ অধিকাংশ মুর স্থাপনাতে এই খিলান ব্যবহৃত হতে থাকে। ১০ম শতাব্দি থেকে ইউরোপীয়রা এটার প্রেমে পড়ে এবং এটাকে তাদের স্থাপনা, ভবন পরিকল্পনা ও শিল্পে অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। তিনপাতা বা ত্রিপত্র অবয়বে ইউরোপে এটার ব্যবহার বেশ জনপ্রিয় হয়, যেহেতু এটার সাথে খ্রিস্টানদের ত্রিনিটির সাদৃশ্য রয়েছে। কর্ডোবা মসজিদে যেসব খিলান দেখা যায়, প্রকৃতপক্ষে সেগুলো ইউরোপীয় খিলানের আদি অনুপ্রেরণা।

■ ওউগি (*Ogee*) খিলান

অর্ধবৃত্তাকার খিলানের পর অন্যতম জনপ্রিয় আরেকটি খিলান: ওউগি খিলান, যা ইউরোপে গথিক খিলান নামে পরিচিত। অভিজাত খিলানটি সূচ্যগ্র খিলানেরই একটি শৈল্পিক বিকাশ। খিলানের বক্রতা পরস্পর মুখোমুখি দুটো 'S' অবয়ব থেকে উদ্ভূত এবং শোভাবর্ধনের কাজে এ খিলানের বেশি ব্যবহার ছিল, মাঝে মাঝে এ খিলানের চূড়াতে পাথরের গিঁট লাগানো হতো। খিলানের এই নতুন নকশার বিকাশ মুসলিম ভারতে এবং পরবর্তীতে তা ১৪শ শতাব্দির দিকে ইউরোপে প্রবেশ করে। গথিক যুগের শেষদিকে ভেনিস, ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের ১৬শ শতাব্দির স্থাপত্যশিল্পে এটা বেশ জনপ্রিয় ছিল।

আপনি ইংল্যান্ডের সর্বত্র এই খিলানের দেখা পাবেন, যেহেতু প্রায় সবগুলো গির্জা ও ক্যাথিড্রালে পূর্ণাঙ্গ ওউগি খিলানের ব্যবহার হয়েছে কিংবা ওউগি ছাঁচে নির্মিত খিলান ব্যবহৃত হয়েছে। শোভাবর্ধক অন্তরাল, প্রবেশিকা এবং পরবর্তী গথিক শৈলীতে খিলানটি ব্যবহৃত হতো।

০৪ ধনুকাকৃতি ছাদ

ধনুকাকৃতি ছাদ আসলে এক ধরনের পাথুরে খিলান, যা ইট, পাথর, চুন-সুরকির মিশ্রণ ও পাথরের ধ্বংসাবশেষ দিয়ে বানানো বিশালাকার স্থাপনাতে সিলিং-এর কাজ করে। উনবিংশ শতাব্দিতে ধাতব চূর্ণন যন্ত্র এবং ভারবাহী কাঠামো প্রচলনের আগ পর্যন্ত দীর্ঘ কাঠের ভেলা বা পাথুরে চৌকাঠ ছিল পাথুরে ধনুকাকৃতি ছাদের একমাত্র বিকল্প। ব্যবহারের জন্য এগুলো বেশ সাধারণ হলেও তেমন পরিশীলিত ছিল না। বেশ ব্যয়বহুল এবং এগুলোর ব্যবহারে ভবনের পরিধি কাঠের দৈর্ঘ্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।

খিলানের মতো রোমানরা ধনুকাকৃতির ছাদও ব্যবহার করতো, কিন্তু এগুলোকে আরও বড় ও উঁচু স্থাপনায় ব্যবহার উপযোগী করার কাজটি মুসলিমদের হাত দিয়েই ঘটে। তারা এগুলোকে মজবুত করার পাশাপাশি পাতলা দেয়াল আস্তরণের সাহায্যে বেশ হালকা বানিয়ে ফেলে, যেন আরও বেশি আলো ভিতরে প্রবেশ করে। ১১শ শতাব্দি পর্যন্ত অধিকাংশ ইউরোপ পুরু রোমান ধনুকাকৃতি ছাদ ব্যবহার করতো – যেগুলো বহনের জন্য বেশ শক্ত (২ মিটার বা ৬.৬ ফুট পুরু) এবং ছোট দেয়ালের প্রয়োজন হতো। কিন্তু ইউরোপীয়রা যখনই কর্ডোবায় মুসলিম রীতির ধনুকাকৃতির ছাদের ব্যবহার প্রত্যক্ষ করে, তখনই তারা এই নকশা ও কৌশলের অনুকরণ শুরু করে। এসব স্থাপত্য রীতির কতগুলো তো ইউরোপে (১০ম থেকে ১২শ শতাব্দির) রোমান স্থাপত্যশৈলীর নমুনাতে পরিণত হয় এবং ইংল্যান্ডের ডুরহামের মতো ক্যাথিড্রালগুলোতে প্রথমবারের মতো দৃশ্যমান হতে থাকে।

■ **পাঁজরাকৃতি ছাদ**

মেসকুইটা নামে পরিচিত কর্ডোবার বিখ্যাত মসজিদই ছিল ইউরোপের বেশিরভাগ স্থাপত্যকলার আঁতুড়ঘর। এটা ছিল বহু রঙে রঙিন, নাল আকৃতি ও পরস্পরছেদী খিলান, পাঁজরাকৃতি ছাদ এবং গম্বুজের সমন্বয়ে গড়ে উঠা বিশাল হলঘর। এখানে উল্লিখিত সবগুলো স্থাপত্য কৌশলই উত্তর তথা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে এবং এটা উল্লেখ করার মতো যে, ওই সময়ে যেসব গির্জা কর্ডোবা মসজিদের পূর্বে নির্মিত ছিল (যেমন: পশ্চিম স্পেনের লিওন এলাকার গির্জাসমূহ), সেগুলোতে পাঁজরাকৃতি কোনো ছাদ ছিল না।

পাঁজরাকৃতি ছাদ মূলত পাথরের সিলিং বা শামিয়ানা। অতিরিক্ত ভার বহনের জন্য ছাদের নিচে সংযুক্ত একক অর্ধবৃত্তাকার খিলানের সাহায্যে এসব পাথুরে সিলিংকে আরও মজবুত করা হতো। সংযুক্ত এসব খিলান দেখতে পাঁজরের মতো এবং এগুলো চূড়ার ভার বইতো। অর্থাৎ ধনুকাকৃতির ছাদের প্রযুক্ত চাপের একটি বড় অংশ এসব পাঁজরের উপর আপতিত হতো, এতে করে দেয়ালগুলো অনেকটাই ভারমুক্ত হয়ে পড়ে। এর ফলে নির্মাতারা এগুলোকে আরও পাতলা ও উঁচু করতে সমর্থ হতো।

পাঁজরাকৃতি সুড়ঙ্গ ছাদ, ১২শ শতাব্দির সেন্ট মেরি মেডেলিন গির্জা।

রোমানদের ব্যবহৃত পুরাতন পাথরকুচি বা প্রকাণ্ড পাথর টুকরো ব্যবহারের পরিবর্তে মুসলিম স্থপতিরা পাঁজরাকৃতি ছাদগুলোর মাঝে ছোট ছোট পাথর বা ইটের ব্যবহারের প্রচলন ঘটায় এবং নির্মাণ কাজের শুরুতে ভবনের দেয়াল যেভাবে বিন্যাস করা হয়, সেভাবে তারা সেগুলো বিন্যস্ত করতো।

পাঁজরাকৃতি ছাদের প্রথম ব্যবহারের নমুনা ইরাকে অবস্থিত ৮ম শতাব্দির আব্বাসী প্রাসাদ উখাইদারে পাওয়া যায়। স্থাপত্যশৈলীতে সমৃদ্ধ এ মরুপ্রাসাদে ছিল আটটি আড়াআড়ি স্থাপিত খিলান ও পাঁজরাকৃতি ছাদ। পাঁজরাকৃতি ছাদের এমন কাঠামো ৮২১-৮২২ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত তিউনিসের সুসা প্রাসাদের সুড়ঙ্গ-সদৃশ ছাদেও দেখা যায়। বস্তুত এসব নির্মাণশৈলী ১১শ শতাব্দির শেষার্ধে নির্মিত টর্নাসের সেন্ট ফিলিবার্ট গির্জা, ভ্যাজেলের সেন্ট মেরি মেডলিন আশ্রম (১১০৪-১১৩২) এবং ফোন্টেনয় আশ্রম (১১৩৯-১১৪৭)-এর মধ্যবর্তী অংশে থাকা মুখোমুখি ছাদগুলোকে দারুণভাবে প্রভাবিত করেছে। ধনুকাকৃতি ছাদ বানানোর এমন নির্মাণ ভাবনা ইউরোপে প্রবেশ করে করে এটা প্রমাণ করে যে, উত্তর আফ্রিকা বিশেষত তিউনিসের সুসা শহরের সাথে এই শহরগুলোর অধিবাসীদের বেশ ভালো যোগাযোগ ছিল।

ফিলিস্তিনের রামলার জলাধার সূচ্যগ্র খিলানে তৈরি, যা পাথরের তৈরি ক্রুশাকৃতির ভারবাহী স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়ে আছে এবং জলাধারটিকে ঢেকে রেখেছে দেয়ালের উপর ভর দেয়া ছয়টি পিপাকৃতি ছাদ। ঠিক এ ধরনের ছাদ তিউনিসের সুসা শহরের প্রধান দুটো মসজিদঃ বনী ফাতাতা (৮৩৪-৮৪১) এবং জামে মসজিদ (৮৫০-৮৫১)-এ বসানো হয়েছিল। নির্মাণ কৌশলের এই ধারণা ফ্রান্সের ওভেয়ানিয়া প্রভিন্সের পুয়ে দে-ডোমে অবস্থিত ১২শ শতাব্দিতে নির্মিত নটরডেম ডি-অরকিবাল ক্যাথিড্রালে দৃশ্যমান।

■ গথিক পাঁজরাকৃতি ছাদ

আপনি ইতোমধ্যে জেনে গেছেন যে, খ্রিস্টান ক্যাথিড্রাল ও গির্জাগুলোতে পাঁজরাকৃতির ছাদের ব্যবহারেরও ১৫০ বছর আগেই মুসলিমদের নিকট বিষয়টি পরিচিত ছিল। ইউরোপে গথিক পাঁজরাকৃতি ছাদ নামে পরিচিত দ্বিতীয় ধরনের এই ছাদ বেশ জটিল প্রকৃতির এবং এটার ব্যবহার সর্বপ্রথম টলেডো ও কর্ডোবার জামে মসজিদে দেখা যায়।

কর্ডোবা মসজিদের পাঁজরাকৃতি ছাদ ইউরোপীয় স্থাপত্যবিদ ও তাদের পৃষ্ঠপোষকদের রোমান ও গথিক স্থাপত্য রীতিতে সে ধরনের নির্মাণ কৌশল অবলম্বন করতে উদ্বুদ্ধ করে। বস্তুত, পাঁজরাকৃতি ছাদ এবং *flying buttresses* বা থাম থেকে দেয়াল পর্যন্ত প্রলম্বিত ঠেকনার ইতিহাস আসলে গথিক স্থাপত্যশিল্পেরই ইতিহাস। টলেডোর বাব মারদূর মসজিদের রয়েছে পাঁজরাকৃতি ছাদের এক অনন্য গঠনশৈলী, যা চারকোণা ছাদ (*quadripartite vault*) হিসেবে পরিচিতি পায় - এটার সহায়ক স্তম্ভগুলো তির্যক ও পরস্পরছেদী খিলানের আদলে নির্মিত ছিল। এই চারকোণা ছাদ-কেই গথিক নির্মাণশৈলীর উৎস হিসেবে মেনে নেয়া হয়েছে।

কর্ডোবার জামে মসজিদের মাকসূরা গম্বুজে পাঁজরাকৃতি ছাদ ১০ম শতাব্দিতে সংযুক্ত করা হয়েছিল।

মুসলিম স্থপতি মূসা ইবনে আলী এবং সা'দা ৯৯৮ থেকে ১০০০ খ্রিস্টাব্দকালে টলেডো মসজিদ নির্মাণ সম্পন্ন করেছিলেন। নয়টি ছোট কামরার বর্গাকৃতির এই মসজিদ নয়টি পাঁজরাকৃতি গম্বুজ দিয়ে আবৃত ছিল। প্রতিটি গম্বুজ ছিল ছোট আকারের ছাদ এবং পরস্পরছেদী খিলান ছিল এগুলোর অবলম্বন। দেখতে এগুলো ঠিক পাঁজরের মতো, যেন তা একে-অপরের সাথে অত্যন্ত চমৎকারভাবে বিন্যস্ত হয়ে আছে।

ফরাসী শিল্পকলার প্রখ্যাত ইতিহাসবেত্তা ইলে ল্যামবার্ট বলেন, "১০ম শতাব্দির শেষভাগেই আরব স্থপতিরা ... পাঁজরাকৃতি ছাদের নির্মাণ কৌশলসহ পরস্পরছেদী খিলান ব্যবস্থা সম্পর্কে ভালোভাবেই অবগত ছিল এবং তারা তাদের ছাদে সেগুলোর প্রয়োগ পর্যন্ত করেছিল। এই নির্মাণ কৌশল পরবর্তীতে ফ্রান্সে চারকোণা ছাদ হিসেবে বেশ পরিচিতি পায়।"

ছাদের এমন নির্মাণ কৌশল ৯৮০ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত আরেকটি মসজিদে দেখা যায়, যা পরবর্তীতে লাস টার্নারেস নামক গৃহে রূপান্তরিত হয়। বিভিন্ন গঠনের ছাদের সমন্বয়ে এটাতে নয়টি পাঁজরাকৃতি গম্বুজ ছিল এবং এর পাশাপাশি ছিল বহু রঙে রঙিন ত্রিপত্রী এবং নাল আকৃতির খিলান, যা এই গৃহকে করেছিল বেশ দৃষ্টিনন্দন।

> "১০ম শতাব্দির শেষভাগেই আরব স্থপতিরা ... পাঁজরাকৃতি ছাদের নির্মাণ কৌশলসহ পরস্পরছেদী খিলান ব্যবস্থা সম্পর্কে ভালোভাবেই অবগত ছিল এবং তারা তাদের ছাদে সেগুলোর প্রয়োগ পর্যন্ত করেছিল ... পরবর্তীতে তা ফ্রান্সে চারকোণা ছাদ হিসেবে বেশ পরিচিতি পায়।"
>
> – ইলে ল্যামবার্ট, ফরাসী শিল্পকলার ইতিহাসবেত্তা

অনুরূপ পাঁজরাকৃতি গম্বুজের ব্যবহার বিপুল সংখ্যক স্পেনীয় ভবনে দেখা যাবে, বিশেষত যেগুলো মোজারাবদের

বায়ে এবং ডানেঃ গির্জা ও আশ্রমের এসব ছাদ গথিক পাঁজরাকৃতি ছাদের কিছু নমুনা।
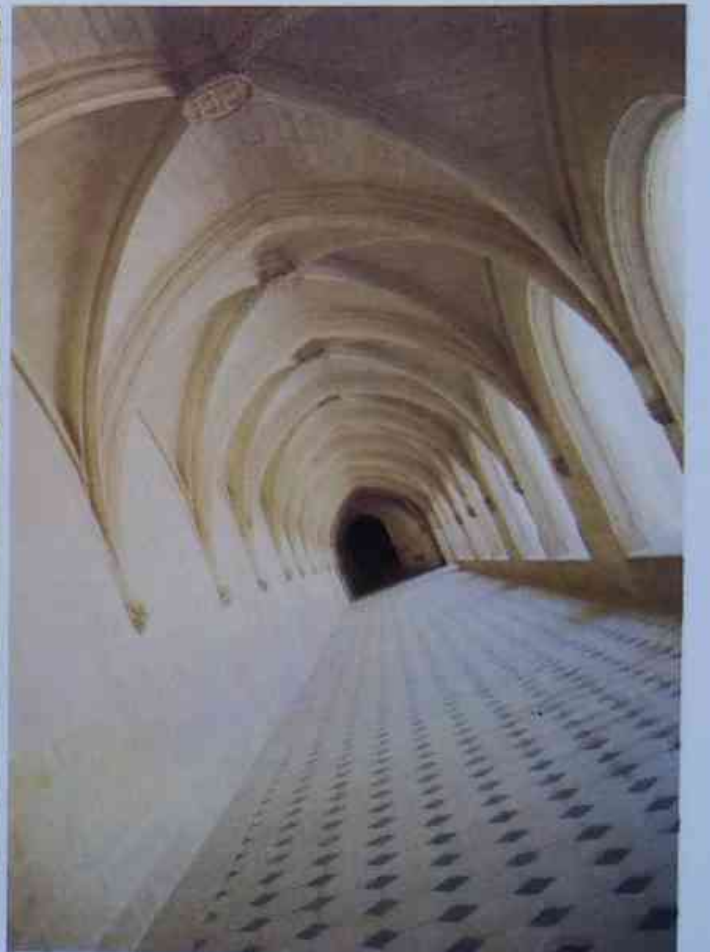
বায়েঃ স্পেনের গ্রানাডার আল-হামরা প্রাসাদে মৌচাকসদৃশ ছাদ বা মুকারনাসের দেখা মিলবে।
ডানেঃ ইরানের ইস্পাহানের লুতফুল্লাহ মসজিদের প্রবেশপথে মুকারনাস ছাদ।

দ্বারা নির্মিত ছিল। সান্তিয়াগো ডি কম্পাসটিলা গির্জা অভিমুখী তীর্থযাত্রা পথে এ ধরনের নির্মাণশৈলী দেখা যাবে, যেখানে পাঁজরাকৃতি ছাদগুলো সজ্জিত করেছে কাস্তালের আলমাঝান চার্চ, নাভারের টরেস ডেল রিও ভবন, পিরিনীয় এলাকার সেন্ট ক্রয়িক্স ডিঅলর্ন গির্জা এবং সেন্ট ব্লেজের হাসপাতালের গম্বুজকে। সেগোভিয়ার টেম্পলার গির্জা এবং সালমানকার ১২শ শতাব্দির সম্মেলন ভবনেও পাঁজরাকৃতি এসব ছাদের দেখা মিলবে।

তৃতীয় আবদুর রহমানের সময়ে মোজারাব ও মুসলিমদের মধ্যস্থ সুসম্পর্ক এবং সেইসাথে সংস্কৃতি ও শিল্পকলার দিক থেকে তার আমলে এই এলাকা যে ধরনের সমৃদ্ধির মুখ দেখেছিল, সেটার বদৌলতে পাঁজরাকৃতি ছাদের নির্মাণ কৌশল ইউরোপের দিকে যাত্রা অব্যাহত রেখেছিল। শান্তি ও সহাবস্থানের এই সময়ে শিল্প বিকশিত হয়েছিল সতেজভাবে। অন্যদিকে খ্রিস্টানদের হাতে বাব মারদুমসহ টলেডোর মসজিদগুলোর পতন ঘটলেও এগুলো উজাড় করে দিয়েছিল ইউরোপীয় শিল্পী ও স্থপতিদের নির্মাণ শিল্পের গুরুত্বপূর্ণ সব পাঠ। টলেডো ফ্রান্সের অতি নিকটবর্তী হওয়ায় স্পেনের খ্রিস্টানদের দ্বারা এর পতনে ফরাসীরা বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছিল।

■ মুকারনাস

সবশেষে আমরা মৌচাকসদৃশ ছাদ বা *মুকারনাস* নিয়ে আলোচনা করবো। জ্যামিতিক কাঠামোর এসব ত্রিমাত্রিক কাঠামো খোদাই করে বসানো হতো ছাদ, গম্বুজ, কোটর, খিলান এবং দেয়ালের কোণাগুলোতে। ১০ম শতাব্দির পারস্যে উদ্ভূত এই স্থাপত্য ধারণা ১০৩৮ থেকে ১৩২৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত পারস্য, আনাতোলিয়া এবং তুরস্ক শাসন করা সেলজুক তুর্কিদের দ্বারা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। ১১শ শতাব্দির শেষভাগে গোটা মুসলিম বিশ্বে মুকারনাস পরিণত হয় সাধারণ এক স্থাপত্য বৈশিষ্ট্যে।

মুকারনাস স্থাপত্যশিল্পের সর্বোত্তম নমুনা আমরা ৭০০ বছর পূর্বে নির্মিত গ্রানাডার আল-হামরা প্রাসাদের মৌচাকসদৃশ ছাদে দেখতে পাবো। *Abencerrajes* বা ইবনে সিরাজ গোষ্ঠীর নির্মিত আল-হামরা প্রাসাদের হল ঘরে থাকা মৌচাকসদৃশ ছাদটি সাজানো হয়েছে আটটি সূচাগ্র তারকা দিয়ে। এই তারকাগুলো বিষমকোণী চতুর্ভুজ আকৃতির ছোট ছোট পরস্পর-সংবদ্ধ অনেকগুলো *squinch* (স্কুইঞ্চ – গম্বুজ ধারক) দিয়ে গঠিত এবং এগুলো দেখতে ঠিক মৌচাকের ন্যায়। বস্তুত এটা মধুর প্রতীকী চিত্রায়ন, যা ঈমানদারগণ জান্নাতে লাভ করবে বলে কুরআনে প্রতিশ্রুতি দেয়া আছে। প্রতিটি তারকার পাশে দুটো করে মোট ১৬-টি জানালা থাকায় প্রাসাদের হলঘর আলোয় আলোকিত থাকতো। এমন নির্মাণশৈলী আল-হামরায় এনে দিয়েছে প্রতিশ্রুত জান্নাত এবং অসীমের এক প্রতিমূর্ত ছায়া।

০৫ গম্বুজ

গম্বুজ কার্যত ত্রিমাত্রিক খিলান এবং ইসলামী স্থাপত্যশিল্পে এটা দুটো প্রতীকী তাৎপর্য বহন করে: আসমানী গম্বুজ এবং মুমিনদের আধ্যাত্মিক ও দৈহিক সত্তাকে বেষ্টনকারী খোদায়ী সার্বভৌমত্বের বহিঃপ্রকাশ। মসজিদের মিহরাবের ন্যায় ভবনের বিশেষ অংশগুলোতে চাপ প্রয়োগের পাশাপাশি অভ্যন্তরে আলোর ব্যবস্থা করা ছিল গম্বুজের প্রয়োগিক কিছু দিক।

বাঁকানো অবয়ব থেকে বর্গাকার কাঠামো নির্মাণ সমস্যা নিরসনকল্পে বিকাশ ঘটেছিল গম্বুজের। বাইযান্টিন, রোমান এবং পারসীয়রা মুসলিমদের উল্লেখযোগ্য সময় পূর্বে *pendentive* (*প্যানডেনটিভ* – বাঁকানো ত্রিভুজ-সদৃশ্য ছাদ) ব্যবহার করে এই সমস্যা অনেকটা সামলে নিয়েছিল। *প্যানডেনটিভ* হচ্ছে: গম্বুজ স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় বৃত্তাকর বা উপবৃত্তাকর ভিত্তি সৃষ্টির জন্য ত্রিভুজের ন্যায় বৃত্তাকার কাঠামো। এই *প্যানডেনটিভ*গুলো গম্বুজের ভারকে চারটি কোণাতে ছড়িয়ে দেয়, আর এটার নিচে থাকা ভারবাহী স্তম্ভসমূহ কোণাগুলোর ভার বহন করে।

কিছুকালের জন্য *প্যানডেনটিভ* ব্যবহার করলেও পরবর্তীতে মুসলিমরা *squinch* (স্কুইঞ্চ – গম্বুজ ধারক)-এর সমৃদ্ধি ঘটায়, যেটা ছোট আকারের কোটরের সাহায্যে খিলানগুলোকে একেবারে কেন্দ্রে সরিয়ে দিতো। এসবের চূড়ান্ত বিকাশ আমরা মৌচাকসদৃশ ছাদ বা *মুকারনাস* নামে পরিচিত নির্মাণশৈলীতে দেখি, যা গম্বুজের অভ্যন্তরকে সজ্জিত করে।

■ **অর্ধবৃত্তাকার গম্বুজ**

গম্বুজ কাঠামোর মাঝে অর্ধবৃত্তাকার গম্বুজই সর্বাধিক প্রাচীন ও বহুল প্রচলিত। প্রাথমিক দিকের মসজিদ গম্বুজগুলো ছোট ছিল এবং সেগুলো মিহরাবের সংযোগস্থলের উপর নির্মাণ করা হতো, যেমনটি দেখা যায়: কায়রাওয়ানের মসজিদসমূহে (৬৭০-৬৭৫), দামেস্কের উমাইয়া মসজিদে (৭০৫-৭০৭) এবং কর্ডোবা মসজিদে (৭৫৬-৭৯৬)। শতাব্দি ব্যবধানে গম্বুজ আকার ও সংখ্যায় বৃদ্ধি পায় এবং পরবর্তীতে ভবনের একেবারে মাঝে, আবার কখনো ভবনের সম্পূর্ণ ছাদ ঢাকতে গম্বুজের ব্যবহার হতো। অটোমানদের আমলে গম্বুজের আকার পুরো মসজিদ ঢেকে দেয়ার উপযোগী হতে শুরু করে এবং ওই গম্বুজের চারিপাশে থাকতো অনেকগুলো ছোট ছোট গম্বুজ – যেমন: সুলেমানিয়া মসজিদের গম্বুজ।

"এসব স্থাপত্যশিল্পের মাধ্যমে
আরবদের পদার্থবিদ্যা ও
দর্শনশাস্ত্র ইউরোপে নিজে
থেকেই ছড়িয়ে পড়ে।"

– ক্রিস্টোফার র‍্যান (১৬৩২-১৭২৩), ব্রিটিশ স্থাপতি

*উপরে: লন্ডনের সেন্ট পল'স ক্যাথিড্রালে দ্বৈত গম্বুজ ও মিনারের ইসলামী স্থাপত্য কৌশলের প্রয়োগ দেখা যাচ্ছে, যা স্যার ক্রিস্টোফার র‍্যানের কল্যাণে ঘটেছে। নিচে: তুরস্ক, ইস্তাম্বুলের সুলতান আহমাদ মসজিদ **Blue Mosque**- (নীল মসজিদ)-এর অর্ধবৃত্তাকার গম্বুজ।*

ঐতিহ্যগতভাবে, চুন-সুরকির গাঁথুনি, ছোট পাথর, ধ্বংসাবশেষের মিশ্রণ দিয়ে গম্বুজ বানানো হতো, কিন্তু এতে অনেক কাঠের দরকার ছিল এবং চুন-সুরকির গাঁথুনি শুকানোর জন্যও অপেক্ষা করতে হতো। নির্মাণ কাজ সহজ করতে কাঠের ঠেসের পরিবর্তে ইটের কাঠামো এবং অর্ধবৃত্তাকার চারটি স্কুইঞ্চ দিয়ে গম্বুজের জন্য বৃত্তাকার ভিত্তি প্রস্তুত করা হতো।

মুসলিমগণ বাঁকানো ধারক ব্যবহার করতো, যা তাদেরকে পাঁজরাকৃতি ছাদের প্রক্রিয়া মোতাবেক গম্বুজ বানাতে সক্ষম করে তুলেছিল।

রাশিয়ার সেন্ট পিটার্সবার্গের বহির্ভাগে অবস্থিত সারস্কো সেলোর ইমপেরিয়াল প্রাসাদ (নির্মাণকাল ১৭১৭ খ্রিস্টাব্দ)।

■ কন্দাকার গম্বুজ

কন্দাকার গম্বুজ বা পেয়াজ-সদৃশ গম্বুজ বিশেষভাবে মুঘলদের পছন্দের তালিকায় শীর্ষে ছিল এবং তাদের থেকেই এটা পারস্য, ভারতীয় উপমহাদেশ এবং দক্ষিণ এশিয়াতে ছড়ায়। রাশিয়ার মস্কোতে সমধিক প্রসিদ্ধ এই কন্দাকার গম্বুজ ইউরোপের ভেনিসে প্রথম আসে এবং সেখানের সেন্ট মার্কস ক্যাথিড্রালের গম্বুজের লন্ঠন সজ্জিত করার জন্য ব্যবহৃত হয়। মুসলিম বিশ্বে বিশেষ করে ১৪শ শতাব্দির এশিয়া ও পারস্যে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হওয়ার পর এই গম্বুজ ইউরোপে নতুন স্থাপত্য ফ্যাশন হিসেবে ওউগি খিলান বা গথিক খিলানের সাথে সঙ্গতি লাভ করে। কন্দাকার ছোট গম্বুজগুলো এ জাতীয় খিলানের সাথে বেশ নান্দনিকভাবে খাপ খায়।

কন্দাকার গম্বুজ ক্রমান্বয়ে পূর্ব ইউরোপে প্রচলিত হতে শুরু করে এবং পাথরের কাঠামোর পূর্বে কাঠের কাঠামোতে এগুলোর প্রথম ব্যবহার দেখা যায়। খুব সম্ভবত, এই গম্বুজের ধারণার উৎস জেরুজালেমের ডোম অব রক (*কুব্বাত আস-সাখরা*) এবং সেইসাথে সিরিয়া, যেখানে উমাইয়াদের মোজাইক শিল্পকর্মের চিত্রগুলোতে এসব গম্বুজের প্রাথমিক বিকাশ স্পষ্টত দৃশ্যমান।

■ দ্বৈত গম্বুজ ও মিনার

দ্বৈত গম্বুজ ও মিনার এক প্রকার নান্দনিক আকর্ষণ বিচ্ছুরণ করে এবং স্যার ক্রিস্টোফার র‍্যানসহ বহু পশ্চিমা স্থপতি এই নির্মাণ কৌশল অনুকরণ শুরু করেন। তার অনন্য কীর্তি লন্ডনের সেন্ট পল'স ক্যাথিড্রালের গম্বুজ, করিডোর এবং সেইসাথে দুটো মিনারের মাঝে বৃত্তাকার গম্বুজের সমন্বিত ব্যবহার এবং এটা যে মুসলিম স্থাপত্য রীতি, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। স্যার ক্রিস্টোফার র‍্যান অটোমান ও মুরদের মসজিদগুলোর স্থাপত্য কৌশল গবেষণা করেন এবং *সারাসিন* থিওরি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তিনি এ ব্যাপারে তিনি নিশ্চিত হন যে, গথিক স্থাপত্যশৈলীর উৎস মুসলিম স্থাপত্য।

র‍্যান ব্যাখ্যা করেন, "বর্তমানে আমরা যেটাকে গথিক স্থাপত্য রীতি বলি – *যদিও জার্মান গথরা যতটা না নির্মাতা ছিল, তার চেয়ে বেশি ছিল বিধ্বংসী* – প্রকৃতপক্ষে, এটাকে সারাসিন রীতি বলা উচিত ... এই স্থাপত্য রীতি স্পেনের মাধ্যমে ইউরোপে প্রবেশ করে; সেখানে যতদিন আরবদের আধিপত্য পুরোদমে কার্যকর ছিল, ততদিন তাদের মাঝে সর্বদা জাগ্রত ছিল শিখার অদম্য আগ্রহ ... এসব স্থাপত্যশিল্পের মাধ্যমে আরবদের পদার্থবিদ্যা ও দর্শনশাস্ত্র ইউরোপে নিজে থেকেই ছড়িয়ে পড়ে এবং এসব স্থাপত্য রীতির অনুকরণে *সারাসিন* আদলে নির্মিত হয় বহু গির্জা।"

সুলেমানিয়া মসজিদ

অনমনীয় গম্বুজ

নয়া স্থাপত্য কৌশল, যা আসমানকে দিয়েছে মাহাত্মের ছোঁয়া

উল্লেখযোগ্য পরম্পরা: মুসলিম স্থাপত্য প্রভাব দুনিয়াব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে

অবস্থান: ইস্তাম্বুল, তুরস্ক

তারিখ: ১৫শ শতাব্দি

প্রধান ব্যক্তিত্ব: সিনান, স্থপতি

জেরুজালেমের ডোম অব রক (*কুব্বাত আস-সাখরা*) এবং হলি সেপুলচার (*Holy Sepulchre*) গির্জা থেকে রোমের সেন্ট পিটার'স বেসিলিকা, ইস্তাম্বুলের হাগিয়া সোফিয়া এবং আগ্রার তাজমহলের ন্যায় বিশ্বের আশ্চর্যতুল্য স্থাপনাগুলোর ছাদ গম্বুজ দিয়ে আচ্ছাদিত। বাইযান্টিন ও পারস্যরা প্রথম বিশালাকার গম্বুজ নির্মাণ করলেও মুসলিম স্থাপতিরা নিজেদের স্থাপত্য কর্মে এগুলো অবলম্বনের পাশাপাশি বিদ্যমান রীতিতে ব্যাপক সমৃদ্ধি নিয়ে আসে এবং এতে এগুলো আরও জনপ্রিয় ও বৈচিত্রময় হয়ে উঠে।

গম্বুজ বহু মুসলিম ভবন নির্মাণ শিল্পীদের বিমোহিত করেছিল, তাদের নিকট এটা ছিল আসমানী ছাদ এবং স্রষ্টার অদম্য ক্ষমতায় প্রতীকী চিত্রায়ন। গম্বুজ মসজিদ ভবনের গুরুত্বপূর্ণ কামরা নির্দেশ করতো, যেমন: কিবলার দিকে মুখ করা মিহরাব অংশ। গির্জা, প্রাসাদ, সরকারি ভবনসহ মসজিদসমূহে স্থানীয় কালচারের প্রতিনিধিত্বশীল বিভিন্ন আকারের গম্বুজ শোভা পেত।

১৪৮৯ খ্রিস্টাব্দে জন্ম নেয়া সিনান পিতার কাছ থেকে প্রশিক্ষণ লাভ করে পাথর দিয়ে ভবন নির্মাণে বেশ পারদর্শী হয়ে উঠেন। সাধারণ নির্মাতা ও রাজমিস্ত্রী হিসেবে নিজের কর্মজীবন শুরু করলেও এক সময় তিনি পরিণত হন অটোমান সাম্রাজ্যের প্রধান স্থপতিতে এবং তিন সুলতানের অধীনে তিনি এই পরম আকাঙ্ক্ষিত পদ নিজের করে রেখেছিলেন। তার জীবদ্দশাতে তিনি ৪৭০-এরও অধিক ভবনের নকশা করেছিলেন এবং উঁচু ও প্রশস্ত গম্বুজ ছাদ নির্মাণের জন্য তিনি এমন কৌশল উদ্ভাবন করেছিলেন, যা ইতোপূর্বে কারো জানা ছিল না।

সিনান দৃষ্টিনন্দন সব বিদ্যালয়, মসজিদ এবং সরকারি ভবনের নকশা ও নির্মাণ কাজ করেছিলেন এবং তিনি

তার সবগুলো কাজে স্থাপত্য কৌশল এবং ভূমি বিন্যাসের মাঝে সামঞ্জস্য বজায়ে জোর দিতেন। দামেস্ক, মক্কা, বসনিয়া এবং অন্যত্র তার কীর্তির দেখা মিললেও তুরস্কের এড্রিনের সুলেমানিয়া মসজিদ হচ্ছে তার শেষ এবং অনন্য স্থাপত্য কীর্তি।

মুসলিম সভ্যতার স্থাপত্য রীতি অন্যান্য সভ্যতায় কতটুকু প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিল? দুনিয়া জুড়ে বিস্তৃত গম্বুজ, খিলান এবং মিনার বিশিষ্ট ভবনগুলোতে আমরা ওইসব ধারণার শক্ত প্রতিধ্বনি শুনতে পাই, যেগুলো সমৃদ্ধ ও লালিত হয়েছিল মুসলিম দেশগুলোতে। ভ্রমণ ও বাণিজ্য বিভিন্ন জাতির মাঝে পারস্পরিক আদান-প্রদান বৃদ্ধি করেছিল এবং সেইসাথে ফ্যাশনের বেশে এসব নতুন স্থাপত্য ধারণা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে অথবা বৃহৎ ও মজবুত স্থাপনা বানানোর কার্যকর পন্থা এসব স্থাপত্য ধারণায় নিহিত ছিল, তাই এগুলো গ্রহণ করাটাই ছিল স্বাভাবিক।

রাশিয়ান স্থাপত্যকীর্তির নমুনা চিত্রায়ন। অর্থোডক্স এই গির্জাতে কন্দকার গম্বুজ দৃশ্যমান।

বাইযান্টিন ও পারস্যরা প্রথম বিশালাকার গম্বুজ নির্মাণ করলেও মুসলিম স্থপতিরা নিজেদের স্থাপত্য কর্মে এগুলো অবলম্বনের পাশাপাশি বিদ্যমান রীতিতে ব্যাপক সমৃদ্ধি নিয়ে আসে। ৬৯১ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত জেরুজালেমের ডোম অব রক (কুব্বাত আস-সাখরা)।

এছাড়া অন্য পথ ধরেও এসব ধারণার বিস্তৃতি ঘটেছিল। নরম্যানদের দ্বারা ইউরোপ বিজিত হলে তারা সিসিলির মুসলিম স্থাপত্যকীর্তির সংস্পর্শে আসে এবং এর থেকেই উদ্ভব ঘটে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের গথিক রীতির। উচ্চ পর্যায়ে সংঘটিত বিভিন্ন বিবাহ যেমন: ১২৫৪ খ্রিস্টাব্দে প্রথম এডওয়ার্ডের সাথে কাস্তালীয় এলিনরের বিবাহের বদৌলতে ইংলিশ রাজ দরবারের স্থপতিরা মুসলিম স্থাপত্য ধারণা সম্পর্কে সম্যক অবগতি লাভ করে এবং পরবর্তীতে বিভিন্ন রাজকীয় খ্রিস্টান ভজনালয় ও প্রাসাদে তারা সেসব ধারণার প্রয়োগ ঘটায়।

রাশিয়ান অর্থোডক্স গির্জাগুলোর হাত ধরে বর্তমানে সুপরিচিত পেয়াজ-সদৃশ্য গম্বুজ ভারতে বিশেষভাবে মুঘল সাম্রাজ্যজুড়ে অত্যধিক জনপ্রিয় ছিল। ১৭শ শতাব্দির মধ্যভাগে স্যার ক্রিস্টোফার র‍্যান তার নকশা করা লন্ডনের সেন্ট পল'স ক্যাথিড্রালে দ্বৈত গম্বুজ ও মিনারে সচেতনভাবে মুসলিম প্রভাব তুলে ধরেন।

১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত সেন্ট পিটার্সবার্গের নিকটস্থ ক্রোন্সটার্ডের সমুদ্র ক্যাথিড্রালের একটি অংশ গম্বুজ। মস্কোর ক্রেমলিনের চূড়াও গম্বুজ দ্বারা সজ্জিত। ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দে প্রিন্স র‍্যাজেন্টের জন্য জন ন্যাশের নকশা করা ব্রিংগটনের রয়াল প্যাভিলিয়নে পেয়াজ-সদৃশ্য কন্দাকার গম্বুজ রয়েছে, যা বৃহত্তর-ভারতের গোটা মুঘল সাম্রাজ্য জুড়ে বেশ জনপ্রিয় ছিল।

০৬ মোচা-সদৃশ চূড়া

মিনার শব্দ আরবী মানারা শব্দ থেকে উৎসারিত, যার অর্থ: 'বাতিঘর', কিন্তু এটা সমুদ্র তীরবর্তী বাতিঘর নির্দেশ করে না, যেমনটি কিছু লেখক ধারণা করেন। এটার প্রতীকী মর্ম ইসলামের আলো, যা মসজিদ এবং এর মিনার থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে।

৮ম শতাব্দিতে দামেস্কের জামে মসজিদে মিনার পরিণত হয় ধর্মীয় স্থাপনার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যে। মিনারে দুটো প্রধান অংশ থাকে; নিম্নাংশ শক্ত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকলেও সেখানে বিশেষ কোনো সাজ-সজ্জা থাকে না, অন্যদিকে উঁচু অংশটি বেশ জাঁকজমকের সাথে সজ্জিত থাকে। মিনারের এমন বিভক্তিকরণ স্যার ক্রিস্টোফারের নকশাকৃত সেন্ট মেরী-লে-বো মিনারসহ বহু ইংলিশ মিনারে দেখা যায়।

১০০৭ খ্রিস্টাব্দে পূর্ব আলজেরিয়াতে নির্মিত *ক্বালাআ'তু বনী হাম্মাদ* হচ্ছে টিকে থাকা সর্বপ্রাচীন মুসলিম মিনার। বিশালাকার এই মিনার বনী হাম্মাদের ক্ষমতা প্রদর্শন করতো এবং আযান দেয়ার পাশাপাশি এটা পাহারার কাজেও ব্যবহৃত হতো। অত্যন্ত জাঁকজমকে সজ্জিত এই মিনারে অনেকগুলো উন্মুক্ত স্থান ছিল, যা আলো প্রদানের পাশাপাশি কাঠামোর ভার অনেকটা হ্রাস করতো। এসব জানালা কাঠামোতে ত্রি-লতি, পঞ্চ-লতি, বহু-লতি এবং অর্ধবৃত্তাকার বিভিন্ন ধরনের খিলান ব্যবহৃত হতো।

এই বৈশিষ্ট্যগুলো পশ্চিমা রোম ও গথিক টাওয়ারগুলোর স্টাইলে ব্যাপক প্রভাব রেখেছিল। এর সবচেয়ে ভাল দৃষ্টান্ত আমরা ইতালির কোমে অবস্থিত সেন্ট আবোন্দি গির্জা (১০৬৩-১০৯৫), ফ্রান্সের কেইনে অবস্থিত সেন্ট ইটিয়েন গির্জা, অ্যাক্স হোমেস আশ্রম (১০৬৬-১১৬০) এবং ইংল্যান্ডের বারিতে অবস্থিত সেন্ট এডমন্ড (১১২০)-এ দেখতে পাই। সবগুলো ক্ষেত্রে *ক্বালাআ'তু বনী হাম্মাদ* মিনারের ছাপ প্রশ্নাতীতভাবে দৃশ্যমান; মূলত উত্তর আফ্রিকার সাথে ইউরোপের বাণিজ্য সম্পর্কই এমন আদান-প্রদানের মূল অনুঘটক।

১০০৭ খ্রিস্টাব্দে আলজেরিয়াতে নির্মিত ক্বালাআ'তু বনী হাম্মাদ হচ্ছে টিকে থাকা সর্বপ্রাচীন মুসলিম মিনার। উপরিভাগের জাঁকজমক সজ্জা এবং খিলান বিশিষ্ট এই ডিজাইনগুলো পরবর্তীতে ইউরোপের রোমান ও গথিক টাওয়ারগুলোতে দেখা যায়।

রোমান স্থাপত্য যুগের ১০ম শতাব্দিতে ইউরোপে প্রথম টাওয়ারের প্রচলন হলেও এটা গথিক স্থাপত্যশিল্পে একীভূত হয়ে যায়। কেউ কেউ মনে করেন, মিনার থেকেই টাওয়ারের সূচনা, যেহেতু ক্রুসেডারদের প্রত্যাবর্তনের পর থেকে ইউরোপীয় দুর্গ ও ফটকবাড়িতে এটার প্রচলন দেখা যায়। ক্রুসেডারদের প্রত্যাবর্তনের পর ব্যাপক হারে ইউরোপের সর্বত্র টাওয়ারের সংখ্যাবৃদ্ধির কারণে এমনটি ধারণা করা হলেও এটা ভুল, কেননা গির্জা-টাওয়ারসহ আরও টাওয়ার আমরা এর বহু পূর্বেই দেখতে পাই।

মিনার নির্মাণের আগ পর্যন্ত মোচা-সদৃশ চূড়ার কোনো ব্যবহার জানা যায়নি, এমনকি ১২০০ খ্রিস্টাব্দের আগ পর্যন্ত ইংল্যান্ডে কোনো মোচা-সৃদশ চূড়া ছিল না এবং ১২২১ খ্রিস্টাব্দে নির্মাণ কাজ শেষ হলে লন্ডনের সেন্ট পল'স ক্যাথিড্রালে এটা প্রথম দেখা যায় (মোচা-সদৃশ চূড়াটি ১৫৬১ খ্রিস্টাব্দে বজ্রপাতে বিধ্বস্ত হয় এবং গির্জাটি ১৬৬৬ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডের মহাঅগ্নিকাণ্ডে ধ্বংস হয় এবং ১৭১০ খ্রিস্টাব্দে ক্রিস্টোফার র‍্যান তা পুনর্নির্মাণ করেন)। ১০৮৫ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত কায়রোর আল-জুয়ুশী মিনার বিশেষভাবে ইতালি ও ইংল্যান্ডের জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবক ছিল।

বর্গাকার কাঠামোর মিনারগুলো অব্যাহতভাবে ইউরোপীয় টাওয়ারগুলোতে তাদের একচেটিয়া প্রভাব বজায় রেখেছিল, যেমনটি ইতালির পিয়াজো ডেলা সিগনোরিয়াতে অবস্থিত পালাজো ভেকচিয়ো-তে (নির্মাণকাল ১২৯৯-১৩১৪ খ্রি.) দেখা যায়। ইতালির পিয়াজো ডুক্যাল তো বিশেষভাবে লক্ষণীয়, যেহেতু এটাকে দামেস্কের উমাইয়া জামে মসজিদের সাথে তুলনা করা হয়। ইতালীয় এই টাওয়ারের বর্গাকার কাঠামো ক্রমান্বয়ে বেড়ে উঠেছে এবং এটার শীর্ষে রয়েছে কন্দাকার গম্বুজ, যেমনটি ওই মসজিদে রয়েছে। আশ্রমের আচ্ছাদিত প্যাভিলিয়ন থেকে বেড়ে উঠা টাওয়াটি দেখতে হুবহু উমাইয়া মসজিদ কাঠামোর অনুরূপ।

এ ধরনের দৃষ্টিনন্দন, বৃত্তাকার গঠনের মিনারের অনুকরণে জার্মানিতে বিভিন্ন স্থাপনা নির্মিত হয়েছে, যেমন: কোলনে অবস্থিত হোলি এপোসল চার্চ (১১৯০) এবং রাইনল্যান্ডে অবস্থিত অ্যামিয়েন্স ক্যাথিড্রাল (১০০৯-১২৩৯) এবং ওর্মস ক্যাথিড্রাল (১১শ থকে ১৩শ শতাব্দি সময়ে নির্মিত)।

উপরে: ১১শ শতাব্দিতে নির্মিত ইতালির কোমে অবস্থিত সেন্ট আবোন্দি গির্জা। নিচে: ৮ম শতাব্দির শুরু দিকে নির্মিত দামেস্কের সুবিখ্যাত জামে মসজিদের মিনার।

০৭ প্রভাবশালী ধ্যান-ধারণা

স্পেন ও পবিত্রভূমিতে মুসলিমদের বিরুদ্ধে চালানো প্রথম পাল্টা অভিযানে অনেক মুসলিম স্থপতি বন্দী হয়ে ইউরোপে আসে এবং ঠিক এই সময়ে নরম্যান স্থাপত্য রীতি দৃশ্যপটে হাজির হতে শুরু করে। লালীস ছিলেন এমনই এক বন্দী। তার নতুন মালিক ছিলেন ইংল্যান্ডের রিচার্ড ডে গ্রান্ডভিলে, যিনি লালীসকে দিয়ে ১১২৯ খ্রিস্টাব্দে দক্ষিণ ওয়েলসের নেথ আশ্রমটির নকশা করান। পরবর্তীতে লালীস পরিণত হন প্রথম হেনরির আস্থাভাজন স্থপতিতে।

১০৬৬ খ্রিস্টাব্দের হামলার পর নরম্যানরা সাথে করে বহু স্থপতি ইংল্যান্ডে নিয়ে আসে। সিসিলি দখল করে নিলে তারা মুসলিমদের সংস্পর্শে আসে এবং এখানে এসে তারা বিধ্বংসী থেকে পরিণত হয় নির্মাতাতে। বিবিসি'র প্রামাণ্য চিত্র *An Islamic History of Europe*-এ রাগেহ উমর বলেন, "মুসলিম আমলের স্থাপত্য কীর্তির খুব কমই সিসিলিতে টিকে আছে এবং অনেক ভবনকে দেখতে ইসলামী ধাঁচের মনে হলেও বিষয়টি একেবারে তেমন নয়। প্রকৃতপক্ষে, এই ভবনগুলো ১১শ শতাব্দির নরম্যান বিজেতাদের দ্বারা নির্মিত, যারা আরবীয় সংস্কৃতি দ্বারা ব্যাপক অনুপ্রাণিত ছিল। ১২শ শতাব্দির নরম্যান রাজা দ্বিতীয় রজার মুসলিম স্থাপত্যশিল্প দ্বারা দারুণভাবে মোহিত ছিলেন, এমনকি তিনি অনর্গল আরবী বলতে পারতেন।" স্থাপত্যশিল্পের দিক থেকে ইসলামী রীতি দ্বারা দারুণভাবে প্রভাবিত নরম্যানরাই ইউরোপ বিনির্মাণে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছিল। গথিক স্থাপত্য রীতি নরম্যান রাজাদের আমলেই বিকশিত হয়েছিল।

> "১২শ শতাব্দির নরম্যান রাজা দ্বিতীয় রজার মুসলিম স্থাপত্যশিল্প দ্বারা দারুণভাবে মোহিত ছিলেন, এমনকি তিনি অনর্গল আরবী বলতে পারতেন।"
>
> – রাগেহ উমর, বিবিসি'র প্রামাণ্য চিত্র *An Islamic History of Europe*

প্রথম এডওয়ার্ড মুসলিম এলাকা দখলকারী এবং তাদের শত্রু মোঙ্গলদের সাথে মৈত্রী স্থাপনে পারস্যের সাথে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে উপহারের আদান-প্রদান ঘটান। ১২৯২ খ্রিস্টাব্দে জেফরি ল্যাংলে এই মিশনের নেতৃত্ব দেন এবং এটা এক বছর স্থায়ী ছিল। এই মিশনে ভাস্কর রবার্টাস ছিলেন এবং ধারণা করা হয়: ওউগি খিলানসহ বেশ কিছু স্থাপত্য ধারণা তিনি সাথে করে নিয়ে আসেন এবং পরবর্তীতে ১৪শ শতাব্দির শেষভাগে ইংলিশ স্থাপত্যশিল্পে আমরা সেগুলোর প্রচলন দেখতে শুরু করি।

পরবর্তীতে, রাজা প্রথম এডওয়ার্ড পারস্যের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখেন; এছাড়া তার ক্রুসেড অভিজ্ঞতা এবং কাস্তালের রাণী এলিনরের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন – সবকিছু তাকে মুসলিম স্পেনের আরও নিকটে নিয়ে আসে। এই সম্পর্কগুলো ইংলিশ লোককাহিনীতে মুর নৃত্যের মাধ্যমে স্মরণ করা হয়, যা প্রথম দিকে মরিস্কো নামে পরিচিত ছিল। এই মুসলিম সংস্পর্শ টিউডর স্থাপত্য রীতির বিকাশে অগ্রণী অনুঘটক ছিল। এই স্থাপত্য রীতির নমুনা আমরা উইন্ডসরের অষ্টম হেনরি টাওয়ার এবং তার ভজনালয়ের জানালাগুলোতে থাকা বহুভুজ তারকা নকশা এবং বর্তমানের টম টাওয়ার হিসেবে পরিচিত অক্সফোর্ডের সুবিশাল উলসি ফটকের চূড়াতে দেখতে পাই।

তীর্থযাত্রী এবং শিল্পীদের মিশর যাতায়াতের মাধ্যমেও স্থাপত্য ধারণা ইউরোপে অনুপ্রবেশ করে। সিমন সাইমেন এবং হগ দ্য ইলুমিনেটর

সিসিলির পালেরমোতে অবস্থিত পালাতিন ভজনালয়, নরম্যান রাজা দ্বিতীয় রজারের আমলে মুসলিম স্থপতিরাই এই স্থাপনার নকশা ও সজ্জার কাজটি সম্পন্ন করেছিলেন।

১৬৩০ খ্রিস্টাব্দে নির্মাণ কাজ শুরু হওয়া ভারতের আগ্রাতে নির্মিত তাজমহল।

ছিলেন এমন দু'জন আইরিশ শিল্পী, যারা ১৩২৩ খ্রিস্টাব্দে পবিত্রভূমি হয়ে মিশর ভ্রমণে যান এবং কায়রোতে তারা মুস্তাফা পাশা (১২৬৯-১২৭৩) সমাধিস্থল পরিদর্শন করেন। এই স্থাপনাতে ছিল মুসলিম আদলে করা খাড়া রীতির সজ্জা, যা পরবর্তীতে যুক্তরাজ্যের গথিক স্থাপত্য রীতির সাধারণ বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়।

ন'জন ফরাসী নাইট দ্বারা প্রথম ক্রুসেডের পর ১১১৮ খ্রিস্টাব্দে জেরুজালেমে প্রতিষ্ঠিত নাইট টেমপলার তরিকার ভজনালয়গুলো কেন্দ্রীভূত কাঠামোর আদলে সৃষ্ট, যা শহরের ডোম অব রক (*কুব্বাত আস-সাখরা*) মসজিদ থেকে উৎসারিত। এ ধরনের গির্জা কাঠামো পরবর্তীতে পশ্চিমে বিস্তৃতি লাভ করে এবং তার নমুনা ১১৮৫ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত লন্ডনের বৃত্তাকার টেম্পল চার্চে দৃশ্যমান। নরম্যান আমলের শেষভাগে নির্মিত রোটুন্ডা, ১২৪০ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত গথিক কোয়ার (*choir* – সমবেত কণ্ঠে ধর্মীয় সঙ্গীত গাওয়ার নির্দিষ্ট স্থান) উভয় স্থাপনা একই জ্যামিতিক বিন্যাসের ছিল। এ ধরনের স্থাপত্য রীতি গ্রিক বিশেষভাবে প্লেটো ও ভিটরুভিয়াস থেকে ইউরোপ ও ফ্রান্সে এসেছে, এ ব্যাপারে কিছু বিশেষজ্ঞ জোর দিলেও অনেকে এটার সময়কাল নিয়ে বেশ অবাক হন এবং ফরাসীগণ ঠিক এ সময়ের আগে কিংবা পরে কেন প্লেটোর এ ধারণার সন্ধান পায়নি, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। উল্টো কাকতালীয়ভাবে এই বৈশিষ্ট্যগুলো ইউরোপে ঠিক তখনই দৃশ্যমান হয়, যখন তা ইসলামী স্থাপনাগুলোতে ব্যাপক হারে ব্যবহৃত হচ্ছিল।

মুঘল সম্রাট শাহজাহান কর্তৃক নির্মিত ভারতের তাজমহল এমন আরেকটি সুবিখ্যাত স্থাপনা। সম্রাটের স্ত্রী মুমতাজ মহল তার ১৪-তম সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করেন এবং তার স্মরণেই এই ভবন নির্মিত হয়। 'অনন্তের চোখের জল' নামে পরিচিত এই মসজিদ স্থাপনার নির্মাণ কাজ ১৬৪৮ খ্রিস্টাব্দে সম্পন্ন হয়। মূল্যবান রত্নপাথর দিয়ে খচিত এবং বিপুল পরিমাণ সাদা মার্বেলে নির্মিত এই স্থাপনা মুঘল সাম্রাজ্যকে প্রায় দেউলিয়া করতে বসেছিল। কেন্দ্র থেকে কিছুটা বিচ্যুত প্রধান মেঝের নিচে অবস্থিত সম্রাটের সমাধি কক্ষটি ছাড়া তাজমহল পুরোপুরি প্রতিসম।

অনন্য-সুন্দর আরও ইসলামী স্থাপত্যকীর্তির তালিকায় রয়েছেঃ ক্যাথিড্রালে রূপান্তরিত স্পেনের কর্ডোবা মসজিদ এবং গ্রানাডার আল-হামরা প্রাসাদ। দৃষ্টিনন্দন এই স্থাপনাগুলো আজও দর্শনার্থীদের বিমোহিত করে, যেখানে প্রতি বছর তিন মিলিয়ন (বা ৩০ লক্ষ) দর্শনার্থী নিয়ে তাজমহল সর্বাধিক দর্শনার্থীর প্রতিযোগিতায় আল-হামরাকে পিছনে ফেলেছে। প্রতি বছর প্রায় ২.২ মিলিয়ন বা দৈনিক গড়ে ৭,৭০০ জন দর্শনার্থী আল-হামরা পরিদর্শন করে।

০৮ দুর্গ এবং দুর্গে থাকা বৃহৎ টাওয়ার

সম্ভাব্য অবরোধের আশংকা নিয়ে এখন আর শহর পরিকল্পনা নকশা করা হয় না, কিন্তু দুনিয়ার চারপাশে তাকালে অতীতের দুর্গ ঘেরা স্থানগুলো এখন আমাদের নিকট পর্যটন স্থান হিসেবে সহজলভ্য হয়ে উঠেছে, যেমন: লন্ডনের টাওয়ার।

জেরুজালেম আক্রমণের সময় গোলা-বারুদ ও সৈন্যের দিক দিয়ে ইউরোপীয় ক্রুসেডারদের সংখ্যা মুসলিমদের থেকে এগিয়ে থাকলেও মুসলিমরা উল্লেখযোগ্য সময়ের জন্য ক্রুসেডারদের আক্রমণ আটকে রাখতে পেরেছিল। মুসলিমদের সামরিক কাঠামো এবং দুর্গসমূহের অপূর্ব কার্যকারিতা কেবল ক্রুসেডারদের নিকট পরাস্ত হয়নি, বরং তারা এসব স্থাপত্য ধারণা নিজেদের সাথে করে ইউরোপে নিয়ে যায়। সিরিয়া ও জেরুজালেমের দুর্গগুলির দুর্ভেদ্য ডিজাইন পশ্চিমা দেশগুলোতে অনুসৃত হয়, যাতে বৃত্তাকার টাওয়ার, তীর নিক্ষেপের সংকীর্ণ ফাঁক, রক্ষণস্তম্ভ, গরম জল বা ভারী পাথর নিক্ষেপের রক্ষণ পাঁচিল, নিরাপত্তা পাঁচিল, তীর চালানোর ছিদ্রবিশিষ্ট প্রাচীর ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত ছিল।

১২শ শতাব্দিতে সালাউদ্দীনের নিকট ক্রুসেডারদের গুরুত্বপূর্ণ পরাজয়ের আগ পর্যন্ত অধিকাংশ খ্রিস্টান সামরিক টাওয়ারগুলোর বেষ্টনী ছিল বর্গাকার। সালাউদ্দীনের বৃত্তাকার টাওয়ারগুলো ক্রুসেডারদের অভিভূত করে এবং আড়াআড়ি অভিক্ষেপ কৌশল পরিত্যাগে তাদের বাধ্য করে, যেহেতু তারা শত্রুর পাশ থেকে আগুন নিক্ষেপে জোর দিতো। বর্গাকার বেষ্টনী পরিত্যাগ করে ইউরোপে প্রথমবারের মতো কোনো দুর্গে বৃত্তাকার টাওয়ার ব্যবস্থা দেখা গেছে, তার ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত: ১১২০ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত সাওন।

■ লুপহোল বা তীর নিক্ষেপের সংকীর্ণ ফাঁক

দুর্ভেদ্য দেয়ালে লুপহোল বা তীর নিক্ষেপের সংকীর্ণ ফাঁক সর্বপ্রথম খ্রিস্টপূর্ব ২০০-এর দিকে সিরাকিউসকে রক্ষা করতে আর্কিমিডিস ব্যবহার করেছিলেন। এই দীর্ঘ ও সংকীর্ণ ফাঁক দিয়ে তীর নিক্ষেপকারীরা শত্রুর দিকে তীর ছুড়তো, কিন্তু পাল্টা আঘাত থেকে তারা নিরাপদ থাকতো। রোমের দুর্গগুলোতে ব্যবহৃত হলেও ৮ম শতাব্দির ইরাকী উখাইদার প্রাসাদ এবং তিউনিসের সুসা রিবাত প্রাসাদে ব্যবহারের মাধ্যমে মুসলিমগণ এটার প্রভূত উন্নয়নের পাশাপাশি এটাকে বেশ জনপ্রিয় করে তোলে। ইংল্যান্ডে এটার প্রথম ব্যবহারের ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত ১১৩০ খ্রিস্টাব্দে লন্ডনে পাওয়া যায়।

■ রক্ষণস্তম্ভ (*barbican*)

রক্ষণস্তম্ভ মূলত: দুর্গের প্রবেশদ্বারের সামনে থাকা প্রধান প্রতিরক্ষা দেয়ালের সাথে সংযুক্ত দেয়াল-ঘেরা পথ। এটা শত্রুর দুর্গে প্রবেশকে বিলম্বিত করে তাদের ছোট একটি জায়গায় আটকে রাখতো। এভাবে প্রতিরোধকারীরা তাদের থেকে অনেকটা সময়ের বের করে নিতো। তাছাড়া উপর ও আশপাশ থেকেও তারা শত্রুর উপর আক্রমণ চালাতে পারতো। '*barbican*' শব্দটি আরবী *বাব আল-বাকারা* (باب البَقَارة) হতে এসেছে, যার অর্থ: 'ছিদ্রযুক্ত গেট।'

যুদ্ধ থেকে ফেরার সময় ক্রুসেডাররা প্রায়শই তাদের সাথে করে মুসলিম রাজমিস্ত্রীদের নিয়ে আসতো এবং ১২শ শতাব্দিতে এদের মাধ্যমে তারা ইউরোপীয় দুর্গগুলোতে এ ধরনের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা যুক্ত করতে থাকে। এছাড়া ক্রুসেডের মাঝে শান্তিকালীন সময়ে ক্রুসেডারদের সাথে থাকা স্থপতি ও নির্মাতারা স্থানীয় মুসলিমরা কীভাবে তাদের দুর্গ ব্যবস্থার নকশা ও নির্মাণ কাজ সমাধা করতো, তা পর্যবেক্ষণ করতো।

জার্মানির বায়ার্নের এই দুর্গের মতো ইউরোপীয় দুর্গগুলো সিরিয়া ও জেরুজালেমের দুর্গগুলোর নকশা অনুকরণে নির্মিত।

খ্রিস্টান রাজমিস্ত্রীদের অনেকে জীবিকার তাকিদে বিশেষকরে শান্তিকালীন সময়ে সংস্কার বা নতুন স্থাপনা নির্মাণে মুসলিমদের দ্বারা ভাড়ায় কাজ করতো। ইউডেস দ্য মন্ট্রিউইলের ঘটনা এমনই এক উপাখ্যান তুলে ধরে, যেখানে ১২৪৮ থেকে ১২৫৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি ছিলেন সেন্ট লুইসের ক্রুসেড সঙ্গী এবং এর ফাঁকে তিনি জাফা ও সাইপ্রাসেও কাজ করেছিলেন।

■ আবদ্ধ কলাম

মুসলিমরা দেয়াল শক্ত ও মজবুত করতে পাথর, চুন-সুরকির আস্তরণের মাঝে আবদ্ধ কলাম ব্যবহার করতো। এই কৌশল রোমান স্থপতি ও প্রকৌশলী মার্কোস ভিটরুভিয়াস পোলিও থেকে গৃহীত হলেও মুসলিমরা এতে সমৃদ্ধির ছাপ নিয়ে আসে। আক্কা প্রোতাশ্রয়ের দেয়ালগুলো এই পদ্ধতিতে নির্মিত। মিশরের আমীর আহমাদ ইবনে তুলুন ৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে সমুদ্রের উত্তাল ঢেউ এবং শত্রু আক্রমণ ঠেকাতে সবচেয়ে শক্তিশালী পোতাশ্রয় নির্মাণের আদেশ জারি করেন। সেজন্য দেয়ালের পাথর, চুন-সুরকির আস্তরণের মাঝে কাঠের বীম প্রবেশ করানো হয়, যেন এটার দুটো পৃষ্ঠ একসাথে আবদ্ধ থাকে। ১১০৩ খ্রিস্টাব্দে ক্রুসেডাররা আক্কা দখল করে নিলে তারা এই নির্মাণ কৌশল শিখে নেয় এবং তারা তাদের সামরিক স্থাপনাতে এ কৌশলের প্রয়োগ ঘটায়, যেমন: ১২১৮ খ্রিস্টাব্দে সিজারিয়াতে নির্মিত দুর্গসমূহ।

■ গরম জল বা ভারী পাথর নিক্ষেপের রক্ষণ পাঁচিল (*Machicolations*)

মুসলিম প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান গরম জল বা ভারী পাথর নিক্ষেপের রক্ষণ পাঁচিল। এগুলো ছিল নিরাপত্তা পাঁচিলে ঝুলে থাকা কিছু ছিদ্র বা ফাঁক। এগুলোর মধ্য দিয়ে প্রতিরক্ষাকারীরা আক্রমণকারীদের উদ্দেশ্যে আগুনের তীর এবং ভারী পাথর নিক্ষেপ বা গরম তেল ঢেলে দিতো। ৭২৯ খ্রিস্টাব্দে সিরিয়ার রুসাফার নিকটস্থ কাসর আল-হাইর দুর্গে এটার প্রথম ব্যবহার দেখা যায়। ইউরোপে এই কৌশলের প্রথম ব্যবহার ১২শ শতাব্দিতে রিচার্ড দ্য লায়নহার্ট কর্তৃক নির্মিত শাতু গালিয়ার্ড দুর্গে দেখা যায়। মূলত রিচার্ড দ্য লায়নহার্টের ক্রুসেড অভিযান থেকে প্রত্যাবর্তনের পরেই এই দুর্গ নির্মিত হয়েছিল। ১১৮৭ খ্রিস্টাব্দের দিকে নরউইচে এবং এর ছয় বছর পর উইনচেস্টারে এই কৌশলের ব্যবহার দেখা যায়। বস্তুত, অনেক প্রতিরক্ষা কৌশলের ন্যায় এই কৌশলও ক্রুসেডররা মুসলিম বিশ্ব থেকে শিখেছিল এবং দেশে প্রত্যাবর্তনের পর নিজ দেশে তারা এটার প্রচলন ঘটিয়েছিল।

উপরে: ১৬শ শতাব্দির শুরুর দিকের নমুনা দুর্গের চিত্রায়ন। নিচে: ক্রুসেডাররা সালাউদ্দীনের বৃত্তাকার টাওয়ার দ্বারা এতটাই মোহিত ছিল যে, তারা ইউরোপে অনুরূপ বহু টাওয়ার নির্মাণ করে। চিত্রের টাওয়ারটি পোল্যান্ডের পোডজামকিতে অবস্থিত।

■ আকাশজননী বা তীর চালানোর ছিদ্রবিশিষ্ট প্রাচীর (*Battlements*)

আকাশজননী মূলত এক সারি পাথরের খাঁজ এবং উঁচু করা অংশ, যা ভবনের দেয়ালের শীর্ষে সংযুক্ত করা হয়। প্রকৃতপক্ষে, এগুলো প্রতিরক্ষাকারীদের সুরক্ষা প্রদান করে এবং আধুনিক সময়ে এগুলো বেশ সজ্জিত থাকে। ক্রুসেড অভিযান থেকে প্রত্যাবর্তনের পর ১২শ শতাব্দিতে ইউরোপে এগুলো জনপ্রিয় হয়ে উঠে। ১৫শ শতাব্দির নরফোকের ক্রোমার গির্জা, ভেনিসের পালাজো সান্তা সোফিয়া প্রাসাদের আকাশজননীর সাথে ১৩শ শতাব্দির যাইনুদ্দীন ইউসুফ মসজিদ এবং ১০শ শতাব্দির আল-আযহার মসজিদসহ কায়রোর অনেক স্থাপনার আকাশজননীর ব্যাপক সাদৃশ্য দৃশ্যমান।

যদিও ক্রুসেড মানেই রক্ত-গঙ্গা, তথাপি কিছু সময়ের জন্য সেখানের পরিবেশ শান্ত ছিল এবং এ সুযোগেই ঘটে বিভিন্ন তত্ত্ব ও ধারণার আদান-প্রদান। বিপুল সংখ্যক মানুষের দেশান্তরের সাথে সাথে সৃজনশীল চিন্তারও স্থানান্তর ঘটে, আর এভাবেই প্রাচ্যের ধারণা স্থান করে নেয় পশ্চিমে।

০৯ স্নানাগার

স্পা এবং হেলথ ক্লাবগুলো দুনিয়া জুড়ে তাদের ডালপালা মেলে ধরেছে এবং বাষ্পস্নান ও কোমল সাবানের সেবাকে কেবল বিলাসীদের মাঝে সীমাবদ্ধ রেখেছে; কিন্তু সেবাগ্রহণের এই সীমাবদ্ধতা সব সময় এমন ছিল না, বরং মুসলিমদের স্বর্ণালী যুগে ধনী-গরিব, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার ছিল উন্মুক্ত ছিল এ সেবা। তথাকথিত ইউরোপের অন্ধকার যুগে রোমান স্নান তো একেবারে অপ্রচলিত হয়ে উঠে।

রোমান সাম্রাজ্যের বিভাজনের পর রোমান ও তাদের অধিকাংশ সরকারি প্রণোদনা প্রতিষ্ঠান বিলুপ্ত হয়ে যায়। রোমানদের নিকট স্নানাগার মানে ছিল, সেটার জন্য সম্প্রসারিত ভবন থাকবে এবং সেখানে *Tepidarium* নামের মৃদু উষ্ণ কক্ষ, *Caldarium* নামের উষ্ণ বাষ্পে ঘেরা কক্ষ এবং *Frigidarium* নামের নিমজ্জন পুল বা জলাধার থাকবে। কিছু বৃহৎ স্নানাগারে *Apodyterium* নামের জামা পরিবর্তন কক্ষ, পাঠাগার এবং খেলাধুলার জায়গা পর্যন্ত ছিল। কিন্তু এই সেবাকেন্দ্রগুলি কেবল ধনী ও অভিজাত রাজনৈতিক ব্যক্তিদের জন্য উন্মুক্ত ছিল।

রোমান সাম্রাজ্যের পতনের সাথে এই স্নানাগারগুলো একে একে বিলুপ্ত হতে শুরু করে; অন্যদিকে এককালে রোম সাম্রাজ্যের অধীনে থাকা ভূমধ্যসাগরীয় আরব দেশগুলো রোমানদের এই ঐতিহ্য নিজেদের করে নেয়, যেমনঃ সিরিয়া। রোমানদের রেখে যাওয়া এই ঐতিহ্যকে মুসলিমরা বেশ গুরুত্বের সাথে লুফে নেয়, যেহেতু ইসলাম পরিচ্ছন্নতা, স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা এবং সুস্বাস্থ্যের ব্যাপারে বেশ জোর দেয়। রিপোর্টার রাগেহ উমর বিবিসি নির্মিত প্রামাণ্যচিত্র *An*

কাগালোগলু হামামী নামের তুর্কি স্নানাগারে কিছু লোক আয়েশী সময় কাটাচ্ছেন। ইস্তাম্বুলের স্নানাগারটি ১৬৯০ খ্রিস্টাব্দের দিকে নির্মিত হয়েছিল।

Islamic History of Europe-এ মন্তব্য করেন, "এক মিলিয়নের এক-চতুর্থাংশ লোকের শহরে প্রায় কয়েক হাজার স্নানাগার ছিল।"

> "নিশ্চয়, আল্লাহ তাদের ভালবাসেন, যারা প্রতিনিয়ত তার নিকট ফিরে আসে (তাওয়াবীন) এবং তিনি ভালবাসেন তাদের – যারা নিজেদের পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন রাখে।"
>
> – কুরআন (২:২২২)

মুসলিম বিশ্বে স্নানাগার ছিল একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং জীবনের প্রয়োজনীয় জিনিসগুলোর তালিকায় এটাকে বেশ উঁচুতে স্থান দেয়া হতো। নবী মুহাম্মদ (ﷺ) থেকে বর্ণিত হয়েছে, "পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক।" রুচিশীল নকশা, সজ্জা এবং অলঙ্করণ নিয়ে সে সময় স্নানাগার পরিণত হয় এক প্রকাণ্ড বিষয়ে। দৃষ্টিনন্দন নকশা ও বিলাসবহুল সজ্জা এবং সেইসাথে সুদৃশ্য ঝরণা ও দারুণভাবে সজ্জিত জলাধার নিয়ে এসব স্নানাগার মামলুক এবং অটোমান শাসনামলে পরিণত হয় জমকালো স্থাপনায়।

কিছু মুসলিম সমাজের জন্য স্নানাগার ছিল অনন্য সামাজিক মিলনমেলা, যা সামাজিক কর্মকাণ্ডে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতো এবং এটার কিছু প্রভাব আজও বাকি রয়েছে। বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর সামাজিক ভাব-বিনিময় বা মিথস্ক্রিয়ার এক অন্তরঙ্গ স্থান এই স্নানাগার, যেখানে আয়েশী পরিবেশে নিজেদের পরিচ্ছন্ন করার মানসে জড়ো হতো বন্ধুবান্ধব, প্রতিবেশী, আত্মীয়-পরিজন এবং শ্রমিকগণ। এতে করে দলীয় বন্ধন দৃঢ় হতো, বন্ধুত্ব নতুন করে গাঢ় হতো এবং খোশ-গল্পে সকলে মেতে উঠতো। নারী ও পুরুষ উভয়ে পৃথক পৃথক সময়ে থেরাপিতুল্য এই সেবা নিতে স্নানাগারে আসতো; নারীরা সাধারণত দিনের আলোয় এই সেবা নিতো, আর পুরুষরা নিতো সন্ধ্যা বা রাতে।

স্নানাগারের কৌতূহল ও সামাজিকতা কেবল শরীর ঘষামাঝা করে পরিষ্কার করা আর খোজগল্পের মাঝে সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং ঐতিহ্যগতভাবে এই স্থানগুলো ঘটকালিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছিল। উত্তর আফ্রিকার মতো রক্ষণশীল সামাজিক গোষ্ঠীগুলোতে নারীরা তাদের ছেলের জন্য উপযুক্ত পাত্রী খুঁজতে স্নানাগারে যেত। যেহেতু এখানে তারা পাত্রীকে খুব কাছ থেকে পর্যবেক্ষণের সুযোগ পেত এবং দৈহিকভাবে মানানসই পাত্রী পছন্দ করতে পারতো। অবশ্য, পারিবারিকভাবে আয়োজিত বিবাহ হ্রাস পাওয়ার প্রেক্ষিতে এই ঐতিহ্য পরবর্তীতে তার জনপ্রিয়তা হারাতে শুরু করে।

জর্জিয়ার তিবলিসে অবস্থিত গণ-স্নানাগারের বহির্ভাগ, যা বেশ জমকালো ও রঙিন টাইলসে সজ্জিত।

মুসলিম বিশ্বের বহু এলাকায় এই রেওয়াজ ছিল যে, নববধূকে তার বন্ধুসহ স্নানাগারে নিয়ে যাওয়া হতো এবং সেখানে তাকে প্রস্তুত করা হতো, কনে সাজানো হতো, বিভিন্ন স্টাইলে মেহেদী দিয়ে চুল, হাত ও পা রাঙানো হতো। নববধূর সাথে সাক্ষাতের পূর্বে বরকেও এখানে এনে বিবাহ অনুষ্ঠানের জন্য প্রস্তুত করা হতো।

স্নানাগারে স্নানরীতি কতগুলো নিয়ম দ্বারা পরিচালিত হতো, যেমন: দেহের নিম্নাংশকে আবৃত করে এমন পোশাক পরিধান পুরুষদের জন্য বাধ্যতামূলক ছিল এবং পুরুষদের অবস্থানকালে নারীদের সেখানে প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। এসব নিয়মকানুন নিয়ে বেশ কিছু গ্রন্থ রয়েছে,

তেমনি এক গ্রন্থ: "*আল-হাম্মাম ওয়াল আদাবিহা*" (স্নানাগার এবং তার নিয়মনীতি), যা ৯ম শতাব্দিতে আবু ইসহাক ইব্রাহীম ইবনে ইসহাক আল-হারবী কর্তৃক রচিত।

১৪শ শতাব্দির বাগদাদে স্নানের রীতি বেশ অভিনব ছিল, যেমন: স্নানের জন্য সেখানে পৃথক কক্ষ ছিল এবং সেখানে তিনটি তোয়ালে থাকতো, যা ইবনে বতুতাকে বলতে বাধ্য করে, "বাগদাদ ছাড়া অন্য কোনো শহরে আমি এমন বিশদ ও অদ্ভুত জিনিস দেখিনি।"

যেমনটি আমরা উল্লেখ করেছি, রোমান আমলে ইউরোপে স্নানাগারের বিষয়টি পরিচিত থাকলে তাদের পতনের সাথে সাথে তা হারিয়ে যায়। ১৫২৯ খ্রিস্টাব্দে স্যার জন ট্রেফির লেখা *Grete herbal* গ্রন্থে আমরা স্নানাগারের প্রতি সে সময়কার দৃষ্টিভঙ্গির নমুনা দেখতে পাই: "(স্নানাগারে) ঠাণ্ডা পানি ব্যবহারের কারণে অনেকেই মারা গিয়েছে।"

শত শত বছর পর ক্রুসেডাররা যখন জেরুজালেম ও সিরিয়াতে মুসলিম রীতিতে নির্মিত স্নানাগারগুলোর মুখোমুখি হয়, তখন তারা পুনরায় স্নানাগারের সন্ধান পায়। এই পুনরাবিষ্কার বেশ ক্ষণস্থায়ী ছিল এবং অনেক গির্জা এটার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে, যেহেতু একদিকে এগুলো ছিল 'ধর্মদ্রোহী মুসলিমদের সংস্কৃতি' এবং অন্যদিকে মুসলিমদের অনুসৃত কঠোর নিয়মকানুনের অভাবে স্নানাগারগুলোতে ব্যভিচার ও বিকৃত যৌনাচারের বিস্তৃতি ঘটে এবং এমন অনৈতিক ব্যবহারে নানা রোগব্যাধি পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে।

১৭শ শতাব্দির দিকে ইউরোপীয় পর্যটকরা তুর্কি স্নানাগার দর্শন করে নতুন করে আবার এটার সন্ধান পায়। মূলত ঠিক এই সময়ে ইউরোপীয়দের নিকট প্রাচ্যের স্নানাগার ব্যবহার ও ভূমধ্যসাগরীয় ফুল ফ্যাশনে পরিণত হয়। ইংল্যান্ডে বিশেষ করে লন্ডন, ম্যানচেস্টার এবং লিডসের মতো স্থানে তুর্কি রীতির স্নানাগার পরিণত হয় সত্যিকার উন্মত্ততায়। ১৬৭৯ খ্রিস্টাব্দের দিকে লন্ডনের নিউগেইট স্ট্রিট (বর্তমান বাথ স্ট্রিটে) প্রথম তুর্কি রীতির স্নানাগার বা ব্যাগনিও (*bagnio*) চালু করা হয়। তুর্কি বণিকরাই স্নানাগারটি নির্মাণ করেছিল। স্কটল্যান্ডের এইডেনবার্গেও তুর্কি রীতির স্নানাগার প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে এবং এখানেই ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় জন বার্নেটের নকশাকৃত সুবিখ্যাত ড্রামশুখ (*Drumsheugh*) স্নানাগার। ইট ও পাথরে ভর দেয়া গম্বুজ, নাল আকৃতির খিলান কাঠামোতে লতানো গুল্মের বেড়ে উঠার জ্যামিতিক সজ্জাসহ তুর্কি রীতির স্নানাগার যেমন হতে পারে, তার সবটুকু জৌলুস এখানে নতুনভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। মূল ভবনটি জ্যামিতিক বিন্যাসে বিন্যস্ত লোহার গ্রিলের দৃষ্টিনন্দন মুর রীতির তোরণ-শ্রেণি দিয়ে সজ্জিত ছিল।

ধারণা করা হয় যে, আধুনিক বিশ্বের অধিকাংশ আধুনিক হেলথ ও ফিটনেস ক্লাব এবং অবকাশ কেন্দ্রগুলোর মূল উৎস এসব স্নানাগার; যদিও সাউনা (*Sauna* – ফীনল্যান্ডীয় রীতির বাষ্পস্নান)-এর ক্ষেত্রে বলা হয়: এটা স্ক্যান্ডেনেভিয়ান ঐতিহ্য থেকে এসেছে। শরীর ঘেমে গেলে তা আমাদের দেহ থেকে দূষিত পদার্থ বের দেয়ার পাশাপাশি ওজন কমাতেও সাহায্য করে। বাষ্প এবং উষ্ণ-জল রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধির সাথে সাথে নাড়ীর স্পন্দন ও বিপাকীয় ক্রিয়ার হার বাড়িয়ে দেয়। আল-বার্‌রানী স্নানাগারে অবকাশ যাপন ছিল বিশ্রাম কক্ষ বা রোমান *Apodyterium*-এ সময় কাটানোর সমতুল্য, যেখানে গোসল ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কসরত থেকে উপকৃত হওয়ার পাশাপাশি পরিশ্রান্ত শরীর আরামের কোলে ঢলে পড়তো এবং একইসাথে সামাজিক আদান-প্রদান ও প্রীতিকর পরিবেশ সকলকে নানাভাবে উপকৃত করতো।

স্যার নরম্যান ফোস্টারের বিখ্যাত লন্ডন গ্রেকিন ভবনের ছায়ায় দাঁড়িয়ে থাকা পুরাতন একটি তুর্কি স্নানাগারের বহির্ভাগ। সাবেক এই স্নানাগার এখন একটি পিৎজা রেস্তোরাঁ।
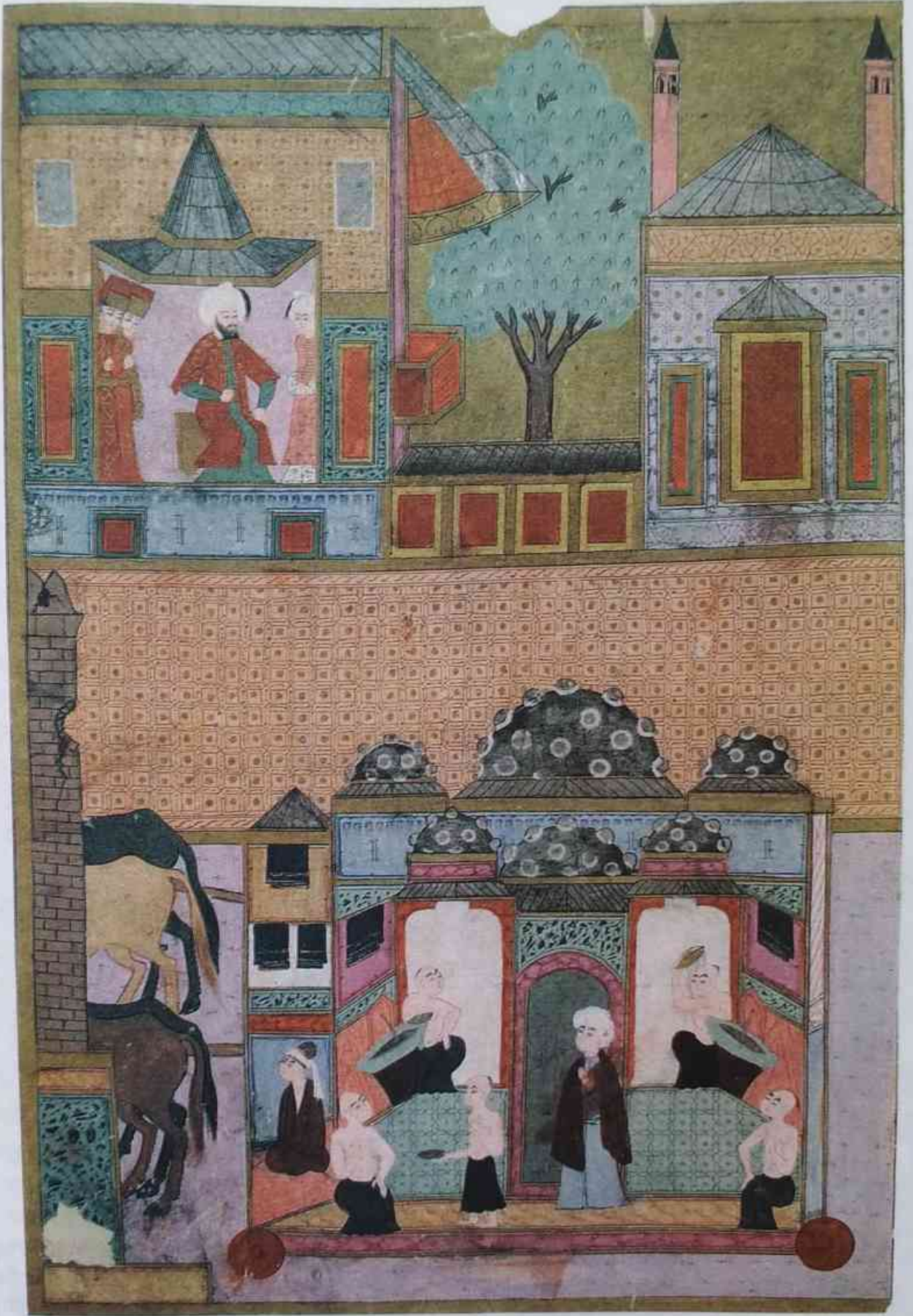
১৬শ শতাব্দির তুর্কি পাণ্ডুলিপিতে চাকায় চলমান সরকারি স্নানাগার দৃশ্যমান। সুলতান তৃতীয় মুরাদের খতনা অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে কারিগরদের এক শোভাযাত্রায় চলমান সরকারি স্নানাগারটি প্রদর্শিত হচ্ছে।

১০ তাঁবু

তাঁবুর কথা বললেই আমাদের মানসপটে ভেসে উঠে বৃষ্টিসিক্ত ক্যাম্পসাইট (অবকাশ শিবির) বা বিবাহ অনুষ্ঠানের জন্য বসানো সুদৃশ্য বৃহৎ তাঁবুর কথা। ছোট কী বড়, তাঁবুর রয়েছে নানাবিধ ব্যবহারিক ও সামাজিক কার্যক্রম। মুসলিম ও বেদুইন আরব কালচারে আশ্রয় ও সাক্ষাতের স্থান হিসেবে তাঁবুর ব্যবহার হলেও আজ অবধি তাঁবু তার ব্যবহার উৎস থেকে বিচ্যুত হয়নি।

সুলতানের মসনদে আসীন হওয়া উপলক্ষ্যে বেশ রাজকীয় কায়দায় তাঁবু টাঙানো হতে পারে, রেশমি মুকুটসহ এটা অত্যন্ত রঙিন এক ব্যাপার এবং তাঁবুর একাংশ উঁচু করে পুরো ব্যাপারটিকে আরও বেশি জাঁকজমক ও ভাব-গম্ভীর করে তোলা হতো। ভেতরে থাকতো আরামদায়ক আসন, শামিয়ানা, রঙিন কার্পেট; এছাড়া থাকতো সুলতানের পছন্দনীয় কিছু যুদ্ধাস্ত্র ও প্রসাধনী। যুদ্ধ, শিকার অভিযান, অন্যান্য ভ্রমণ ও অনুষ্ঠানসহ সুলতানের প্রায় সকল রাজকীয় কাজে তাঁবু ছিল নিত্যসঙ্গী।

প্রথম দেখাতেই ইউরোপীয়রা অটোমান তাঁবুর মোহে পড়ে। বড় আসর এবং বিভিন্ন রাজকীয় অনুষ্ঠানের প্রথমদিকে এটা কেবল রাজকীয় ব্যক্তিবর্গ এবং ধনীদের জন্য সংরক্ষিত ছিল। ফরাসী রাজা চতুর্দশ লুইস এটার উৎসাহী গুণগ্রাহী ছিলেন এবং *a Ia Turque* নামে পরিচিত তার কিছু আনুষ্ঠানিক তাঁবু ছিল। এ ধরনের তাঁবুর সাথে থাকতো বেহিসাবি শোভাযাত্রা ও আতশবাজি প্রদর্শনকারী রাজকীয় দল। তার এমন ফ্যাশন রুচি ইউরোপের অন্যান্য রাজকীয় পরিবারের নজর কাড়ে এবং তারাও পিছিয়ে না থেকে প্রতিযোগিতায় নেমে পড়ে, যার সুবাদে ১৭শ শতাব্দিতে তাঁবু একটা অন্যতম সাংস্কৃতিক অনুঘটকে পরিণত হয়।

ইসলামী বিশ্বের প্রতি চতুর্দশ লুইসের ছিল সত্যিকার আগ্রহ এবং ফ্রান্সোয়েস ডি লা বুল্লিয়ে-লে-গৌয এবং জিন ব্যাপটিস্টে টাভার্নিয়ারের মতো পর্যটকদের মাধ্যমে তিনি ইসলামী দুনিয়ার জ্ঞান জড়ো করতেন। লা বুল্লিয়ে তো পারসীয় পোশাক পরে তার দরবারে হাজির হয়েছিলেন। লুইসের সেবায় নিয়োজিত ছিল দু'জন বিখ্যাত আরবী ভাষাবিদ: লরেন্ট ডি আরভিয়াক্স এবং এন্টোইন গালান্ড।

লন্ডনের ভক্সহল গার্ডেনে ১৭৪৪ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত এ ধরনের একটি তাঁবু ছিল, যার ভেতরের খাবার কক্ষে ১৪-টি টেবিলের ব্যবস্থা পর্যন্ত ছিল। ইংল্যান্ডের দুটো বিখ্যাত তুর্কি তাঁবু ১৭৫০ খ্রিস্টাব্দের দিকে নির্মিত হয়। একটি তাঁবু সারের পেইনশিল গার্ডেনে অবস্থিত – এটার মালিক ছিলেন চার্লস হ্যামিল্টন এবং অপর তাঁবুটি উইল্টশায়ারের স্টুরহেডে অবস্থিত – এটার মালিক ছিলেন হেনরি কোল্ট হোর। ১৭৬৩ খ্রিস্টাব্দে পেইনশিল পরিদর্শনের পর জন পারন্যাল ওই তাঁবুর একটি জলচিত্র এঁকেছিলেন।

১৬শ শতাব্দির মেহমেদ বুরসেভির হুনেরনামা থেকে নেয়া অনুচিত্র, যেখানে সুলতান প্রথম সেলিমের মসনদে আরোহণের চিত্র চিত্রায়িত হয়েছে। বিভিন্ন ধরনের উর্দি রাজ দরবারের ভিন্ন পদমর্যাদার কর্মচারীদের নির্দেশ করছে। উচ্চপদস্থ কর্মচারী সুলতানের আলখাল্লার আঁচল ধরে চুমু খাচ্ছে। আলখাল্লার আঁচল ধরে চুমু খাওয়ার অটোমান রীতি মূলত বিশ্বস্ততা ও আনুগত্যের প্রতিনিধিত্ব করে।

স্টুরহেডের তাঁবুর স্থানে মিনারসহ মসজিদ নির্মাণের কথা থাকলেও পরবর্তীতে কেবল তাঁবুতেই সীমাবদ্ধ থাকে এবং এটা ১৭৯০ খ্রিস্টাব্দের দিকে বিধ্বস্ত হয়। ১৮শ শতাব্দির শেষার্ধে আয়ারল্যান্ডের উইকলোতে অবস্থিত ডেলগানিতে তৃতীয় আরেকটি তুর্কি তাঁবু স্থাপন করা হয়, কিন্তু আবহাওয়ার কারণে তাঁবুটি সেখানে টিকতে পারেনি।

তুর্কি তাঁবুর ইউরোপীয় অনুকরণে বহু ইসলামী স্থাপত্য ছাপ দৃশ্যমান। ১৮শ শতাব্দিতে স্থপতি জন ন্যাশ 'বিচিত্র বাহ্যিক প্রভাব'-বিশিষ্ট একটি রয়াল প্যাভিলিয়ন বানান, যা তার রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকদের পুরোপুরি তুষ্ট করেছিল। এ কাজে তিনি ১৮শ শতাব্দির ভূ-চিত্রকর থমাস ডেনিয়েলের দেয়া প্রাচ্যদেশের বিভিন্ন দৃশ্য ব্যবহার করেছিলেন। *Oriental Scenery* (প্রাচ্যের দৃশ্য) নামক গ্রন্থের রচয়িতা ডেনিয়েলকে এমন একটি ব্রিটিশ আবাসিক এলাকার নকশা প্রস্তুতে পরামর্শক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়, যেখানে থাকবে ছত্রী (গম্বুজসদৃশ প্যাভিলিয়ন) ও ঝুলন্ত ছাদের প্রান্তবিশিষ্ট কন্দাকার গম্বুজ, তীক্ষ্ণ ডগার খিলান এবং ভবন চূড়ার ন্যায় স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য। ব্রিংগটনের রয়াল প্যাভিলিয়নের কিছু অসম্পূর্ণ কাঠামোর নতুন মডেল বানাতে ন্যাশকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন ডেনিয়েল এবং পঞ্চম জর্জ এ কাজে ন্যাশকেই নিয়োগ দিয়েছিলেন। ভোজন ও সঙ্গীত কক্ষকে ঢেকে দেয়, তুর্কি খলীফাদের এমন রীতির তাঁবুর অনুকরণে তিনি ধনুকের ন্যায় বাঁকানো ছাদের সাথে কন্দাকার গম্বুজের সম্মিলন ঘটান। এছাড়া চিমনি ঢাকতে তিনি মিনারসদৃশ কাঠামো ব্যবহার করেছিলেন।

এ ধরনের নির্মাণশৈলীর ভবন আজও তার প্রভাব প্রদর্শন করে এবং এমন একটি ভবন হ্যাম্পশায়ারের ক্যান্টারবারিতে এখনো টিকে আছে। ভক্সহল গার্ডেনে অবস্থিত রোটুন্ডার ছাদ মূলত পর্যায়ক্রমিক নীল ও হলুদ স্ট্রাইপের একটি তাঁবু ছিল, যেটার অবলম্বন ছিল ২০-টি পিলার বা স্তম্ভ। ১৮২৭ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ লেখক ন্যাথানিয়েল হুইটক এটাকে পারসীয় প্যাভিলিয়ন বলে আখ্যায়িত করেছিলেন।

তাঁবু বেশ উপভোগ করতেন এবং নিজেদের আলাদা তাঁবু ছিল, এমন বিখ্যাত ব্যক্তিদের মাঝে রয়েছেন: ফ্রান্সের সম্রাজ্ঞী জোসেফাইন। মালমাইসনে তার একটি মুসলিম রীতির অনুকরণে নির্মিত তাঁবু কক্ষ ছিল, যেখানে রাজা পঞ্চম জর্জ প্রায়শ ভোজন করতেন। 'খলীফা' ডাকনামে পরিচিত হার্টফোর্ডের মারকুইসের একটি তাঁবু কক্ষ ছিল, যেটা ডেমিকাস বার্টন তার জন্য সেন্ট ডানস্টান'স হাউজে নির্মাণ করেছিলেন। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে এটা আগুনে পুড়ে যায় এবং ভিন্ন ডিজাইন দিয়ে পুনরায় নির্মাণ করা হয়।

হাঙ্গেরির বিরুদ্ধে চালিত মহামতি সুলতান সুলায়মানের সামরিক অভিযানের স্মৃতিকথা সম্বলিত একটি অটোমান পাণ্ডুলিপি। বিভিন্ন রঙের তাঁবুগুলো খুব সম্ভবত কসোবার লেপোসাভিক পৌরনগরে অবস্থিত ইবার নদীর তীরে স্থাপন করা ভিন্ন ভিন্ন সেনা ছাউনি নির্দেশ করছে। সংযুক্ত লিখনী ৯৫০ হিজরীর ২৩ সফর (১৫৪৩ খ্রিস্টাব্দের ২৪-শে মে) তারিখের সেনা শিবিরের তথ্য প্রদান করছে এবং এ তথ্য মোতাবেক সেনা ছাউনি দু'দিনে ছয় মাইল পথ অতিক্রম করেছে।

১১ শামিয়ানা ঢাকা দোকান থেকে কাচে ঘেরা কক্ষ

বসার সুবিধা থাকা – বাগান ছায়াঘর এবং স্থানীয় পার্ক, নগর-চত্বরে থাকা ব্যান্ডস্ট্যান্ড (*Bandstand* – ব্যান্ডশিল্পীদের নৈপুণ্য প্রদর্শনের বৃত্তাকার, অর্ধবৃত্তাকার বা বহুকোণী হলঘর) নিয়ে আমরা যাই ভাবি না কেন, এগুলো এসেছে তুর্কি কিয়স্ক বা কাশ্‌ক থেকে। কিয়স্ক প্রকৃতপক্ষে বাঁকানো পার্শ্ব ও চতুর্দিকে উন্মুক্ত কাঠামোর গম্বুজবিশিষ্ট হলঘর, যা সেলজুকদের আমলে জামে মসজিদের সাথে সংযুক্ত থাকতো। ক্রমান্বয়ে এটা বিবর্তিত হয়ে পরিণত হয় অটোমান সুলতানদের ব্যবহৃত ছায়াঘরে।

সিনিলি কাশ্‌ক এবং বাগদাদ কাশ্‌ক ছিল এ ধরনের কিয়স্কের মাঝে সর্বাধিক বিখ্যাত। ১৪৭৩ খ্রিস্টাব্দে ইস্তাম্বুলের তোপকাপি প্রাসাদে মুহাম্মদ আল-ফাতিহ কর্তৃক সিনিলি কাশ্‌কটি নির্মিত হয়। গম্বুজবিশিষ্ট দোতলা এই হলঘরের উন্মুক্ত অংশ দিয়ে প্রাসাদ থেকে বাগানের মনোরম দৃশ্য উপভোগ করা যেত। বাগদাদ কাশ্‌কটিও ১৬৩৮-১৬৩৯ খ্রিস্টাব্দে সুলতান চতুর্থ মুরাদ কর্তৃক তোপকাপি প্রাসাদের অভ্যন্তরে নির্মিত হয়। এটার একটি গম্বুজ ছিল এবং এখান থেকে প্রাসাদে থাকা বাগান, পার্ক এবং ইস্তাম্বুল শহরের যে অপরূপ স্থাপত্য দৃশ্য দেখা যেত, তা সত্যিই অপূর্ব ছিল।

কন্সট্যান্টিনোপলে নিয়োগকৃত ইংরেজ রাষ্ট্রদূতের স্ত্রী লেডি ওয়ার্টলে মন্টাগু পহেলা এপ্রিল ১৭১৭ খ্রিস্টাব্দে অ্যানি থিসলেথওয়েট বরাবর তার দেখা একটি 'কিয়স্ক'-এর বিবরণ দিয়ে লিখেন, "(এগুলো) লতানো গুল্মের সজ্জা বেষ্টিত নয় বা দশ হাত উঁচু হলঘর।" ইউরোপীয় রাজপরিবারই ইউরোপে কিয়স্ক নিয়ে আসে এবং পোল্যান্ডের রাজা পঞ্চদশ লুই এটা বিশেষভাবে পছন্দ করতেন, যেমনটি তার শ্বশুর লরেইন প্রদেশের স্টানিসলাস তুরস্কে বন্দী থাকাকালের স্মৃতি কাজে লাগিয়ে নিজের জন্য অনেকগুলো কিয়স্ক বানিয়েছিলেন। এই কিয়স্কগুলো কফি ও পানীয় পরিবেশনের জন্য বাগান প্যাভিলিয়ন হিসেবে ব্যবহৃত হলেও পরবর্তীতে এ ধরনের হলঘরগুলো ব্যান্ডস্ট্যান্ড এবং পর্যটন তথ্যবুথে রূপান্তরিত হয়, যা ইউরোপের বিভিন্ন বাগান, পার্ক এবং রাজপথের শোভাবর্ধনে দারুণ ভূমিকা রেখেছিল।

প্রতিটি ভাল নকশারই বিবর্তন ঘটে এবং কিয়স্কের ক্ষেত্রে তার বিবর্তন *Conservatory* (কনজারভেটরি) পর্যন্ত থেমেছে। কনজারভেটরি মূলত বাগান বা ইউরোপীয় বাড়িগুলোর পাশে নির্মিত কাচে ঘেরা গৃহ। ব্রিংগটনের রয়াল প্যাভিলিয়নের প্রথম দিককার কনজারভেটরিগুলি হাম্প্রি রেপটন নির্মাণ করেছিলেন। প্যাভিলিয়নকে ভিত্তির সাথে সংযোগ করে, এমন বারান্দা এবং কাচ আচ্ছাদিত ফুলের লম্বা সমারোহ দ্বারা সৃষ্ট পথ – এসব কনজারভেটরির কথা মানেই ব্যয়বহুল কিছু একটা। এগুলো কমলালেবুর বাগিচা, গ্রিনহাউজ, পক্ষীশালা, লম্বা লেজের মথুরা পাখির ঘের এবং উষ্ণ গ্রিনহাউজকে সংযুক্ত করে। লম্বা লেজের মথুরা পাখির ঘের মুসলিম ঐতিহ্যের প্রতিনিধিত্ব করে, কেননা এটা যে ভারতের এলাহাবাদ দুর্গের প্রাসাদের ছাদে থাকা কিয়স্কেরই আত্তীকরণ মাত্র।

ইউরোপের গ্রিনহাউজ বা কনজারভেটরিগুলো আসলে ইস্তাম্বুলের তোপকাপি প্রাসাদে নির্মিত কিয়স্কেরই বিবর্তন।
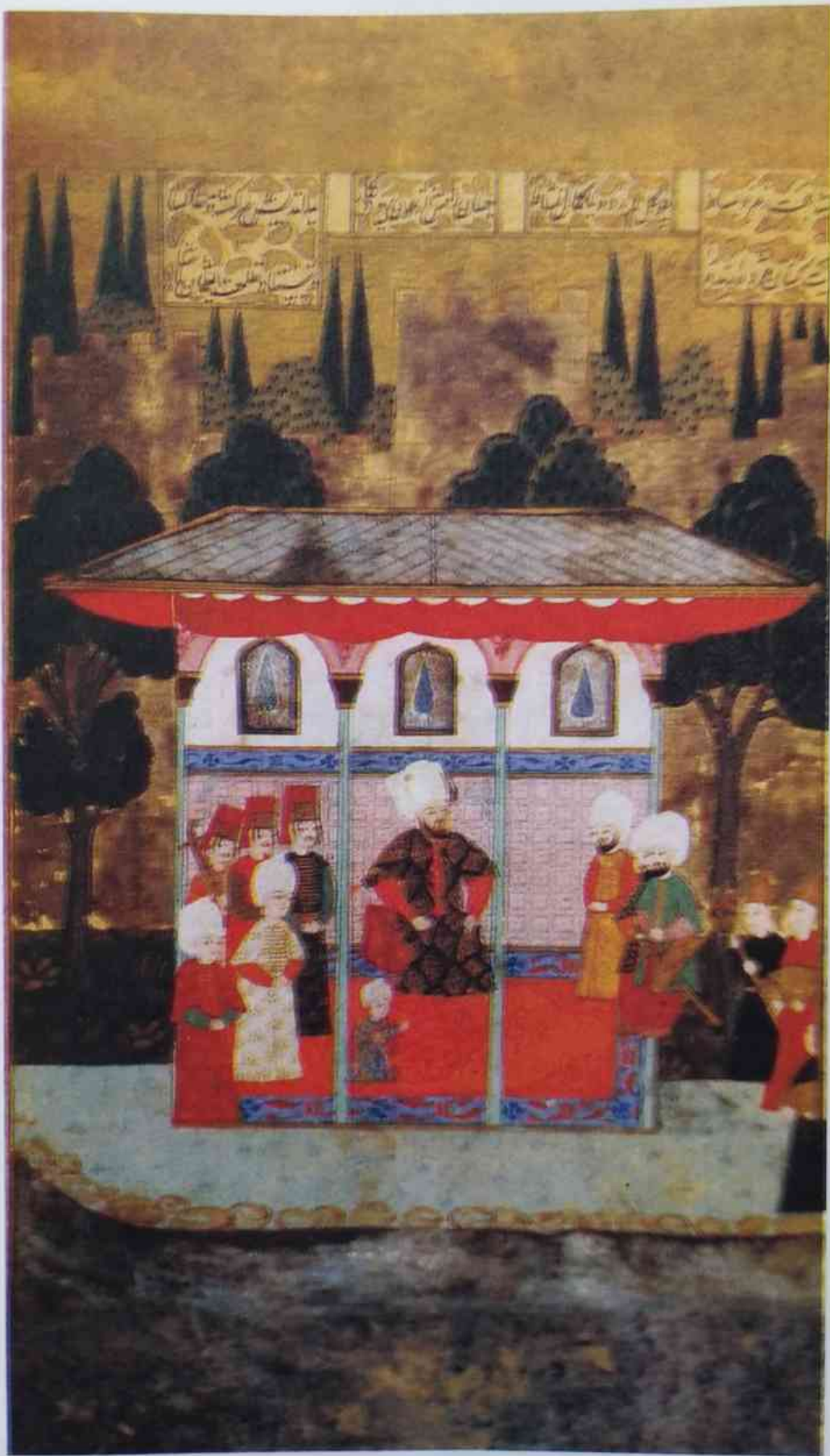
মির্জা আলী ইবনে তৃতীয় খাজিমকুলী কর্তৃক রচিত শাহিনশাহানামা-ই-মুরাদ নামের ১৬শ শতাব্দির এই পাণ্ডুলিপিতে দেখা যাচ্ছে: তৃতীয় সুলতান মুরাদ এবং তার পুত্র কিয়ক্কের মাঝে বসে আছেন।

১২ বাগান

মুষলধারে বৃষ্টি হবে না এই আশায় রদ্দুর দিনগুলোতে বাগানের ঘাস ছোট করা, কীটপতঙ্গ দমন, মাটিতে গর্ত খুঁড়ে ছুঁচো জাতীয় প্রাণিদের অন্যত্র সরানো এবং পাখিদের স্বাগত জানানোর পরিবেশ নিশ্চিত করাই একটি আদর্শ বাগানের দিনপঞ্জি। লতাগুল্মের সীমানা বেষ্টিত তৃণাচ্ছাদিত প্রান্তর ছিল ইউরোপের বেশিরভাগ বাগানের বৈশিষ্ট্য এবং এক্ষেত্রে যুক্তরাজ্যের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অভিজাত শ্রেণির বাড়ি বা আশ্রমের আঙ্গিনায় সীমাবদ্ধ ইউরোপের মধ্যযুগীয় বাগানগুলো প্রধানত ঔষধি-বৃক্ষ এবং নিজেদের পুষ্টি চাহিদা মেটাতে শাক-সবজি ও ফল-ফলাদি উৎপাদনেই সীমাবদ্ধ ছিল।

মুসলিমদের জন্য বাগান ছিল বরাবরের মতোই বিস্ময় ও মোহ জাগানোর অন্যতম উৎস, কেননা উদ্ভিদ, লতাগুল্ম, জীবজন্তু, পোকামাকড়সহ গোটা প্রকৃতিই তাদের নিকট আল্লাহর এক অপার অনুগ্রহ এবং তাঁর বড়ত্বের নিদর্শন। প্রকৃতির ব্যবহার, এটাকে উপভোগ করা এবং নৈতিকপন্থায় পরিবেশের পরিবর্তনে ইসলামের কোনো আপত্তি না থাকায় ইসলামী বাগানগুলো প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যশীল করে বানানো হতো এবং আজকের দিন পর্যন্ত মুসলিম মানসপটে বাগান বেশ উঁচু আসন দখল করে আছে।

সৌন্দর্য ও মহাপ্রশান্তির স্থান হিসেবে চিত্রায়িত জান্নাতু আদনের ন্যায় কুরআনের বহু জায়গায় বাগানের বিবরণ বিবৃত হয়েছে। ৮ম শতাব্দির পর থেকে এসব আসমানি স্বর্গোদ্যানের বর্ণিত নকশা মোতাবেক স্পেন থেকে ভারত পর্যন্ত বিস্তৃত মুসলিম বিশ্বে বাগান সৃষ্টির এক হিড়িক পড়ে। এর প্রায় একশ বছর পর আব্বাসীরা বাগান স্থাপনে তাদের নিজস্ব নকশা উদ্ভাবন করে নেয়। তখন থেকে বহির্জগৎ থেকে সাময়িক নির্জনতার প্রশান্তি লাভের জন্য পারস্য, স্পেন, সিসিলি ও ভারতসহ ইসলামী বিশ্বের সর্বত্র জ্যামিতিক বিন্যাসে সাজানো ফুলের কেয়ারি, সংকীর্ণ নালা ও ঝরনাবিশিষ্ট বাগান গড়ে উঠতে থাকে। স্পেনের গ্রানাডার আল-হামরা প্রাসাদ কিংবা ভারতের তাজমহলের দিকে তাকালে এ চিত্র সহজেই আপনার নজর কাড়বে।

আত্ম-উপলব্ধি ছাড়াও বাগানের বেশকিছু ব্যবহারিক দিক থাকায় আরব শাসকগণ বাগানে বিভিন্ন জাতের উদ্ভিদ ও লতাগুল্মের এক বিশাল সংগ্রহশালা গড়ে তুলেছিল। খাদ্যের যোগান নিশ্চিতের পাশাপাশি ঘরোয়া বাগানগুলো তো *রাওদ্বিয়াত* বা বাগান কাব্য নামের এক বিশেষ আরবী কাব্যরীতির সূচনা করে, যা বিভিন্ন আঙ্গিকে শ্রোতার মানসপটে স্বর্গীয় বাগানের স্মৃতিচিহ্নের জাগরুক ঘটায়।

১১শ শতাব্দির মুসলিম স্পেনের টলেডো এবং পরবর্তীতে সেভিলের মাধ্যমে ইউরোপ প্রথমবারের মতো রাজকীয় উদ্ভিদ উদ্যান বা বোটানিকাল গার্ডেনের সাথে পরিচিত হয়। রাজকীয় এই উদ্যানগুলো মধ্যপ্রাচ্য থেকে আনা বিভিন্ন উদ্ভিদ ইউরোপের পরিবেশে মানিয়ে নিতে পারছে কিনা, তা যাচাইয়ে ব্যবহৃত হতো।

এর প্রায় পাঁচ শতাব্দি পর বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠা ইতালির নগরগুলোর মাধ্যমে অবশিষ্ট ইউরোপ এ ধরনের বাগানের দেখা পায়। ফ্লোরেন্সের স্টিবার্ট বাগান

১৬শ শতাব্দির অনুচিত্রে মহামতি সুলতান সুলায়মানকে দেখা যাচ্ছে। মহামতি সুলতান সুলায়মানের আমলে সারাই বাগানগুলোতে ব্যাপক হারে টিউলিপের চারা লাগানো হয়েছিল।

মনোরম পুষ্পোদ্যানে শোভিত স্পেনের গ্রানাডার আল-হামরা প্রাসাদে জ্যামিতিক বিন্যাসে চারা রোপণ এবং পানির ফোয়ারা সমৃদ্ধ আদর্শ ইসলামী বাগানের নমুনা ফুটে উঠেছে।

থেকে ইংল্যান্ডের ব্রিংগটনের রয়াল প্যাভিলিয়ন পর্যন্ত ইউরোপের প্রায় সর্বত্র মুসলিম বাগানগুলোর ব্যাপক প্রভাব দৃশ্যমান।

মুসলিমদের থেকে কেবল বাগানের ধারণাই ইউরোপে প্রবেশে করেনি, বরং সেইসাথে প্রবেশ করেছে বেশকিছু ফুলও – যেগুলো ইউরোপের যেকোন স্থানীয় নার্সারীতে বর্তমানে সহজলভ্য হলেও আদতে এ ফুলগুলোর উৎস ভূমি সুদূর প্রাচ্য। কার্নেশান (সাদা, গোলাপী বা লাল রঙের সুগন্ধি ফুল), টিউলিপ এবং শ্বেতদূর্বা এমনি কিছু ফুল।

> "শুরুর দিকের মুসলিমরা যেখানে পেরেছে, সেখানেই বাগান গড়েছে – যা তাদের সামনে স্বর্গীয় বাগানের এক নজির তুলে ধরে। বিপুল সংখ্যক বাগান নিয়ে গর্ব করতে পারে, এমন ইসলামী শহরের তালিকা সত্যই বেশ দীর্ঘ। উদাহরণস্বরূপ, বসরা শহরের কথা উল্লেখ করা যায়; অসংখ্য বাগান ও ফলবাগানের মধ্য দিয়ে আঁকা-বাঁকাভাবে মাইলের পর মাইল বয়ে চলা নালাপথ দেখে তো শুরুর দিকের ভূগোলবিদরা এটাকে সত্যিকারের ভেনিস আখ্যা দিয়েছিলেন; মেসোপটেমিয়ার শহর নুসাইবিনের কথাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য; বলা হয় যে, এ শহরে ফলবৃক্ষ সম্বলিত ৪০,০০০ বাগান ছিল, অন্যদিকে দামেস্কে এ জাতীয় বাগান ছিল ১১০,০০০।"
>
> – অ্যান্ড্রু এম. ওয়াটসন, *Agricultural innovation in the early Islamic world* (১৯৮৩)
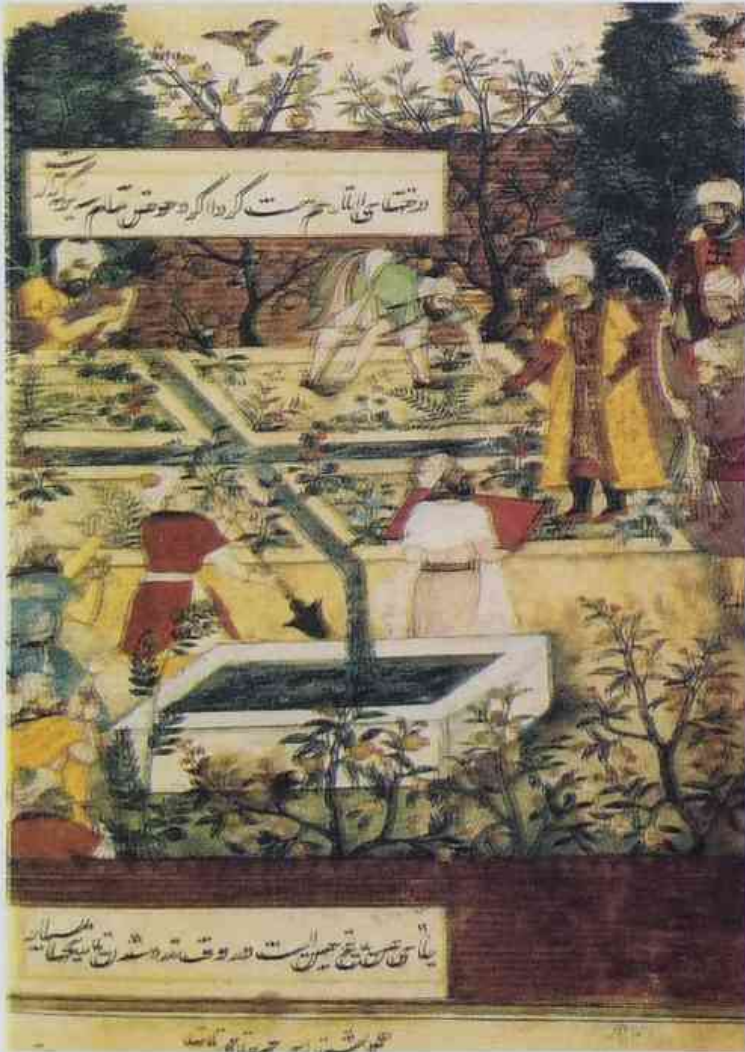
১৭শ শতাব্দির এই পান্ডুলিপিতে দেখা যাচ্ছে, সুলতান বাবর একটি নকশা ধরে আছেন এবং তার বাগানের মালীরা ফুলের কেয়ারির পরিমাপ ঠিক মতো নিচ্ছে কিনা, তিনি তা পর্যবেক্ষণ করছেন।

কিছু লোকের মতে, 'টিউলিপ' (*tulip*) শব্দটি এসেছে ফারসি دولبند (দুলবান্দ) শব্দ থেকে, যার অর্থ: পাগড়ি এবং লোকজন যেহেতু তাদের পাগড়িতে ফুল ব্যবহার করতো, হয়তো সেখান থেকেই নামটি উৎসারিত। অন্যদের মতে, টিউলিপ ফুলের জন্য ব্যবহৃত ফারসি দুলাব শব্দের ইংরেজি সংস্করণ এই 'টিউলিপ'। রাষ্ট্রদূত পর্যায়ে উপহারের আদান-প্রদানের মাধ্যমে পারস্যের টিউলিপ পৌঁছে যায় কন্সট্যান্টিনোপলে এবং সারাই বাগানসমূহ বিশেষভাবে ইস্তাম্বুলের তোপকাপি প্রাসাদের বাগানসমূহ টিউলিপের বিপুল সমারোহে ছেয়ে যায়।

টিউলিপের ইউরোপ অভিযানের তাৎপর্য হচ্ছে: সুপরিকল্পিত পন্থায় সুগন্ধি এবং রঙের আধিপত্য বিস্তার। এটার সূচনা ঘটে ১৫৫৪ খ্রিস্টাব্দে, যখন মহামতি সুলতান সুলায়মানের নিকট প্রেরিত হাবসবার্গের রাজদূত কাউন্ট ওগিয়ের ডে বাসবেক নিজের সাথে করে একটি টিউলিপ নিয়ে আসেন। এর প্রায় দশ বছর পর এটা তার বিখ্যাত 'আবাস' হল্যান্ডে পৌঁছায়। সারমোনেতার ডিউক ফ্রান্সিসকো কিয়াতানি ছিলেন একজন টিউলিপ সংগ্রাহক এবং ১৬৪০ খ্রিস্টাব্দের দিকে তার ইতালীয় বাগানে প্রায় ১৫,১৪৭-টি টিউলিপ ছিল।

মুসলিম দেশসমূহ থেকে ইউরোপের প্রবেশে পর থেকে টিউলিপ সেখানে তুমুল জনপ্রিয়তা লাভ করে।

প্রটেস্ট্যান্ট ধারার অনুসারী ফ্রান্সের নিপীড়িত হুগেনটস সম্প্রদায় বিভিন্ন দেশে পালিয়ে যাওয়ার সময় নিজেদের সাথে করে টিউলিপও নিয়ে যায়। অবশেষে, ১৬৮০ খ্রিস্টাব্দের দিকে স্যার জর্জ ওয়েলার নামের এক ইংরেজের হাত ধরে কন্সট্যান্টিনোপলের সারাই বাগান থেকে এটা চলে আসে ব্রিটেনে।

কার্নেশান এবং শ্বেতদুর্বা এতটা পথ পাড়ি না দিলেও এটা পারসীয় ও তুর্কি সিরামিকের শোভাবর্ধনে বেশ জনপ্রিয় ছিল। পাখা আকৃতির গড়নের কারণে ইযনিক মৃৎশিল্পে টিউলিপের সাথে কার্নেশানের সম্মিলিত নকশা বেশ দৃষ্টিনন্দন ও সফল ছিল। শোভাবর্ধনের জন্য এই নকশা ইউরোপে অনুসৃত হতে থাকে এবং ১৬৬০ থেকে ১৭০০ খ্রিস্টাব্দ সময়ে ইংল্যান্ডের ল্যামবেথে উৎপাদিত বেশকিছু সিরামিক সামগ্রীর গায়ে এ নকশা দেখা যায়।

অনুভূমিক ও বৃত্তাকার নকশাগুলোতে পারস্যের মৃৎশিল্পীগণ শ্বেতদুর্বার ব্যবহার করতেন এবং ১৬শ ও ১৭শ শতাব্দির সাফাভী আমলে এটা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিল। কার্নেশানের ন্যায় শ্বেতদুর্বাও ইউরোপীয় কারুকার্যে প্রভাব রাখতে সক্ষম হয়েছিল, যেমন: ব্রিস্টলের ডেলফ্‌ট সিরামিক নকশা।

১৩ ঝরনা

শ্রবণ ও দর্শন উভয় ইন্দ্রিয় ঝরনার কলতালে প্রফুল্ল হয়। যান চলাচল, রাস্তা খনন, আর ওদিকে কুকুরের ঘেউ ঘেউ - শোরগোলে ভরা দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করে ঝরনা আপনাকে দেয় প্রশান্তির আমেজ। কোলাহলে অনুভূত হয় না, এমন নীরব আলাপে একাকী মেতে থাকতে চাইলে চলে আসতে হবে ঝরনার কাছে; আর ঝরনাই পাখিদের দেয় নিরাপদ স্নানাগারের সুবিধা।

এক হাজার বছর পূর্বে ইসলামী বিশ্বে ঝরনা যেমনিভাবে ছিল বাগানের অপরিহার্য অংশ, ঠিক তেমনটি আজও সমভাবে সত্য। পানির সংকট থাকায় ওই সময়ে এ ধরনের প্রদর্শনী ছিল আভিজাত্যের চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ এবং এমন জল-প্রদর্শনীকে বিস্ময়ের বিষয় ভাবা হতো। ঝরনা পরিণত হয় ইসলামী শিল্প এবং স্থাপত্যের অন্যতম স্তম্ভে এবং এর সবচেয়ে চমৎকার উদাহরণ: স্পেনের আল-হামরা প্রাসাদের সিংহ উদ্যানের ঝরনা, যা ৬৫০ বছরেরও বেশি পুরানো। সুলতান পঞ্চম মুহাম্মদের নির্দেশে ১৩৫৪ থেকে ১৩৫৯ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে এই সিংহ উদ্যান নির্মিত হয়।

মার্বেল পাথর দিয়ে খোদাই করে বানানো ১২-টি সিংহ দিয়ে পরিবেষ্টিত এই ঝরনাতে রয়েছে বৃত্তাকার গামলা। শুরুর দিকে এই সিংহগুলো বেশ কারুকার্যময় ছিল এবং অনেকটা অংশ স্বর্ণ দিয়ে রঙ করা ছিল। এই সিংহগুলো জ্যোতির্বিদ্যার ১২ প্রতীক এবং ১২ মাসের প্রতিনিধিত্ব করে। চারিপাশে থাকা পর্বত থেকে নালাপথে এগুলোর মধ্যে পানি সরবরাহ করা হতো এবং মেঝেতে থাকা প্রণালীগুলো হয়ে পানি সিংহগুলোর মুখ দিয়ে বের হতো। আশ্চর্যজনকভাবে প্রণালীগুলো দিয়ে পানি প্রবাহের ক্ষেত্রে সময় বেঁধে দেয়ার এক জটিল ব্যবস্থা সংযুক্ত ছিল।

প্রতি ঘন্টায় একটি সিংহের মুখ দিয়ে পানি বের হতো, যা ছিল ১২ ঘন্টায় ১২ মাসের আবর্তনের এক ভিন্ন জাগতিক আমেজ। সময়হীনতার এই আমেজ বেশ তাৎপর্যপূর্ণ, কেননা সুরম্য এই প্রসাদকে দুনিয়ায় নেমে আসা এক টুকরো জান্নাত মনে করা হতো, আর জান্নাতে সময়ের অস্তিত্ব না থাকায় সেখানের অধিবাসীগণ বসবাস করবে অসীম সুখের সাথে।

এই অনন্য ঝরনার এক কোণায় লিখিত রয়েছে ইবনে ঝারমাকের লেখা কবিতা। ঝরনার সৌন্দর্য এবং সিংহগুলোর শক্তি বর্ণনার পাশাপাশি দর্শনার্থীদের হতবাক করা জলবাহী নালাগুলোর কার্যপদ্ধতির বিবরণও তাতে তুলে ধরা হয়েছে। অভিকর্ষ এবং পানির চাপ র্নিভর এই ব্যবস্থা আজও অবধি অপরিবর্তিত রয়েছে।

■ বনী মূসার ভাইদের ঝরনা

জান্নাতের সাথে পানির একটি সম্পর্ক থাকায় মুসলিম প্রকৌশলীরা জল-প্রদর্শনী এবং এর প্রবাহ ধারা নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন পন্থা উদ্ভাবনে বেশ সময় ব্যয় করে। ৯ম শতাব্দিতে এমন অনন্য উদ্ভাবনকুশনের স্বাক্ষর রেখেছিল বনী মূসার তিন ভাই।

উপরে: জল-ফোয়ারা ও ঝরনা দুনিয়া জুড়ে বাগানের চোখ জুড়ানো অংশ। নিচে: ৬৫০ বছরেরও পুরানো স্পেনের আল-হামরা প্রসাদের সিংহ ঝরনা। এটা মনে করা হয় যে, ১২-টি সিংহ মিলে জলঘড়ি নির্দেশ করছে। বিধিবদ্ধ সময় ব্যবস্থার আলোকে সিংহের মুখ দিয়ে পানি বের হতো। প্রথম সিংহের মুখ দিয়ে পানির বের হওয়ার মানে এক ঘন্টা পার হয়েছে, আর এভাবে প্রতি ঘন্টা পরপর একটি সিংহের মুখ দিয়ে পানি বের হতো।

বনী মূসার ভাইদের ঝরনার তিনটি মৌলিক স্টাইল

একটি পাইপ নিক্তির কাজ করতো, যা প্রধান জলাধার থেকে পানি বহন করতো। এটার দুটো অবস্থান ছিলঃ অনুভূমিক ও উত্তোলিত। অনুভূমিক অবস্থায় জলাধার থেকে পানি বাম ট্যাংকে প্রবেশ করতো এবং মুকুল অবয়বের মধ্য দিয়ে যাওয়া পানি ভর্তি এই পাইপগুলো বর্শা-আকৃতির ঝরনা সৃষ্টি করতো। এমনটি ঘটার সময় নিক্তির বাহুর সাথে সংযুক্ত ছোট পাত্রগুলো ধীরে ধীরে পানিপূর্ণ হয়ে উঠতো। ফলে এটা নিক্তির বাহুতে আলতো আঘাত দিয়ে নিক্তির উত্তোলিত অংশকে সচল করতো। উত্তোলিত অবস্থায়, প্রধান জলাধার থেকে পানি নালাপথ ধরে ডান ট্যাংকে প্রবেশ করে ঢাল-আকৃতির মুকুল সৃষ্টি করতো। পাশে থাকা ছোট পাত্রগুলো ধীরে ধীরে খালি হতে শুরু করে যতক্ষণ না নিক্তি উত্তোলিত অবস্থা থেকে অনুভূমিক অবস্থায় ফিরছে এবং প্রধান জলাধারে পানি থাকা পর্যন্ত প্রক্রিয়াটির পুনরাবৃত্তি দীর্ঘ সময় ধরে চলতে থাকে।

লিলি

ঢাল

বর্শা

বনী মূসার ভাইদের উদ্ভাবিত ঝরনার প্রধান তিনটি নকশার একটি চিত্রায়ন।

জাফর মুহাম্মদ, আহমাদ এবং আল-হাসান নামের তিন ভাই মিলে "*কিতাবুল হিয়াল*" (*উদ্ভাবনকুশলী ডিভাইস*) শীর্ষক গ্রন্থ রচনা করে, যেখানে প্রতিনিয়ত আকৃতি বদল করে – এমন ঝরনার বিবরণ রয়েছে। এসব ঝরনার জমকালো অবয়ব ও বিভিন্ন গঠনের জলকেলির কারণে ৯ম শতাব্দি, এমনকি আজকের দিনেও এসব ঝরনা এক ধরনের রহস্য ও আশ্চর্যের পরিবেশ সৃষ্টি করে।

"নিশ্চিতভাবে, আল্লাহ-ভীরু মুত্তাকীরা থাকবে বাগান ও
ঝরনার মাঝে।" – কুরআন (৫১:১৫)

বনী মূসা ভাইদের ঝরনার নকশাগুলো সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম প্রযুক্তিতে সমৃদ্ধ, যেমনঃ *worm gear* (খাঁজওয়ালা গিয়ার), ভালব, নিক্তি বাহু এবং পানি ও বাতাসের টার্বাইন। এগুলো নকশাবিদ ও কারিগর হিসেবে তাদের যোগ্যতার মাত্রা তুলে ধরে। ঢাল, বর্শা এবং লিলি হচ্ছেঃ তিন ভাইয়ের উদ্ভাবিত ঝরনার তিনটি মৌলিক স্টাইল এবং তিনটি স্টাইল একই ঝরনা থেকে তাদের আকৃতি বদলের কারিশমা দেখাতো। প্রকৃতপক্ষে, নির্দিষ্ট সময় পরপর ঝরনার আকৃতি বদল – বর্শা আকৃতি থেকে ঢাল আকৃতি ধারণ এবং আবার সে আকৃতিতে ফিরে যাওয়া – ছিল তৎকালে সবচেয়ে অভাবনীয় কীর্তির অন্যতম। কিন্তু কাজটি করার জন্য ঝরনার উপরে থাকা বিশালাকার চৌবাচ্চা পূর্ণ করে কাঙ্ক্ষিত আকৃতি পাওয়ার জন্য উপযুক্ত চাপ সৃষ্টি করতে হতো।

কিছু ঝরনা *worm gear* (খাঁজওয়ালা গিয়ার) এবং সুনিপুণ ফাঁপা 'নাভি' ভাল্‌ভ বিশিষ্ট ছিল। মানুষের নাভির মতো দেখতে, তাই এটা নাভি ভাল্‌ভ নামে পরিচিত এবং কী আকৃতিতে পানি নির্গত হবে, তা এই ভাল্‌ভ নির্ধারণ করতো।

প্রবহমান পানির গতিকে ঘূর্ণায়মান পাইপে সঞ্চারিত করার জন্য খাঁজ এবং চাকার ব্যবহার ছিল প্রকৌশল বিজ্ঞানে গতি নিয়ন্ত্রণের উদ্ভাবন। এটা প্রকৌশল বিজ্ঞানে নব দিগন্তের সূচনা ঘটায়। কেননা গতি নিয়ন্ত্রণ ছিল শিল্প বিপ্লবের সময়কার অটোমেটিক বা স্বয়ংক্রিয় মেশিন উদ্ভাবনের গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক।

বর্তমানের ঝরনাগুলো সর্বাধিক প্রযুক্তি ব্যবহারের এই ঐতিহ্যকে ধরে রেখে সামনে এগিয়েছে; সময়ের সাথে এর সাথে যুক্ত হয়েছে আলোকসজ্জা ও সুরের তালে ফোয়ারা দিয়ে পানির নির্গমন। এক সহস্রাব্দ পর, পানি এবং মানবীয় সৃজনশীলতার এই মিশেল আজও আমাদেরকে সমানভাবে মুগ্ধ করে।
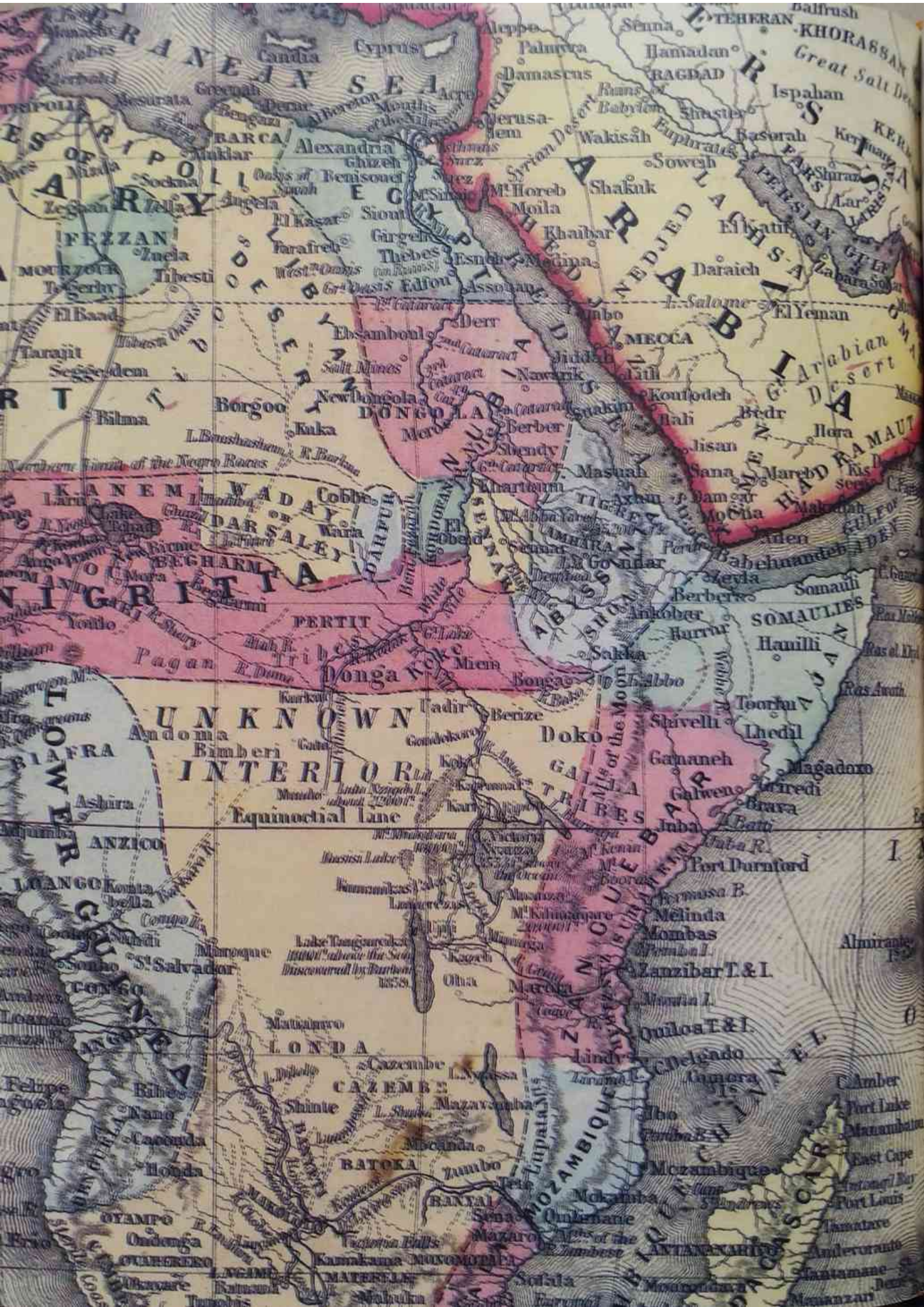
সপ্তম অধ্যায়

"লোকমুখে যাই প্রচলিত থাক না কেন, পৃথিবী গোলাকার ... এর প্রমাণ হচ্ছেঃ পৃথিবীর কোনো নির্দিষ্ট স্থানের সাপেক্ষে সূর্য সর্বদা খাড়া থাকে।"

– ইবনে হাযম, ১০ম শতাব্দির কর্ডোবা নিবাসী অতুলনীয় প্রতিভা

বিশ্ব

পৃথিবী গৃহ • ভূ-বিজ্ঞান • প্রাকৃতিক ঘটনা
ভূগোল • মানচিত্র • পর্যটক এবং অভিযাত্রী
নৌচালন-বিদ্যা • নৌ অভিযান • বৈশ্বিক যোগাযোগ
যুদ্ধ এবং যুদ্ধাস্ত্র • সমাজ বিজ্ঞান এবং অর্থনীতি

আজ যেকেউ বিমানের একটি টিকিট নিয়ে দেশ-বিদেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারলেও দুনিয়া ঘুরে বেড়ানোর এই ধারণা আধুনিক কিছু নয়। বিমান, ট্রেন ও মোটরগাড়ির সৌভাগ্য না থাকলেও মধ্যযুগীয় মুসলিমরা জ্ঞানার্জন ও বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে মক্কাতে বাৎসরিক হজ্জব্রত পালনের আকাঙ্ক্ষা নিজেদের অন্তরে সযত্নে লালন করতো। নিজেদের দুনিয়া আবিষ্কারের জন্য তারা ছিলেন সুবিখ্যাত। তাদের বিচিত্র অভিজ্ঞতা থেকে আমরা পাচ্ছি পূর্ণাঙ্গ ভ্রমণ কাহিনী, যা আমাদের সামনে তুলে ধরে মধ্যযুগীয় দুনিয়ার এক সমৃদ্ধ চিত্র।

নিজের চারিপাশ পর্যবেক্ষণ এবং হিসেব নিরূপণের মাধ্যমে মুসলিমরা চাইতো তারা যেন তাদের পরিবেশের বোধগম্য ব্যাখ্যা দাঁড় করানোর ক্ষেত্রে একটু হলেও অবদান রাখতে পারে। পৃথিবী যে নিজ অক্ষকে কেন্দ্র করে আবর্তন করছে, এই তত্ত্ব গ্যালিলির ৬০০ বছর পূর্বেই আল-বিরুনী আলোচনা করেছিলেন এবং একইসাথে জোয়ার-ভাটা বিষয়টিরও ব্যাখ্যা তিনি দিয়েছিলেন। কেউ বের করেছিলেনঃ আকাশ নীল হওয়া এবং রংধনু সৃষ্টির কারণ, আবার কেউ হিসেব করেছিলেন পৃথিবীর পরিধি। যোগাযোগ ব্যবস্থার উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি এবং কোনো এক সুলতানের তাজা চেরি ফল খাওয়ার বাসনা সূচনা করেছিল পায়রা-ভিত্তিক ডাক ব্যবস্থার।

পূর্ববর্তী সহস্রাব্দ দেখেছে কীভাবে আল-কিন্দী সাংকেতিক বার্তা বিশ্লেষণের ভিত্তি দাঁড় করিয়েছিলেন, যার ভিত্তিতে যুদ্ধকালীন সময়ে গোপন বার্তা আদায়-প্রদানের রীতি চালু হয়। এক হাজার বছর পূর্বেকার বৈশ্বিক চিন্তার অগ্রদূতদের দুনিয়া কেমন ছিল, তা জানতে এখনই হারিয়ে যান এই বিভাগের অধ্যায়গুলোতে।

উল্টো পৃষ্ঠার চিত্রঃ বিভিন্ন দেশ ভ্রমণের চাক্ষুষ বিবরণ লিপিবদ্ধ করতে মুসলিম পর্যটকদের জুড়ি মেলা ভার।

০১ পৃথিবী গ্রহ

একটা সময় ছিল, যখন কেউ যদি বলতো: পৃথিবী জল ও স্থল বেষ্টিত গলিত ও উত্তপ্ত ধাতুর এক ছাচ, যা হেলানো ও কম্পিত অবস্থায় নিজ অক্ষকে কেন্দ্র করে আবর্তন করছে, একইসাথে এটা উপবৃত্তাকার পথে প্রকাণ্ড এক অগ্নি গোলাকের চারিপাশে ঘুরছে, তখন যেকেউ এমন কথাকে পাগলের প্রলাপ বলে উড়িয়ে দিতো। কিন্তু বহু সভ্যতার বহু শতাব্দির পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের মাধ্যমে আমরা এ ব্যাপারে নিশ্চিত হয়েছি যে, এককালের পাগলের প্রলাপই আসল বাস্তবতা এবং এটাই পৃথিবী নামক গ্রহের গঠনশৈলী।

খ্রিস্টপূর্ব ১২৭-১৫১ সময়কালের এই তুমুল বিতর্কের অন্যতম আদি চিন্তাবিদ টলেমি। তৎকালীন পৃথিবীকেন্দ্রীক মহাবিশ্ব ব্যবস্থা বর্ণনার সময় প্রাচীন আমলের এই জ্যোতির্বিদ ও গণিতজ্ঞ পর্যবেক্ষণ দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, স্থির নক্ষত্রসমূহের দ্রাঘিমারেখা প্রতি শতাব্দিতে ১ ডিগ্রি বা প্রতি বছর ৩৬ সেকেন্ড করে সরে যায়। এই সরে যাওয়াটা বর্তমানে *'the precession of the equinoxes'* (অয়নচলন – সূর্যের বিষুবরেখা অতিক্রমণের সময় প্রতি বছর একটু এগিয়ে আসা) হিসেবে পরিচিত; অর্থাৎ পৃথিবীর বিষুবরেখার স্ফীতির উপর সূর্য ও চাঁদের মহাকর্ষীয় টানে পৃথিবী নিজ কক্ষপথ আবর্তনের সময় স্বীয় ঘূর্ণন অক্ষ থেকে ধীরে ধীরে হেলে পড়ছে।

আজ আমরা জানি যে, ২৫,৭৮৭ বছরের চক্রাকার সময়কালে এই হেলে পড়াটা সূর্য থেকে নিকট ও দূর উভয় অবস্থায় পৃথিবীর সময়ের উপর প্রভাব ফেলে, যা শেষমেশ বিভিন্ন ঋতুর আগমন ও প্রস্থানে প্রভাব রাখে। এর মানে দাঁড়াচ্ছে: তারকা এবং নক্ষত্রপুঞ্জ ধীরে ধীরে পশ্চিম অভিমুখে বিচ্যুত হচ্ছে।

অয়নচলনের যে হিসেবে টলেমি বের করেছিলেন, সেটার চেয়ে মুসলিম জ্যোতির্বিদদের হিসেব নির্ভুলের একেবারে নিকটে ছিল। ১০ম শতাব্দির বাগদাদের সুবিখ্যাত জ্যোতির্বিদ মুহাম্মদ আল-বাত্তানী বলেন, অয়নচলনের মাত্রা প্রতি ৬৬ বছরে ১ ডিগ্রি বা বার্ষিক ৫৪.৫৫ সেকেন্ড অথবা পূর্ণ আবর্তনের জন্য ২৩,৮৪১ বছর। ১০০৯ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণকারী ইবনে ইউনূস বলেন, এই পরিবর্তন প্রতি ৭০ বছরে ১ ডিগ্রি বা বার্ষিক ৫১.৪৩ সেকেন্ড অথবা পূর্ণ আবর্তনের জন্য ২৫,১৭৫ বছর। বার্ষিক ৫০.২৭ সেকেন্ড অথবা পূর্ণ আবর্তনের জন্য ২৫,৭৮৭ বছরের বর্তমান যে হিসেব রয়েছে, তার সাথে আশ্চর্যজনকভাবে মুসলিমদের এ হিসেব নির্ভুলতার বেশ নিকটতর।

উপবৃত্তাকার কক্ষপথে পরিভ্রমণের সময় পৃথিবীর অক্ষরেখা হেলে থাকে এবং এটাই পৃথিবীর বিভিন্ন ঋতু সৃষ্টির জন্য দায়ী। উদাহরণস্বরূপ, উত্তর গোলার্ধ সূর্যের দিকে হেলে থাকলে আমরা গ্রীষ্মকাল অনুভব করি। ঋতু বৈচিত্র নিয়ে মুসলিমদের আলোচনা থেকে এটা স্পষ্টত প্রতীয়মান যে, তাদের পর্যবেক্ষণ ও হিসেবে পৃথিবীর এই হেলানো অবস্থা অন্তর্ভূত ছিল।

হেলানো অবস্থার নির্ভুল হিসেব আবিষ্কার ছিল টলেমি পরবর্তী জ্যোতির্বিদ ও গণিতবিদদের মধ্যে শতাব্দিকাল ধরে চলা তুমুল বিতর্কের বিষয়। সূর্যের মধ্যরেখার একটি সিরিজ পর্যবেক্ষণের জন্য ১০ম শতাব্দির শেষদিকে তাজিকিস্তান নিবাসী গণিত ও জ্যোতিষশাস্ত্রে পারদর্শী আল-খুজান্দী ইরানের তেহরানের নিকটস্থ রাঈ শহরে একটি মানমন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এটা তাকে সূর্যের সাপেক্ষে পৃথিবীর অক্ষরেখার হেলানো অবস্থা অত্যন্ত নির্ভুলভাবে পরিমাপের সুযোগ করে দিয়েছিল।

আজ আমরা জানি, এই হেলানো অবস্থা প্রায় ২৩°৩৪′ (২৩ ডিগ্রি ৩৪ মিনিট)-এর কাছাকাছি, অন্যদিকে আল-খুজান্দীর হিসেবে মোতাবেক তা: ২৩°৩২′১৯″ (২৩ ডিগ্রি ৩২ মিনিট ১৯ সেকেন্ড) – যা বর্তমান হিসেবের বেশ নিকটতর। এই তথ্যের ভিত্তিতে তিনি প্রধান শহরগুলোর অক্ষাংশ এবং দ্রাঘিমারেখার একটা তালিকা পর্যন্ত প্রস্তুত করেছিলেন।

এই আবিষ্কারের এক শতাব্দি পূর্বে নবম শতাব্দির আলোকিত মননের অধিকারী খলীফা আল-মামুন পৃথিবীর পরিধি নির্ণয়ে একদল মুসলিম জ্যোতির্বিদ নিয়োগ দিয়েছিলেন। স্থলজ ডিগ্রির দৈর্ঘ্য পরিমাপের সাহায্যে তারা কাজটি করেছিল। তাদের হিসেবে স্থলজ ডিগ্রির দৈর্ঘ্য ৫৬,৬৬৬ আরবীয় মাইল বা ১১১,৮১২ কিলোমিটার (৬৯,৪৭৭ মাইল) এবং এই ভিত্তিতে পৃথিবীর পরিধি তাদের নিকট: ৪০,২৫৩.৪ কিলোমিটার (২৫,০১২ মাইল)। পৃথিবীর পরিধির নির্ভুল পরিমাপ আজ আমরা অবগত আছি এবং তা বিষুবরেখার নিকট: ৪০,০৬৮.০ কিলোমিটার (২৪,৮৯৭ মাইল) এবং মেরুরেখা বরাবর: ৪০,০০০.৬ কিলোমিটার (২৪,৮৫৫ মাইল)। এ হিসেব থেকে এটা সহজেই অনুমেয় যে, এই জ্যোতির্বিদগণ নির্ভুল হিসেব থেকে খুব একটা পিছিয়ে ছিল না।

১১শ শতাব্দির বহুশাস্ত্রবিদ আল-বিরুনী রসিকতাচ্ছলে বলেন, "পৃথিবীর পরিধি নির্ণয়ে বিকল্প আরেকটি পথ রয়েছে এবং এর জন্য মরুভূমি চষে বেড়াতে হয় না।" তিনি *geodesic* বা ভূমিতিক বক্ররেখার অত্যন্ত জটিল সমীকরণ ব্যবহার করে পৃথিবীর পরিধি হিসেবে করেছিলেন এবং পুরো বিষয়টি তিনি তার "*তাহদীদ নিহায়াত আল-আমাকিন লি-তাসহীহ মাসাফাত আল-মাসাকিন*" (শহরসমূহের স্থানাঙ্ক নির্ণয়) শীর্ষক গ্রন্থে তুলে ধরেছিলেন। বর্তমান সময়ের লেখক লেন বারগ্রেন বলেন, "এটা সন্দেহাতীতভাবে আল-বিরুনীর মনে এনে দিয়েছিল সীমাহীন আনন্দ, যখন তিনি দেখেন: সাধারণ একটি গাণিতিক সমীকরণের সাথে পরিমাপ একত্র হয়ে এমন কাজ করতে সক্ষম, যা সম্পন্ন করতে জরিপকারীদের দুটো দলকে মরুভূমির বুকে দীর্ঘপথ পাড়ি দেয়া লাগে।"

আল-বিরুনীর গ্রন্থে পৃথিবীর পরিধি পরিমাপের নিয়মতান্ত্রিক ও বিস্তারিত গবেষণা লিপিবদ্ধ রয়েছে এবং এর পাশাপাশি তিনি অক্ষাংশ, দ্রাঘিমা, ভূ-পৃষ্ঠের বিপরীত বিন্দুস্থ দুটো স্থান এবং পৃথিবী বৃত্তাকার গঠন নিয়েও আলোচনা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে, নিজের যুগের চেয়ে এগিয়ে থাকা এই মনীষী গ্যালিলির প্রায় ৬০০ বছর পূর্বেই নিজ অক্ষ কেন্দ্র করে পৃথিবীর ঘূর্ণন ক্রিয়া তত্ত্বটি আলোচনা করেছিলেন।

পৃথিবী গোলাকার – আল-বিরুনীসহ বহু শিক্ষিত মুসলিমই এটাকে স্বতসিদ্ধ বিষয় মনে করতেন। ১০ম শতাব্দির কর্ডোবা নিবাসী অতুলনীয় প্রতিভা ইবনে হাযম বলেন, "লোকমুখে মাঝে যাই প্রচলিত থাক না কেন, পৃথিবী গোলাকার ... এর প্রমাণ হচ্ছে: পৃথিবীর কোনো নির্দিষ্ট স্থানের সাপেক্ষে সূর্য সর্বদাই খাড়া থাকে।" লোককাহিনি ও রূপকথার বদলে মুসলিম বিজ্ঞানীগণ পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের মাধ্যমে যুগান্তকারী গবেষণাকে নিজেদের মত গঠনের প্রধান অবলম্বনে পরিণত করেছিলেন, এটা তারই আরেকটি দৃষ্টান্ত।

০২ ভূ-বিজ্ঞান

মহাবিশ্ব, মানবতা ও জীবন নিয়ে মুসলিম সভ্যতার স্বাভাবিক দৃষ্টিভঙ্গি বিশেষভাবে লক্ষণীয়ভাবে। খনিজ পদার্থ, শিলা, পর্বত, ভূমিকম্প এবং পানির উৎস নিয়ে মুসলিম বিজ্ঞানীদের কৌতূহলের পাশাপাশি এগুলো নিয়ে তাদের ভাবনার অন্ত ছিল না।

খনিজ পদার্থ, মূল্যবান রত্ন এবং মণি পাথরের বিভিন্ন প্রকার সম্পর্কে প্রাচীন মিশর, মেসোপটেমিয়া, ভারত, গ্রিক এবং রোমের অধিবাসীরা অবগত ছিল। বস্তুত, এই অঞ্চলগুলোর অধিকাংশই পরবর্তীতে পরিণত হয় ইসলামী খিলাফতে। অন্যসব বিষয়ের মতো মূল্যবান রত্ন-পাথর ও খনিজ বিষয়ক রচনাবলী যখন ইসলামী বিশ্বের প্রথম ৩০০ বছরের মধ্যে আরবীতে অনূদিত হতে থাকে, তখন থেকেই মুসলিম বিজ্ঞানী ও অনুসন্ধানীগণ সেগুলোর উপর ব্যাপক অধ্যয়ন ও গবেষণা-যজ্ঞ শুরু করে দিয়েছিল।

ইসলামী বিশ্ব যে বিস্তৃত অঞ্চল নিজেদের সাম্রাজ্যভুক্ত করেছিল, তার স্বাভাবিক তাৎপর্য হচ্ছেঃ মুসলিম পণ্ডিতগণ যে ধরনের ভূ-বিজ্ঞানের বিকাশ ঘটাবেন, গ্রিকদের ন্যায় তা কেবল ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে সীমাবদ্ধ থাকবে না, বরং ইউরোপ, এশিয়া এবং আফ্রিকার ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ ভৌগোলিক এলাকাগুলোকেও গবেষণার আওতায় নিয়ে আসবে। মালয় দ্বীপপুঞ্জের ন্যায় দূর-দূরান্ত থেকে খনিজ পদার্থ, উদ্ভিদরাজি ও জীবজন্তু বিষয়ক জ্ঞান আসতে থাকে এবং সেগুলো জায়গা করে নিতে থাকে মুসলিম মনীষীদের গ্রন্থসমূহে – ১১শ শতাব্দির পণ্ডিত ইবনে সীনার "*আশ-শিফা*" তেমনি এক গ্রন্থের নমুনা, বস্তুত যা ছিল দর্শন ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের এক অপ্রতিদ্বন্দ্বি বিশ্বকোষ।

পশ্চিমা মহলে *আবিসিনা* নামে পরিচিত ইবনে সীনা ছিলেন মুসলিম সভ্যতার অতুলনীয় বৈজ্ঞানিক সমৃদ্ধির এক আদর্শ সৃষ্টি, যদিও ভূ-বিজ্ঞানে অবদানের চেয়ে বর্তমানে তিনি চিকিৎসা ও দর্শনশাস্ত্রের জন্য সমধিক পরিচিত। তথাপি তার "*আশ-শিফা*" গ্রন্থে খনিজ ও আবহাওয়া-বিজ্ঞান নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায় অন্তর্ভূত আছে, যেখানে তিনি পৃথিবীতে কী কী ঘটে, তা নিয়ে তার সময় পর্যন্ত প্রচলিত জ্ঞানের একটা পূর্ণাঙ্গ বিবরণ দিয়েছেন। লাতিন অনুবাদের মাধ্যমে তা রেনেসাঁয় আলোকিত ইউরোপে পরিচিত হয়ে উঠে এবং তা পরিণত হয় ইউরোপের ভূতাত্ত্বিক চিন্তাবিদদের প্রধান অনুপ্রেরণার উৎসে – ১৫শ শতাব্দির লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি, ১৭শ শতাব্দির নিকোলাস স্টিনো এবং ১৮শ শতাব্দির জেমস হাটন ছিলেন তেমনি কিছু দৃষ্টান্ত।

১১শ শতাব্দির শুরুর দিকের পণ্ডিত আল-বিরুনী তার জীবনের গুরুত্বপূর্ণ একটা অংশ ভারতে কাটান। তিনি অত্যন্ত নির্ভুলভাবে গঙ্গা নদীর অববাহিকার পাললিক গঠনের বিবরণ দিয়েছিলেন।

জ্ঞানের সীমাকে পাড়ি দেয়া একমাত্র মুসলিম পণ্ডিত ইবনে সীনাই ছিলেন না, বরং ভূ-বিজ্ঞানের এই তালিকায় আছেন ইবনে সীনার সমসাময়িক আরেক মনীষী – আল-বিরুনী। ৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে খাওয়ারিযমে জন্ম নেয়া আল-বিরুনীকে একটি শাস্ত্রে সীমাবদ্ধ করা সম্ভব নয়, কারণ গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসা, দর্শন, ইতিহাস, ফার্মাসি এবং ভূ-বিজ্ঞানসহ জ্ঞানের বহু শাখায় তিনি পারদর্শী ছিলেন।

তার জীবনের উল্লেখযোগ্য একটা সময় ভারতে অতিবাহিত হয়, যেখানে তিনি সেখানকার মানুষ, তাদের ধর্ম, কৃষ্টি-কালচার এবং গুরুত্বপূর্ণ স্থান পর্যবেক্ষণের পাশাপাশি সেখানের স্থানীয় ভাষা পর্যন্ত রপ্ত করেছিলেন। এই পুরো অভিজ্ঞতা তিনি তার "*তাহকীক মা লিল-হিন্দ মিন মাকুলাতি মাকবুলাতি ফী আকলি আও মারযুলাতি*" (ভারত তত্ত্ব) নামক গ্রন্থে জমা করেছেন। হিন্দি বলার পাশাপাশি তিনি গ্রিক, সংস্কৃত ও সিরিয়াক ভাষাও জানতেন, যদিও তার সমস্ত গ্রন্থ আরবী ও ফারসিতে রচিত। তিনি অত্যন্ত নিবিড়ভাবে ভারতের প্রাকৃতিক ইতিহাস ও ভূতত্ত্ব পর্যবেক্ষণ করেছিলেন; গঙ্গা নদীর অববাহিকার পাললিক গঠনের নির্ভুল বিবরণের মাঝে আমরা সেটার নমুনা দেখতে পাই। খনিজবিজ্ঞান বিষয়ে তার রচনা "*আল-জামাহির ফী মারিফাতিল জাওয়াহির*" (মূল্যবান রত্নপাথর চিহ্নিতকরণ পদ্ধতি) তাকে এনে দেয় এই বিদ্যার অপ্রতিদ্বন্দ্বি বিজ্ঞানীর খেতাব।

ভূতত্ত্ব বিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করার পিছনে আরও বহু মুসলিম বিজ্ঞানীর রয়েছে অসামান্য অবদান।

ইয়াহইয়া ইবনে মাসাওয়ী (মৃ. ৮৫৭)-এর রচনা: "*আল-জাওয়াহির ওয়া সিফাতিহা*" (মূল্যবান রত্নপাথর এবং তাদের বৈশিষ্ট্য)। আল-কিন্দী (মৃ. আনুমানিক ৮৭৩) লিখেছেন তিনটি প্রবন্ধ, যার মাঝে: "*আল-জাওয়াহির ওয়াল আশবাহ*" (মূল্যবান রত্নপাথর এবং সেগুলোর সদৃশ) সর্বাধিক প্রসিদ্ধ হলেও তা আর এখন পাওয়া যায় না। ১০ম শতাব্দির পণ্ডিত আল-হামাদানী আরবের উপর তিনটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, যেখানে তিনি স্বর্ণ, রুপা, অন্যান্য খনিজ ধাতু ও মূল্যবান পাথর অনুসন্ধানের প্রক্রিয়া এবং সেগুলোর বৈশিষ্ট্য ও প্রাপ্তির স্থানের বিবরণ পর্যন্ত লিপিবদ্ধ করেছিলেন। *ইখওয়ানুস সাফা* বা পবিত্রতার ভ্রাতৃসংঘ নামে পরিচিত ১০ম শতাব্দির একদল পণ্ডিত "*রাসাইল*" নামে বিশ্বকোষতুল্য প্রবন্ধমালা রচনা করেছিল, যেখানে খনিজ পদার্থ এবং বিশেষভাবে সেগুলোর প্রকারভেদ নিয়ে বিস্তর আলোচনা রয়েছে।

খনিজ পদার্থ, পাথর এবং মূল্যবান রত্নপাথর নিয়ে অগণিত গ্রন্থ লেখা হয়েছে, যার অধিকাংশই কালের আবর্তে হারিয়ে গেছে। অল্পকিছু রচনাই কালের গণ্ডি পাড়ি দিয়ে টিকে থাকার পাশাপাশি মুদ্রিতও হয়েছে।

মূল্যবান রত্ন-পাথর চিহ্নিতকরণ

মূল্যবান রত্ন ও খনিজপাথর প্রাচীনকালের মানুষদের মোহিত করে রেখেছিল।

"আমি ভারত থেকে অশোধিত কিছু শিলাখণ্ড নিয়ে আসি। সেসবের কয়েকটা উত্তপ্ত করলে সেগুলো আরও লাল বর্ণ ধারণ করে। একটি টুকরো লালচে এবং অপরটি তার চেয়ে কম লাল বর্ণের। ধাতু গলানোর পাত্রে আমি টুকরো দুটো রেখে ৫০ মিছক্বাল স্বর্ণ গলানোর সময় পর্যন্ত সেগুলো উত্তপ্ত করি। ঠাণ্ডা হলে টুকরো দুটো তুলে নিই। খেয়াল করি যে, অপেক্ষাকৃত কম লালচে পাথরটি গোলাপী লালবর্ণ ধারণ করে এবং আরও বেশি পরিশুদ্ধ হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে অধিক গাঢ় লালচে পাথরটি বর্ণ হারিয়ে *সারান্দিব* (বর্তমান শ্রীলঙ্কা) অঞ্চলের স্ফটিকের ন্যায় বর্ণ ধারণ করেছে। এরপর আমি পরীক্ষা করে দেখি যে, এটা *ইয়াকুত* বা রুবি চেয়েও নরম ... এবং আমি এই উপসংহারে আসি যে, উত্তাপের সাথে লালবর্ণ উদাও হলেও উত্তপ্ত ওই ধাতু *ইয়াকুত* নয়। এই ফলাফল উল্টানো সম্ভব নয়; অর্থাৎ উত্তপ্ত ধাতু যদি লাল রয়ে যায়, তথাপি এটা আবশ্যক নয় যে, তা *ইয়াকুত*, কারণ উত্তাপের পরও লোহা লাল রয়ে যায়।"

রুবি বা চুনি নিয়ে অনুসন্ধানকালে ১১শ শতাব্দির বিজ্ঞানী আল-বিরুনী তার "*আল-জামাহির ফী মারিফাতিল জাওয়াহির*" পুস্তকে তার এ অভিজ্ঞতার বিবরণটুকু তুলে ধরেছেন।

০৩ প্রাকৃতিক ঘটনা

সচরাচর শিশুরাই আমাদের নানা কঠিন প্রশ্নের মুখোমুখি করে, যেমন: 'আকাশ নীল কেন?' 'রংধনুর শেষ কোথায় গিয়ে মিলেছে?' 'সমুদ্র কেন বালুর সাথে মিশেছে?' এসব প্রাকৃতিক ঘটনার অধিকাংশই আজ আমাদের নিকট সাধারণ মনে হলেও নিজেদের চারপাশ উপলব্ধি করতে ৯ম শতাব্দির মুসলিম প্রতিভাগণ কৌতূহলের সাথে এসব পর্যবেক্ষণে নিজেদের ব্যস্ত রেখেছিলেন। বস্তুত আল্লাহর সৃষ্টির গূঢ় হাকিকত জানার অদম্য স্পৃহা তাদেরকে এ পথে নামিয়েছিল।

কর্ডোবা নিবাসী ১০ম শতাব্দির অতুলনীয় প্রতিভা ইবনে হাযমের যুগে এবং তার পূর্ব পর্যন্ত জ্যোতির্বিদগণ এটা বিশ্বাস করতেন যে, তারকা ও গ্রহসমূহের আত্মা ও মন রয়েছে, তাই তারা মানুষদের প্রভাবিত করার ক্ষমতা রাখে। ইবনে হাযম এ ব্যাপারে সর্বাধিক বাস্তববাদী পন্থা অবলম্বন করে বলেন, "মহাকাশের এসব বস্তুর না আছে আত্মা বা মন। আর না তারা মানুষের ভবিষ্যৎ জানে আর না তাতে প্রভাব রাখে। মূলত বস্তুগত বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে এসব গ্রহ ও তারকা মানুষের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে, যেমনিভাবে সূর্যের উত্তাপ ও আলো অন্যসব গ্রহের উপর প্রভাব রাখে এবং চাঁদ নিয়ন্ত্রণ করে সমুদ্রের জোয়ার-ভাটার গতি।" [*আল-মিলাল ওয়াল আহওয়া ওয়ান নিহাল*]

১১শ শতাব্দির আরেক পণ্ডিত আল-বিরুনী চাঁদের বিভিন্ন মনযিল চক্রের ভিত্তিতে জোয়ার-ভাটার টানের বিষয়টি ব্যাখ্যা করেন। তিনি ভারতের সোমনাথ শহরের জোয়ার-ভাটার এক প্রাণবন্ত বিবরণ দেয়ার পাশাপাশি এর সাথে যে চাঁদের সম্পর্ক রয়েছে, তা সবিস্তারে তুলে ধরেছেন।

আকাশ নিয়ে মুসলিমদের গবেষণা ছিল এবং আল-কিন্দীর ন্যায় কিছু পণ্ডিত আকাশের নীল রঙ হওয়ার কারণ নিয়ে মন্তব্য করেছেন। "*মাকালাত ফী ইল্লাতি লাওনি আল-আযওয়ার্দি আল্লাযী ইউরা ফীস সামায়ি ওয়া ইয়ুযান্নু আন্নাহ লাওনুস সামায়ি*" (আকাশের রঙ নীল হওয়ার কারণ – যেখানে নীলবর্ণকে আকাশের রঙ ভাবা হয়) শীর্ষক লম্বা শিরোনামের ছোট প্রবন্ধে তিনি পুরো বিষয়টির ব্যাখ্যা দিয়েছেন। সহজভাবে বললে, এই প্রবন্ধে তিনি আসমানের রঙ নীল হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করেছেন। আল-কিন্দী বলেন, "ধূলিকণা ও বাতাসে থাকা বাষ্প সূর্যের আলো দ্বারা আলোকিত হয়ে মহাকাশের অন্ধকারের সাথে মিলে রংধনু সৃষ্টি করে।" প্রবন্ধের শিরোনামের মতো তার লেখনী পুরো বিষয়টি পূর্ণরূপে তুলে ধরে: "আমাদের বায়ুমণ্ডলে থাকা বাতাস পৃথিবী ও তারকাদের থেকে আসা আলোর সাথে সম্মিলিত হয়ে আলো ও আঁধারের মাঝামাঝি নীল রঙ হিসেবে দৃশ্যমান হয়। এ থেকে প্রমাণিত হয়, এই রঙ আকাশের রঙ নয়, বরং তা আলো-আঁধারের মিথস্ক্রিয়ার ফলে আমাদের দৃষ্টির সামনে হাজির হয়।
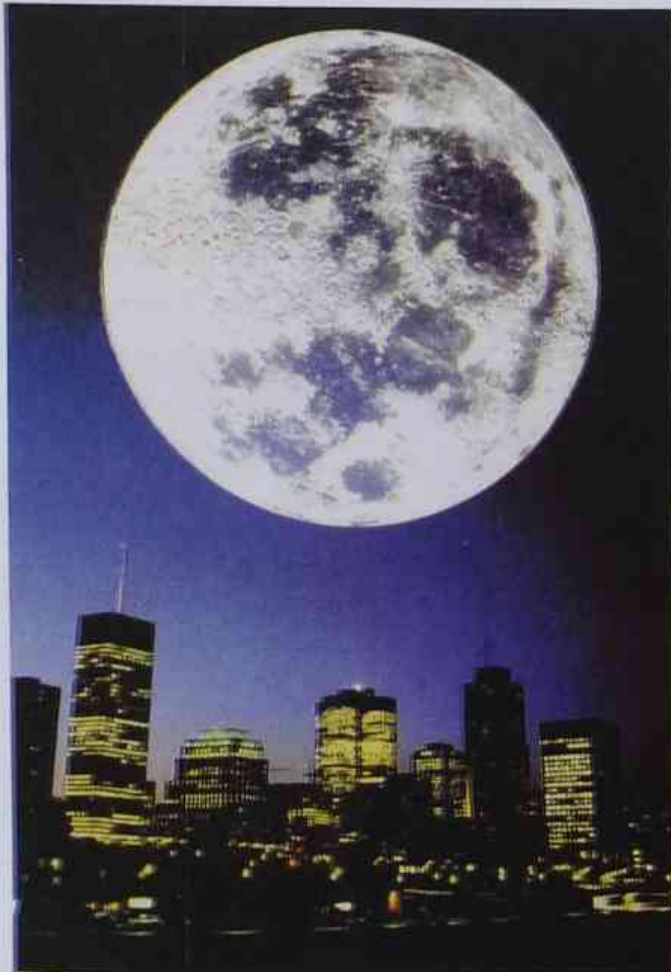
শহরের দৃশ্য সম্বলিত এই চিত্রে চাঁদকে সাধারণ অবস্থা থেকে বড় দেখা যাচ্ছে। দৃষ্টিগত যে প্রভাবের কারণে চাঁদকে তার সাধারণ অবস্থা থেকে বড় দেখায়, ইবনুল হাইছাম বিস্তর গবেষণা ভিত্তিতে তার ব্যাখ্যা হিসেবে এই উপসংহার টানেন যে, এটা দৃষ্টিভ্রম ছাড়া আর কিছু নয়।

ঠিক যেমনটি স্বচ্ছ কোনো বস্তুর পিছন থেকে উজ্জ্বল বস্তু দেখার সময় ঘটে, যেমনঃ সূর্যোদয়। ওই সময় সূর্যের আলোর সাথে স্বচ্ছ বস্তুর রঙের সংমিশ্রণ আমাদের দৃষ্টিতে আসে। কাচের পিছন থেকে যখন আমরা কিছু দেখি, প্রকৃতপক্ষে তখন আমরা কাচ এবং ওই বস্তুর রঙের সম্মিলনে সৃষ্ট একটি রঙ দেখি।"

উচ্চ শিক্ষিত মহলে জ্ঞান হিসেবে বহু অসম্ভব ও সংশয়ে ঘেরা মতবাদ প্রচলিত থাকলেও আল-কিন্দী ঠিক জায়গাতেই ছিলেন, কেননা আকাশ আসলেই নীল নয়। ৯ম শতাব্দির বাগদাদ নিবাসী সুপণ্ডিত এই মনীষী বিজ্ঞান, গণিত, সঙ্গীতবিদ্যায় সবার চেয়ে অগ্রগামী এবং একইসাথে দক্ষ চিকিৎসক হওয়ার সুবাদে তিনি খুব সহজেই এসব মতবাদের সাথে পাল্লা দিতে পারতেন।

ইবনুল হাইছামও তার সময়ের প্রচলিত জ্ঞানকে চ্যালেঞ্জ জানাতে পিছিয়ে আসেননি। এক হাজার বছর পূর্বে খলীফার চাহিদা মাফিক নীলনদের প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হওয়ায় তাকে কায়রোতে গৃহবন্দী করা হয়। প্রাচীন মিশরীয়রা যা পারেনি, সেটা যে তিনিও পারবেন না, তা তিনি বেশ ভালোভাবেই বুঝে যান। তাই গা বাঁচানো এবং নিজের অধ্যয়ন চলমান রাখার জন্য তিনি পাগলের ভান ধরেন। বন্দীদশা তার জন্য উপকার বয়ে আনে, কেননা তার মানে দাঁড়াচ্ছেঃ জানালার শাটারের ছোট ছিদ্র দিয়ে আসা আলো পর্যবেক্ষণে কেউ আর তাকে বিরক্ত করবে না।

পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের এই সময়টুকুর বদৌলতে তিনি রংধনু, বর্ণবলয় প্রভাব এবং দিগন্তের কাছাকাছি আসলে চাঁদ ও সূর্যের আকৃতি বড় মনে হওয়ার মতো প্রাকৃতিক ঘটনাগুলো ব্যাখ্যা করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তিনি বলেন, বায়ুমণ্ডলের প্রভাবে চাঁদ ও সূর্য দিগন্তের কাছাকাছি আসলে তাদের আপাত দৃশ্যমান আকৃতি বড় মনে হয়। তিনি আরও যোগ করেন, চাঁদ ও সূর্যের এই বর্ধিত আকার আসলে মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে সৃষ্ট দৃষ্টির এক ভেল্কি মাত্র। তিনি দেখান যে, প্রতিসরণের মাধ্যমে সূর্যের আলো আমাদের নিকট পৌঁছায়, এমনকি তা যদি দিগন্তের ১৯ ডিগ্রি নিচেও অবস্থান করে এবং এর ভিত্তিতে তিনি বায়ুমণ্ডলের উচ্চতা পরিমাপ করেনঃ ১০ মাইল।

১৩১৯ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণকারী কামালুদ্দীন আল-ফারিসী কাচের গোলকের অভ্যন্তরে আলোকরশ্মির পথ পর্যবেক্ষণ করে হাইছামের কাজের পুনরাবৃত্তি ঘটান এবং সেটার উন্নয়ন সাধন করেন। তিনি চেয়েছিলেন বৃষ্টির ফোঁটায় সূর্যরশ্মির প্রতিসরণ নির্ণয় করতে। পরীক্ষায় প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে তিনি মুখ্য ও গৌন রংধনুর গঠনের ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন, বস্তুত এ পরীক্ষা প্রিজমের মাধ্যমে সাদাবর্ণের বিশ্লিষ্টকরণ মাত্র।

পরেরবার শিশু যখন আপনাকে 'কেন' প্রশ্নটি করবে, তখন মধ্যযুগীয় মুসলিমদের এসব কর্মকাণ্ডের উল্লেখ হবে আবিষ্কারের পথে শিশুর মানসিক অভিযাত্রার এক উত্তম সূচনা।

উপরেঃ মহাকর্ষীয় বলের প্রভাবে জোয়ার-ভাটা ঘটে, যেমনকি ১১শ শতাব্দিতে আল-বিরুনী ব্যাখ্যা করেছিলেন। নিচেঃ আল-বিরুনীর সমসাময়িক আরেক মনীষী ইবনুল হাইছাম রংধনুর ন্যায় প্রাকৃতিক ঘটনায় ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন।

০৪ ভূগোল

সাধারণভাবে বললে মুসলিমগণ এবং বিশেষভাবে বললে মুসলিম সভ্যতার পর্যটক, অনুসন্ধানী এবং বণিকগণ ছিলেন বহির্মুখো স্বভাবের। তারা তাদের নিকট-দূর গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করতেন এবং সংরক্ষণ করতেন সেসব বিবরণ। যে পরিবেশে বসবাস করতেন, তা ছিল ভূগোলে তাদের আগ্রহ জোগানের অন্যতম একটি কারণ। উন্নত ও সতেজ চারণভূমির অন্বেষণে তাদেরকে বেরিয়ে পড়তে হতো মূল্যবান পশুপাল নিয়ে, তাই নিজেদের চারপাশের উদ্ভিদ, লতাগুল্ম এবং বন্য প্রাণিদের ব্যাপারে তাদের আহরিত জ্ঞান ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এমন পরিবেশে নিতান্ত ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তার খাতিরেই বিকশিত হয়েছিল ভূগোলের ন্যায় বিজ্ঞান।

পবিত্র হজ্জ নিছক একটি ইবাদত ছিল না, বরং তা ছিল বিভিন্ন বস্তু ও পণ্যের এক গুরুত্বপূর্ণ উৎস। দূর-দূরান্ত থেকে আসা অনেক হজ্জযাত্রীই মক্কা ও মদীনায় পৌঁছানোর ক্ষেত্রে মৌখিক বিবরণ অনুসরণ করতো। পরবর্তীতে এগুলোর লিখিত রূপ ভ্রমণ গাইড বা সহায়িকা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। মুসলিম বিশ্বের সকল প্রান্ত থেকে আসা হজ্জযাত্রীদের দীর্ঘ ও কঠিন যাত্রাকে সহজীকরণের গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে এসব ভ্রমণ সহায়িকা অন্যদের নিকট হস্তান্তরিত হতে থাকে।

প্রতিদিনের পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের জন্য মক্কায় অবস্থিত কাবাঘরের দিক নির্ণয় এবং মসজিদগুলোকে মক্কামুখী করা ছিল ভূগোল অধ্যয়নের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ চালিকাশক্তি। সবশেষে, যুদ্ধ, সাম্রাজ্য বিস্তার এবং সম্প্রসারণশীল মুসলিম বিশ্বের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক প্রয়োজনীয়তা ভূগোল চর্চায় আরেকটি মাত্রা এনেছিল।

অধিকতর নিখুঁত জ্যোতির্বিদ্যা ও গণিতশাস্ত্র গড়ে উঠায় ভূগোলের সমৃদ্ধিতে বড় ধরনের গবেষণা উদ্যোগ সম্ভবপর হয়েছিল এবং এর ধারাবাহিকতায় মানচিত্রাঙ্কন পরিণত হয় ভূগোলের একটি সম্মানজনক শাখায়। ৯ম শতাব্দির পারসীয় পণ্ডিত ও অত্যন্ত উঁচুমাপের গণিতজ্ঞ আল-খাওয়ারিযমী ছিলেন বর্ণনামূলক ভূগোলের শুরুর দিকের অন্যতম অগ্রনায়ক এবং এ কাজে তিনি বৈজ্ঞানিক পন্থা অবলম্বন করতেন। তার বিখ্যাত "*সুরাতুল আরদ*" (পৃথিবীর আকার) গ্রন্থটি মাটি খোঁড়া, পর্যবেক্ষণ এবং প্রাপ্ত ভূতাত্ত্বিক তথ্য সংরক্ষণের কাজে উদ্বুদ্ধ করেছিল বাগদাদ, মুসলিম স্পেন তথা আন্দালুসের মুসলিম অনুসন্ধানীদের এক প্রজন্মকে।

সুহরাব নামের আরেক ভূগোলবিদ দশম শতাব্দির শুরুর দিকে পৃথিবীর বিভিন্ন সমুদ্র, দ্বীপ, হ্রদ, পর্বত এবং নদ-নদীর বিবরণ সম্বলিত গ্রন্থ রচনা করেন। ইউফ্রেটিস, তাইগ্রিস ও নীলনদ নিয়ে তার মন্তব্যগুলো বেশ গুরুত্বপূর্ণ, অন্যদিকে তার দেয়া বাগদাদের খালগুলোর বিবরণ হচ্ছে ওই শহর পুনর্গঠনের মধ্যযুগীয় পরিকল্পনার প্রধান ভিত্তি।

১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে গাই ল্যা স্ট্রেন্জ এই নগর পরিকল্পনার পুনর্গঠন করেন, তবে তিনি সুহরাবের নামের সাথে সুবিখ্যাত চিকিৎসক ইবনে সারাবিউন (বা লাতিনে ইবনে সেরাপিওন)-এর নাম গুলিয়ে ফেলেছিলেন। ল্যা স্ট্রেন্জ তার পুনর্গঠনে ৯ম শতাব্দির আল-ইয়াকূবীর কাজকেও ব্যবহার করেছিলেন।
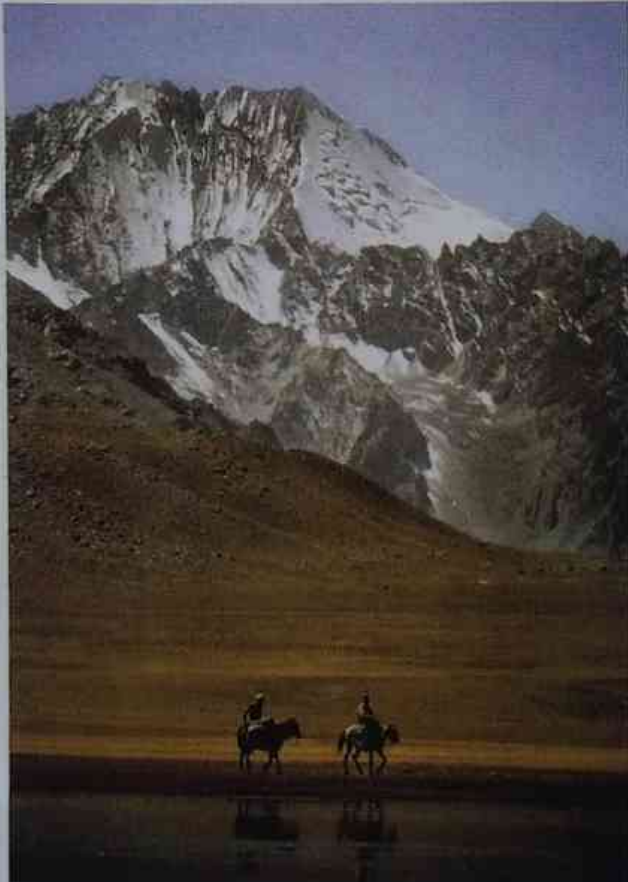
ভ্রমণের মাধ্যমে মুসলিম সমাজে ভৌগোলিক জ্ঞানের বিকাশ ঘটে।

সুহরাবের দেয়া জল-ব্যবস্থাপনা নেটওয়ার্কের বিবরণ এবং আল-ইয়াকুবীর দেয়া বাগদাদ থেকে আসা প্রধান সড়কগুলোর বিবরণ মূলত একে অপরের উত্তম পরিপূরক।

১০ম শতাব্দির ভূগোলবিদ আল-মুকাদ্দিসী মুসলিম বিশ্ব ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন দলিল-দস্তাবেজ পর্যবেক্ষণ, প্রণয়ন ও নিরীক্ষণ, নোট নেয়া এবং লেখার কাজে সময় ব্যয় করেছিলেন। এত বছরের ভ্রমণ অভিজ্ঞতার আলোকে ৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে রচিত হয় "*আহসানুত তাক্বাসীম ফী মা'রিফাতিল আকালীম*" (বিভিন্ন অঞ্চলের জ্ঞান লাভের সর্বোত্তম বিভাজন) নামক গ্রন্থ। পড়তে আনন্দায়ক এই গ্রন্থ বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের নিকট আবেদন সৃষ্টি করেছিল। পূর্ব ও পরের বহু পণ্ডিতদের ন্যায় তার এই পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণার পিছনে ঐশ্বরিক প্রেরণা কাজ করেছিল। আল্লাহকে ভালোভাবে জানার জন্য নিবেদিত তার এসব রচনা উপযুক্ত মূল্যায়নও পেয়েছিল। ভৌগোলিক পরিভাষা, জমি ভাগ করার বিভিন্ন পদ্ধতি এবং প্রায়োগিক পর্যবেক্ষণের গুরুত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তার এই গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ মুসলিম ভূগোলের নিয়মতান্ত্রিক ভিত্তি দাঁড় করিয়েছিল।

অভিধানপ্রণেতা হিসেবে সুবিদিত মাহমূদ আল-কাশগরী ছিলেন শুরুর দিকের অন্যতম তুর্কি ভূগোলবিদ। ভাষাতত্ত্বের আলোকে দেখতে বেশ অদ্ভুত ও গোলাকার প্রকৃতির একটি মানচিত্র এঁকেছিলেন। ১০৭৩ খ্রিস্টাব্দে রচিত ব্যাকরণ বিষয়ক তার শ্রেষ্ঠকীর্তি "*দিওয়ান লেহজাতুত তুর্ক*" (তুর্কি উপভাষার তথ্য বিবরণী)-তে মানচিত্রটি রয়েছে। চীন, উত্তর আফ্রিকাসহ মধ্য এশিয়ার উল্লেখযোগ্য অংশ এই মানচিত্রে থাকলেও ভলগা নদী পেরিয়ে খুব অল্প তথ্যই এখানে এসেছে। তুর্কিদের পশ্চিম অভিমুখে যাত্রার পূর্বে রচিত হওয়ায় খুব সম্ভবত এমনটি হয়েছে।

১১শ ও ১২শ শতাব্দির দু'জন মুসলিম লেখক – আল-বাকরী ও ইবনে জুবায়ের – তাদের পূর্বপুরুষদের রেখে যাওয়া তথ্য-উপাত্ত সংকলন ও তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে সহজে পঠনযোগ্য গ্রন্থে জমা করেন। এই দু'জনের প্রথম ব্যক্তি স্পেনের হুয়েলবা এবং সলটেজ প্রদেশের গভর্নরের পুত্র ছিলেন। বহু কূটনৈতিক মিশন পরিচালনাকারী আল-বাকরী ছিলেন সেভিল রাজ দরবারের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি।

জরিপ

আজকের দিনের নির্মাণ কাজের গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ জরিপ।

রোমান জরিপকারীরা 'জমির সমতা বা ভারসাম্য' পরিমাপের জন্য ওলনদড়িসহ একটি ত্রিকোণাকার স্থিতি ব্যবহার করতো। এই কৌশল মুসলিম ও খ্রিস্টান স্পেনেও চালু ছিল।

কিন্তু রোমানরা *triangulation* (ট্রায়াঙ্গুলেশন – জানা কোণের সাহায্যে অজানা বিন্দুর অবস্থান নির্ণয়) সম্পর্কে অবহিত ছিল না, যে পদ্ধতিটি আজও জরিপ ও মানচিত্র প্রস্তুতের জন্য ব্যবহৃত হয়। প্রাচ্যে উদ্ভূত এ পদ্ধতির বিবরণ মাসলামা এবং ইবনুস সাফফার নামের দু'জন স্পেনীয় পণ্ডিতের আস্তুর্লাব বিষয়ক প্রবন্ধে পাওয়া যায়। মাসলামার গ্রন্থটি সেভিলের জন ১২শ শতাব্দিতে লাতিন ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন।

১০ম শতাব্দিতে লেখা "জ্যামিতি" গ্রন্থে আস্তুর্লাবে প্রয়োগযোগ্য ট্রায়াঙ্গুলেশনের বিভিন্ন প্রক্রিয়া বিশেষত বড় জমিতে সোজা সীমারেখা প্রস্তুতের বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে।

বর্তমানে সেচ-প্রণালীসহ বিভিন্ন চ্যালেঞ্জিং প্রকল্পের জরিপ কাজ জরিপকারী দল দিয়ে সমাধা করা হয়। আন্দালুসে জরিপকারী দলকে *মুহান্দিস* বলা হলেও পূর্ব স্পেনে এরা *soguejador* (সোগিউযেডর) নামে পরিচিত ছিল।

সমতল ত্রিকোণমিতি ব্যবহার করে আজও অজানা বিন্দুর অবস্থান নির্ণয়ে ট্রায়াঙ্গুলেশন পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়, তবে এর সাথে যুক্ত হয়েছে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি, যেমন: বিশ্বজনীন অবস্থান নির্ণায়ক ব্যবস্থা বা জিপিএস (*GPS*)।
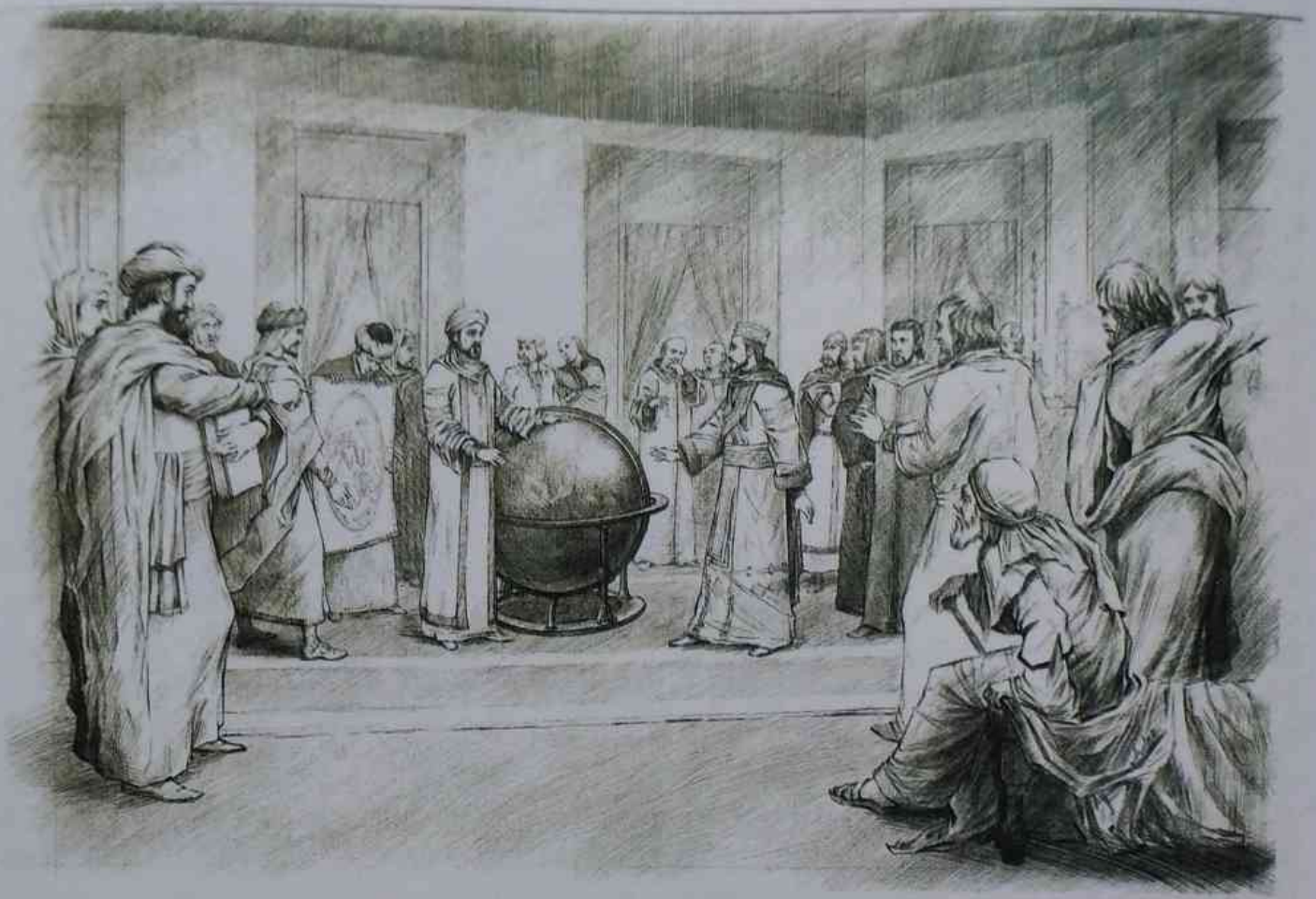
আল-ইদরিসী তার বানানো বৃত্তাকার মানচিত্র নিয়ে সিসিলির রাজা দ্বিতীয় রজারের দরবারে দাঁড়িয়ে আছেন, শিল্পীর তুলিতে সেই দৃশ্য এখানে চিত্রিত হয়েছে। গোলাকার পৃথিবীর ধারণা যে আল-ইদরিসীর অজানা ছিল না, এখানে সেটাও দেখা যাচ্ছে।

দাপ্তরিক কাজে ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও তিনি একজন সফল পণ্ডিত ও প্রাবন্ধিক ছিলেন। বিভিন্ন স্থানের নামসহ আরব উপদ্বীপের ভৌগোলিক বিবরণ সমৃদ্ধ "*আল-মাসালিক ওয়াল মামালিক*" (যাত্রাপথ এবং সাম্রাজ্য) নামের গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ তারই রচনা। বর্ণানুক্রমিক ধারায় রচিত এই গ্রন্থে বিভিন্ন শহর, গ্রাম, উপত্যকা এবং পাহাড়-পর্বতের নাম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তৎকালের জানা পৃথিবী নিয়ে তার ছিল বিশ্বকোষ তুল্য আরেকটি মূল্যবান গ্রন্থ।

গ্রানাডার গভর্নরের অধীনে সচিবের দায়িত্ব পালনকারী ভ্যালেন্সিয়ার ইবনে জুবায়ের ওইসব মানুষের অন্যতম, যারা হজ্জ পালনের জন্য নিজেদের মক্কা অভিমুখী সফরনামা লিখে রাখতেন। পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় বিশ্বের বিস্তারিত বিবরণ সম্বলিত ৭০০ বছরের পুরানো এসব গ্রন্থ অনেকটা সাময়িকীর ন্যায় ছিল। তার এই সফরনামা কেবল ভূগোলে সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং তাতে উদ্ভিদ, লতাগুল্ম, রন্ধনশিল্প ও ভ্রমণ বিষয়ে বেশ উপকারী উপদেশ পর্যন্ত অন্তর্ভূত ছিল।

সফরনামা নথিবদ্ধ করার মনোবৃত্তি মুসলিম স্পেনে বেশ বলিষ্ঠ ছিল এবং এটা আল-ইদরিসীর মতো গুণী পণ্ডিতের পক্ষে সম্ভব করেছিল তৎকালীন পৃথিবীর সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গ মানচিত্র প্রস্তুত করা। ১১৩৯ খ্রিস্টাব্দে সিসিলির নরম্যান রাজা দ্বিতীয় রজার মানচিত্র প্রস্তুতের জন্য আল-ইদরিসীকে নিয়োগ দেন। কর্ডোবা থেকে সিসিলি এসে সুদীর্ঘ ১৫ বছর তিনি এ কাজে ব্যয় করেন। নরম্যান রাজার পালেরমো দরবারে অত্যন্ত মর্যাদার সাথে অবস্থান করে হাজারো পর্যটকদের সাক্ষাতকার নেয়াসহ তিনি ৭০-টি নির্ভুল মানচিত্র সম্বলিত "কিতাব রজার" রচনা করেছিলেন, যাতে এমনকিছু এলাকা অন্তর্ভুক্ত হয়, যা পূর্বে মানচিত্রভুক্ত ছিল না।

পূর্ববর্তী লেখকদের দেয়া তথ্য এবং সিসিলিতে অবস্থানকালে তিনি যেসব তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করেছিলেন, উভয়ের ভিত্তিতে তিনি গ্রন্থটি লিখেছিলেন। পৃথিবী গোলাকার, এটার পুনর্ব্যক্তকরণের পাশাপাশি তিনি বলেন, পৃথিবী

"মহাকাশে ডিমের কুসুমের ন্যায় দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত।" এছাড়াও ছিল এতে উত্তর-দক্ষিণ গোলার্ধ, জলবায়ু, সাগর-মহাসাগর ও উপসাগর নিয়ে বিস্তর আলোচনা। এশিয়া ও আফ্রিকার অত্যন্ত দূরবর্তী বহু অঞ্চলের চমকপ্রদ বিবরণের আকর হিসেবে এ গ্রন্থের জুড়ি মেলা ভার।

১৩শ শতাব্দিতে ইয়াকূত আল-হামাবী ইরাকের মাওসুল থেকে সিরিয়ার আলেপ্পো, এরপর ফিলিস্তিন, মিশর এবং পারস্য পর্যন্ত ভ্রমণ করেন। দুঃখজনকভাবে এই মনীষীর মাত্র চারটি কর্ম টিকে আছে, যার মধ্যে *"মু'জামুল বুলদান"* (শহর ও নগরের অভিধান) গ্রন্থটি সর্বাধিক পরিচিত। প্রত্নতত্ত্ব, মানব জাতির বৈজ্ঞানিক বিবরণ, ইতিহাস, নৃতত্ত্ব, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, ভূগোল এবং প্রতিটি স্থানের স্থানাঙ্ক প্রদানসহ এই ভূগোল বিশ্বকোষে তৎকালীন সময়ের জানা পৃথিবীর প্রায় সকল মধ্যযুগীয় জ্ঞানের সন্নিবেশ ঘটেছে। প্রতিটি শহর-জনপদের নাম ও বিবরণের পাশাপাশি তিনি এতে সংশ্লিষ্ট এলাকার পুরাকীর্তি, অর্থনীতি, ইতিহাস, জনসংখ্যা এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের অবস্থাও অন্তর্ভূত করেছেন।

গোলাকার পৃথিবী

"(পৃথিবী যে গোলাকার) আরব বিজ্ঞানীরা তা বেশ আগে থেকে জানলেও ইউরোপীয়রা এই বিশ্বাস আঁকড়ে ধরে ছিল যে, পৃথিবী সমতল ... (আল-ইদরিসীর এ গ্রন্থে) একটি ভ্রমণ সহায়িকা ও মানচিত্রও অন্তর্ভুক্ত ছিল, আশ্চর্যজনকভাবে যা কলাম্বাসের আগ পর্যন্ত ৩৫০ বছর ধরে নির্ভুল ছিল। এ গ্রন্থে ইংল্যান্ডকে 'চিরস্থায়ী শীতের কবলে আটকা' দেশ হিসেবে উল্লেখ করা হয় ... এটা ছিল ইসলামী পাণ্ডিত্যের এক অপরিহার্য উপাদান, যা ইউরোপের সভ্যতা বিকাশে অগ্রনী ভূমিকা রেখেছিল।"

বিবিসি নির্মিত প্রামাণ্যচিত্র *An Islamic History of Europe*-এ ১২শ শতাব্দির ভূগোলিবিদ আল-ইদরিসীর ব্যাপারে রাগেহ উমর এই মন্তব্য করেন

পৃথিবী গোলাকার বিষয়ে মুসলিম ভূগোলবিদগণ একমত ছিলেন এবং তারা এই ভূগোলকের বিশদ পরিমাপ বের করার পিছনে ব্যাপক ঘাম ঝরিয়েছিলেন।

"মধ্যযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ভূগোল গ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃত (আল-ইদরিসীর এ গ্রন্থে) একটি ভ্রমণ সহায়িকা ও মানচিত্রও অন্তর্ভুক্ত ছিল, আশ্চর্যজনকভাবে যা কলাম্বাসের আগ পর্যন্ত ৩৫০ বছর ধরে নির্ভুল ছিল। এ গ্রন্থে ইংল্যান্ডকে 'চিরস্থায়ী শীতের কবলে আটকা' দেশ হিসেবে উল্লেখ করা হয় ... এটা ছিল ইসলামী পাণ্ডিত্যের এক অপরিহার্য উপাদান, যা ইউরোপের সভ্যতা বিকাশে অগ্রনী ভূমিকা রেখেছিল।"

– রাগেহ উমর, বিবিসি নির্মিত প্রামাণ্যচিত্র *An Islamic History of Europe*

বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং শিল্পকলার বিভিন্ন শাখার মতো ভূগোলে অবদান রেখেছেন, এমন ব্যক্তিদের তালিকা করতে গেলে তা আর শেষ হবে না। এদের অনেকেই চাক্ষুষ তথ্য সংগ্রহ, জ্ঞান আহরণ, উপলব্ধি ও কৌতূহলের আজন্ম তৃষ্ণা মেটাতে ঘর ছেড়ে পৃথিবী ছড়িয়ে পড়েছিলেন; এবং তারা এমনসব তথ্য ও উপাত্ত রেখে গেছেন, যা আজও আমাদের কল্যাণে ভূমিকা রাখছে।

আজ আমরা ম্যাগাজিন, স্যাটেলাইট টিভি ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে নিমিষেই দুনিয়া সম্পর্কে জানতে পারি। এরপরেও অনেকেই আনন্দ উপভোগের জন্য সশরীরে ভ্রমণে বেরিয়ে পড়ে। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আরাম কেদারায় বসে 'পেশাদারদের' থেকে আমরা শেখা ও বোঝার চেষ্টা করি। অন্যদিকে গত সহস্রাব্দে কৌতূহল ও ঈমান দ্বারা চালিত একদল মানুষ তাদের চারিপাশ উপলব্ধির জন্য কতশত পথই না পাড়ি দিয়েছিল, তা ভাবতেই অবাক লাগে।

আল-ইদরিসীর বিশ্ব মানচিত্র

সাংস্কৃতিক সংযোগস্থল থেকে মূল্যায়ন

ইউরোপ, এশিয়া এবং উত্তর আফ্রিকাকে একত্রে প্রদর্শনকারী প্রথম মানচিত্র

উল্লেখযোগ্য পরম্পরা: তার সময়ের সবচেয়ে নির্ভুল মানচিত্রের মাধ্যমে আল-ইদরিসী মুসলিম সভ্যতায় চালু করেছিলেন দক্ষ মানচিত্র প্রস্তুতকারকদের এক লম্বা ধারা

অবস্থান: সিসিলি

তারিখ: ১২শ শতাব্দি

প্রধান ব্যক্তিত্ব: মুসলিম বিদ্বান আল-ইদরিসী এবং সিসিলির নরম্যান রাজা দ্বিতীয় রজার

এক হাজার বছর পূর্বে দেশ-মহাদেশ এবং জল-প্রণালীর নির্ভুল পরিকল্পনা অজানা ছিল। বাণিজ্য, অনুসন্ধান এবং ধর্মীয় কারণে যখন থেকে মানুষের ভ্রমণ বেড়েছে, তখন থেকেই সমৃদ্ধ একটি মানচিত্রের দাবী বেশ জোরালো হতে থাকে।

বিশ্বের মূল্যবান কিছু মানচিত্র মুসলিম সভ্যতার অতুলনীয় পণ্ডিতদের দ্বারা অঙ্কিত, যারা তাদের সবটুকু সাধ্য দিয়ে ওই সময়ের যাবতীয় ভৌগোলিক জ্ঞান সংগ্রহ করেছিলেন। নিজেদের যাত্রার বিবরণ সংরক্ষণ করে, এমন মুসলিম ভূগোলবিদ ও পর্যটকদের চাক্ষুষ বিবরণের ভিত্তিতে মধ্যযুগীয় বিশ্বের বর্ণনা দিতে তারা চেষ্টার ত্রুটি করেননি।

১২শ শতাব্দিতে পণ্ডিত আল-ইদরিসী একটি মানচিত্র প্রস্তুত করেছিলেন, যাতে প্রথমবারের মতো ইউরোপ, এশিয়া এবং উত্তর আফ্রিকা দৃশ্যমান ছিল। প্রায় ৮৫০ বছরের পুরানো এই মানচিত্র মার্কো পোলো কিংবা কলাম্বাসের বিশ্ব অনুসন্ধানের কয়েক শতাব্দি আগে প্রস্তুত করা হয়েছিল। পূর্ববর্তী জ্ঞান ও হাজারো পর্যটকের সাক্ষাতকারের ভিত্তিতে আল-ইদরিসী তার সময়ের সবচেয়ে নির্ভুল মানচিত্র এঁকেছিলেন। আরবী লেখা এটা দেখাচ্ছে যে, ওই সময়ের রীতি মোতাবেক আল-ইদরিসী এই মানচিত্রে দক্ষিণ গোলার্ধকে উপরে রেখেছেন এবং উত্তর গোলার্ধকে নিচে স্থান দিয়েছেন।

সদ্য মুসলিমদের পরাস্ত করা সিসিলির নরম্যান রাজা দ্বিতীয় রজার ছিলেন এই মানচিত্র প্রস্তুতের মূল পৃষ্ঠপোষক। স্পেন নিবাসী আল-ইদরিসীকে আমন্ত্রণ জানিয়ে রাজা এই কাজের ভার তার কাঁধে তুলে দেন, যা শেষ করতে তার ১৫ বছর লেগেছিল। ১২শ শতাব্দির সিসিলি ছিল সংস্কৃতি ও সৃজনশীলতার এক বৈশ্বিক সংযোগস্থল। নিজ জন্মভূমি মরক্কোতে প্রত্যাবর্তনের আগ পর্যন্ত আল-ইদরিসী ছিলেন রাজদরবারের একজন সম্মানিত সদস্য।

আল-ইদরিসী বৃত্তাকার মানচিত্রে ভারত, আরব, এশিয়া, ভূমধ্যসাগরীয় এলাকা, ইউরোপ এবং উত্তর আফ্রিকা এঁকেছিলেন এবং রুপার বৃহৎ বৃত্তাকার ফলকে তিনি এ মানচিত্র রাজা রজারের নিকট হস্তান্তর করেছিলেন। প্রাচীন গ্রিকদের সময় থেকেই মানুষ পৃথিবীকে গোল ভাবতো এবং মুসলিম পণ্ডিতগণ এই ভূগোলকের বিস্তারিত পরিমাপ প্রদানের চেষ্টায় কোনো ঘাটতি রাখেনি। আল-ইদরিসীর হিসেব মোতাবেক বিষুবরেখা বরাবর পৃথিবীর পরিধি: ২২,৯০০ মাইল, যা আধুনিক হিসেবে থেকে শতকারা ১০ ভাগ কম। এছাড়া পৃথিবীর উভয় গোলার্ধ, এটার জলবায়ু মণ্ডল, সাগর-মহাসাগর ও উপসাগর নিয়েও তার আলোচনা ছিল।

মুসলিম সভ্যতার শুরুর দিকে, পৃথিবীর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদির পরিমাপ এবং সেগুলোকে মানচিত্রভুক্ত করা ছিল গাণিতিক ভূগোলের মুখ্য উদ্দেশ্য এবং উচ্চতা ও দূরত্ব পরিমাপে তারা ব্যবহার করেছিলেন অত্যাধুনিক আভূর্লাব। পৃথিবীর পরিধি মাপার জন্য খলীফা আল-মামুন নিয়োগ দিয়েছিলেন একদল জ্যোতির্বিদদের এবং তারা যে হিসেব দাখিল করেছিল, তার সাথে আমাদের বর্তমান হিসেবের পার্থক্য মাত্র: ১২৫ মাইল।

১২শ শতাব্দিতে আঁকা আল-ইদরিসীর এই মানচিত্রে প্রথমবারের মতো অধিকাংশ ইউরোপ, এশিয়া এবং উত্তর আফ্রিকা চিত্রিত হয়েছে। সিসিলির নরম্যান রাজা দ্বিতীয় রজার এই মানচিত্র আঁকার জন্য আল-ইদরিসীকে নিযুক্ত করেছিলেন।

০৫ মানচিত্র

প্রায় তিনহাজার পাঁচশত বছর ধরে মানুষ তাদের পথ খুঁজে নিতে মানচিত্রের ব্যবহার করে আসছে। একেবারে শুরুর দিকে কাদামাটির ফলকে মানচিত্র খোদাই করা হতো। কাগজের ব্যবহার যেমন মানচিত্রাঙ্কনে এক সময় এনেছিল নবজোয়ার, ঠিক তেমনি ভৌগোলিক তথ্য ব্যবস্থা (*GIS*)-এর উদ্ভাবন মানচিত্রাঙ্কনে এনে দিয়েছে সাম্প্রতিককালের সবচেয়ে বড় বিপ্লব। ফলশ্রুতিতে ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে যুক্তরাজ্যে প্রথম বৃহদাকার কম্পিউটারাইজড এবং ডিজিটাল মানচিত্রের দেখা মেলে এবং ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দের দিকে অধিকাংশ শিল্পায়িত বিশ্ব পুরোপুরি ডিজিটাল হয়ে উঠে।

স্যাটেলাইট ব্যবস্থা ব্যবহার এবং রিসিভার বা গ্রাহকের মাধ্যমে পৃথিবীর যেকোন বিন্দুর অবস্থান নির্ণয়ের আধুনিক প্রযুক্তির পূর্বে মানচিত্র প্রস্তুত করা হতো পর্যটক ও তীর্থযাত্রীদের প্রত্যক্ষ বিবরণের ভিত্তিতে।

ভ্রমণ পিপাসু ৭ম শতাব্দির মুসলিমগণ বাণিজ্য ও ধর্মীয় কারণের পাশাপাশি নিজেদের আশেপাশের দুনিয়া অনুসন্ধানে বেড়িয়ে পড়ে। কখনো তারা পথের পর পথ পাড়ি দিয়েছে নতুন স্থান সম্পর্কে জানার জন্য এবং যাত্রা শেষে তারা সেসব এলাকা, মানুষ ও দর্শনীয় স্থানসমূহের বিবরণ সংরক্ষণ করতো। প্রথম দিকে তা মৌখিক হলেও ৮ম শতাব্দিতে বাগদাদে কাগজের প্রচলন হলে প্রথম কাগুজে মানচিত্র প্রস্তুতসহ একে একে ভ্রমণ সহায়িকাগুলো আবির্ভূত হতে থাকে।

নিজেদের সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে বার্তা আদান-প্রদানে সহায়তা করতে আব্বাসী খলীফাগণ পোস্টমাস্টার বা ডাকমুন্সীদের জন্য বহু প্রতিবেদক নিয়োগ দেয়। প্রতিবেদকদের দেয়া বিবরণের ভিত্তিতে "*আল-মাসালিক ওয়াল মামালিক*" (যাত্রাপথ ও সাম্রাজ্য) শ্রেণির গ্রন্থসমূহ রচিত হতে থাকে এবং তা দূর-দূরান্ত ও ভিনদেশী এলাকাগুলোর বিবরণ, সেখানের ভূ-বিন্যাস, উৎপাদন ক্ষমতা ও বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডের পূর্ণাঙ্গ তথ্যাদি সংগ্রহে উদ্দীপনার এক নব জোয়ার নিয়ে আসে।

মুসলিমরা যখন দুনিয়া চষে বেড়াচ্ছিল, তখন (৮ম থেকে ১১শ শতাব্দির) ভাইকিংদের কথা বাদ দিলে খুব অল্প ইউরোপীয়রাই এমন দূরত্বে ভ্রমণ করতো এবং ধর্মীয় কর্তৃপক্ষদের বানানো মানচিত্রের সুবাদে চারপাশের পৃথিবী সম্পর্কে গড়পড়তা ইউরোপীয়দের জ্ঞান নিজেদের এলাকা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিল। ইসলামী বিশ্বের ভূগোলবিদ এবং মানচিত্রকাররা না থাকলে ১৫শ ও ১৬শ শতাব্দির বিখ্যাত ইউরোপীয় অভিযাত্রীদের যাত্রা কখনো আলোর মুখ দেখতো কিনা, তা ভাববার বিষয়।

আমরা যেসব মানচিত্র ব্যবহার করি, সেগুলো ইউরোপীয় রীতির এবং কয়েক শতাব্দি পুরানো। গতানুগতিক ধারায় 'উত্তর'-কে মানচিত্রের উপরে রাখার কারণটা বেশ অদ্ভুত; আসলে ধ্রুবতারা (নর্থ স্টার) এবং চৌম্বকীয় কম্পাস ব্যবহার করে ইউরোপীয় নাবিকরা তাদের নৌ-অভিযানের সূচনা করায় তারা 'উত্তর'-কে মানচিত্রের উপরে স্থান দিয়েছে। এর আগ পর্যন্ত ইউরোপীয় মানচিত্রের শীর্ষে 'পূর্ব'-এর অবস্থান ছিল, বস্তুত এটা থেকেই *orientation* (অভিমুখ) শব্দের উৎপত্তি। মধ্যযুগীয় ইউরোপে সাধারণত জেরুজালেমকে উপরে বা কেন্দ্রে রাখা হতো, যেহেতু এটা তাদের নিকট পবিত্রভূমি তুল্য ছিল।

ইউরোপীয় মানচিত্র এবং মুসলিম মানচিত্রের মাঝে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য হচ্ছেঃ মুসলিমরা দক্ষিণকে উপরে এবং উত্তরকে নিচে রাখতো। অধিকতর নিখুঁত জ্যোতির্বিদ্যা ও গণিতশাস্ত্র গড়ে উঠার বদৌলতে মুসলিমদের নিকট মানচিত্রাঙ্কন পরিণত হয় এক সম্মানজনক বিজ্ঞানে। পশ্চিমা মানচিত্রকাররা পরবর্তীতে যে ধরনের মানচিত্র বানাতো, মুসলিমদের দৃষ্টিতে তা উল্টানো ছিল, যেহেতু সেগুলোতে উত্তর ছিল উপরে এবং দক্ষিণ নিচে।

১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে তুরস্কের তোপকাপি প্রাসাদ জাদুঘরে নাবিক পিরি ইবনে হাজ্জ মুহাম্মদ রেইস স্বাক্ষরিত ১৬শ শতাব্দির বিশ্ব মানিচিত্রের অংশবিশেষ খুঁজে পাওয়া যায়, যেখানে বছর হিসেবে লেখা রয়েছে মুহাররম, ৯১৯ হিজরী বা ১৫১৩ খ্রিস্টাব্দ। 'আমেরিকার মানচিত্র' নামেও পরিচিত এই মানচিত্র কলাম্বাসের নতুন বিশ্বে পৌঁছানোর মাত্র ২১ বছর পর আঁকা হয়েছিল।

> "কলাম্বাস আরবী মানচিত্রসমূহ অধ্যয়ন করেছিলেন ... দক্ষ মুসলিম ও ইহুদিদের সাহায্য নেয়া ছাড়া ১৬শ শতাব্দির ইউরোপে স্পেন কখনো শক্তিধর ঔপনিবেশিক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হতে পারতো না।"
>
> – রাগেহ উমর, বিবিসি নির্মিত প্রামাণ্যচিত্র *An Islamic History of Europe*

পিরি রেইসের এই মানচিত্র আবিষ্কৃত হলে দুনিয়া জুড়ে বেশ উত্তেজনার সৃষ্টি হয়, কেননা ১৪৯৮ খ্রিস্টাব্দে নতুন বিশ্বের অনুসন্ধানে তৃতীয়বারের মতো বের হওয়া কলাম্বাসের বানানো একটি মানচিত্রের সাথে এটার যোগসূত্র রয়েছে। কলাম্বাসের ওই হারিয়ে যাওয়া মানচিত্রের সাথে সম্পর্কযুক্ত পিরি রেইসের এ মানচিত্রে ব্রাজিল চিহ্নিত এলাকাতে লিখিত রয়েছে, "এই অধ্যায় বলবে কীভাবে এই মানচিত্র রচিত হয়েছে। এরূপ মানচিত্র আর কারও কাছে কখনো ছিল না। ২০-টি আঞ্চলিক এবং বেশকিছু বিশ্ব মানচিত্রের সাহায্যে এই ফকির নিজ হাতে এটা প্রস্তুত করেছে। বিশ্ব মানচিত্রের মাঝে রয়েছে ... আরবদের আঁকা ভারতের একটি মানচিত্র, গাণিতিক প্রক্ষেপণ প্রক্রিয়া ব্যবহার করে সাম্প্রতিককালে পর্তুগিজদের বানানো চারটি মানচিত্র – যেখানে হিন্দুস্তান ও চীন চিহ্নিত রয়েছে এবং সেইসাথে রয়েছে কলাম্বাসের আঁকা পশ্চিমের মানচিত্র ... এই মানচিত্রে অঙ্কিত (নতুন বিশ্বের) উপকূল ও দ্বীপসমূহ কলাম্বাসের মানচিত্র থেকে নেয়া।" এটা ছাড়া কলাম্বাসের মানচিত্রের আর কোনো নিশানা পাওয়া যায়নি।

অতি সম্প্রতি চীনা মুসলিম নৌ-সেনাপতি যেং হোর মানচিত্র আবিষ্কৃত হয়েছে এবং সেখান থেকে জানা যায় যে, এটা বানানোর সময়কাল ১৪১৮ খ্রিস্টাব্দ। পিরি রেইস এই মানচিত্র সম্পর্কে অবগত ছিলেন কিনা, তা আমরা এখনো নিশ্চিত জানি না।

চার্লস হ্যাপগুড ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে প্রস্তাব করেন যে, পিরি রেইসের মানচিত্রে এন্টার্কটিকা মহাদেশ রয়েছে (এই মহাদেশ 'আবিষ্কারের' ৩০৭ বছর পূর্বে)। কিন্তু গভীর পর্যালোচনার সামনে এই তত্ত্ব টিকেনি, বরং দৃশ্যত এটা দক্ষিণ আমেরিকার উপকূল। এছাড়াও এই মানচিত্রে দক্ষিণ আমেরিকার আন্দিজ পর্বতমালা রয়েছে, যা এই মানচিত্র তৈরির ১৪ বছর পর ১৫২৭ খ্রিস্টাব্দে 'প্রথমবারের মতো' কোনো স্পেনীয় মানুষের নজরে আসে। ১৫১৩ খ্রিস্টাব্দে হরিণের চামড়ায় অঙ্কিত বিশ্ব মানচিত্রের এই অংশে স্পেনের নিকটবর্তী উপকূল এবং নতুন বিশ্বসহ উত্তর আফ্রিকা চিত্রিত হয়েছে।

পিরি রেইস এখানেই থেমে যাননি, বরং ১৫২৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি দ্বিতীয় আরেকটি মানচিত্র প্রস্তুত করেছিলেন, যার এক-ষষ্ঠাংশ বর্তমানে টিকে আছে। এটাতে আটলান্টিকের উত্তর-পশ্চিমাংশ, ভেনিজুয়েলা থেকে নবআবিষ্কৃত এলাকা হয়ে গ্রিনল্যান্ডের দক্ষিণ ডগা পর্যন্ত চিত্রিত হয়েছে। ইতিহাসবেত্তাগণ মানচিত্রের এই উৎকর্ষতা দেখে বিস্মিত হওয়ার পাশাপাশি প্রথম বিশ্ব মানচিত্রের খুব সামান্য অংশ টিকে থাকায় বেশ আক্ষেপ প্রকাশ করেন। অবশিষ্ট অংশ খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা এখন পর্যন্ত তেমন ফলপ্রসু হয়নি।

৭ম শতাব্দি থেকে মুসলিমরা হজ্জ পালনের জন্য হাজার হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে পায়ে হেঁটে, ঘোড়ায় বা উটের পিঠে চড়ে মক্কা অভিমুখে বের হতো। কাগজের সুবাদে হজ্জ যাত্রীগণ অন্যদের যাত্রাকে সুখকর করতে ভ্রমণ সহায়ক মানচিত্র প্রস্তুত করা শুরু করেছিল।

বামে: ক্রিস্টোফার কলাম্বাস। ডানে: ক্রিস্টোফার কলাম্বাসের পতাকাবাহী জাহাজ সান্তা মারিয়ার একটি রেপ্লিকা।

কে এই পিরি রেইস এবং মানচিত্রাঙ্কনে এত অবদান সত্ত্বেও অধিকাংশ ইতিহাসের বই কেন তার ব্যাপারে নীরব?

১৪৬৫ খ্রিস্টাব্দে গ্যালিপলিতে জন্ম নেয়া পিরি রেইস ১৫শ শতাব্দির শেষদিকে তার প্রথিতযশা চাচা কামাল রেইসের অধীনে নিজের সমুদ্র জীবন শুরু করেছিলেন। চাচার সাথে তিনি বেশকিছু নৌযুদ্ধে অংশ নেন এবং পরবর্তীতে নৌ-সেনাপতি পদে উন্নীত হয়ে তিনি লোহিত সাগর এবং ভারত মহাসাগরে পর্তুগিজদের বিরুদ্ধে অটোমান নৌবহরের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

এসমস্ত যুদ্ধের মাঝে তিনি অবসর নিয়ে গ্যালিপলিতে ফিরে আসেন এবং তৈরি করেন তার প্রথম বিশ্ব মানচিত্র, রচনা করেন নৌ-চালনার দিক নির্ণয়ের ম্যানুয়েল গ্রন্থ: *"কিতাবুল বাহরিয়া"* (সমুদ্র জ্ঞান বিষয়ক পুস্তক) এবং ১৫২৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি তার দ্বিতীয় বিশ্ব মানচিত্র প্রস্তুত করেন। ১৫২৮ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় বিশ্ব মানচিত্র তৈরি, এরপর অবসর, এরপর আবার ১৬শ শতাব্দির মধ্যভাগে লোহিত সাগর ও ভারত মহাসাগরে অটোমান নৌবহরের নেতৃত্ব দিতে সেনাপতি হিসেবে ফিরে আসা – মাঝের এই অবসর সময়কে ঘিরে অনেক রহস্য লোকমুখে প্রচলিত আছে। কিন্তু তার জীবনের শেষটা খুবই নির্মম ছিল – গুরুত্বপূর্ণ এক নৌযুদ্ধে পরাজিত হওয়ায় অটোমান সুলতান তাকে হত্যার আদেশ দেয়।

১০০১ মুসলিম আবিষ্কার গ্রন্থে বর্ণিত অধিকাংশ ঐতিহাসিক তথ্যের ন্যায় মানচিত্রাঙ্কনের অনেক তথ্যই সাধারণ মানুষের নিকট পৌঁছেনি। ইউরোপ তার নিজের ইতিহাস নিয়ে ব্যস্ত থাকায় এবং সমুদ্র অভিযান, আবিষ্কার, বাণিজ্যিক ও ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের নাটকীয় সব গল্পের রহস্যজট খোলাতে নিমগ্ন থাকায় তুর্কি মানচিত্রগুলোতে খুব কমই দৃষ্টিপাত করা হয়েছে, আর না হয় ভ্রান্তভাবে সেগুলোকে ইতালীয় বলে চালিয়ে দেয়া হয়েছে।

কিন্তু আসল বাস্তবতা হচ্ছে: তুর্কির নৌচালন-বিদ্যা তার সময়ের চেয়ে এগিয়ে ছিল। ১৫১৭ খ্রিস্টাব্দে পিরি রেইস যখন অটোমান সুলতানের নিকট তার নতুন বিশ্ব মানচিত্র পেশ করেছিলেন, তখন তুরস্কের হাতে ছিল উত্তর-দক্ষিণ আমেরিকা ও আফ্রিকার দুর্গম কিছু এলাকার নির্ভুল মানচিত্র, যেখানে ওই সময় ও তার পরবর্তী কিছু কাল ধরে ইউরোপীয় নাবিকগণ এসব এলাকা হন্যে হয়ে খুঁজে ফিরছিলেন।

সম্ভবত সবচেয়ে অবাক করা বিশ্ব মানচিত্রের মাঝে আলী মাজার রেইসের মানচিত্র অন্যতম। ১৫৬৭ খ্রিস্টাব্দে আঁকা এই মানচিত্র এতই নিখুঁত ও খুটিনাটি বিবরণ সম্বলিত যে, তা আধুনিক মানচিত্রের সাথে বেশ সাদৃশ্যপূর্ণ এবং আমাদের অনেকের নিকট এমনটি মনে হবে যে, আলী মাজার রেইস যেন চাঁদ থেকে পৃথিবী দেখে এই মানচিত্র এঁকেছেন।

অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ মানচিত্রের মাঝে রয়েছে সিসিলির নরম্যান রাজা দ্বিতীয় রজারের জন্য আল-ইদরিসীর আঁকা ৭০-টি আঞ্চলিক মানচিত্র, যেগুলো একত্র হয়ে তখনকার জানা পৃথিবীর পূর্ণাঙ্গ মানচিত্র দাঁড় করায়। হাজারো পর্যটকের সাক্ষাতের ভিত্তিতে বানানো নিখুঁত এই মানচিত্রে এমনও এলাকা ছিল, যা ওই সময়ের পূর্বে কখনো মানচিত্রভুক্ত হয়নি। তিন শতাব্দি ধরে ভূগোলবিদগণ কোনো পরিবর্তন ছাড়াই তার মানচিত্রগুলো নকল করতো। মুগ্ধ করা আকর্ষণীয় গুণের অধিকারী এই প্রতিভা সম্পর্কে আপনি এই বিভাগের নৌচালন-বিদ্যা অধ্যায়ে আরও তথ্য পাবেন।
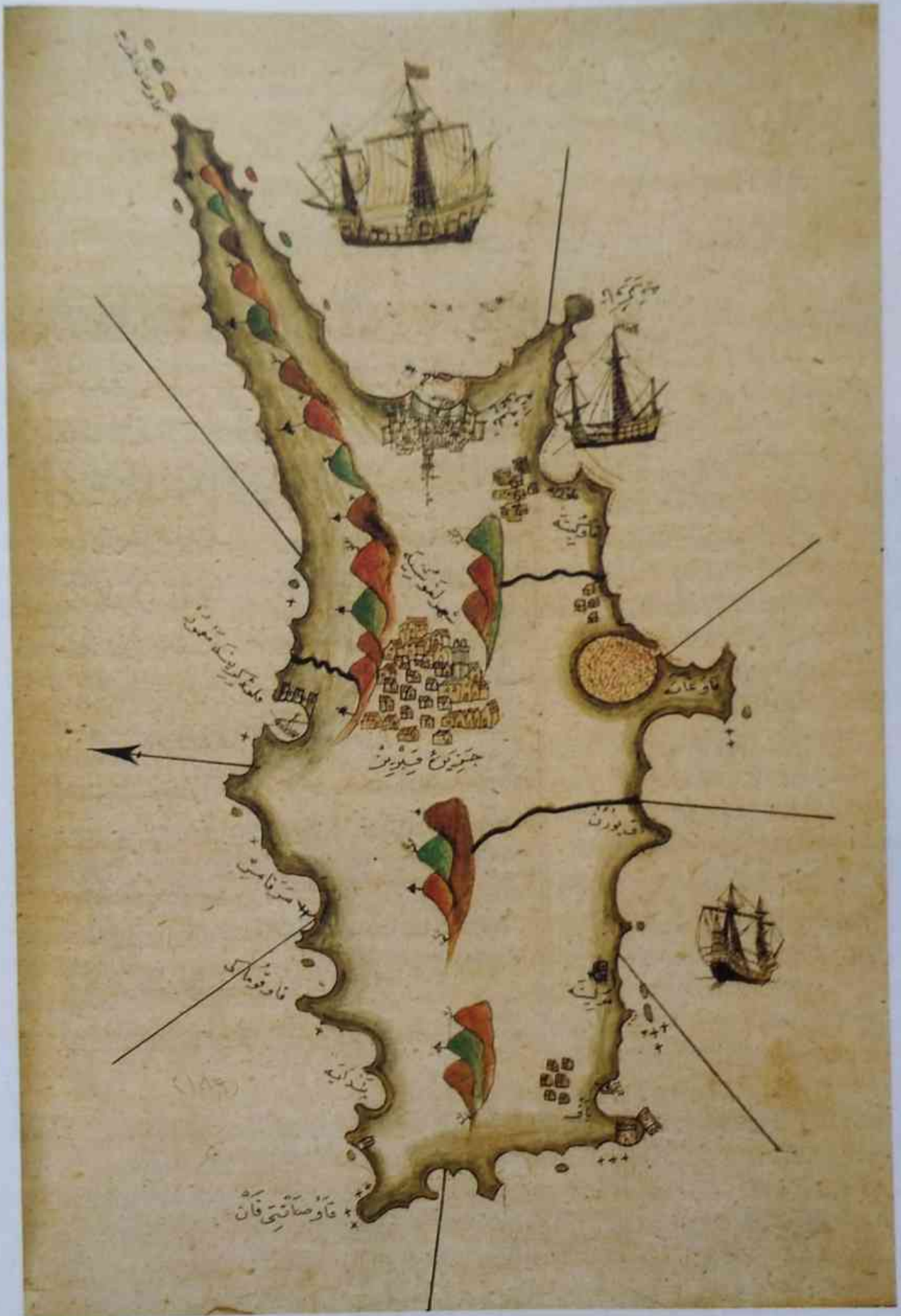
তুর্কি নৌ-সেনাপতি পিরি রেইস কর্তৃক রচিত ১৬শ শতাব্দির গ্রন্থ "কিতাবুল বাহরিয়া"র অন্তর্গত একটি মানচিত্র, যেখানে সাইপ্রাস প্রদর্শিত হয়েছে।

পিরি রেইসের মানচিত্র

পূর্ব ও পশ্চিমকে এক করা মানচিত্র

এ যাবৎ টিকে থাকা আমেরিকা মহাদেশের বিস্তারিত বিবরণ সমৃদ্ধ সর্বপ্রাচীন মানচিত্র

উল্লেখযোগ্য পরম্পরা: নিজেই যেখানে বিস্ময়, সেখানে পিরি রেইসের এই অসাধারণ মানচিত্রে আমেরিকা অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পাশাপাশি এটাই ক্রিস্টোফার কলাম্বাসের হারিয়ে যাওয়া মানচিত্রের একমাত্র সংরক্ষিত নথি

অবস্থান: তুর্কি
তারিখ: ১৬শ শতাব্দি
প্রধান ব্যক্তিত্ব: তুর্কি নৌ-সেনাপতি পিরি রেইস

১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে একদল গবেষক তুরস্কের তোপকাপি প্রাসাদ জাদুঘরে ১৬শ শতাব্দির তুর্কি বিশ্ব মানচিত্রের কিছু অংশ আবিষ্কার করে। নাবিক পিরি ইবনে হাজ্জ মুহাম্মদ রেইস স্বাক্ষরিত মানচিত্রটি প্রস্তুতের সময়কাল: ১৫১৩ খ্রিস্টাব্দ (*রেইস অর্থ: নৌ-সেনাপতি*)। 'আমেরিকার মানচিত্র' নামেও পরিচিত মানচিত্রটি কলাম্বাসের নতুন বিশ্বে পৌঁছানোর মাত্র ২১ বছর পর আঁকা হয়েছিল।

১৪৬৫ খ্রিস্টাব্দে গ্যালিপলিতে জন্ম নেয়া পিরি রেইস ১৫শ শতাব্দির শেষদিকে তার প্রথিতযশা চাচা কামাল রেইসের অধীনে নিজের সমুদ্র জীবন শুরু করেছিলেন। চাচার সাথে তিনি বেশকিছু নৌযুদ্ধে অংশ নেন এবং পরবর্তীতে নৌ-সেনাপতি পদে উন্নীত হয়ে তিনি লোহিত সাগর এবং ভারত মহাসাগরে পর্তুগিজদের বিরুদ্ধে অটোমান নৌবহরের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। প্রাসাদ জাদুঘরে পুনরাবিষ্কৃত এই মানচিত্র আঁকতে পিরি রেইস তার নিজস্ব ভ্রমণ বা নৌ-অভিযানের উপর নির্ভর করেননি, যেমনটি আপনি ভাবতে পারেন। আরবদের আঁকা ভারতের একটি মানচিত্র, একটি চীন ও চারটি পর্তুগিজ মানচিত্র এবং 'পশ্চিমাঞ্চল' তথা নতুন বিশ্বের উপকূল ও দ্বীপ-সম্বলিত কলাম্বাসের আঁকা মানচিত্রসহ ২০-টি আঞ্চলিক মানচিত্র ব্যবহার করে তিনি এ বিশ্ব মানচিত্র প্রস্তুত করেছিলেন।

শেষের এই তথ্যের জন্যই পিরি রেইসের এই মানচিত্রের পুনরাবিষ্কার বিশ্বব্যাপী ইতিহাসবেত্তাদের মাঝে বেশ উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিল। সবশেষে তিনি যে মানচিত্রের উল্লেখ করেছেন, তা নতুন বিশ্ব অনুসন্ধানে কলাম্বাসের তৃতীয় অভিযানের সময় আঁকা। ১৪৯৮ খ্রিস্টাব্দে কলাম্বাস এটা স্পেনে পাঠিয়েছিলেন – কিন্তু তা পুরোপুরি হারিয়ে যায়। এখন আমরা পিরি রেইসের এই মানচিত্রের দিকে তাকিয়ে বলতে পারি: কলাম্বাস কী সংরক্ষণ করেছিলেন।

পিরি রেইস সম্পর্কে আমরা খুব কমই জানি। চলমান নৌ-যুদ্ধ থেকে অবসর নিয়ে তিনি গ্যালিপলিতে ফিরে আসেন এবং তৈরি করেন তার প্রথম বিশ্ব মানচিত্র, রচনা করেন নৌ-চালনার দিক নির্ণয়ের ম্যানুয়েল গ্রন্থ: *"কিতাবুল বাহরিয়া"* এবং ১৫২৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি তার দ্বিতীয় বিশ্ব মানচিত্র প্রস্তুত করেন – যার এক-ষষ্ঠমাংশ টিকে আছে। এই মানচিত্রে আটলান্টিকের উত্তর-পশ্চিমাংশ, ভেনিজুয়েলা থেকে নবআবিষ্কৃত এলাকা হয়ে গ্রিনল্যান্ডের দক্ষিণ ডগা পর্যন্ত চিত্রিত হয়েছে। ইতিহাসবেত্তাগণ মানচিত্রের এই উৎকর্ষতা দেখে বিস্মিত হওয়ার পাশাপাশি প্রথম বিশ্ব মানচিত্রের খুব সামান্য অংশ টিকে থাকায় তারা বেশ আক্ষেপ করেন। অবশিষ্ট অংশ খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা এখন পর্যন্ত তেমন ফলপ্রসু হয়নি। ১৫২৮ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় বিশ্ব মানচিত্র তৈরি, এরপর অবসর, এরপর আবার ১৬শ শতাব্দির মধ্যভাগে লোহিত সাগর ও ভারত মহাসাগরে অটোমান নৌবহরের নেতৃত্ব দিতে সেনাপতি হিসেবে ফিরে আসা – মাঝের এই অবসর সময়কে ঘিরে অনেক রহস্য লোকমুখে প্রচলিত আছে। কিন্তু তার জীবনের শেষটা খুবই নির্মম ছিল – গুরুত্বপূর্ণ এক নৌযুদ্ধে পরাজিত হওয়ায় অটোমান সুলতান তাকে হত্যার আদেশ দেয়।

পিরি রেইসের আঁকা এই মানচিত্র বস্তুত এখন পর্যন্ত টিকে থাকা আমেরিকা মহাদেশের বিস্তারিত বিবরণ সমৃদ্ধ সর্বপ্রাচীন মানচিত্র। তুর্কি নৌচালন-বিদ্যা যে তার সময় থেকে কতটা এগিয়ে ছিল, এই মানচিত্র সেটারই এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ১৫১৭ খ্রিস্টাব্দে পিরি রেইস যখন অটোমান সুলতানের নিকট তার নতুন বিশ্ব মানচিত্র পেশ করেছিলেন, তখন তুরস্কের কাছে ছিল উত্তর-দক্ষিণ আমেরিকা ও আফ্রিকার দুর্গম কিছু এলাকার নির্ভুল মানচিত্র, যা ওই সময় ও তার পরবর্তী কিছু কাল ইউরোপীয় কোনো শাসকের কাছে ছিল না।
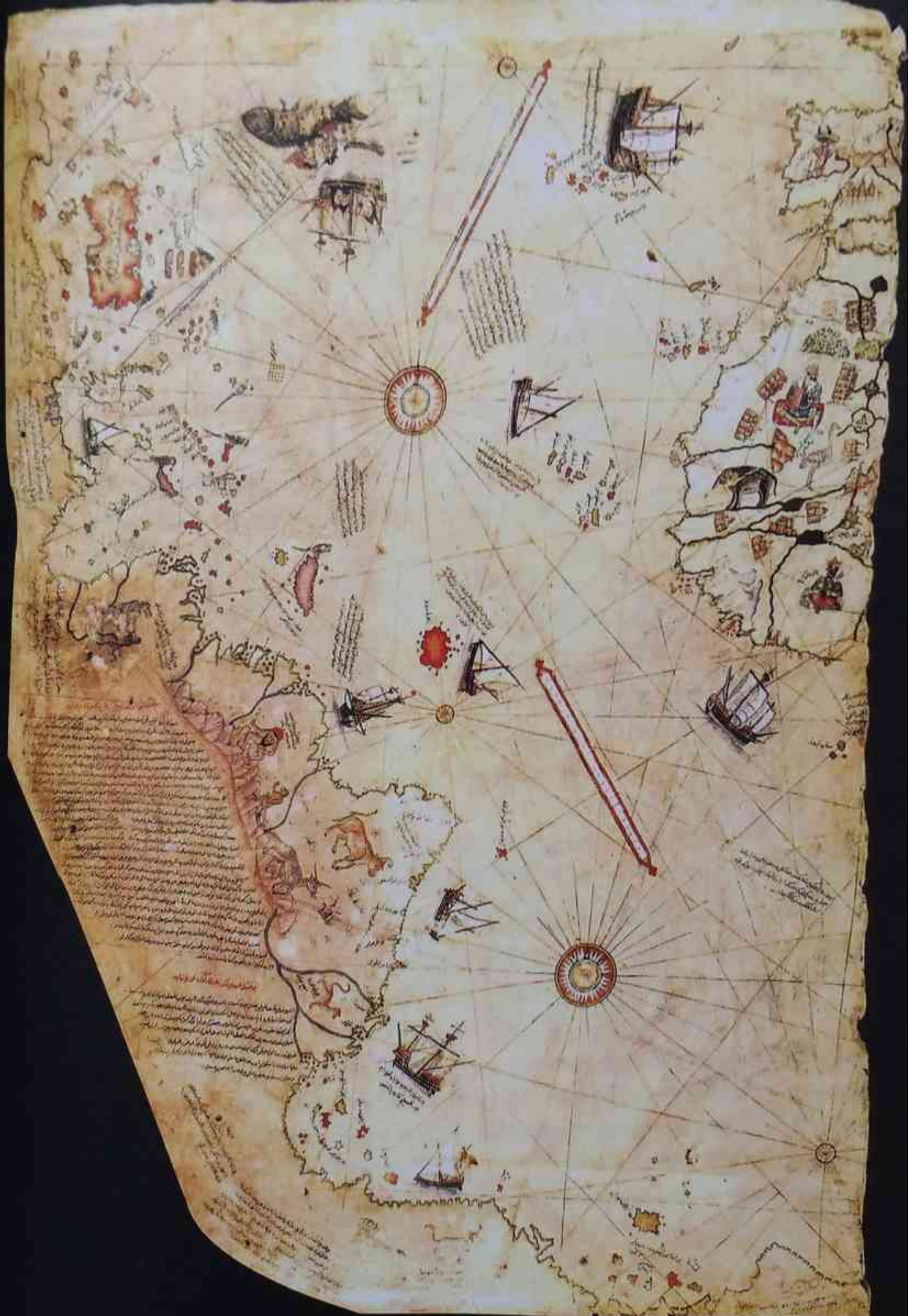
এখন পর্যন্ত টিকে থাকা সর্বপ্রাচীন মানচিত্র, যেখানে আমেরিকা মহাদেশের বিবরণ রয়েছে। ১৫১৩ খ্রিস্টাব্দে তুর্কি নৌ-সেনাপ পিরি রেইস এটা এঁকেছিলেন। প্রমাণসূত্র হিসেবে তার ব্যবহৃত মানচিত্রের মাঝে কলাম্বাসের হারিয়ে যাওয়া মানচিত্রও অন্তর্ভু ছিল। মানচিত্রের বামে: ব্রাজিলের উপকূল এবং ডানে: স্পেন ও উত্তর আফ্রিকার উপকূল দেখা যাচ্ছে।

০৬ পর্যটক এবং অভিযাত্রী

১৩০০ খ্রিস্টাব্দের শুরুর দিকে মুসলিম বিশ্ব ছিল এক বৃহৎ সাম্রাজ্য, যার আওতায় ছিল ওই সময়ের জানা পৃথিবীর অধিকাংশ এলাকা এবং একতাবদ্ধ ছিল ইসলামের মূলনীতির সাথে। ১১শ শতাব্দির বহুশাস্ত্রবিদ আল-বিরুনী তার "*তাহদীদ নিহায়াত আল-আমাকিন লি-তাসতীহ মাসাফাত আল-মাসাকিন*" (শহরসমূহের স্থানাঙ্ক নির্ণয়) গ্রন্থে বলেন, "ইসলাম ইতোমধ্যেই দুনিয়ার প্রাচ্য থেকে পশ্চিমের শহরগুলোতে পৌঁছে গেছে। পশ্চিমে এটা পাড়ি দিয়েছে আন্দালুস পর্যন্ত, পূর্বে দিয়েছে একেবারে চীনের সীমা এবং ভারতের মধ্যাঞ্চল পর্যন্ত। দক্ষিণে এটা পৌঁছেছে আবিসিনিয়া ও যানজ শহর (নিম্ন সাহারা এলাকা) হতে মালি হয়ে কিলওয়া (তানযানিয়া) এবং মোরিতানিয়া থেকে ঘানা পর্যন্ত। পূর্বে এটা আরও পাড়ি দিয়েছে মালয় দ্বীপপুঞ্জ ও জাভা সীমা এবং উত্তরে এটার বিস্তৃতি গিয়ে ঠেকেছে তুরস্ক ও সার্বিয়া অবধি। পারস্পরিক আদান-প্রদানের ভিত্তিতে এভাবে একত্র হয়েছে বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠী, যা কেবল এক আল্লাহর কৃপা ছাড়া সম্ভব ছিল না।"

হজ্জে যাওয়ার পথ ও বাণিজ্য সড়ক সুবিশাল এ মুসলিম সাম্রাজ্যের বুকে ধমনীর ন্যায় ছড়িয়ে থেকে এটাতে করেছে প্রাণের সঞ্চার। সম্পর্কের জালে বিস্তৃত এই ব্যবস্থায় মুসলিম সুলতানগণ তাদের নিজ নিজ এলাকা শাসন করতেন, কিন্তু ১৩শ শতাব্দির পর থেকে অন্তর্কলহে পরিস্থিতি অস্থিতিশীল হতে থাকে, তথাপি একজন সাধারণ মুসলিম এই বিশাল ভূখণ্ডের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত খুব সহজেই এক টুকরো পাসপোর্ট বা ছাড়পত্র বহন করে যাতায়াত করতে পারতো।

সিরিয়া ভ্রমণের প্রাক্কালে ইবনে বতুতা বলেন, "ব্যক্তির সম্পদের নিরাপত্তা এবং [মঙ্গোল বিজিত] ইরাকের পক্ষে গুপ্তচরবৃত্তিতে কোনো ব্যক্তি যে জড়িত নয়, তা নিশ্চিতে ছাড়পত্র ব্যতীত কেউ এই এলাকা পার হতে পারতো না ... এখান দিয়ে পার হওয়ার রাস্তা বেদুইনদের দখলে ছিল। সন্ধ্যা হলে তারা এ পথ বালি দিয়ে সমান করে দিতো, যেন কোনো চিহ্ন বাকি না থাকে। সকালে গভর্নর এসে বালি সরিয়ে দেখতো। যদি কোনো আরবের পায়ের চিহ্ন পাওয়া যেত, তবে তাকে হন্যে হয়ে খোঁজা হতো এবং খুব কম তার এ অনুসন্ধান থেকে রক্ষা পেত।"

মুসলিমরা স্বভাবতই ভ্রমণ পিয়াসু ছিল, যেহেতু ইসলামের নিয়ম মোতাবেক সামর্থ্যবান প্রতিটি ব্যক্তির জীবনে অন্তত একবার হজ্জ পালনে মক্কায় আসাটা বাধ্যতামূলক। ৭ম শতাব্দি থেকে পৃথিবীর দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ পায়ে হেঁটে হলেও ইসলামী সাম্রাজ্যের মক্কাতে পাড়ি জমাতে শুরু করে, আর একান্ত সৌভাগ্যবানেরা হয় উটের পিঠে, গরু-চালিত বাহনে করে কিংবা ঘোড়া ও গাধায় চড়ে এ পথটুকু পাড়ি দিতো। ভ্রমণের সাথে তারা তাদের সফরের বিবরণ লিখে রাখতো। এসব বিবরণের অনেকগুলোই ছিল আরবী ভ্রমণ সাহিত্যে প্রথম সৃষ্টির মতো, যেমনঃ চীনের বর্ণনা।

চীন সম্পর্কে প্রথম বর্ণনা ৯ম শতাব্দির দিকে পাওয়া যায়, মূলত তা পারস্য উপসাগরে চীনাদের বাণিজ্য বিবরণ। সিরাফের অধিবাসী আবু যায়েদ হাসান নামের এক মুসলিম বর্ণনা করেন যে, ইরাকের বসরা ও পারস্য উপসাগরের সিরাফ থেকে চীনের উদ্দেশ্যে নৌকা ছেড়ে যেত। মুসলিম নৌকার চেয়ে অতিকায় বৃহৎ চীনা নৌকাগুলো সিরাফেও আসতো এবং ওই নৌকাগুলোতে বসরা থেকে আসা মালামাল বোঝাই করা হতো।

হাজার বছর ধরে এসব নৌকা আরব উপকূল থেকে মাস্কাট হয়ে ওমানে যেত এবং সেখান থেকে তা ভারতে আসতো। পুরো পথ ধরে বাণিজ্য ও মালামালের আদান-প্রদান চলতো এবং শেষমেশ নৌকাগুলো গোয়াংজু (আরবীতেঃ খানফু) শহরে ভিড়তো, আর এই শহরেই গড়ে উঠেছিল গুরুত্বপূর্ণ মুসলিম কলোনি। এখানে মুসলিম বণিকদের ছিল নিজস্ব প্রতিষ্ঠান এবং তাতে সম্রাটের কর্মচারীদের সাথে বাণিজ্য চলতো – পণ্য পছন্দের ক্ষেত্রে এদের পছন্দ সবার আগে প্রাধান্য পেত। খানফু থেকে কিছু মুসলিম চীনা সাম্রাজ্যের রাজধানী ক্যান্টন পর্যন্ত চলে যেতো, যা ছিল দু'মাসের যাত্রাপথ।

> "এবং তিনি জমিনে পাহাড় স্থাপন করেছেন, যেন তা তোমাদের নিয়ে হেলে-দুলে না পড়ে, আর তিনি বইয়ে দিয়েছেন নদী; ব্যবস্থা করেছেন রাস্তার, যেন তোমরা পথ পাও। এছাড়াও রয়েছে অন্যান্য আলামত এবং লোকেরা (আসমানের) তারকার সাহায্যেও পথ বের করে নেয়।" – কুরআন (১৬:১৫-১৬)

৯ম শতাব্দির বণিক ইবনে ওয়াহ্হাব বসরা থেকে চীনে আসেন এবং তার বিবরণ মোতাবেক: চীনের রাজধানী একটি লম্বা ও বেশ প্রশস্ত রাস্তা দিয়ে দুটো ভাগে বিভক্ত হয়ে আছে। রাস্তার এক পাশে সম্রাট, তার রাজ কর্মচারী এবং প্রশাসনিক কর্মচারীরা বসবাস করতো এবং অপর পাশে থাকতো ব্যবসায়ী ও সাধারণ মানুষজন। দিনের শুরুতে রাজ কর্মচারী ও সেবাদাসগণ সম্রাটের আবাসিক এলাকা থেকে বেরিয়ে অপর পাশে এসে প্রয়োজন-মাফিক পণ্য কিনে ফিরে আসতো, অতঃপর সেখানে আর প্রবেশ করতো না।

মুসলিম বণিকদের নিকট চীন ছিল নিরাপদ ও আইনের শাসনে শাসিত এক ভূখণ্ড এবং পর্যটকদের সাথে সম্পৃক্ত আইনের বদৌলতে নজরদারীর পাশাপাশি তারা বেশ নিরাপত্তাও ভোগ করতো। ইবনে বতুতা বলেন, "পর্যটকদের জন্য চীন সবচেয়ে নিরাপদ ও সর্বোত্তম দেশ। এমনকি যেকেউ চাইলে কোনো ভয়-ডর ছাড়াই বিপুল ধন-সম্পদ নিয়ে সেখান থেকে একলা ঘুরে আসতে পারে।"

১৩শ শতাব্দির এই পাণ্ডুলিপিতে মক্কা অভিমুখী একটি কাফেলা চিত্রায়িত হয়েছে।

ভূগোলবিদ আল-মুকাদ্দিসী (আনুমানিক ৯৪৫-১০০০ খ্রি:) ইবনে বতুতার বহু আগেই নিজ গৃহ জেরুজালেম থেকে বেরিয়ে দেশ-বিদেশ ঘুরে শেষ করেছিলেন। তিনি প্রায় মুসলিম বিশ্বের প্রতিটি অঞ্চল ঘুরে দেখেছেন এবং ৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে সম্পন্ন করেন তার অনবদ্য গ্রন্থ: "*আহসানুত তাক্বাসীম ফী মা'রিফাতিল আকালীম*" (বিভিন্ন অঞ্চলের জ্ঞান লাভের সর্বোত্তম বিভাজন)।

এমন বহু মুসলিম পর্যটক ছিলেন, যারা ইসলামী বিশ্ব ও তার বাহিরের এলাকা ভ্রমণের অভিজ্ঞতা হাসিল করেছিলেন। বহু বছরের ভ্রমণ শেষে ৮৯১ খ্রিস্টাব্দে আল-ইয়াকূবী রচনা করেন: "*কিতাবুল বুলদান*" (শহর-নগর বিষয়ক পুস্তক) – যেখানে তিনি বিভিন্ন শহর, দেশ ও সেখানকার শাসকদের নাম: স্থানীয় শহর ও নগরের দূরত্ব, কর-ব্যবস্থা, স্থান-বিবরণী ও পানির উৎস্যের বর্ণনাও দিয়েছেন। ৯১২ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণকারী ইবনে খুররাদাযবিহ তার "*আল-মাসালিক ওয়াল মামালিক*" (যাত্রাপথ ও সাম্রাজ্য) গ্রন্থে মুসলিম বিশ্বের প্রধান প্রধান বাণিজ্য-পথের বিবরণ দেয়ার পাশাপাশি চীন, কোরিয়া ও জাপান থেকে শুরু করে দক্ষিণ এশিয়ার উপকূল হয়ে ব্রহ্মপুত্র নদী, আন্দামান দীপপুঞ্জ, মালয় ও জাভা পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকার বিবরণও অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন।

১৩শ শতাব্দির ভূগোলবিদ ইয়াকূত আল-হামাবী লিখেছেন বিশ্বকোষ-তুল্য গ্রন্থ "*মু'জামুল বুলদান*" (শহর ও নগরের অভিধান) – যেখানে তিনি তার দেখা প্রতিটি দেশ, এলাকা, নগর ও শহরের বর্ণানুক্রমিক বিবরণের পাশাপাশি সেগুলোর প্রকৃত অবস্থান, এমনকি সংশ্লিষ্ট এলাকার পুরাকীর্তি, অর্থনীতি, ইতিহাস, জনসংখ্যা ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের হাল-হাকিকতও তুলে ধরেছেন। আবুল ফিদার লেখা ১৩শ শতাব্দির "*তাকয়ীমুল বুলদান*" (দেশসমূহের সমীক্ষা) শীর্ষক গ্রন্থটি পশ্চিম ইউরোপে এতটাই জনপ্রিয়তা পায় যে, ১৬৫০ খ্রিস্টাব্দে মধ্য এশিয়ার খাওয়ারিযম ও ট্রান্সঅক্সানিয়া নিয়ে এটার দেয়া বিবরণের নির্বাচিত অংশ লন্ডনে থেকে প্রকাশ পর্যন্ত পায়।

ধ্রুপদী আরবী সাহিত্যকর্ম "মাক্বামাত আল-হারিরী"র ১৩শ শতাব্দির পাণ্ডুলিপিতে অঙ্কিত অনুচিত্রে প্রাচ্যের একটি মুসলিম নৌকা দেখা যাচ্ছে। আরবী লেখাটি সমুদ্র যাত্রা নিয়ে লেখা এবং তাতে নূহ নবীর নৌকা নিয়ে কুরআনের একটি আয়াতের উদ্ধৃতি তুলে ধরা হয়েছে। "وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا ۚ إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ" সাধারণত কুরআনের এই আয়াত (সূরা হূদ: ৪১) বরকত হিসেবে সমুদ্রযানে লিখে রাখা হতো।

মুসলিম পর্যটক এবং তাদের রেখে যাওয়া কাজগুলো পশ্চিমা পণ্ডিতদের দ্বারা পুরোপুরি উপেক্ষিত হয়নি; বিংশ শতাব্দির গোড়ার দিকে গ্যাব্রিয়েল ফারনান্দ ৭ম ও ৯ম শতাব্দির মুসলিম পর্যটকদের সুদূর প্রাচ্যের সফরনামা নিয়ে বেশ গুরুত্বপূর্ণ একটি গবেষণা পরিচালনা করেছিলেন। উক্ত গবেষণাতে ৩৯-টি ভ্রমণবৃত্তান্ত অন্তর্ভূত ছিল, যার ৩৩-টি আরবী, ৫-টি ফারসি এবং ১-টি তুর্কি ভাষার। এই গবেষণায় যাদের রচনা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, তাদের মাধ্যে ৯ম শতাব্দির পর্যটক আল-ইয়াকূবী অন্যতম; তিনি লিখেছেন, "চীন বিশাল এক দেশ, যেখানে সাত সমুদ্র পাড়ি দিয়ে পৌঁছাতে হয়। প্রতিটি সমুদ্রের রয়েছে নিজস্ব রঙ, বাতাস, মাছ এবং প্রফুল্লতার পরিবেশ, যা আরেকটি সমুদ্রে পাওয়া যায় না। এমন সাত সমুদ্রের অন্যতম মালয় দ্বীপপুঞ্জ দ্বারা বেষ্টিত কাংকাহ সমুদ্র। এ সমুদ্র দক্ষিণের বাতাস দিয়ে পাড়ি দিতে হয়।"

> "কেউ যদি বের হয় জ্ঞান অর্জনের সফরে, তবে আল্লাহ তাকে জান্নাত অভিমুখী যেকোন একটি রাস্তা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।"
>
> – নবী মুহাম্মদ (ﷺ), আবু দারদা সূত্রে বর্ণিত

৯ম ও ১০ শতাব্দির আরেক পর্যটক ইবনুল ফাকীহ চীন ও ভারতের কৃষ্টি-কালচার, খাদ্যভাস, পোশাক পরিধান রীতি, ধর্মীয় আচার এবং সেখানের কিছু উদ্ভিদ ও প্রাণির তুলনামূলক গবেষণা তুলে ধরেছিলেন। ইবনে রুশতাহ এক মদ্যপ রাজা (*মালিকুল খামির*) নিয়ে লিখেছিলেন, যাকে ঘিরে থাকতো ৮০-জন বিচারক। মদ্যপ অবস্থায় ওই রাজার নেয়া বিভিন্ন হটকারী সিদ্ধান্ত নিয়ে লিখলেও ইবনে রুশতাহ এটা উল্লেখ করতে ভুলেননি যে, এই রাজা মুসলিমদের প্রতি বেশ সদয় ছিল। আবু যায়েদও মদ্যপদের দেশ (আরদুল খামির) এবং এর বিপুল জনসংখ্যা নিয়ে আলোকপাতের সময় মন্তব্য করেন যে, এই অঞ্চলে অশ্লীলতা নেই। আবুল ফারাজের আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল ভারত ও সেখানকার মানুষের কৃষ্টি-কালচার ও ধর্মীয় বিষয়াদি। চীন সম্পর্কেও তিনি লিখেছেন যে, এর রয়েছে ৩০০-টি শহর এবং কেউ যদি চীন ভ্রমণ করতে চায়, তবে তার নাম, ভ্রমণ তারিখ, বংশ, পরিচয়, বয়স, সাথে বহন করা মালামাল ও তার সাথিদের বিষয়াদি নথিখাতায় নথিভুক্ত করতে হয়। এই নথি ওই ব্যক্তির ভ্রমণ নিরাপদে সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত সংরক্ষণ করা হতো। পর্যটকদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা এবং সম্রাটের মান রক্ষার্থেই এমনটি করা হতো।

১৩শ শতাব্দির পর্যটক যাকারিয়া ইবনে মুহাম্মদ আল-কাজবিনীর দেখা চীনা সমুদ্রে বেড়ে উঠা প্রকাণ্ড মাছ (সম্ভবত তিমি মাছ), বিশালাকার কচ্ছপ এবং সমুদ্র উপকূলে এসে আস্ত মহিষ ও হাতি গিলে খাওয়া দানবাকৃতি সাপের বিবরণও ফারনান্দ তার গবেষণায় উল্লেখ করেছেন। অন্যদিকে, নিজের ভ্রমণ করা প্রতিটি অঞ্চলের অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমা উল্লেখকারী ইবনে সাঈদ আল-মাগরিবীর বেশিরভাগ সময় ভারত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ এবং ভারতীয় উপকূলবর্তী শহর ও নগরে কেটেছে।

১৪শ শতাব্দির পর্যটক আদ-দিমাস্কী লিপিবদ্ধ করেছিলেন *আল-কুমর* দ্বীপ তথা মালয় দ্বীপপুঞ্জের বিস্তারিত বিবরণ। তিনি মন্তব্য করেছেন যে, বহু নগর-বন্দরে সমৃদ্ধ এই অঞ্চলে বেশ ঘন বনজঙ্গল রয়েছে এবং সেখানে বেশ উঁচু গাছপালা ও সাদা হাতি দেখা যায়। সেখানে 'রুখ' নামের এক দানবাকৃতি পাখি বাস করতো, যার ডিম ছোট গম্বুজের ন্যায় বড় ছিল।

মুসলিম সমাজে বহুল পরিচিত নীতিবাক্য: "জ্ঞানের অন্বেষণে বের হও, এমনকি তার জন্য সুদূর চীনে যেতে হলেও।"

বা থেকে: শিল্পীর তুলিতে চিত্রায়িত হয়েছে – ইবনে বতুতা তার সফরনামার ধারাবিবরণী দিচ্ছেন এবং শ্রুতি লেখক তা লিপিবদ্ধ করছে; ইবনে বতুতা বিপজ্জনক সংকীর্ণ পথ অতিক্রম করছেন; এবং তিনি তার উট নিয়ে হাঁটছেন।

রুখ পাখি নিয়ে একটি কাহিনী প্রচলিত যে, কিছু নাবিক তার ডিম ভেঙে খেয়ে ফেলে এবং এতে সে বেজায় চটে গিয়ে বড় বড় পাথর পায়ে নিয়ে তাদের সমুদ্র পর্যন্ত ধাওয়া করতে থাকে এবং নাবিকদের দিকে ওই পাথরগুলো সজোরে নিক্ষেপ করতে থাকে। ভয়ার্ত এই নাবিকরা রাত নামলে পাখির আক্রমণ থেকে রক্ষা পায়। এই গল্প এবং পর্যটকদের থেকে বর্ণিত অন্যান্য গল্প ইসলামী সাহিত্যে "*নাবিক সিন্দাবাদের অভিযান*" এবং "*আলিফ লায়লা*"-সহ বহু উপাখ্যানের রসদ জুগিয়েছিল। "*আলিফ লায়লা*" কল্পকাহিনীর উৎকর্ষ কারো অজানা নয়; বহু লেখক এটাকে উপজীব্য করে গল্প লিখেছেন, আবার কেউ বানিয়েছেন ফিল্ম ও ড্রামা-সিরিজ। আরব ধারা-বিবরণীকার ইবনে ফাদলানকে ৯২১ খ্রিস্টাব্দে বাগদাদের খলীফা মধ্য ভোলগার বুলগেরীয় রাজার নিকট রাজদূত হিসেবে প্রেরণ করেছিলেন। "*কিতাব ইলা মালিক আস-সাকালিবা*" নামের সফরনামায় ইবনে ফাদলান তার এই অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করেন। ইবনে বতুতার সফরনামার ন্যায় এটার ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম, যেহেতু এতে রয়েছে উত্তর ইউরোপ ও সেখানকার মানুষ বিশেষভাবে সুইডেনের রুস জনগোষ্ঠীর বিবরণ।

তিনি লিখেছেন, "বাণিজ্য যাত্রায় আসা রুসদের আমি দেখেছি এবং দেখেছি ভোলগায় তাদের তাঁবু পাততে। এদের ন্যায় এমন সুঠাম দেহের মানুষ আমি খুব কমই দেখেছি, খেজুর গাছের ন্যায় লম্বা, সোনালি চুল এবং লালিমামণ্ডিত। না জোব্বা আর না কটিবন্ধনযুক্ত প্রশস্ত জামা তারা পরতো, তবে তাদের পুরুষেরা বিশেষ আলখাল্লা পরতো, যা তাদের দেহের একপাশ ঢেকে দিতো এবং একটি হাত খোলা রাখতো।"

এই গ্রন্থ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে ঔপন্যাসিক মাইকেল ক্রিচটন রচনা করেন *Eaters of the Dead* (মৃত খাদক), যার কাহিনী অবলম্বনে নির্মিত হয় *The 13th Warrior* চলচিত্রটি। আধুনিক সময়ের বহু মানুষই মুসলিম পর্যটকদের দ্বারা দারুণভাবে প্রভাবিত। ইবনে বতুতার কিংবদন্তী প্রদর্শনের মাঝে উল্লেখযোগ্য: দুবাইয়ে অবস্থিত বিশ্বের সর্ববৃহৎ শপিংমল, যা তার নামে নামকৃত; এছাড়া '*Beat from Baghdad*' গানসহ জার্মান ব্যান্ড এমব্রিও (*Embryo*)-এর মিউজিক সিডি উল্লেখ করার মতো।

■ ইবনে বতুতা

১৩ জুন, ১৩২৫ খ্রিস্টাব্দে মাত্র ২১ বছর বয়সে নিজের গাধার পিঠে চড়ে ইবনে বতুতা মরক্কোর তানজাহ থেকে মক্কা অভিমুখী তার ৩০০০ মাইলের যাত্রা শুরু করেন। নিজের পরিবার, পরিজন, বন্ধু-বান্ধব ও শহর থেকে দীর্ঘ ২৯ বছর পরবাসে থাকা এই ব্যক্তি নিজভূমে ফিরে আসলেও পাননি অনেকের সাক্ষাত, যেহেতু তার ফেরার আগেই প্লেগের ভয়াল থাবা গ্রাস করেছিল তার লোকালয়কে।

তার সফরনামা আমাদের সামনে তুলে এনেছে মধ্যযুগীয় বিশ্বের নানা চিত্র, আমরা জেনেছি: স্বর্ণতুল্য এই মানুষ ভ্রমণ করেছেন আফ্রিকার সাহারার দক্ষিণভূমি থেকে মিশর ও সিরিয়া; হজ্জের জন্য প্রতিনিয়ত গিয়েছেন মক্কায়; মালদ্বীপের খোলস থেকে চষে বেরিয়েছেন উত্তর আফ্রিকা পর্যন্ত, আর সুদূর চীন থেকে আনা মৃৎসামগ্রী ও কাগজের মুদ্রা তার সাথে করে পৌঁছে যায় পশ্চিমে। পশমি ও সুতি বস্ত্র, স্বর্ণ ও তরমুজ, হাতির দাঁত ও রেশম, শায়খ ও সুলতান, বিজ্ঞ পণ্ডিত ও সতীর্থ হজ্জযাত্রী – কত কিছুরই না অভিজ্ঞতা ইবনে বতুতা তার এ দীর্ঘ যাত্রায় জমা করেছিলেন। সুলতান ও সম্রাটদের দরবারে তিনি ছিলেন প্রধান বিচারপতি এবং ধর্মনিষ্ঠ মুসলিম হিসেবে তার এসবের পিছনে ঈমানের অনুপ্রেরণা সচল ছিল। কায়রো ও দামেস্কের ন্যায় ইসলামী শহরগুলো ঘুরে বেড়ানো এবং তার সময়ের আলোকিত মানুষদের থেকে জ্ঞান হাসিল করে অতিবাহিত করেছেন নিজের গোটা জীবন।

"জ্ঞানের অন্বেষণে বের হও, এমনকি তার জন্য সুদূর চীনে যেতে হলেও" – নবী মুহাম্মদ (ﷺ) থেকে প্রমাণিত নয়, তথাপি মুসলিম সমাজের লোকমুখে প্রচলিত এই নীতিবাক্যকে ইবনে বতুতা একেবারে আক্ষরিক রূপ দিয়েছিলেন। তার এই যাত্রা পরিণত হয়েছিল এক শিক্ষাসফরে, যেখানে ধর্মাচার, বাণিজ্য থেকে রোমাঞ্চ – সবই ছিল। ১৪শ শতাব্দির ইউরেশিয়ার বিভিন্ন আচার-সংস্কৃতি, সমতা, অর্থদান, বাণিজ্য, আদর্শ নাগরিক, জ্ঞানের অন্বেষণ এবং বিশ্বাস ইতাদি বহু বিষয়ই তিনি সম্যকভাবে অবগত হয়েছিলেন।

তিন যুগ পরে নিজ দেশে ফিরে তিনি পরিণত হন বিখ্যাত পরিব্রাজকে – যিনি দূর-দূরান্ত ও পরদেশের বিভিন্ন গল্পে সকলকে মাতিয়ে রাখতেন। তিনি যখন তার এসব অভিজ্ঞতার গল্প শোনাতেন, তখন অনেকের কাছে এগুলো অবিশ্বাস্য মনে হতো। ফেযের তৎকালীন সুলতান আবু ই'নান তাকে তার ভ্রমণ অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করার আদেশ দেন এবং শ্রুতি লিখনের কাজে তিনি রাজকীয় অনুলেখক ইবনে জুযাঈকে নিয়োগ দেন। ২ বছর সময় নিয়ে ইবনে জুযাঈ এ কাজ সম্পন্ন করেছিলেন।

ইবনে বতুতা আমাদের জন্য রেখে গেছেন এক অনন্য ঐতিহাসিক দলিল, বিশেষত উত্তর আফ্রিকার মালি সম্পর্কে তার দেয়া বিবরণ আমাদের নিকট ওই এলাকার একমাত্র মধ্যযুগীয় নথি। বস্তুত তার এ সফরনামায় চড়ে আমরা খুব সহজেই ফিরে যেতে পারি ১৪শ শতাব্দির দুনিয়ায়।

বায়ে: পাণ্ডুলিপিতে ১০ম শতাব্দির ইবনে ফাদলানের রিসালা, যেখানে তার উত্তর ইউরোপ ভ্রমণের বিবরণ লিপিবদ্ধ রয়েছে। ডানে: শিল্পীর তুলিতে – ইবনে বতুতার দু'আ করার দৃশ্য। কুরআন তিলাওয়াতের পর মুসলিমগণ সাধারণত বিভিন্ন দু'আ করে থাকে।

০৭ নৌচালন-বিদ্যা

এটা ব্যাপকভাবে প্রচলিত যে, ফেং শুই (চীনা ভবিষ্যৎ কথন-বিদ্যা)-তে ব্যবহারের জন্য চীনারা কম্পাসের বিকাশ ঘটায় এবং পরবর্তীতে নৌচালনাতে ব্যবহারের জন্য নাবিকরা এটার প্রভূত উন্নয়ন সাধন করে। মুহাম্মদ আল-আওফী কর্তৃক রচিত "*মাজমুআ'তু কাসাসিয়া*" (গল্প সংকলন) শীর্ষক পারসীয় গ্রন্থে চম্বুকীয় কম্পাস ব্যবহারের সর্বপ্রাচীন নিদর্শন পাওয়া যায়।

১২৩৩ খ্রিস্টাব্দ, লোহিত সাগর এবং পারস্য বা আরব উপসাগরের সমুদ্রযাত্রা সবে শেষ হলো। আর এ অভিযানের কোনো বিবরণীতে কম্পাস নিয়ে মন্তব্য করা হলো এভাবে: "ইস্পাতে তৈরি মাছ পালিশ করে চুম্বকীয় পাথরের সাথে আটকে তা পানি পূর্ণ পাত্রে স্থাপন করা হয়। এটা ঘুরতে থাকে, যতক্ষণ না দক্ষিণে মুখ করছে।"

নৌচালন-বিদ্যাতে চুম্বকীয় কম্পাস ব্যবহারের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বিবরণ ইসলামী বিশ্বে সর্বপ্রথম বাইলাক আল-কিবজাকীর "*কিতাব কানযুত তুজ্জার ফী মা'রিফাতিল আহজার*" (ব্যবসায়ীদের জন্য পাথর বিষয়ক জ্ঞানের খনি) শীর্ষক গ্রন্থে পাওয়া যায়; গ্রন্থটি ১২৮২ খ্রিস্টাব্দে মিশরে রচিত। ১২৪২ খ্রিস্টাব্দে লেবাননের ত্রিপলি থেকে আলেকজান্দ্রিয়া অভিমুখী এক সমুদ্র সফরে তিনি ভাসমান কম্পাসের ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। তিনি লিখেছেন, "ইস্পাতের একটি সুচ একটি নলখাগড়ার সাথে আড়াআড়ি যুক্ত করে পানিপূর্ণ পাত্রের স্থাপন করা হয়। অতঃপর একটি চুম্বকীয় পাথর এই যন্ত্রের নিকটে আনা হলে চুম্বকীয় পাথরকে বহন করা হাত এটার উপর একটি চক্রাকার অবস্থা সৃষ্টি করে এবং এতে সুচ ও নলখাগড়া এই দিকে ঝুকে পড়ে। হঠাৎ করে চুম্বকীয় পাথরটি সরিয়ে নিলে সুচটি মধ্যরেখা বরাবর তাক হয়ে থাকে।"

চুম্বকীয় সুচবিশিষ্ট নমনীয় কাঠ অথবা কুমড়া-সদৃশ 'মাছের' সাজবিশিষ্ট কম্পাস নিয়েও তিনি আলোচনা করেছেন। আলকাতরা বা মোম দিয়ে সীলগালা করে এগুলোকে পানি নিরোধক করা হতো, যেহেতু এগুলো পানিতে ভাসতো। এগুলো আর্দ্র কম্পাস নামে পরিচিত ছিল, এগুলোর পাশাপাশি শুষ্ক কম্পাসও ছিল। এখানে, কাগজের চাকতির বিপরীত পাশে দুটো সুচ রাখা হতো এবং মাঝে ফানেলের মতো কিছু একটা স্থাপন করা হতো। ফানেলটি একটি অক্ষে থেকে ঘুরতো। আবর্তনকীলক হিসেবে কাজ করা অক্ষটি বাক্সের মাঝ বরাবর অবস্থান করতো এবং কাগজের চাকতি যেন না পড়ে, সেজন্য তা কাচ দিয়ে সীলগালা করা হতো। কম্পাসের ব্যবহার এবং এ ধরনের নকশা সম্বলিত কম্পাসের প্রচলন মুসলিম বণিকদের দ্বারা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে এবং পরবর্তীতে ইউরোপীয়রা কম্পাসের প্রভূত উন্নয়ন ঘটায়।

■ মহাদক্ষ নাবিকদের প্রজন্ম

নৌচালন যন্ত্রে ব্যাপক উন্নতির পাশাপাশি নাবিক হিসেবে মুসলিমদের তুলনা কেবল তারাই ছিল। ১৫শ শতাব্দির আরবের নজদের ইবনে মাজিদ ছিলেন এমনই এক নাবিক। নৌচালন-বিদ্যায় তাদের পরিবারের আলাদা খ্যাতি ছিল। তার পিতা ও দাদা উভয়েই নৌচালন-বিদ্যার প্রধান শিক্ষক হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন এবং লোহিত সাগরের খুঁটিনাটি ছিল তাদের নখদর্পণে। লোহিত সাগর থেকে পূর্ব আফ্রিকা এবং পূর্ব আফ্রিকা থেকে চীন পর্যন্ত বিস্তৃত সবগুলো সমুদ্রপথ সম্পর্কে তিনি সম্যকভাবে অবগত ছিলেন। সমুদ্রপথ নিয়ে গদ্য ও পদ্যের ছন্দে তিনি ৩৮-টির মতো প্রবন্ধ লিখেছিলেন, যার মধ্যে ২৫-টি এখনো টিকে আছে। জ্যোতিষশাস্ত্র ও নৌচালন-বিদ্যাসহ চাঁদের বিভিন্ন মনযিল, সমুদ্রপথ এবং বিভিন্ন পোতাশ্রয়ের অক্ষাংশ নিয়ে এই প্রবন্ধগুলোতে বিস্তর আলোচনা রয়েছে।

এদিকে, ১৬শ শতাব্দির নৌ-সেনাপতি পিরি রেইস নৌচালন-বিদ্যাকে ভিন্ন এক উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছিলেন। তার লেখা ৪৫০ বছরের পুরানো নৌ-চালনার দিক নির্ণায়ক ম্যানুয়েল গ্রন্থ: "*কিতাবুল বাহরিয়া*"-এর অনুবাদ তিনটি ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত, যথা: *The Book of the Mariner* (নৌ সহায়িকা), *The Naval Handbook* (নৌ পুস্তিকা) এবং *The Book of Sea Lore* (সমুদ্র জ্ঞান বিষয়ক পুস্তক)। ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে তুরস্কের সংস্কৃতি ও পর্যটন মন্ত্রণালয় গ্রন্থটির নতুন সংস্করণ প্রকাশ করে, যাতে অটোমান তুর্কি ভাষায় লেখা মূল পাণ্ডুলিপির রঙিন ছাপার পাশাপাশি লাতিন, আধুনিক তুর্কি এবং ইংরেজি অনুবাদও শামিল রয়েছে। ভূমধ্যসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ ও উপকূলের পথ-নির্দেশিকা তুল্য পিরি রেইসের

"কিতাবুল বাহরিয়া" গ্রন্থটি আধুনিক সমুদ্র ভ্রমণে নয়া দিগন্ত উন্মোচন করেছিল।

নৌ-সারণী বা *portolan* হিসেবে পরিচিত গ্রন্থটি ছিল নাবিকদের জন্য পূর্ণাঙ্গ নৌ-নির্দেশিকা, যেখানে উপকূল, জলপ্রবাহ, বন্দর ও ভূমধ্যসাগরীয় উপকূল থেকে কিছুটা দূরবর্তী এলাকার মানচিত্র অন্তর্ভূত ছিল। ভূমধ্যসাগরীয় উপকূল, দ্বীপপুঞ্জ, সংকীর্ণ সমুদ্রপথ, প্রণালী, উপসাগর, উত্তাল সমুদ্রে কোথায় আশ্রয় নিতে হবে, বন্দরে অগ্রসর হওয়ার পদ্ধতি ও নোঙ্গর করাসহ নাবিকদের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনায় গ্রন্থটি ভরপুর ছিল। বিভিন্ন স্থানের দিক এবং সেগুলোর নিখুঁত দূরত্বের বিবরণও এটাতে অন্তর্ভুক্ত ছিল।

২১৯-টি বিস্তারিত সারণীসহ এটা ছিল ভূমধ্যসাগর ও আজিয়ান সাগর সংক্রান্ত একমাত্র পূর্ণাঙ্গ ও অনবদ্য ম্যানুয়েল গ্রন্থ। প্রকৃতপক্ষে, পিরি রেইসের এই গ্রন্থের মাধ্যমে ভূমধ্যসাগরীয় নাবিক ও পণ্ডিতদের ২০০ বছরের প্রচেষ্টা উৎকর্ষের চূড়ায় আরোহণ করেছিল। এই ম্যানুয়েল গ্রন্থের দুটো সংস্করণ ছিল, যার প্রথমটি ১৫২১ খ্রিস্টাব্দের এবং পরেরটি এর পাঁচ বছরের পরের। প্রথম সংস্করণটি মুখ্যত নাবিকদের জন্য লেখা হলেও দ্বিতীয় সংস্করণটি ছিল পিরি রেইসের তরফ থেকে সুলতানের উদ্দেশ্যে নিবেদিত উপহার। নিপুণ হস্তে আঁকা নকশা এবং দক্ষ ক্যালিগ্রাফি ও চিত্র শিল্পীদের তুলি রাঙা মানচিত্র সম্বলিত গ্রন্থটি খোদ ১৬শ শতাব্দিতেই পরিণত হয় সংগ্রাহকদের দুষ্প্রাপ্য বস্তুতে। এক শতাব্দিরও বেশি সময় ধরে গ্রন্থটির নানা সংস্করণ বের হতে থাকে এবং ঝড়ো আবহাওয়া, কম্পাস, নৌ-সারণী, নৌচালনায় জ্যোতির্বিদ্যার প্রয়োগ, সাগর-মহাসাগর এবং সেগুলো ঘিরে থাকা এলাকাগুলোর নিখুঁত ও অনবদ্য বিবরণ থাকায় প্রতিনিয়ত এটা দামী থেকে আরও দামী বস্তুতে পরিণত হতে থাকে। আশ্চর্যজনকভাবে এটাতে ইউরোপীয় অভিযান নিয়েও আলোচনা রয়েছে, যার মধ্যেঃ ভারত মহাসাগরে পর্তুগিজদের অভিযান এবং নতুন বিশ্ব আবিষ্কারে কলাম্বাসের অভিযান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

> "শহর চিত্র, রীতি-নীতি, জাহাজ, উদ্ভিদ ও জীবজন্তুর বিবরণ এবং বিশেষ কিছু মানচিত্রে আঁকা চিত্রগুলো রীতিমতো এগুলোকে শিল্পের স্থানে নিয়ে এসেছে।"
>
> – অধ্যক্ষ গুনসেল রেন্ডা, *Hacettepe University*, আঙ্কারা, তুরস্ক

ইউরোপের বিভিন্ন গ্রন্থাগারে *"কিতাবুল বাহরিয়া"*-এর ৩০-টির মতো পাণ্ডুলিপি ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকলেও এগুলোর বেশিরভাগই প্রথম সংস্করণ। পিরি রেইস সম্পর্কে এই বিভাগের মানচিত্র অধ্যায়ে আরও তথ্য আলোচিত হয়েছে এবং একইসাথে সে অধ্যায়ে চীনা মুসলিম নৌ-সেনাপতি যেং হো নিয়ে কিছুটা আলোচনা রয়েছে।

নৌচালন যন্ত্রে উন্নতির পাশাপাশি মুসলিম নাবিকগণ নৌচালন-বিদ্যায় ব্যাপক উৎকর্ষ হাসিল করেছিল।

০৮ নৌ অভিযান

আজ থেকে ৬৩০ বছরেরও আগে এমন এক মানবের জন্ম হয়েছিল, সমুদ্র অভিযানে যিনি ছিলেন কিংবদন্তীদের জনক। যেং হো নামে পরিচিত এই ব্যক্তি পরিণত হয়েছিলেন 'চীনা নৌবহরের সেনাপতি'-তে। যেং হো-কে নিয়ে লেখা "১৪২১" গ্রন্থের রচয়িতা গ্যাভিন ম্যানজিয়েসের তথ্য মোতাবেক, পুরো ভারত মহাসাগরে অভিযান চালনার পাশাপাশি মক্কা, পারস্য উপসাগর, পূর্ব আফ্রিকা, শ্রীলঙ্কা ও আরব অঞ্চল জুড়ে তার অভিযানের ব্যাপ্তি ছিল। ক্রিস্টোফার কলাম্বাস কিংবা ভাস্কো দ্য গামার অভিযানের বহু যুগ আগেই তিনি সমুদ্র জয়ে নেমেছিলেন, অন্যদিকে কলাম্বাস ও ভাস্কো দ্য গামা যে আকৃতির জাহাজ নিয়ে অভিযানে নেমেছিলেন, তার আকৃতি যেং হোর জাহাজের এক-চতুথাংশেরও সমান নয়।

বিশ্বের দরবারে চীনকে শক্তিধর রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিত করাতে যেং হো নামের এই মুসলিমের ছিল অসামান্য অবদান। ২৮ বছরের ভ্রমণকালে তিনি বাণিজ্য ও কূটনীতির নামে প্রায় ৩৭-টি দেশ সফর করেছিলেন। এই অভিযানগুলো ৫০,০০০ কিলোমিটার (৩১,০০০ মাইল)-এরও অধিক দূরত্ব পাড়ি দিয়েছিল। তার প্রথম নৌবহরে অন্তর্ভূত ৩১৭-টি জাহাজে পুরুষের সংখ্যা ছিল: ২৭,৮৭০। এ যেন ছোট একটি নগর বা গোটা ফুটবল স্টেডিয়াম সমুদ্রে ভেসে বেড়াচ্ছে। সম্পূর্ণ অজানা জল-সীমায় এমন প্রকাণ্ড নৌবহর চালাতে নৌযান পরিচালনাতে ব্যাপক দক্ষতার পাশাপাশি প্রয়োজন ব্যবস্থাপনা কাজে পারদর্শীতা এবং এ কাজে যেং হোর নৈপুণ্যের কোনো কমতি ছিল না। ওই সময়ে তিনি যা অর্জন করেছিলেন, তার সাথে বর্তমানের কিছুর যদি তুলনা দিতে হয়, তবে তা কেবলই: চন্দ্র অভিযান।

যেং হো মুসলিম পরিবারে জন্মেছিলেন এবং তার নাম ছিল মা হো। তার পিতা ও দাদা হজ্জ পালনের জন্য মক্কা গিয়েছিলেন, সে সুবাদে তিনি আরবী ও চীনা ভাষায় পারদর্শী হয়ে উঠেন। আক্রমণকারী চীনা মিং রাজবংশ বালক বয়সে তাকে তার শহর কুনমিং থেকে মঙ্গোলিয়ায় নিয়ে যায়। দুঃখজনকভাবে তার জননাঙ্গ কেটে দেয়া হয় এবং এতে তিনি পরিণত হন খোজা পুরুষে। রাজ পরিবারে তিনি কার্যনির্বাহীর দায়িত্ব পান এবং তিনি যুবরাজ ডিউক ইয়ান বা যু-দির বিশ্বস্ত অনুচরে পরিণত হন। যু-দি পরবর্তীতে ক্ষমতার মসনদ দখল করলে বনে যান সম্রাট ইয়ং লি-তে।

নানচিং-এ অবস্থিত যেং হো মেমোরিয়াল হলে যেং হোর একটি পাথুরে ভাস্কর্য দাঁড়িয়ে আছে।

গ্যাভিন ম্যানজিয়েস বলেন, "দুর্ধর্ষ যোদ্ধা হওয়ার পাশাপাশি যেং হো অত্যন্ত ধার্মিক মুসলিম ছিলেন এবং তিনি যু-দির ঘনিষ্ঠ পরামর্শকে পরিণত হন। শক্তিমান এই ব্যক্তি যু-দির চেয়েও লম্বা ছিলেন; কিছু বর্ণনা মতে, 'বাঘের ন্যায় পদক্ষেপ ফেলা' এই ব্যক্তি দুই মিটারের চেয়েও লম্বা ছিলেন এবং তার ওজন ছিল একশ কেজির উর্ধ্বে।"

নিবেদিত সেবা এবং নৃপতির সবগুলো সফল সামরিক অভিযানে সঙ্গদান ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার জন্য মা হো-কে রাজ পরিবারের সামরিক মহাঅধিনায়েকের খেতাব দেয়া হয় এবং 'যেং' পদবীতে ভূষিত করা হয়। এছাড়াও তিনি তিন-খোজা-মণি (সান-পাও থাই-চীয়েন) হিসেবেও সমধিক পরিচিত ছিলেন, যা মূলত বৌদ্ধ ধর্মের সাথে সম্পর্ক (যদিও তিনি মুসলিম) এবং উচ্চ প্রাসাদ পরিষদের সম্মানসূচক মুকুটের প্রতিনিধিত্ব করে।
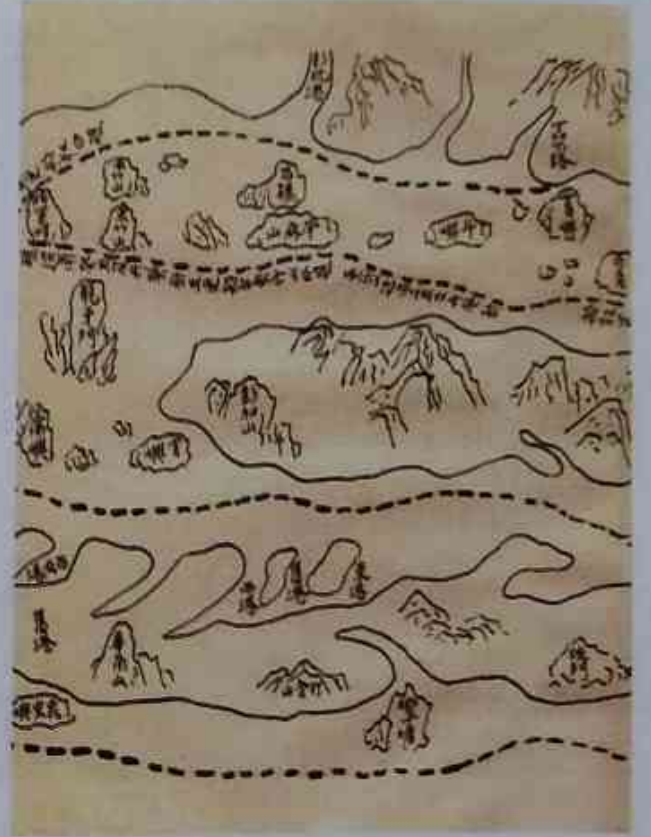
১৫শ শতাব্দির যেং হো ও তার নাবিকগণ তাদের যাত্রাপথের অবস্থান নিরূপণে এই মানচিত্র ব্যবহার করেছিল।

'গুপ্তধন অনুসন্ধানী' সাতটি সমুদ্র অভিযানে নামার পিছনে বহু কারণ ছিল। মুক্তা, খনিজ পদার্থ, উদ্ভিদ, লতা-গুল্ম, জীবজন্তু, ঔষধ, বিভিন্ন চিকিৎসা কৌশল ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার অনুসন্ধান ছিল এই অভিযানগুলোর প্রধান কারণ এবং অভিযানের সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে এগুলো আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে। সম্রাট চেয়েছিলেন বিশ্বের নৌচালন এবং মানচিত্রাঙ্কন বিদ্যাকে সমৃদ্ধ করতে; এছাড়া বাকি বিশ্বের কাছে চীনকে অন্যতম সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক পরাশক্তি হিসেবে পরিচয় করিয়ে দিতে তিনি বেশ সচেষ্ট ছিলেন। এজন্য তখন বহির্বাণিজ্যে উৎসাহ দেয়া হতো, অর্থাৎ এতে অন্য দেশগুলো প্রকাণ্ড চীনা জাহাজগুলো দেখবে এবং এতে চীনা প্রতিপত্তির খ্যাতি সবদিকে ছড়িয়ে পড়বে। সাম্রাজ্যিক পরাশক্তির প্রকাণ্ড 'শক্তিধর জাহাজগুলো'র শক্তিমত্তাকে স্বীকৃতি দিয়ে স্থানীয় ও আঞ্চলিক নেতাগণ বশ্যতা মেনে নেয়, অন্যদিকে কূটনৈতিক সম্পর্কের বদৌলতে অন্যান্য জাতিগুলো চীনের সাথে আনুগত্যের সম্পর্ক স্থাপন করে। আনুগত্যের সমর্থন হিসেবে দেশগুলো সম্রাটের নিকট দূত পাঠাতো।

১৪০৫ থেকে ১৪৩৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে যেং হো তার এই মহাঅভিযানগুলো পরিচালনা করেছিলেন এবং তার সাথে ছিল আরও দু'জন দক্ষ খোজা নেতা – হাউ হসিয়েন এবং ওয়াং চীং হাং। শৃঙ্খলার সাথে পরিচালিত অতিকায় ও প্রকাণ্ড সব জাহাজ ছিল এই অভিযানের সবচেয়ে আশ্চর্যজনক দিক। যেং হো লিখেছেন, "৬২-টি অতিকায় জাহাজ ছিল ৪৪০ ফুট লম্বা এবং দীর্ঘতম প্রস্থ ১৮০ ফুট।" এগুলো মিং সাম্রাজ্যের পরিমাপের একক (০.৩১ মিটার অথবা ১.০২ ফুট), তাই এগুলো আমাদের পরিমাপে হবে: লম্বায় ১৩৭ মিটার (৪৪৯ ফুট) এবং প্রস্থে ৫৬ মিটার (১৮৪ ফুট)। যেং হো আরও লিখেছেন যে, নাবিক, কেরানি, দোভাষী, সৈনিক, শিল্পী, চিকিৎসক এবং আবহাওয়াবিদসহ তার প্রতিটি জাহাজে প্রায় ৪৫০ থেকে ৫৫০ জন মানুষ ছিলেন। চতুর্থ অভিযানে তিনি ৩০,০০০ মানুষ নিয়ে আরব ও লোহিত সাগরের দ্বারপ্রান্তে গিয়েছিলেন।

চীনা জাহাজ নির্মাতাগণ ঠিক বুঝে ছিলেন যে, প্রকাণ্ড আকৃতির কারণে এসব জাহাজ থেকে রণকৌশল পরিচালনা বেশ কঠিন হবে। তাই তারা জাহাজগুলোতে 'ভারসাম্য রাডার' স্থাপন করে, যা ভারসাম্য রক্ষার জন্য প্রয়োজনে উপরে ও নিচে নেমে যায়। আজকের জাহাজ নির্মাতাগণ এখনও এটার কুল কিনার করতে পারেননি যে, ইস্পাতের কাঠামো ছাড়া কীভাবে ৪০০ ফুট লম্বা এসব জাহাজ সমুদ্রে দাপিয়ে বেড়িয়েছে। অনেকে তো এ ধরনের জাহাজের অস্তিত্ব নিয়ে দ্বিধায় পর্যন্ত পড়ে গিয়েছে।
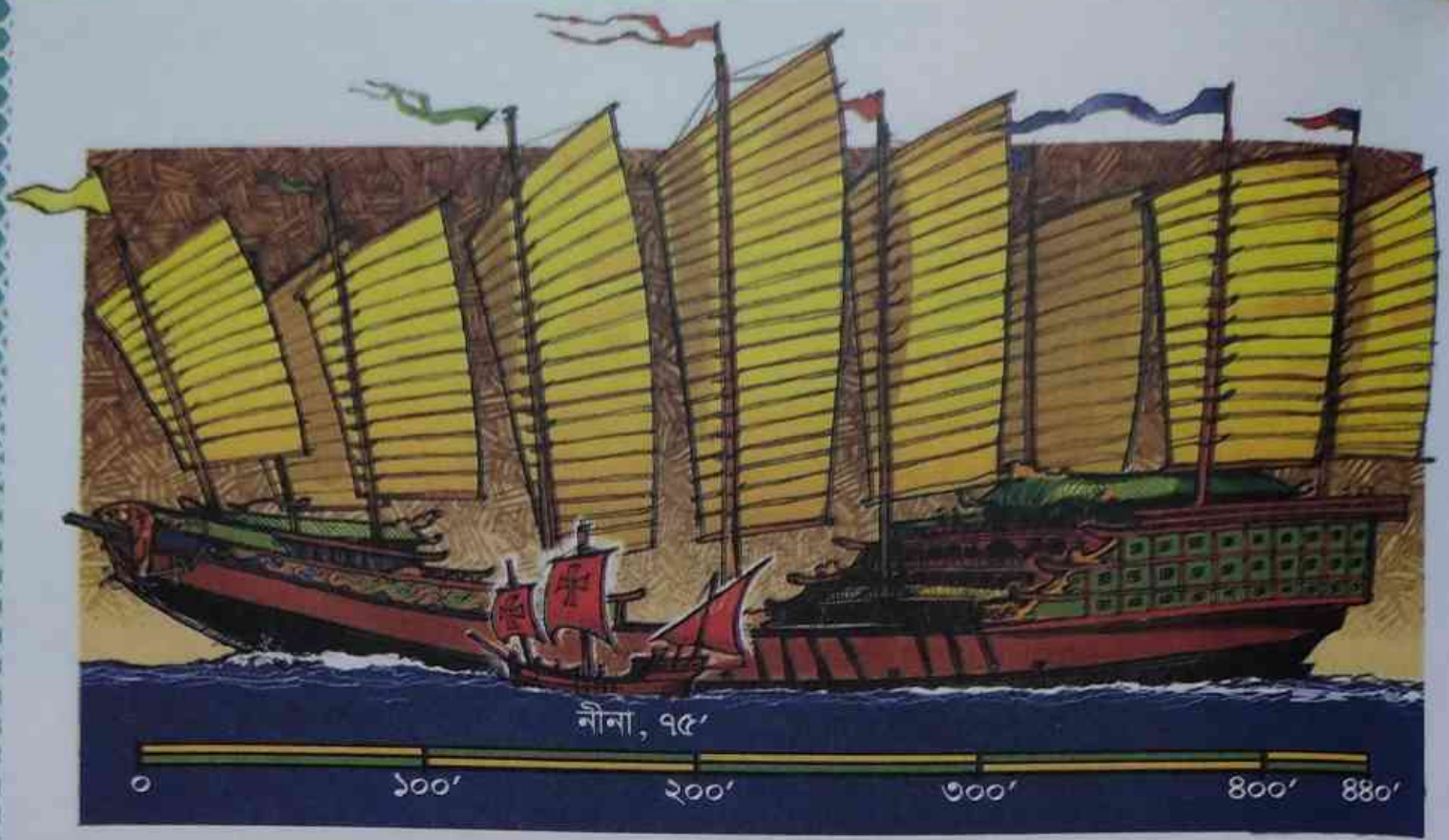
২৩ মিটার (৭৫ ফুট) লম্বা ক্রিস্টোফার কলাম্বাসের জাহাজের সাথে ১৩৪ মিটার (৪৪০ ফুট) লম্বা যেং হোর জাহাজের তুলনা চিত্র।

কিন্তু ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে নানচিং-এর একটি নৌবন্দরের ধ্বংসস্তূপে 'গুপ্তধন অনুসন্ধানী' জাহাজের রাডার পোস্ট উদ্ধার হয়। সাধারণ ঐতিহ্যবাহী সমতল পাটাতনের চীনা নৌকাগুলোর অনুপাতের সাহায্যে উল্টো হিসাবের মাধ্যমে এই রাডারের আনুমানিক পরিমাপ দাঁড়ায়ঃ ১৫২ মিটার (৫০০ ফুট)।

পাটাতনের দিক দিয়ে প্রকাণ্ড এই জাহাজগুলো ছিল কার্গো (পণ্যবাহী জাহাজ)-তুল্য, যেগুলো রেশমি ও সুতি বস্ত্র, চীনামাটির বাসনকোসন, স্বর্ণ ও রৌপ্য সামগ্রী, তামার গৃহস্থালী সরঞ্জাম এবং লোহার হাতিয়ারে বোঝাই ছিল। জিরাফ, জেব্রা বা 'স্বর্গীয় ঘোড়া', আফ্রিকার কৃষ্ণসার মৃগ বা 'স্বর্গীয় হরিণ' এবং উটপাখির ন্যায় জীবজন্তু বহনের পাশাপাশি জীবন্ত মাছ রাখা ও গোসলের জন্য জাহাজে জলরোধী বেষ্টনীরও ব্যবস্থা ছিল।

ভাসমান জলাধারের মাধ্যমে এই জাহাজগুলো পানি নিষ্কাশন করতো এবং যোগাযোগের জন্য এরা ব্যবহার করতোঃ পতাকা, লণ্ঠন, ঘণ্টা, ধাতুর তৈরি চাকতির ন্যায় ঘণ্টা, বাহক কবুতর এবং ঝাণ্ডা। অভিযানগুলো নিয়ে মিং আমলের একটি বর্ণনা, "দক্ষিণ সমুদ্রে যাত্রা করা জাহাজগুলো ছিল বাড়ির ন্যায়। যখন এদের পালগুলো নজরে আসতো, তখন তা মনে হতো আকাশের মেঘ।" এই জাহাজগুলো সামষ্ঠিকভাবে 'সাতারু ড্রাগন' নামে পরিচিত ছিল, যেহেতু 'দেখা'-র সুবিধার জন্য এসব জাহাজের সামনের অংশে ড্রাগনের চোখের ন্যায় বিন্দু আঁকা ছিল।

যেং হোর সাতটি অভিযানের শেষে চীন নৌ-প্রযুক্তি ও প্রতিপত্তিতে অপ্রতিদ্বন্দ্বি হয়ে উঠে এবং এর পাশাপাশি বহু বিচিত্র প্রাণী প্রথমবারের মতো চীনে প্রবেশ করে, যেমনঃ আফ্রিকা থেকে আসা জিরাফ। প্রথমদিকে ভুলভাবে এটাকে চীনা রূপকথার প্রধান ইউনিকর্ন বা অদ্ভুত কাল্পনিক জন্তু *কিলিন* মনে করা হতো। কনফুসীয় ঐতিহ্যে *কিলিন* ছিল চূড়ান্ত প্রজ্ঞার ঋষি এবং তার উপস্থিতি দয়ার অনুভূতি সৃষ্টি হতো।

এটা ধারণা করা হয় যে, ১৪৩৩ খ্রিস্টাব্দে ফিরতি যাত্রায় যেং হো ভারতে মৃত্যুবরণ করেন। তার মৃত্যু এবং কনফুসীয় দর্শনের পুনর্জাগরণের ফলে চীনা সাম্রাজ্য অন্তর্মুখী হয়ে উঠে এবং শেষমেশ সমুদ্রগামী বাণিজ্য নিষিদ্ধ করা হয়। একশ বছরেরও কম সময়ে, চীন থেকে বহু মাস্তুলের জাহাজে করে সমুদ্র যাত্রায় বের হওয়াটা রীতিমতো বড় ধরনের অপরাধ হিসেবে গণ্য হতে শুরু করে। ১৫২৫ খ্রিস্টাব্দে চীনা সম্রাট সব ধরনের সমুদ্রগামী জাহাজ ধ্বংস করার নির্দেশ দেন। হায়! ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ নৌ-বাহিনী, এককালে যার ছিল ৩,৫০০ জাহাজ (বর্তমানে মার্কিন নৌ-বাহিনীতে প্রায়

৪৯০-টি জাহাজ রয়েছে), সাম্রাজ্যের এমন নীতিতে তা হারিয়ে গেল।

১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে ঝেং হোর অভিযানের ৫৮০-তম বার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে তার সমাধি সংস্কার করা হয় এবং নানচিং-এ থাকা তার কবর ইসলামী রীতিতে সংস্কার করে নতুন সমাধি স্থাপন করা হয়। তার সমাধি স্থলের প্রবেশদ্বার মিং রীতিতে নির্মিত এবং সেখানে মেমোরিয়াল হলটি অবস্থিত। হলের অভ্যন্তরে রয়েছে এই মহামানবের বিভিন্ন ছবি, ভাস্কর্য এবং তার নৌচালনের বিভিন্ন মানচিত্র।

> "আমরা সমুদ্রে দেখছিলাম পর্বততুল্য ঢেউ আসমান ছুঁয়ে আমাদের উপর আছড়ে পড়ছে এবং সেইসাথে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখছিলাম দূর-দূরান্তের অঞ্চলগুলোর দিকে, আড়াল হয়ে আছে যা মৃদু বাষ্পের নীল স্বচ্ছতার পশ্চাতে। ওদিকে আমাদের জাহাজগুলো মেঘের ন্যায় বাতাসে ভাসছে: দিনে ও রাতে চলমান রেখেছে তাদের যাত্রাপথ দ্রুত ধাবমান তারকার গতিতে: অগ্রসর হচ্ছে বুনো তরঙ্গ পাড়ি দিয়ে, যেন আমরা মাড়িয়ে চলছি লোকারণ্যে ভরা সড়ক।"
>
> – নিজের আত্মজীবনী "মিং শিহ" (*Ming Shih*)-তে ঝেং হোর বক্তব্য

তার সমাধিস্থল অভিমুখী পথ নতুন করে পাথরে বাঁধানো হয় এবং তাতে বসানো হয় সারি সারি সোপান ও ধাপ। সমাধিস্থলের দিকে চলে যাওয়া সিঁড়িপথ চারটি সমান ভাগে বিভক্ত ২৮-টি পাথরের ধাপ দিয়ে সাজানো, যা বস্তুত ঝেং হোর পশ্চিম অভিমুখী সাতটি অভিযানের প্রতীকী রূপায়ন। তার সমাধির উপরে খোদাই করে লিখা আছে: আল্লাহু আকবার – আল্লাহ-ই মহান।

ঝেং হোর ন্যায় এত বিশাল নৌবহর কিংবা তার জাহাজের ন্যায় এত মাস্তুলের জাহাজের নজির বিশ্বে নেই বললেই চলে। সমুদ্রে চলার সময় এই নৌবহরকে মনে হতো ভাসমান শহর। এই জাহাজগুলোর অধিকাংশই নির্মিত হয়েছে নানচিংয়ের নিকটবর্তী ড্রাগন বে শিপইয়ার্ডে, যার ধ্বংসাবশেষ আজও দৃশ্যমান।

■ ঝেং হোর সাত মহাকাব্যিক অভিযান

১. **১৪০৫-১৪০৭:** এ অভিযানে তিনি চম্পা (ইন্দোচীন), জাভা ও সুমাত্রা, সিলন এবং ভারতের কলকাতা ভ্রমণ করেন।

২. **১৪০৭-১৪০৯:** এ অভিযানে সিয়াম (*Siam*) এবং ভারত ভ্রমণ করেন এবং কচিতে যাত্রা বিরতি দেন।

৩. **১৪০৯-১৪১১:** মালাকা-কে কেন্দ্রে রেখে পূর্ব ভারতের বহু স্থান ভ্রমণসহ তিনি এ অভিযানে প্রথমবারের মতো ভারতের কিউলন (*Quilon*)-এ যান।

৪. **১৪১৩-১৪১৫:** এই অভিযানে নৌবহর বিভক্ত হয়ে পড়ে। একটি অংশ আবারও পূর্ব ভারত এবং অপর অংশ সিলনকে কেন্দ্রে রেখে বাংলা, মালদ্বীপ ও হরমুজের পারস্য সালতানাত পর্যন্ত যায়। এই যাত্রা এতটাই উদ্দীপন সৃষ্টি করেছিল যে, ১৪১৬ খ্রিস্টাব্দে দূতদের একটি বিশাল বহর নানচিং পর্যন্ত সফর করে। পরবর্তী বছর বিশাল নৌবহরে করে তাদেরকে তাদের দেশে ফেরৎ পাঠানো হয়।

৫. **১৪১৬-১৪১৯:** শান্তিকামী নৌবহরগুলো এই অভিযানে জাভা, রিউকু দ্বীপপুঞ্জ ও ব্রুনাই সফরে যায়। অন্যসব নৌবহর ভারতকে কেন্দ্রে রেখে হরমুজ, এডেন, মোগাদিসু, মোম্বাসা ও পূর্ব আফ্রিকার বিভিন্ন বন্দরে যায়। এই অভিযান থেকেই চীনে প্রথম জিরাফ নেয়া হয়।

৬. **১৪২১-১৪২২:** একই সমুদ্রপথ ধরে পূর্ববর্তী অঞ্চলগুলোর সাথে এই যাত্রায় যোগ হয় দক্ষিণ আরব ও পূর্ব আফ্রিকার বিভিন্ন বন্দর। পূর্বের বোর্নিও থেকে পশ্চিমে জানজিবার পর্যন্ত এই নৌবহর দুই বছরে ৩৬-টি দেশ ঘুরে। এ থেকে সহজে অনুমিত হয় যে, নৌবহরগুলো আগের অভিযানের মতো কয়েকটি ভাগে বিভক্ত হয় এবং মালাকা বন্দর ছিল তাদের জাহাজগুলোর প্রধান মিলনস্থল। রেডিও ব্যবহারের আগ পর্যন্ত কোনো বন্দরকে প্রধান মিলনস্থল হিসেবে ব্যবহারের নজির স্থাপনে এটা ছিল বিস্ময়কর অর্জন।

৭. **১৪৩১-১৪৩৩:** সর্বশেষ এই অভিযানে ঝেং হো ছিলেন ষাটে পা দেয়া ব্যক্তি, যিনি ইতোমধ্যেই সুসম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন জাভা থেকে মক্কা ও পূর্ব আফ্রিকা পর্যন্ত ২০-এরও অধিক দেশ ও সাম্রাজ্যের সাথে। এই চীনা নৌবহরগুলো পূর্ব আফ্রিকার কতটুকু গিয়েছিল, তা কেউ না জানলেও কিছু বর্ণনামতে, এরা উত্তমাশা অন্তরীপ পর্যন্ত চক্কর দিয়েছিল।

০৯ বৈশ্বিক যোগাযোগ

ইলেকট্রিক বা কাগজ – যে মাধ্যমেই তথ্যের আদান-প্রদান হোক না কেন, যেকোন সময় তা ঝুকির মুখে পড়তে পারে। গুরুত্বপূর্ণ গোপন বার্তা ভুল মানুষের হাতে পড়া ঠেকাতে সাংকেতিক বার্তা প্রেরণ করা হয়, যেন সঠিক সংকেত জানা ব্যক্তিটি তার মর্মোদ্ধারে সক্ষম হয়।

সাংকেতিক বার্তার পাঠোদ্ধারের এমন একটি ঘটনা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ঘটেছিল, যখন জার্মানরা এনিগমা (*Enigma*) নামের টাইপ-রাইটার ব্যবহার করে রেডিওতে প্রচারের পূর্বে কিছু বার্তা এনক্রিপ্ট বা সংকেতযুক্ত করে পাঠাচ্ছিল। সাংকেতিক কোড ভাঙতে সক্ষম একদল পোলিশ সাইফার ব্যুরো এবং আরেকদল ব্রিটিশ ব্লেচলে পার্কে থেকে জার্মানদের ওই বাতার কোড ভেঙে ফেলে।

> "সাংকেতিক বার্তার পাঠোদ্ধার – এ বিদ্যার সূচনার জন্য প্রয়োজন এমন এক সমাজের, যারা তিনটি দিকে সমৃদ্ধির চূড়ায় আরোহণ করেছে, যথা: ভাষাতত্ত্ব, পরিসংখ্যান এবং গণিত। এই তিনটি শর্ত আল-কিন্দীর সময় সহজলভ্য হয়ে উঠে এবং এই তিন শাস্ত্রসহ আরও বহু বিষয়ে তিনি বুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন।"
>
> – ড. সাইমন সিং, *The Code Book* (১৯৯৯)

বিংশ শতাব্দির এই লোকগুলো বস্তুত কোড ভাঙার ওই ঐতিহ্যকে আগে বাড়িয়েছে, যা নিয়ে সর্বপ্রথম কলম ধরেছিলেন ৯ম শতাব্দির বহুবিদ্যায় সমান পারদর্শী বাগদাদের আল-কিন্দী। ওই সময় বার্তার আদান-প্রদান পাখির মাধ্যমে হওয়ায় সেগুলোকে ওজনে বেশ হালকা হতে হতো এবং গোপনীয় বার্তাগুলো সাংকেতিকভাবে পাঠানো হতো। *"রিসালা ইসতিখরাজুল মুআ'ম্মা"* (সাংকেতিক বার্তার পাঠোদ্ধার বিষয়ক পুস্তিকা) লিখে ক্রিপ্টগ্রাফি শাস্ত্রে তিনি এক যুগান্তকারী বিপ্লবের জন্ম দিয়েছিলেন। এই পুস্তকের একটি অংশে পুনরাবৃত্তি বা ফ্রিকুয়েন্সি পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা হয়েছে, অর্থাৎ একটি সাধারণ বর্ণকে যদি ভিন্ন আরেকটি বর্ণ দিয়ে বদলানো থাকে, তবে ওই নতুন বর্ণটি মূল বর্ণের যাবতীয় বৈশিষ্ট্য ধারণ করবে – বিষয়টি তিনি ভালোভাবেই লক্ষ্য করেছেন। আমরা যদি ইংরেজি ভাষার দিকে খেয়াল করি, তবে দেখবো বিভিন্ন শব্দে 'e' (ই) বর্ণটি অন্যসব বর্ণের চেয়ে ১৩% বেশি আবির্ভূত হয়েছে। তাই 'e' (ই) বর্ণটি যদি # সংকেত দ্বারা বদলে দেয়া হয়, তবে # পরিণত হবে সবচেয়ে বেশি আবির্ভূত সংকেতে এবং এটার ব্যবহারের হারও অন্যসব সংকেতের চেয়ে ১৩% বেশি হবে। একজন সাংকেতিক তথ্য বিশ্লেষক (*cryptanalyst*) তখন বের করতে সক্ষম হবে যে, # সংকেতটি মূলত 'e'-এর প্রতিনিধিত্ব করছে।

কুরআনের আরবী ভাষ্য নিয়ে গবেষণার সময় বর্ণের ফ্রিকুয়েন্সি বা পুনরাবৃত্তির বিষয়টি তার নজরে আসে, যা ছিল ক্রিপ্টগ্রাফির ভিত্তি প্রতিষ্ঠার মূল নিয়ামক। ইউরোপের রেনেসাঁ আমলে বহু সাংকেতিক তথ্য বিশ্লেষক আল-কিন্দির প্রতিষ্ঠিত ভিতকে আরও সুবিন্যস্ত করতে সক্ষম হয়। বড় রকমের সাংকেতিক বার্তার পাঠোদ্ধার ও কোড ভাঙার পদ্ধতি যদিও ১১০০ বছর পূর্বে আল-কিন্দীর হাত ধরে সমৃদ্ধ হয়েছে, তথাপি '*cryptanalysis*' (সাংকেতিক বার্তা পর্যবেক্ষণ) শব্দটি বেশ সাম্প্রতিক এবং ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে উইলিয়াম ফ্রেডম্যান সর্বপ্রথম এই শব্দ ব্যবহার করেন।

ফ্রিকুয়েন্সি পর্যবেক্ষণ বর্তমানে ধ্রুপদী কোড ভাঙার মৌলিক হাতিয়ার, যা বর্ণমালার সাধারণ পঠনকে ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করে। এই বিদ্যা ভাষার সাধারণ পাঠের সংখ্যা ও ভাষাতাত্ত্বিক জ্ঞান এবং সমস্যা সমাধানের পারদর্শীতার উপর নির্ভর করে। আধুনিক সংকেতগুলো বেশ জটিল, কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ব্রিটেন ও আমেরিকা তাদের প্রধান সংবাদপত্রগুলোতে শব্দ সাজানোর ধাঁধা দিয়ে প্রতিযোগিতার আয়োজন করতো এবং দ্রুততম সময়ে যারা সেগুলো সমাধান করতো, তাদেরকে কোড ভাঙার কাজে নিয়োগ দেয়া হতো।

■ বিমান-ডাক

বর্তমানে আমাদের নিকট ডাক যোগাযোগ মামুলি হলেও একটা সময় পায়রা-ডাক বা প্রশিক্ষিত কবুতর দিয়ে বার্তার

আদান-প্রদানই ছিল একমাত্র সহজলভ্য 'বিমান-ডাক'।

বার্তাবাহক কবুতর নিয়ে লেখা এক গ্রন্থে মুসলিম পণ্ডিত ইবনে আবদ আয-যাহির লিখেছেন, তৎকালীন যোগাযোগের মূলকেন্দ্র কায়রোর নগরদুর্গে সাধারণত ১,৯০০-এর মতো কবুতর থাকতো।

মুসলিম কাহিনীকার আল-নুয়াইরী ১০ম শতাব্দির আজিজ নামে পরিচিত এক ফাতিমী খলীফা সম্পর্কে লিখেছেন: কায়রোতে থাকাকালে তার একবার এন্টিয়কের সতেজ চেরিফল খাওয়ার বাসনা জাগে। এন্টিয়কের নিকটস্থ বালবেকে বার্তাবাহক কবুতর দিয়ে আদেশ পাঠানো হয়। তখন প্রতিটি কবুতরের পায়ে একটি চেরিফল মোড়ানো রেশমি থলে আটকে দিয়ে প্রায় ৬০০ কবুতর কায়রো পাঠানো হয়। ইচ্ছা করার তিনদিনের মাথায় বিশেষ 'বিমান-ডাক' ডেলিভারির মাধ্যমে খলীফার সামনে আনা হয় লেবানন থেকে পাঠানো ১,২০০ সতেজ চেরিফলের এক বিশাল পাত্র।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে সামরিক বার্তা সংকেতযুক্ত করে পাঠাতে ব্যবহৃত এনিগমা (*Enigma*) যন্ত্র। প্রকৃতপক্ষে, ৯ম শতাব্দির আল-কিন্দীর হাত ধরেই ক্রিপ্টোগ্রাফির ভিত্তি প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল।

কোড ভাঙা

"এনক্রিপ্ট করা বা সাংকেতিক বার্তা পাঠোদ্ধারের একটি পথ হচ্ছে: আমরা যদি এটার ভাষা জানি, তবে ওই একই ভাষার বিকল্প সহজবোধ্য পাঠ বের করা, এরপর প্রতিটি বর্ণের পুনরাবৃত্তি গণনা করা। যে সংখ্যাটির পুনরাবৃত্তি সর্বাধিক হবে, আমরা সেটাকে 'প্রথম', এরপরের সর্বাধিক পুনরাবৃত্তিময় সংখ্যাকে 'দ্বিতীয়', পরেরটি 'তৃতীয়' এভাবে চলবে, যতক্ষণ না আমরা নমুনাতে সাধারণ পাঠটির সবগুলো ভিন্ন বর্ণ লিখছি ... এরপর আমরা যে প্রতীকী বার্তার পাঠোদ্ধার করতে চাই, সেটাতে মনোযোগ দিয়ে সেটার প্রতীকগুলো শ্রেণিবদ্ধ করবো। যে প্রতীকটির পুনরাবৃত্তি সর্বাধিক হবে, সেটাকে আমরা আমাদের সহজবোধ্য পাঠের 'প্রথম' বর্ণ দ্বারা বদলে দেবো, পরের সর্বাধিক পুনরাবৃত্তিময় সংখ্যাকে আমরা 'দ্বিতীয়' বর্ণ দ্বারা বদলে দেব এবং এভাবে চলবে, যতক্ষণ না আমরা আমাদের সাংকেতিক বার্তার পুরো প্রতীকটি পাচ্ছি।"

–আল-কিন্দী রচিত ৯ম শতাব্দির
"রিসালা ইসতিখরাজুল মুয়া'ম্মা"
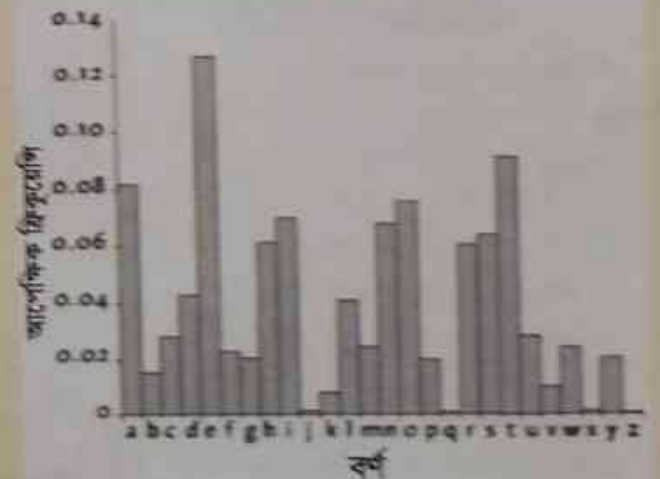
কোনো একটি অনুচ্ছেদে থাকা বর্ণমালার ফ্রিকুয়েন্সি সারণী

১০ যুদ্ধ এবং যুদ্ধাস্ত্র

১৩শ শতাব্দির সামরিক বিষয়াদি নিহায়েৎ জটিল ছিল না, বরং তা ছিল অত্যাধুনিক। গ্রেনেড, সালফার বোমা, কামান, রকেট এবং টর্পেডো ছিল সামরিক আলোচনার অন্তর্ভূত। সামরিক প্রযুক্তি বিষয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রচনা ছিল সিরীয় পণ্ডিত হাসান আর-রাম্মাহর *"কিতাবুল ফুরূসিয়াত ওয়াল মানাসিবুল হারবিয়্যা"* (অশ্বচালন নৈপুণ্য ও অত্যাধুনিক যুদ্ধাস্ত্র) শীর্ষক গ্রন্থটি, যা ১২৭০ খ্রিস্টাব্দের দিকে রচিত। রকেটের প্রথম লিখিত দলিলসহ গ্রন্থটি ছিল বিভিন্ন যুদ্ধাস্ত্রের ডায়াগ্রামে পূর্ণ। এই গ্রন্থে বর্ণিত রকেটের একটি ডিজাইন ওয়াশিংটন ডিসির জাতীয় বিমান ও মহাকাশ জাদুঘরে প্রদর্শিত অবস্থায় রয়েছে।

চীনারা প্রথম গানপাউডার উদ্ভাবন করেছিল এবং কেবল আতশবাজিতে ব্যবহারের জন্য তারা গানপাউডারের অন্যতম উপাদান সল্টপিটারের ব্যাপক উন্নয়ন করেছিল। আমানি যেইন বিবিসি প্রামাণ্যচিত্র *What the Ancients Did for Us*-এ বলেন, "গবেষণা দেখাচ্ছে যে, মুসলিম রসায়নবিদগণ শক্তিশালী গানপাউডার তৈরির এক কার্যকর সূত্র উদ্ভাবন করেছিল এবং অনেকেই তাদের প্রথম আগ্নেয়াস্ত্রে সেটার ব্যবহারও করেছিল।"

সঠিক অনুপাত বের করতে না পারা এবং পটাশিয়াম নাইট্রেট পরিশুদ্ধ করতে না পারার কারণে চীনারা এটাকে বিস্ফোরণে ব্যবহার করতে পারছিল না। ১৪১২ খ্রিস্টাব্দে বিস্ফোরকের অনুপাত বিষয়ে প্রথম চীনা গ্রন্থ হো লাং চীং কর্তৃক রচিত হয়। এর প্রায় একশ বছর পূর্বে হাসান আর-রাম্মাহর গ্রন্থ প্রথমবারের মতো পটাশিয়াম নাইট্রেট বিশোধনের প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করে এবং সেইসাথে বিস্ফোরক গানপাউডার তৈরির বহু রেসিপির বিবরণ দেয়।

"আগ্রাসী ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে বাইবারসের নেতৃত্বাধীন মুসলিম সেনাদলের গানপাউডারের ব্যবহার যুদ্ধের নিয়তি মুসলিমদের অনুকূলে নিয়ে আসে। মিশরের আল-মানসূরা যুদ্ধে মুসলিমদের আগ্নেয়াস্ত্রগুলো এতটাই ভয়ানক এবং ধ্বংসাত্মক ছিল যে, ফরাসি ক্রুসেডার বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে যায় এবং রাজা নবম লুইস তাতে বন্দি হন" বিবিসি

বামে: আর-রাম্মাহর গ্রন্থের ১৩শ শতাব্দির পাণ্ডুলিপিতে সজোরে মিসাইল নিক্ষেপক যন্ত্র চিত্রায়িত হয়েছে। কেন্দ্রে: ইবনে আরাংবুগা আয-যারদাকাশের ১৪শ শতাব্দির যুদ্ধাস্ত্র বিষয়ক ম্যানুয়েলে আরেকটি সজোরে মিসাইল নিক্ষেপক যন্ত্র চিত্রায়িত হয়েছে। ডানে: ইবনে আরাংবুগা আয-যারদাকাশ রচিত ১৪শ শতাব্দির যুদ্ধাস্ত্র বিষয়ক ম্যানুয়েলে আড়-ধনুকের স্তম্ভমূল দেখা যাচ্ছে।

প্রামাণ্যচিত্র *What the Ancients Did for Us*-এ আমানি যেইনের মন্তব্য।

১৫শ শতাব্দির দিকে অটোমানদের ব্যবহৃত কামানগুলো বেশ দারুণ ছিল এবং সেগুলো যেকারো মনে সহজেই ত্রাস সৃষ্টি করে দিতো। যুক্তরাজ্যের পোর্টসমাউথে অবস্থিত ফোর্ট ন্যালসন জাদুঘরে একটি বিশাল ব্রোঞ্জ কামান রয়েছে, যার ওজন ১৮ টন। মূলত এটা দুটো ছাঁচে গঠিত ছিল এবং বহনে সুবিধার জন্য দুটো ছাঁচকে পেঁচিয়ে একত্র করা হতো, যেহেতু এটার মোট দৈর্ঘ্য ৫ মিটার (১৬.৪ ফুট)-এরও বেশি এবং এর ব্যাস ০.৬৩৫ মিটার (প্রায় ২ ফুট)। কেবল ব্যারেল বা পিপার দৈর্ঘ্য ৩ মিটার (৯.৮ ফুট)-এরও বেশি এবং গানপাউডার রাখার পাত্রের ব্যাস ০.২৪৮ মিটার (০.৮১৪ ফুট)। এর আগ পর্যন্ত ইউরোপে এ ধরনের বিশাল কামানের কোনো নিশানা ছিল না।

সুলতান দ্বিতীয় মেহমেদের নির্দেশে ১৪৬৪ খ্রিস্টাব্দে এই অভূতপূর্ব কামান বানানো হয়। আগ্নেয়াস্ত্র বিশেষত কামানের প্রতি তার বিশেষ আগ্রহ ছিল। কন্সট্যান্টিনোপল অবরোধের সময় তিনি তার কামান নির্মাতাকে এমন এক কামান বানাতে বলেন, যার নজির পূর্বে কখনো ছিল না। নির্দেশ মোতাবেক বানানো কামানটি এক মাইল দূরে গোলা ছুড়তে পারতো। কামানের মুখে খোদাই করে আরবীতে লিখা রয়েছে: 'হে আল্লাহ, সাহায্য করো মুরাদ পুত্র সুলতান মুহাম্মদ খানকে।'

সুলতান মেহমেদের কামানের শেষ ঠিকানা পোর্টসমাউথের জাদুঘরে হলেও এর পিছনে একটি কাহিনী রয়েছে। ৬০ বছর ধরে ইংরেজরা কামানটি অটোমানদের থেকে পাওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করে আসছিল, অবশেষে রাণী ভিক্টোরিয়া তার ইউরোপ সফরে সুলতান আবদুল আজিজকে ব্যক্তিগতভাবে এই কামানের ব্যাপারে বলেন। এর এক বছর পর সুলতান কামানটি উপহার হিসেবে ইংল্যান্ডে প্রেরণ করেন। দার্দানেলস থেকে এটা লন্ডনে আনা হয় এবং ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে এটাকে জাদুঘরে রাখা হয়। 'ইউরোপের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কামান' হিসেবে স্বীকৃত হওয়ায় সম্ভবত রাণী ভিক্টোরিয়া এটাকে নিজের করে নিতে চেয়েছিলেন।

মুসলিমরা বহু রকেট বানিয়েছিল এবং প্রথম টর্পেডো তাদেরই কীর্তি। রকেটগুলো ছিল স্বচালিত-জ্বলন্ত ডিমের ন্যায়; অন্যদিকে টর্পেডো ছিল রকেটের সুনিপুণ পরিমার্জন, যা পানির পৃষ্ঠতল স্পর্শ না করেই দ্রুত বেগে অগ্রসর হতো। এটা 'ভস্মকারী চলন্ত ডিম' হিসেবে পরিচিত ছিল এবং হাসান আর-রাম্মাহর চিত্রাঙ্কন ও লেখা প্রদর্শন করছে যে, দুটো ইস্পাত পাত একত্রে যুক্ত করে পশমি বস্ত্র দিয়ে এটা শক্তভাবে বাঁধা হয়েছে। এতে নাশপতির ন্যায় চ্যাপ্টা আকৃতির পাত্র তৈরি হয়, যা "ন্যাপথা, ধাতব পদার্থ এবং [সম্ভবত সল্টপিটারের আর্দশ মিশ্রণ] দিয়ে পূর্ণ করা হতো। কার্য সম্পাদন যন্ত্রের সাথে দুটো রড থাকতো এবং একটি বড় রকেট দিয়ে যন্ত্রটি চালিত হতো।" রড দুটো সম্ভবত রাডারের লেজ হিসেবে কাজ করতো, অন্যদিকে সম্মুখে থাকা বর্শা শত্রুপক্ষের জাহাজের কাঠের খোলসে আটকে গিয়ে বিস্ফোরণ ঘটাতো।

গানপাউডার

গানপাউডার বানাতে: "আপনার ইচ্ছে মাফিক সাদা, পরিষ্কার ও উজ্জ্বল বা আগ্নেয় বারুদ (সল্টপিটার) নেন এবং সাথে (মাটির) দুটো নতুন পাত্র। একটি পাত্রে সল্টপিটার রাখুন এবং পানিতে ডুবিয়ে রাখার জন্য তাতে পানি যোগ করুন। পাত্রটি মৃদু আগুনে রাখুন, যতক্ষণ না তা গরম হচ্ছে। এরপর যে ফেনা সৃষ্টি হবে, তা ফেলে দেবেন। আগুনের তাপ বাড়াতে থাকুন, যতক্ষণ না তরল পুরোপুরি পরিষ্কার হচ্ছে। এই তরল অপর পাত্রে এমনভাবে ঢালুন যেন কোনো তলানি বা ফেনা লেগে না থাকে। এবার পাত্রটি মৃদু আগুনে রেখে দেন, যতক্ষণ না উপাদানগুলো জমাট বেঁধে যাচ্ছে। এরপর পাত্রটি আগুন থেকে বের করুন এবং পাত্রের উপাদানগুলো ভালোভাবে গুঁড়া করুন।"

হাসান আর-রাম্মাহ *"কিতাবুল ফুরুসিয়াত ওয়াল মানাসিবুল হারবিয়্যা"* শীর্ষক পুস্তকে পটাসিয়াম নাইট্রেট বিশোধনের পূর্ণ প্রক্রিয়া আলোচনা করেছেন।

হাসান আর-রাম্মাহর ১৪শ শতাব্দির এ পুস্তকে গানপাউডার বানানোর বহু রেসিপি সন্নিবেশিত হয়েছে।

১১ সমাজ বিজ্ঞান এবং অর্থনীতি

ইবনে খালদুন – ঐতিহ্যবাহী মধ্যযুগীয় মুসলিম সভ্যতার অন্যতম শেষ বিদ্বান। তার লেখনী, পরিবার কথা এবং জীবনালেখ্যে প্রতিফলিত হয়েছে ওইসব পরিবর্তন, যা মধ্যযুগীয় মুসলিম সভ্যতার অবক্ষয়কে ত্বরান্বিত করে এর চূড়ান্ত পতন ডেকে এনেছিল। ইসলামী সভ্যতার জৌলুস হারানোর কারণ ব্যাখ্যাকারী এই মনীষী ১৩৩২ খ্রিস্টাব্দে তিউনিসে জন্ম নেন এবং ১৪০৬ খ্রিস্টাব্দে কায়রোতে তার জীবনপ্রদীপ নিভে যায়।

ইসলামী সভ্যতার জৌলুস হারানোর বিষয়ে তার পর্যবেক্ষণের সূচনায় রয়েছে: বিভিন্ন দখলদারদের আগ্রাসন, যারা এ সভ্যতার ভিত্তিকে দুর্বল করে দিয়েছিল। উপরন্তু, তার পূর্বপুরুষগণও এসব আগ্রাসনের প্রত্যক্ষ শিকার ছিলেন। ১২৪৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তার পূর্বপুরুষগণ সেভিলে বসবাস করতো, কিন্তু খ্রিস্টানরা নিজেদের পিতৃপুরুষদের আবাস স্পেন পুনর্দখল করলে তার পরিবার সেখান থেকে পালিয়ে উত্তর আফ্রিকায় চলে আসতে বাধ্য হয় এবং এখানেই তার পিতা-মাতা প্লেগের কবলে মারা যায়।

ইবনে খালদূন ১৩৮২ খ্রিস্টাব্দে নিজভূমি ছেড়ে পরিবারসহ বেরিয়ে পড়েন, কিন্তু হায়! ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে তিনি ওই সময়ের অভিশাপ ডাকাতের কবলে পড়েন। হয় তার পরিবারকে মেরে ফেলা হয়, না হয় বানানো হয় দাস এবং এরপর থেকে তিনি আর কখনো তাদের দেখেননি, আর না তিনি তাদের সম্পর্কে আরেকটি শব্দ লিখেছেন।
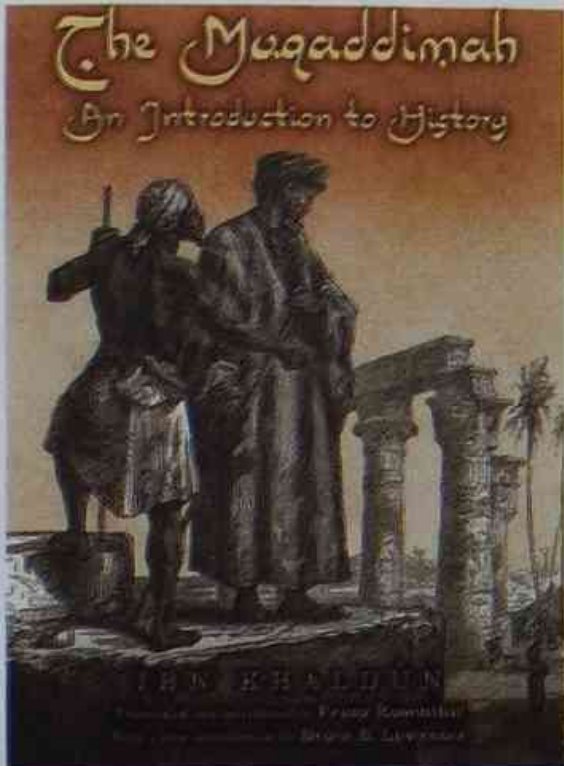
আলজেরিয়াতে জোরপূর্বক নির্বাসনে থাকার সময় ইবনে খালদূন রচনা করেছিলেন "আল-মুকাদ্দিমা" নামক কালজয়ী গ্রন্থ।

"প্রজাতি রক্ষণে মানবজাতির পারস্পরিক সহায়তা আবশ্যক এবং স্বাভাবিকভাবেই তাদেরকে এ কাজের জন্য প্রস্তুত করে পাঠানো হয়েছে। তাদের শ্রমই হচ্ছে তাদের একক ও সামষ্ঠিক অস্তিত্বের বস্তুগত ভিত্তি নিয়ন্ত্রণের একমাত্র নিয়ামক। যেখানে বিপুল সংখ্যক মানুষের বসবাস থাকে, সেখানে কর্মের বিভাজন সৃষ্টি সম্ভবপর হয়ে উঠে এবং তা জীবনের সর্বক্ষেত্রে বড় ধরনের দক্ষতা ও পরিমার্জনের সুযোগ সৃষ্টি করে। এর ফলাফল হচ্ছে: *উমরান* [সভ্যতা বা সংস্কৃতির বিকাশ] – যার সাথে বৈষয়িক ও বুদ্ধিবৃত্তিক অর্জন অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। অন্যদিকে, সভ্যতার [বৃহত্তর অংশের মাঝে] যখন বিলাসিতা ও অবসর কাটানোর প্রবণতা চাঙ্গা হয়, তখন তা সভ্যতাকে ভিতর থেকে ধ্বংস করার বীজ লালন করে বেড়ায়।"

– ১৪শ শতাব্দির ইবনে খালদূন
রচিত আল-মুকাদ্দিমা

ইবনে খালদূনের জীবনের শেষ বছরটি খুব সম্ভবত সমৃদ্ধ ইসলামী পাণ্ডিত্য এবং গৌরবোজ্জ্বল সভ্যতার (শীর্ষে থাকার) শেষ বছর এবং এরপর থেকেই এ সভ্যতা বিবর্ণ থেকে আরও বিবর্ণ হতে থাকে। ১৫শ শতাব্দির শুরুর দিকে স্পেন ও সিসিলি হারানো, ক্রুসেড ও মঙ্গোল আগ্রাসনে ক্ষত-বিক্ষত মুসলিম সভ্যতার জন্য তৈমুর লঙ্গের আগ্রাসী অভিযান আরও সর্বনাশ ডেকে আনে, যার প্রভাব ইবনে খালদূন নিজে প্রত্যক্ষ করেছিলেন।

প্রধান বিচারক ও কূটনৈতিক হিসেবে ব্যস্ত সময় কাটানোর পাশাপাশি তিনি তার তাত্ত্বিক গবেষণা অব্যাহত রেখে রচনা করেন নিজের লেখা বিশ্ব ইতিহাস "*আল-ইবার ওয়া দিয়ানুল মুবতাদা ওয়া খবর ফী আইয়্যামিল আ'রাব ওয়াল আ'জাম ওয়াল বারবার ওয়া মান আসারাহুম মিন যাওয়িস সুলতানিল আকবার*" (আরব, অনারব ও বার্বার জাতির সূচনা ও তাদের ইতিহাস এবং রাজনৈতিক কর্তৃত্বের দিক থেকে তাদের উপর প্রভাব বিস্তাকারী ব্যক্তিবর্গ – এ বিষয়ক নথি

এবং তা হতে শিক্ষাগ্রহণ)। এ মহাগ্রন্থের ভূমিকা পরিবর্তীতে "আল-মুকাদ্দিমা" নামে স্বতন্ত্র পরিচয়ে সমুজ্জ্বল হয়ে উঠে।

আল-মুকাদ্দিমা সার্বজনীন ইতিহাস আলোচনার এক বিশাল কর্মযজ্ঞ। ইতিহাস যে কেবল সঠিক ঘটনাক্রমের এক তালিকা নয়, বরং যিনি ইতিহাস ব্যাখ্যা করছে, তার আবাসস্থল, পরিচয়, তিনি কোন সময়ের মানুষ এবং সেইসাথে তার নিরপেক্ষতার মাত্রার সাথে ইতিহাস যে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, ইবনে খালদূন এই তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং এটার প্রয়োজনীয় বিশ্লেষণের সাথে সাথে এটার প্রয়োগও দেখিয়েছেন। ইতিহাস পর্যালোচনা বিষয়ে তার দেয়া এই তত্ত্ব এক বৈপ্লবিক পদক্ষেপতুল্য এবং তার এই পদ্ধতি ইতিহাসবেত্তাগণ আজও ব্যবহার করে আসছেন। পক্ষপাতদুষ্ট এবং বাছ-বিচারহীন ঘটনাকে তিনি সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করেছেন। এভাবে তিনি জ্ঞান-গবেষণা এবং সমাজ বিজ্ঞানে নিয়ে এসেছেন যাচাই-বাছাইয়ের এক নয়া মাত্রা, যা কোন ঘটনাকে সত্য গৃহীত হওয়ার পূর্বে যথাযথ যুক্তি-প্রমাণের দারস্থ হওয়ার বুনিয়াদ স্থাপন করে।

সভ্যতার উত্থান-পতনের কারণ বিশ্লেষণ ছিল তার সর্বাধিক পরিচিত গবেষণার একটি, আর এটাই সমাজ বিজ্ঞান – বিশেষত সমাজবিদ্যা ও সভ্যতা বিজ্ঞানের ভিত প্রতিষ্ঠিত করেছিল। চক্রাকার প্রকৃতি অনুসরণের পর একটি সভ্যতা ও সংস্কৃতি কীভাবে তার নিজ পতনের সূচনা ঘটায়, তিনি তার ব্যাখ্যা দেন। নিরাপত্তা ও আধিপত্য বিস্তারের একটি সাধারণ প্রয়োজনকে সামনে রেখে সভ্যতা উপরে উঠতে থাকে এবং এভাবে সে তার চূড়ায় পৌঁছায়, যেখানে সামাজিক বন্ধন অত্যন্ত মজবুত থাকে। অতপর, উন্নতির সময়কার অন্যায় প্রতিযোগিতা ও দুর্নীতির কারণে গোষ্ঠীয় সমর্থন ও সামাজিক বন্ধন যখন হালকা থেকে আরও হালকা হতে থাকে, তখনই পতনের সূচনা হয় এবং তা শেষমেশ ধ্বংস ডেকে আনে।

ইবনে খালদূনের মতে, প্রতিটি জাতির মাঝে সহজাতভাবে বিদ্যমান এই বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিগুলোকে রুখে দিতে পারে – ধর্ম। তিনি বলেন, ইসলাম মুসলিম সমাজকে দিয়েছে এক স্থায়ী আধ্যাত্মিক শক্তি এবং সেইসাথে দিয়েছে জীবনের যাবতীয় সমস্যার পূর্ণাঙ্গ সমাধান। বস্তুত, মানবজাতির বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান নিয়ে তিনি যে সাম্রাজ্যিক অনুসন্ধানে নেমেছিলেন – ইসলাম তার সে অনুসন্ধানের পূর্ণাঙ্গ উত্তর দিয়েছিল।

অর্থনৈতিক তত্ত্বে তিনি তার সময়ের চেয়েও এগিয়ে ছিলেন এবং এডাম স্মিথের চার শতাব্দি আগেই ইবনে খালদূন এই উপসংহারে উপনীত হয়েছিলেন যে, শ্রমই উন্নতির মূল চাবি। কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের মতো সরাসরি উপার্জন উৎসের সাথে তিনি সরকারি চাকরি ও বেসরকারি কর্মসংস্থানের মতো পরোক্ষ উপার্জন উৎসের পার্থক্য স্পষ্ট করেছেন। আজ এসব ধারণা মামুলি মনে হলেও আজ থেকে ৭০০ বছর পূর্বে এগুলোর ভূমিকা ছিল যুগান্তকারী। তার উদ্ভাবিত ধারণাগুলো ধ্রুপদী অর্থনীতি এবং ভোগ, উৎপাদন, চাহিদা, ব্যয় ও উপযোগের সাথে জড়িত মডেলগুলোর বিকাশে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছিল।

ইবনে খালদূন

প্রধান বিচারক, বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের পণ্ডিত এবং কূটনীতিক ইবনে খালদূন সমাজবিদ্যা, অর্থনীতি, বাণিজ্য, ইতিহাস, দর্শন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও প্রত্নতত্ত্বে অসামান্য অবদানের জন্য সমধিক পরিচিত।

ফেযের রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে আলজেরিয়াতে আশ্রয় গ্রহণের মতো উত্তাল সময়ে তিনি রচনা করেছিলেন তার বিখ্যাত আল-মুকাদ্দিমা (ইতিহাসের ভূমিকা)।

তার রচিত সুবৃহৎ ইতিহাস গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে অত্যন্ত প্রগাঢ়ভাবে তিনি ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার বিবরণ দিয়েছেন এবং তুলনা করেছেন অন্যান্য সমাজ ব্যবস্থার সাথে। এছাড়াও তিনি সভ্যতার ক্রমবিকাশ পর্যালোচনা বিজ্ঞানের আলোকে তুলে ধরেছেন মানব সমাজ ও সভ্যতার উত্থান-পতনের কারণসমূহ।

সমসাময়িক এক শিল্পীর তুলিতে আঁকা ইবনে খালদূন।
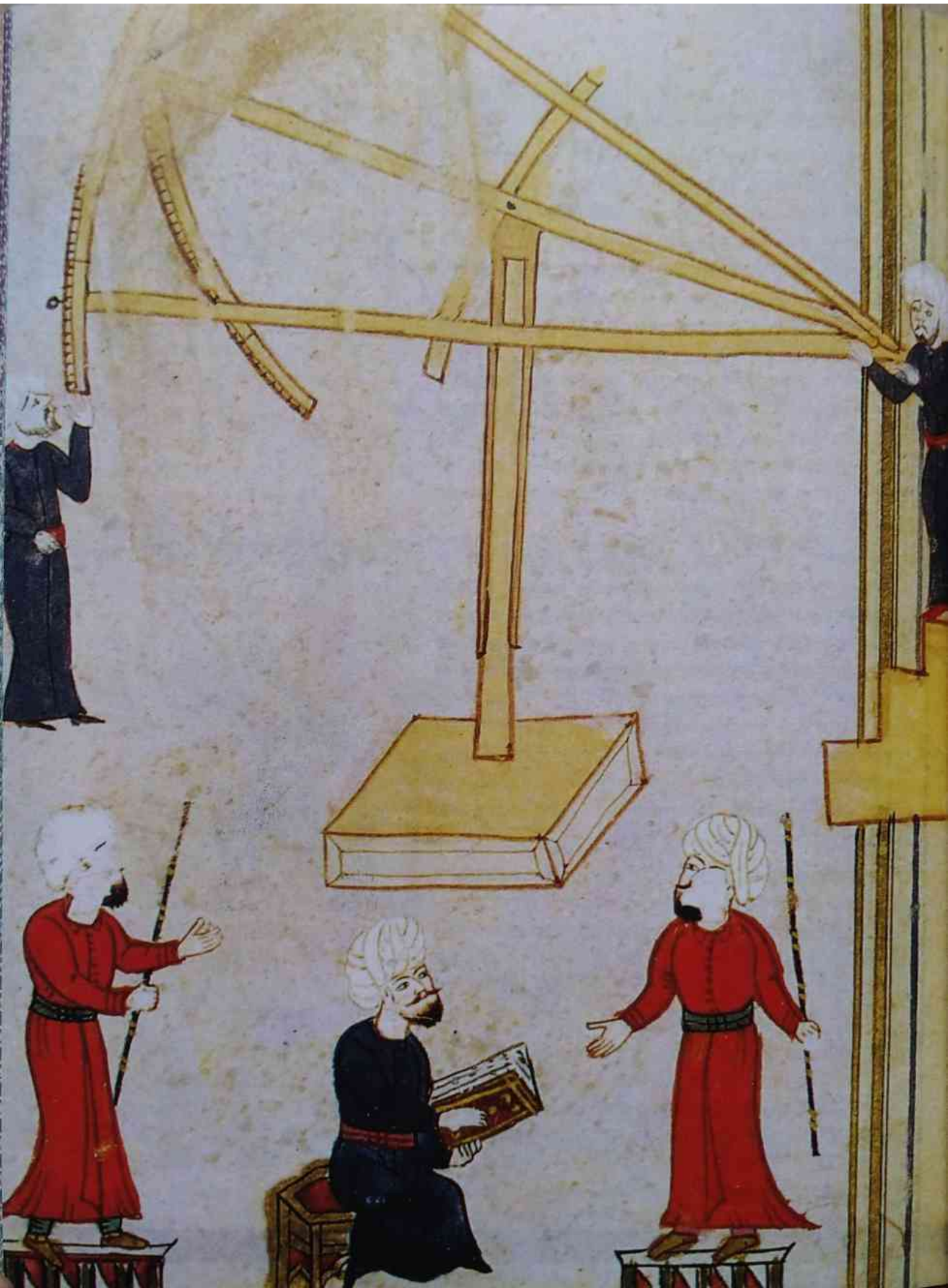
অষ্টম অধ্যায়

"তিনিই সে মহান সত্তা, যিনি সৃষ্টি করেছেন রাত ও দিন এবং চন্দ্র ও সূর্য। এসবের প্রত্যেকেই নিজ কক্ষপথে আবর্তন করে।"

– কুরআন (২১:৩৩)

মহাবিশ্ব

জ্যোতির্বিজ্ঞান • মানমন্দির • জ্যোতিষশাস্ত্রীয় যন্ত্র
আস্তুর্লাব • আর্মিলারি গোলক • জ্ঞানীদের জন্য নিদর্শন
চাঁদ • চাঁদের কলঙ্ক • নক্ষত্রপুঞ্জ • উড্ডয়ন

রাতের আকাশ এবং মহাবিশ্বের ধারণা প্রায় হাজার বছর ধরে যেভাবে কবিতা, সঙ্গীত, দর্শন ও বিজ্ঞানকে অনুপ্রাণিত করে আসছে, এক সহস্রাব্দ পূর্বের মুসলিম বিশ্বও এর ব্যতিক্রম নয়।

আকাশের বিস্ময় দ্বারা দারুণভাবে অণুপ্রাণিত হয়ে প্রথম সফল মানব উড্ডয়নের ঘটনা ১২০০ বছর পূর্বে ঘটে, অন্যদিকে আরেক নিবেদিত প্রাণ সদা চোখ রাখছিল রাতের আকাশ পানে। সূর্যের অবস্থানের সাথে নির্ভরশীল দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের সময় জানা, প্রতিটি ভৌগোলিক অবস্থান থেকে মক্কার দিক নির্ণয় এবং চন্দ্র বর্ষপঞ্জি নির্ধারণের জন্য চাঁদের মাসব্যাপী চলমান চক্র অবগত হওয়াটা মুসলিমদের জন্য আবশ্যক ছিল।

এসব উদ্দীপনা দ্বারা চালিত হয়ে মুসলিমরা উদ্ভাবনের এক নবযুগ আরম্ভ করেছিল – যেমন: আমাদের নিজস্ব ছায়াপথ বা গ্যালাক্সি বহির্ভূত তারকা ব্যবস্থার প্রথম নথি, চাঁদের গতির তৃতীয় তারতম্য – এবং সেইসাথে তারা এমনসব যন্ত্র উদ্ভাবন ও সমৃদ্ধি সাধন করেছিল, যা আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের ভিত দাঁড় করাতে অসামান্য ভূমিকা রেখেছে, এসবের মাঝে মহাকাশীয় গোলক (*celestial globe*), আর্মিলারি গোলক (*armillary sphere*), বৈশ্বিক আস্তুর্লাব এবং সেক্সট্যান্ট উল্লেখযোগ্য। প্রথম মানমন্দির প্রতিষ্ঠা এবং নিখুঁত জ্যোতিষশাস্ত্রীয় সারণীর মাধ্যমে ৮ম শতাব্দিতে শুরু হয় এই অভিযাত্রার।

তারকাতুল্য এসব বিদ্বান ও অন্যান্য প্রখ্যাত মুসলিমদের স্মরণ করাটা আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ, কেননা তাদের সুবাদে দাঁড়িয়ে আছে আধুনিক জ্যোতির্বিদ্যা এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে তাদের অবদানের স্বীকৃতিও প্রদান করা হয়েছে, যেমন: চাঁদের কিছু স্থান মুসলিম মনীষীদের নামে নামকৃত এবং ১৬৫-এরও অধিক তারকার রয়েছে আরবী নাম।

উল্টো পাশের চিত্র: তাকিউদ্দীনের বিখ্যাত ১৬শ শতাব্দির ইস্তাম্বুল মানমন্দিরের সেক্সট্যান্ট যন্ত্র।

০১ জ্যোতির্বিজ্ঞান

আকাশ পর্যবেক্ষণে মুসলিমগণ কেন এত সময় ব্যয় করেছে? প্রথমত, সারা বছর জুড়ে দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের সময় নির্ধারণের মতো ব্যবহারিক প্রয়োজন মেটাতে তারা এমনটি করেছে। সালাতের সময় সূর্যের অবস্থানের উপর নির্ভরশীল, যেহেতু সকাল, দুপুর, বিকাল, সূর্যাস্ত ও রাতের বেলায় সালাত অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়াও যেকোন ভৌগোলিক অবস্থান থেকে মক্কার দিক নির্ণয়ও মুসলিমদের আরেক গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন, যা সূর্য ও চাঁদের অবস্থান হিসেবে করে বের করা হতো। উপরন্তু, কুরআনের কিছু উল্লেখযোগ্য অনুচ্ছেদে আসমান পর্যবেক্ষণে উৎসাহিত করা হয়েছে। আরেকটি শেষ অনুপ্রেরণা ছিল বর্ষপঞ্জি।

মুসলিম বর্ষপঞ্জি চাঁদভিত্তিক, তাই চাঁদের দশা ও অবস্থান সাথে সাথে মাসগুলোরও পরিবর্তন হয়। প্রতিটি মাস নতুন চাঁদ দেখে শুরু হয়। পবিত্র রমযান মাসে গোটা মুসলিম বিশ্ব টানা এক মাস রোযা রাখে বিধায় ওই সময় নবচন্দ্র দর্শন তাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এসব ধর্মীয় কারণে হাজার পূর্বে জ্যোতির্বিজ্ঞান পরিণত হয় মুসলিম পণ্ডিতদের প্রধান আগ্রহের বিষয়ে এবং তারা যে ধরনের অবদান রাখতে সমর্থ হয়েছিল, তা শতাব্দির পর শতাব্দি স্থায়ী হয়েছিল। রেনেসাঁর সময় ১৫শ শতাব্দির প্রখ্যাত গণিতবিদ ও জ্যোতির্বিদ রেগিওমন্টাসকে পর্যন্ত তার উৎসের জন্য মুসলিম গ্রন্থের উপর নির্ভর করতে হয়েছে, যেখানে নিকোলাস কপার্নিকাস তার *De Revolutionibus* গ্রন্থে বারংবার উল্লেখ করে গেছেন আয-যারকালী এবং আল-বাত্তানীর উদ্ধৃতি, এরা ছিলেন যথাক্রমে ১১শ ও ১০ম শতাব্দির অতুলনীয় মুসলিম জ্যোতির্বিদ।

অধিকাংশ জ্যোতিষশাস্ত্রীয় উদ্ভাবনসমূহের আঁতুড়ঘর প্রাচ্যের মানমন্দির হলেও ৩০০ বছর যাবৎ জ্যোতির্বিজ্ঞান জগতের কেন্দ্রভূমি ছিল: মুসলিম শাসিত স্পেনের টলেডো। এখানে বানানো নতুনসব জ্যোতিষশাস্ত্রীয় সারণী ইউরোপে পরবর্তী দুই শতাব্দি ধরে ব্যবহৃত হয়।

আকাশ পর্যবেক্ষণ এক প্রগাঢ় কর্মযজ্ঞ; যা প্রতিদিন চালিয়ে যেতে হয় এবং অত্যন্ত যত্নের সাথে আকাশ জুড়ে চাঁদ ও সূর্যের গতিপথ পর্যবেক্ষণ করতে হয়। সৌর স্থিতিমাপ নির্ধারণ এবং দুই সপ্তাহ অন্তর অন্তর পরিচালিত গ্রহসমূহের অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমা বিষয়ক তথ্যাদি প্রস্তুতে এ পর্যবেক্ষণ বেশ কার্যকর ও সহায়ক।

৯ম শতাব্দি বাগদাদে খলীফা আল-মামুন বায়তুল হিকমা নামের বুদ্ধিবৃত্তিক একাডেমি প্রতিষ্ঠা করেন, যা প্রধানত বিভিন্ন স্থান থেকে প্রাপ্ত গুরুত্বপূর্ণ পাণ্ডুলিপিসমূহ অনুবাদ করতো, এ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানতে আপনি বিদ্যালয় বিভাগ ঘুরে আসতে পারেন। এ একাডেমির প্রথম আরবী অনুবাদ ছিল আলেকজান্দ্রিয়ার জ্যোতির্বিদ টলেমির বিখ্যাত গ্রন্থ *Almagest* (আলমাগেস্ট), যাতে সূর্য, চাঁদ, গ্রহ ও তারকারাজির পৃথিবী-কেন্দ্রীক মডেল প্রদান করা হয়েছে। গ্রন্থটি আরবী পণ্ডিতদের নিকট পরিচিত হয়ে উঠে এবং পরবর্তী ৫০০ বছর যাবৎ তা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডীয় মডেলের উৎস গ্রন্থ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। তথাপি মুসলিম পণ্ডিতগণ এই পুস্তকে বর্ণিত গ্রিক গাণিতিক নিয়মাবলীর

উপরে: মুসলিম জ্যোতির্বিদরা যন্ত্র নির্মাণে বেশ পারদর্শী ছিল, যা আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের পথ সুগম করে। নিচে: প্রতিদিন সূর্য ও চাঁদের পর্যবেক্ষণ চালু রাখার পাশাপাশি মুসলিম পণ্ডিতগণ প্রতি দু'সপ্তাহে গ্রহসমূহের অবস্থান পরিমাপ করতেন।

চেয়ে সমৃদ্ধ গাণিতিক সূত্র উদ্ভাবনের পাশাপাশি বহুদূর পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিলেন। বিশেষত ত্রিকোণমিতি শাস্ত্রে মুসলিম দেশগুলো এতটাই সমৃদ্ধি অর্জন করেছিল যে, তা পশ্চিমা রেনেসাঁযুগীয় জ্যোতিষশাস্ত্র সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক ছিল।

মহাকাশ গবেষণা এবং ভবিষ্যৎ জ্যোতির্বিদদের জন্য শক্ত ভিত দাঁড় করানোর সুবিশাল কর্মযজ্ঞে বহু মুসলিম জ্যোতির্বিদের অসামান্য অবদান ছিল, তাদের মধ্য থেকে অতুলনীয় অবদানে সমুজ্জ্বল কয়েকজন মনীষীর পরিচয় নিম্নরূপ:

■ **আল-বাত্তানী**, পশ্চিমে আলবাতেগনিয়াস (*Albategnius*) নামে পরিচিত এই মনীষী ৯২৯ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন, তার লেখা "*আল-যিজুস সাবী*" (সাবিয়ান সারণী) গ্রন্থটি কয়েক শতাব্দি যাবৎ ব্যাপক প্রভাব রাখতে সমর্থ হয়েছিল। তার গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত বিষয়ের মাঝে নবচন্দ্রের সময়কাল, সৌর ও নাক্ষত্রিক বছরের ব্যাপ্তি গণনা, চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণের পূর্বাভাস এবং লম্বন (*parallax* – দর্শকের দুটো ভিন্ন অবস্থানের কারণে মহাকাশীয় কোনো বস্তুর সাথে উৎপন্ন কোণ) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে ব্যবহৃত ত্রিকোণমিতিক অনুপাত ধারণাটির উদ্ভাবক তিনি না হলেও তিনিই সর্বপ্রথম এটাকে জনপ্রিয় করে তোলেন। তৎকালীন জ্যোতির্বিদ্যায় বহুল ব্যবহৃত টলেমির তত্ত্বগুলোতে তিনি বড় ধরনের রদবদল ঘটান। *পৃথিবী থেকে যেকোন গ্রহ বা নক্ষত্রের দূরতম অবস্থান তথা সৌর শিখর (apogee)-এর গতি কিংবা অন্যান্য নক্ষত্রের মাঝে পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরতম অবস্থান টলেমির সময় যা ছিল, এখন আর তা নেই* – এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তিনিই আবিষ্কার করেছিলেন। গ্রিক জ্যোতির্বিদ টলেমি সূর্যকে ৬৫ ডিগ্রি দ্রাঘিমাতে স্থান দিয়েছিলেন, কিন্তু আল-বাত্তানি এটার দ্রাঘিমা পেয়েছিলেন ৮২ ডিগ্রি। এই গরমিল এতটাই প্রকট যে, এ ধরনের যেকোন ভুল হিসাবের ব্যাখ্যা জানা আবশ্যক এবং বর্তমানে আমরা অবগত যে, মহাকাশে সৌর ব্যবস্থা গতিশীল বিধায় হিসাবে এ ধরনের তারতম্য হয়। ওই সময় পৃথিবীকে মহাবিশ্বের কেন্দ্র ভাবা হতো, তাই এমন উপসংহারে পৌঁছানো সম্ভব ছিল না।

> "এই বিদ্যায় নিজকে দীর্ঘ সময় উৎসর্গ করার পর আমি এটা লক্ষ্য করি যে, গ্রহমণ্ডলীর গতি নিয়ে যতগুলো কাজ হয়েছে, সেগুলোর প্রতিটিই একে অপরের সাথে দারুণভাবে অসামঞ্জস্যশীল এবং বহু লেখকই তাদের পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়া এবং সেসবের নিয়ম নির্ধারণে ভ্রান্তির শিকার হয়েছেন। আমি আরও লক্ষ্য করি যে, প্রাচীন ও বর্তমান পর্যবেক্ষণের আলোকে বলা যায়: গ্রহমণ্ডলীর অবস্থান সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয়: আকাশে সূর্যের পরিভ্রমণ পথ বা গ্রহণরেখার বক্রতার কারণে সৃষ্ট এ পরিবর্তন বছর গণনা এবং ওই বছরের চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণে প্রভাব রাখে। এসব নিয়ে আমার বিরতীহীন পর্যবেক্ষণ আমাকে এ বিদ্যায় পূর্ণতা ও নিশ্চিয়তা আনয়নে সচেষ্ট করেছে।"
>
> – আল-বাত্তানী, জ্যোতির্বিদ ও গণিতজ্ঞ (৮৫৮-৯২৯)

■ **আল-বিরুনী** ৯৭৩ থেকে ১০৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন। পৃথিবী তার নিজ অক্ষকে কেন্দ্র করে ঘুরছে, এই তত্ত্ব উদ্ধৃত করার পাশাপাশি তিনি পৃথিবীর পরিসীমা গণনা এবং বৈজ্ঞানিক উপায়ে পৃথিবীর যেকোন প্রান্ত থেকে মক্কার অবস্থান নির্ধারণের কাজটি সফলভাবে সম্পন্ন করেছিলেন। তার লেখা ১৫০-টি গ্রন্থের মাঝে ৩৫-টি প্রবন্ধ বিশুদ্ধ জ্যোতির্বিদ্যা নিয়ে লেখা। কিন্তু এসবের মাঝে তার কেবল ৬-টি জ্যোতিষশাস্ত্রীয় কাজ টিকে আছে।

■ **ইবনে ইউনুস** ৯৭৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১.৪ মিটার (৪.৬ ফুট) ব্যাসের এক বিশাল আস্তর্লাব দিয়ে দীর্ঘ ৩০ বছর ধরে পর্যবেক্ষণ করে আসছিলেন। এই দশকগুলোতে তিনি ১০,০০০-এরও বেশিবার সূর্যের অবস্থান নথিবদ্ধ করেছিলেন।

■ **আবদুর রহমান আস-সূফী**, পারস্যের এই জ্যোতির্বিদ ১০ম শতাব্দির মানুষ। আপনি এই বিভাগের নক্ষত্রপুঞ্জ অধ্যায়ে তার সম্পর্কে আরও জানতে পারবেন।

■ **আল-ফারগানী** ছিলেন খলীফা আল-মামুনের অন্যতম জ্যোতির্বিদ, যিনি আস্তর্লাবের বিষয়ে লেখালেখির পাশাপাশি এ যন্ত্রের গাণিতিক কার্যক্রম তত্ত্বের ব্যাখ্যাদান, ওই সময়ে বিদ্যমান কেন্দ্রীয় চাকতির ভুল জ্যামিতিক গঠন সংশোধন করেছিলেন। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উপর তার লেখা সমধিক পরিচিত "*জাওয়ামি ইলম আন-নুজুম ওয়াল হারাকাতিস সামাইয়্যা*" (সৌরগতি এবং নক্ষত্রবিজ্ঞানের বিশ্বকোষ) গ্রন্থে পৃথিবীর জনবহুল অংশের বিবরণ, পৃথিবীর আকার এবং পৃথিবী থেকে

মহাকাশীয় গ্রহমণ্ডলীর দূরত্ব ও তাদের আকৃতির বিবরণ সন্নিবেশিত হয়েছে।

■ **আয-যারকালী** – ইউরোপে *আরযাকেল* বা *আরযাকুয়েল* নামে পরিচিত এই মনীষী ১০৮৭ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। টলেডীয় টেবিল বা ছক প্রস্তুতের পাশাপাশি তিনি অত্যাধুনিক আস্তর্লাব নির্মাণ করেছিলেন, যার সাহায্যে যেকোন ভৌগোলিক অবস্থান নির্ণয় করা যেত।

■ **জাবির ইবনে আফলাহ** – মৃত্যু: ১১৪৫ খ্রিস্টাব্দ – ছিলেন প্রথম বহনযোগ্য মহাকাশীয় গোলক (*celestial globe*) নকশাকারী, যেটা মহাকাশীয় স্থানাঙ্ক পরিমাপ করে। গোলীয় ত্রিকোণমিতি নিয়ে কাজের জন্য তিনি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

■ **ইবনে রুশদ**, ১২শ শতাব্দির কর্ডোবা নিবাসী এই প্রতিভা পশ্চিমে *অ্যাভেরস* নামে পরিচিত। কর্ডোবার বিখ্যাত পণ্ডিতদের একজন হওয়ার পাশাপাশি তিনি দক্ষ জ্যোতির্বিদ ছিলেন এবং ধারণা করা হয় যে, তিনি সৌরকলঙ্ক (সূর্যপৃষ্ঠে সময়ে সময়ে দৃশ্যমান কালোদাগ) আবিষ্কার করেছিলেন।

■ **ইবনে আশ-শাতির** – ১৪শ শতাব্দির প্রখ্যাত জ্যোতির্বিদ, যিনি চন্দ্র গতির ক্ষেত্রে টলেমির ভুল সংশোধন করেছিলেন। বস্তুত টলেমির কল্পিত চাঁদের অবস্থান পৃথিবীর সাপেক্ষে চাঁদের প্রকৃত অবস্থান থেকে অধিকতর নিকটে ছিল। অন্যান্য মুসলিমদের ন্যায় গ্রিক গ্রহমণ্ডলীয় ধারণার সীমাবদ্ধতা পর্যবেক্ষণের পর ইবনে আশ-শাতির বলেন, "আমি সর্বশক্তিমান আল্লাহর নিকট দু'আ করি, যেন তিনি আমাকে এ ব্যাপারে দিক-নির্দেশনা দেন এবং যথাযথ একটি মডেল উদ্ভাবনের তাওফিক দান করেন। *মহিমান্বিত তিনি, সমস্ত প্রশংসা ও শোকর তাঁরই* – তিনি আমাকে অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমার আলোকে গ্রহমণ্ডলীর গতি এবং তাদের গতির যাবতীয় পর্যবেক্ষণযোগ্য বৈশিষ্ট্য সম্বলিত একটি সার্বজনীন মডেল উদ্ভাবনে সহায়তা করেছেন, যা পূর্ববর্তী মডেলগুলোর ত্রুটি-বিচ্যুতি ও সন্দেহ থেকে মুক্ত।"

মধ্যযুগীয় ইসলামী জ্যোতির্বিজ্ঞানের নিদর্শন আজও আমাদের সামনে বিদ্যমান। *zenith* ও *azimuth*-এর ন্যায় শব্দ এবং *Summer Triangle* বা গ্রীষ্ম ত্রিভুজের তিনটি তারকা: ভেগা, আলতায়ির ও ডেনেব – এই সবগুলো নামের উৎসমূল আরবী।

আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের আবির্ভাব

নিকোলাস কপার্নিকাস

অনেকেই এটা বিশ্বাস করে যে, গ্রিকদের সাথে সাথে জ্যোতির্বিজ্ঞান মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে এবং ১৫শ শতাব্দির পোল্যান্ড নিবাসী নিকোলাস কপার্নিকাসের হাত ধরে তা আবার প্রাণ ফিরে পায়। নিকোলাস কপার্নিকাস সূর্যকেন্দ্রীক সৌর মডেল প্রদানের জন্য বিখ্যাত এবং তার এই তত্ত্ব আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের সূচনাবিন্দু।

কিন্তু, কপার্নিকাসের গ্রহমণ্ডলীয় তত্ত্বের সাথে রয়েছে তার একশ বছর পূর্বের ইবনে আশ-শাতিরের দেয়া তত্ত্বের হুবহু গাণিতিক মিল। অনেক ঐতিহাসিকই এখন আর এটাকে কাকতালীয় কোনো ঘটনা মনে করেন না। কেননা এটা অজানা নয় যে, কপার্নিকাস ব্যাপকভাবে আল-বাত্তানীর লেখা জ্যোতিষশাস্ত্রীয় প্রবন্ধসমূহের উপর নির্ভর করেছিলেন। আল-বাত্তানীর এ গ্রন্থে তারকারাজির তালিকা এবং গ্রহমণ্ডলীয় সারণী অন্তর্ভুক্ত ছিল।

কপার্নিকাসের পূর্বে মুসলিমদের উদ্ভাবিত গাণিতিক যন্ত্রসমূহ ঠিক তার ব্যবহৃত যন্ত্রের অনুরূপ ছিল। মুসলিম জ্যোতির্বিদ্যা ও কপার্নিকাসের জ্যোতির্বিদ্যার মধ্যস্থ গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য হচ্ছে: মুসলিমদের পৃথিবী মহাকাশে স্থির, অন্যদিকে কপার্নিকাসের তত্ত্বে সেটা সূর্যের চারদিক প্রদক্ষিণ রত। কপার্নিকাস এমনসব যন্ত্র ব্যবহার করেছিলেন, যা প্রাচ্যের জ্যোতির্বিজ্ঞানের সাথে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত, যেমন: দিগন্ত রেখার উপরে জ্যোতির্মণ্ডলীয় কোনো বস্তুর কৌণিক দূরত্ব নির্ণয়ে ব্যবহৃত প্যারালাকটিক (*parallactic*) মাপকাঠির কথা উল্লেখ করা যায় – যা এর পূর্বে কেবল সমরকন্দ ও মারাগার মানমন্দিরেই ব্যবহৃত হতো।
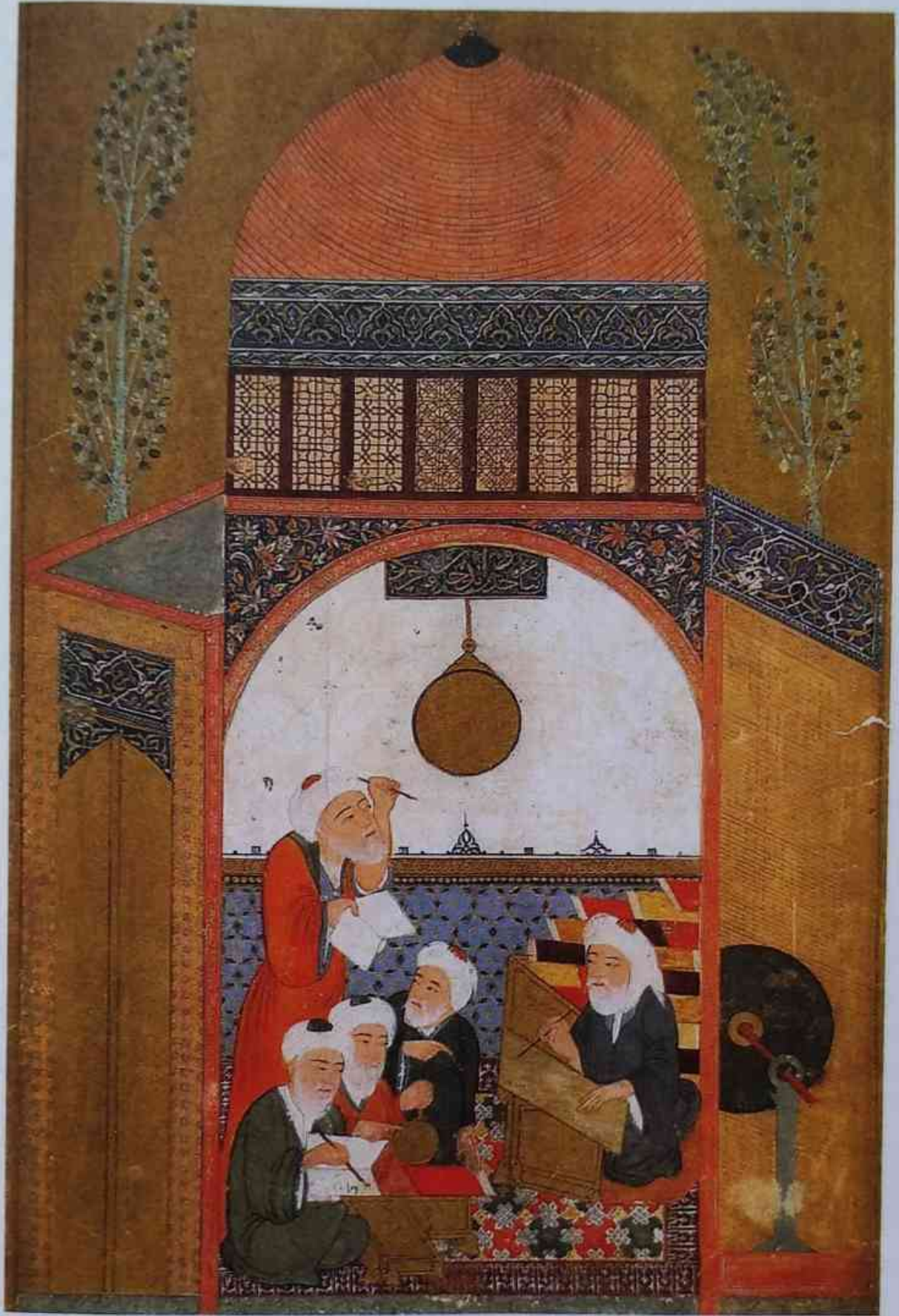
নাসিরউদ্দীন আত-তুসী পরিচালিত মারাগা মানমন্দির বিষয়ক ১৫শ শতাব্দির পারসীয় পাণ্ডুলিপিতে কয়েকজন জ্যোতির্বিদ জ্যোতিষশাস্ত্রের শিক্ষাদানে রত এবং সেখানে তারা আস্তর্লাবের ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করছেন। ওই যন্ত্র মানমন্দিরের দেয়ালে ঝুলে আছে।

০২ মানমিন্দর

মানুষের বোধদয়ের সূচনা থেকেই তারা আসমানের তারকারাজির আশ্চর্যজনক শামিয়ানা এবং আসমানে গতিশীল যেকোন কিছু দ্বারা বেশ বিস্মিত হয়ে আসছে। স্পষ্টত, আসমানে এক সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা বিদ্যমান এবং সুশৃঙ্খল বিন্যাসের ধরন চিহ্নিত করতে বহু প্রচেষ্টাই অতীতে নেয়া হয়েছে।

উদ্ভাবনের এক স্বর্ণযুগে মুসলিম বিশ্বে বহু মানমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

জীবনের মানোন্নয়নে রয়েছে এসব পদক্ষেপের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা এবং এসব পর্যবেক্ষণের কল্যাণে সূচিত হয়েছিল পূর্বাভাস বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রা; এবং এর আশীর্বাদে আমরা এখন আকাশে চাঁদ ও সূর্যের অবস্থান, চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণের সময়, গ্রহ ও নক্ষত্রসমূহের পরিবর্তিত অবস্থান আগাম নির্ণয় করতে পারি।

বিষয়টি এমন নয় যে, মুসলিমরাই প্রথম জ্যোতির্বিজ্ঞান গবেষণা শুরু করেছিল, বরং মানমন্দিরে বৃহদাকার সব যন্ত্রের প্রচলনের মাধ্যমে তারাই প্রথম জ্যোতির্বিজ্ঞানকে বৃহৎ পরিমণ্ডলে নিয়ে আসে। জ্যোতিষশাস্ত্রীয় গবেষণা বেশ ব্যয়বহুল, দামী সব যন্ত্রের পাশাপাশি প্রয়োজন একাধিক জ্যোতির্বিদের পারস্পরিক সহায়তা। পূর্বের জটিল কাজগুলো ছোট ও সহজে বহনযোগ্য যন্ত্র দিয়ে সম্পন্ন করা হতো এবং টলেমিও তার পর্যবেক্ষণসমূহ এসব যন্ত্র দিয়েই করেছিল।

এক্ষেত্রে সবার আগে একজন মানুষের নাম আসবে – খলীফা আল-মামুন, যিনি বাগদাদ থেকে ৮১৩ থেকে ৮৩৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত শাসনকার্য পরিচালনা করেছিলেন – মূলত এই মানুষের হাত ধরে জ্যোতির্বিজ্ঞান পেয়েছে তার প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠপোষকতা ও চালিকাশক্তি, যার সুবাদে এটা পরিণত হয়েছিল বৃহৎ এক বিজ্ঞানে। তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি মানমন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বৃহৎ ও স্থির যন্ত্রপাতিসহ নির্দিষ্ট স্থানে কাজ করা, কাজের ধারা, একাধিক জ্যোতির্বিদ কর্তৃক সম্পাদিত বৈজ্ঞানিক কর্মযজ্ঞ এবং রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা বা রাষ্ট্রের সাথে সম্পৃক্ততা – এসমস্ত মহৎ ও অভিনব ধারণার প্রচলন আল-মামুনের হাতেই হয়েছিল। এসবের মাধ্যমে মুসলিম জ্যোতির্বিদগণ যে অবদানের সূচনা করেছিল, পূর্বের কিছুই এর ধারে কাছেও ছিল না। আল-মামুন শুধু ইসলামের প্রথম মানমন্দির প্রতিষ্ঠাতাই নন, খুব সম্ভবত তিনিই ইতিহাসের প্রথম মানমন্দির প্রতিষ্ঠাতা। প্রকৃতপক্ষে আল-মামুন ছিলেন আলোকিত এক নেতা, যিনি বিশ্বের অন্যতম সর্বশ্রেষ্ঠ বুদ্ধিবৃত্তিক একাডেমি 'বায়তুল হিকমা' প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন। বিদ্যালয় বিভাগে আপনি তার সম্পর্কে আরও তথ্য পাবেন।

একেবারে প্রথমদিকের মানমন্দিরগুলো বাগদাদের আশ-শামসিয়া এলাকা এবং দামেস্কের কাসিউন পর্বতে অবস্থিত ছিল এবং এসব প্রতিষ্ঠানের হাত ধরে কোনো নির্দিষ্ট স্থানে বিশেষজ্ঞগণ সম্মিলিতভাবে কাজ করবে, এমন ধারণার প্রচলন ঘটে। এসব মানমন্দিরের প্রধান কাজ ছিল জ্যোতিষশাস্ত্রীয় সারণী প্রস্তুত করা। গ্রহমণ্ডলীর অবস্থান, চাঁদের বিভিন্ন দশা, চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ নির্ণয় করা এবং বর্ষপঞ্জি বিষয়ক তথ্য প্রস্তুতে এসব সারণী বেশ সহায়ক ছিল। আল-মামুনের মানমন্দিরগুলো সৌর ও চন্দ্র সারণী প্রস্তুতের পাশাপাশি তারকারাজির তালিকা তৈরি এবং কিছু গ্রহমণ্ডলীয় পর্যবেক্ষণ নথিবদ্ধ করেছিল।

আশ-শামসিয়া মানমন্দিরে জ্যোতির্বিদগণ সূর্য, চাঁদ, বিভিন্ন গ্রহ এবং কিছু স্থির তারকা পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। এখানে যেসব গবেষণা সম্পন্ন হয়েছিল, তা "*মুমতাহান যিজ*" বা সত্যায়িত সারণী নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা হয় এবং বলা হয়ে যে, এর রচয়িতা ইবনে আবি মানসূর।

মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র আরও মানমন্দির প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে, যেমন: হুলাগু খান প্রতিষ্ঠিত মারাগা মানমিন্দর, উলুগ বেগের সমরকন্দ মানমন্দির, ইস্পাহানের মালিক শাহ মানমন্দির এবং গাযান খানের তাবরিজ মানমন্দির।

১২৬৩ খ্রিস্টাব্দে ইরানের তাবরিজের দক্ষিণে মারাগা মানমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়, যার ভিত্তি আজও বর্তমান। মারাগা মানমন্দিরের প্রধান অবদান ছিল নতুন জ্যোতিষশাস্ত্রীয় সারণী প্রস্তুত করা এবং এই প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারে ৪০,০০০-এরও অধিক গ্রন্থ ছিল।

এই মানমন্দিরের সাথে জড়িত প্রখ্যাত জ্যোতির্বিদদের মাঝে নাসিরউদ্দীন আত-তুসী এবং কুতুবুদ্দীন আশ-শিরাজী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রংধনুর প্রকৃত কারণ আবিষ্কারের কৃতিত্ব এই কুতুবুদ্দীন আশ-শিরাজীর। নাসিরউদ্দীন আত-তুসীর প্রস্তুতকৃত ইলখানাত (*Ilkhanid*) সারণী এবং স্থির তারকার তালিকা কয়েক শতাব্দি ধরে বিশ্বে ব্যবহৃত হয়। মারাগার একজন জ্যোতির্বিদকে চীনে পাঠানো হয়েছিল এবং মহাকাশ পর্যবেক্ষণে তার নকশাকৃত যন্ত্রের নির্মাণ কৌশল ইয়ান রাজবংশীয় ঘটনাপঞ্জিতে নথিবদ্ধ ছিল এবং সেটা চীনের মহাপ্রাচীরে খোদাই করা ছিল।

মধ্য ও দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত তৈমুরী সাম্রাজ্যের একজন শাসক ছিলেন ১৫শ শতাব্দির উলুগ বেগ। সুলতান হওয়ার পাশাপাশি তিনি একজন জ্যোতির্বিদ ও গণিতজ্ঞ ছিলেন, যা তাকে সৌর, চন্দ্র ও গ্রহমণ্ডলীয় পর্যবেক্ষণ সম্পাদনের জন্য সমরকন্দে তিনতলা একটি মানমন্দির প্রতিষ্ঠাতে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

বিশাল মাধ্যাহ্নিক যন্ত্রে সজ্জিত এবং পাথরে নির্মিত সমরকন্দ মানমন্দির ছিল প্রকাণ্ড এক দালান, যা দীর্ঘকাল ব্যাপী টিকে থাকা প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিজেকে নিয়ে গিয়েছিল আদর্শ মানমন্দিরের উচ্চতায়। মাধ্যাহ্নিক রেখা বরাবর একটি পাহাড়ে ২ মিটার (৬.৬ ফুট) প্রস্থের একটি গর্ত খনন করা হয় এবং এটার মধ্যে যন্ত্রটির একটি খণ্ডিত চাপ স্থাপন করা হয়। মাধ্যাহ্নিক চাপের ব্যাস ইস্তাম্বুলের হাগিয়া সোফিয়া মসজিদের গম্বুজের উচ্চতার সমান এবং তা ছিল: প্রায় ৫০ মিটার (১৬৪ ফুট)। সৌর ও গ্রহমণ্ডলীয় পর্যবেক্ষণের জন্য নির্মিত এ মানমন্দির তৎকালের সর্বাধিক সূক্ষ্ম বিভিন্ন পরিমাপক যন্ত্র দিয়ে সজ্জিত ছিল, এর মধ্যে ৪০.৪ মিটার (১৩২.৫ ফুট) ব্যাসের ফাখরী সেক্সট্যান্ট যন্ত্র বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এটা এ ধরনের জ্যোতিষশাস্ত্রীয় যন্ত্রসমূহের মাঝে সর্ববৃহৎ ছিল। গ্রীষ্মমণ্ডলীয় বছরের দৈর্ঘ্য নির্ণয়সহ জ্যোতির্বিজ্ঞানের মৌলিক বিষয়াদি হিসেব করাটাই ছিল সেক্সট্যান্ট যন্ত্র ব্যবহারের মুখ্য উদ্দেশ্য। অন্যান্য যন্ত্রের মাঝে আর্মিলারি গোলক এবং আস্তর্লাব উল্লেখযোগ্য – এদের সম্পর্কে আপনি এই বিভাগে আরও তথ্য পাবেন।

উলুগ বেগের কাজ তার যুগের সাপেক্ষে বেশ অগ্রগামী হওয়ার পাশাপাশি আশ্চর্যজনকভাবে সেগুলো বেশ নিখুঁতও ছিল। নক্ষত্রীয় বছরের ক্ষেত্রে তার গণনা ছিল: ৩৬৫ দিন ৬ ঘন্টা ১০ মিনিট এবং ৮ সেকেন্ড; বর্তমান হিসেবে থেকে এটা ৬২ সেকেন্ড কম, যা শতকরা ০.০০০২ ভাগ নির্ভুল – সত্যই এটা খুবই অসাধারণ।

চলমান পর্যবেক্ষণ কর্মযজ্ঞ মিলিয়ে এসব মানমন্দির বেশ বড় প্রতিষ্ঠান ছিল, যা সফলভাবে পরিচালনার জন্য প্রয়োজন দক্ষ প্রশাসনিক কাঠামো। মূলত জ্যোতির্বিদগণই তাদের কাজে সহায়ক অন্য কর্মীদের নির্দেশনা ও তত্ত্বধান করতো।

পশ্চিমের মানমন্দির

স্পেনীয় রাজা দশম আলফোনসো

১৩শ শতাব্দির দ্বিতীয়ার্ধের স্পেনীয় রাজা দশম আলফোনসো মানমন্দির প্রতিষ্ঠার মুসলিম ঐতিহ্যকে চলমান রাখার চেষ্টা করেন। তিনি পশ্চিম ইউরোপে মানমন্দির প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিলেও সফল হতে পারেননি, গির্জা কর্তৃপক্ষ জ্যোতিষশাস্ত্রকে বরদাশত করেনি এবং এর উপকারিতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করায় সম্ভবত এমনটি হয়েছে। চার শতাব্দি পরে পরিস্থিতি ধীরে ধীরে বদলে যায় এবং ইউরোপের বুকে অবশেষে জ্যোতিষশাস্ত্র স্বস্তির নিশ্বাস নিতে শুরু করে। মুসলিম বিশ্ব জ্যোতিষশাস্ত্রে যত পথ পাড়ি দিয়েছে, ইউরোপ তার সবই একে একে নিজেদের করে নিতে শুরু করে। আত্তীকরণের এই ধাপ এতটাই প্রকট ছিল যে, ১৬শ শতাব্দির পর্যবেক্ষণধর্মী বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ ট্যাকো ব্রাহের ব্যবহৃত যন্ত্রগুলো ঠিক তার পূর্বে মুসলিম জ্যোতির্বিদদের ব্যবহৃত যন্ত্রের অনুরূপ ছিল। তার বিখ্যাত দেয়ালস্থ কোয়াডর্যান্ট যন্ত্রটি প্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলোতে নির্মিত যন্ত্রের অনুরূপ ছিল।
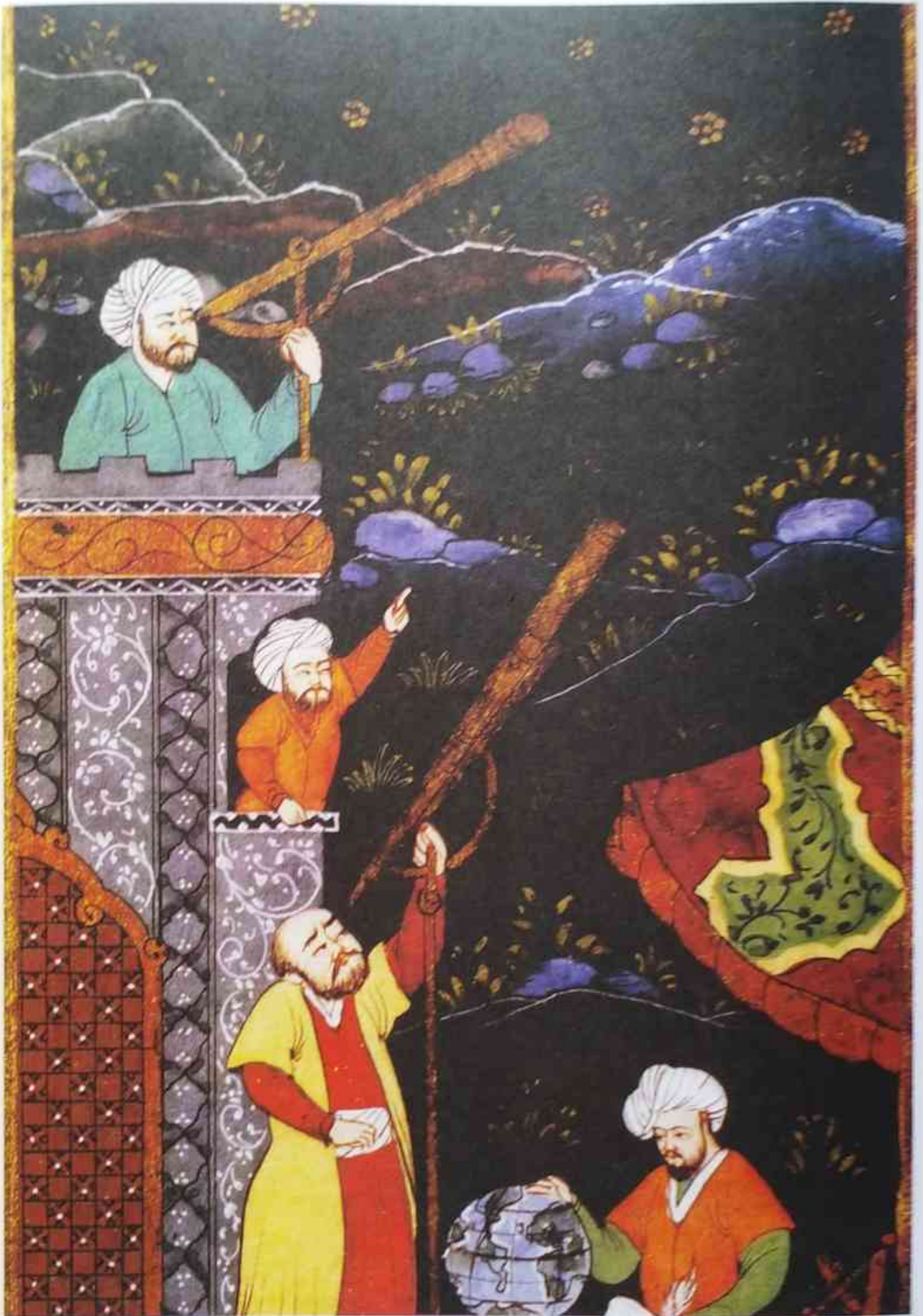
জ্যোতির্বিদগণ চাঁদ ও তারকা নিয়ে গবেষণায় রত আছেন, এমন দৃশ্যের শৈল্পিক চিত্রায়ন ফুটে উঠেছে অটোমান ভঙ্গিতে আঁকা এই চিত্রকর্মে।

পরবর্তীকালের মানমন্দিরগুলোতে পরিচালক, কোষাধ্যক্ষ, কেরানি, গ্রন্থকারিক এবং অন্যান্য প্রশাসনিক কর্মকর্তার পাশাপাশি তাদের নিজস্ব বৈজ্ঞানিক কর্মীবাহিনী পর্যন্ত ছিল।

আল-মামুনের আশ-শামসিয়া এবং কাসিউন মানমন্দিরের প্রধান কাজ যদিও ছিল জ্যোতিষশাস্ত্রীয় ছক প্রস্তুত করা, তথাপি এখানে কিছু মৌলিক ও নবযুগ সৃষ্টি করে এমনকিছু আবিষ্কারের ঘটনাও ঘটেছিল, যেমন: সৌর শিখর *(apogee)*-এর গতিশীলতা আবিষ্কার। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার সম্পর্কে আপনি এ বিভাগের অন্যান্য অধ্যায়ে আরও তথ্য পাবেন।

১৬শ শতাব্দিতে তাকিউদ্দীনের জন্য নির্মিত মানমন্দিরটি বেশ চমকপ্রদ হলেও তা স্বল্প সময়ের জন্য টিকে ছিল। মুসলিম বিশ্বের অন্যতম বিশিষ্ট এ বিজ্ঞানী তার নতুন সুলতান তৃতীয় মুরাদকে ইস্তাম্বুল মানমন্দির প্রতিষ্ঠাতে সম্মত করতে সফল হয়েছিলেন এবং এটার নির্মাণ কাজ ১৫৭৭ খ্রিস্টাব্দে সমাপ্ত হয়েছিল।

উপর থেকে তাকালে ইস্তাম্বুলের আনাতোলীয় অংশকে দেখা যায়, এমন সুবিধাসহ উঁচু পাহাড়ে দুটো সুরম্য ভবন নিয়ে নির্মিত এ মানমন্দির থেকে কোনো বাঁধা ছাড়াই রাতের আকাশ পর্যবেক্ষণ করা যেত। আধুনিক মানমন্দিরের ন্যায় মূল ভবনটি গ্রন্থাগার ও প্রযুক্তিগত বিষয়াদির জন্য নিবেদিত ছিল এবং ছোট ভবনটি তাকিউদ্দীনের বানানো যন্ত্রপাতির দৃষ্টিনন্দন সংগ্রহে পূর্ণ ছিল। এসব যন্ত্রের মাঝে উল্লেখযোগ্য: বিশাল আর্মিলারি গোলক এবং গ্রহসমূহের অবস্থান ও চলাচল পরিমাপের যান্ত্রিক ঘড়ি।

গ্রহ, সূর্য এবং চাঁদের গতির বিবরণযুক্ত করে তাকিউদ্দীন প্রাচীন জ্যোতিষশাস্ত্রীয় ছকগুলোর আধুনিকায়ন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু প্লেগ ও অভ্যন্তরীণ প্রাসাদ রাজনীতির মারপ্যাচে সুলতান তার এই মানমন্দির ধ্বংস করে দেয়। এতকিছুর পরেও জ্যোতির্বিদ্যা, গণিত ও প্রকৌশল নিয়ে অসংখ্য মূল্যবান গ্রন্থ রচনার মাধ্যমে তাকিউদ্দীন নিজের কীর্তিকে অমর করে রেখেছেন।

প্রথম মানমন্দির প্রতিষ্ঠার সমসাময়িক সময়ে সৃষ্টিশীলতার আলোয় আলোকিত ৯ম শতাব্দির কর্ডোবা নিবাসী এক মনীষী তৈরি করেছিলেন: নক্ষত্রশালা। আসমান গবেষণার জন্য নিবেদিত মানমন্দিরের চেয়ে নক্ষত্রশালা কিছুটা আলাদা। নক্ষত্রশালা (গম্বুজসদৃশ বৃহৎ এক) কক্ষ, যেখানে প্রক্ষিপ্ত আলোকবিন্দুর সাহায্যে সূর্য, গ্রহ এবং অন্যান্য মহাকাশীয় বস্তুর গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করা হয়। উড্ডয়ন নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানোর জন্য বিখ্যাত ইবনে ফিরনাস তার নিজ গৃহে কাচ থেকে একটি নক্ষত্রশালা বানিয়েছিলেন, যাতে ওই সময়কার রাতের আকাশ প্রদর্শিত হয়েছে। আজকের দিনের নক্ষত্রশালার সাথে এটার বেশ সাদৃশ্য ছিল এবং সত্যিকার আবহ সৃষ্টির জন্য তিনি তার এ নক্ষত্রশালায় কৃত্রিম বজ্রধ্বনি এবং বিজলিচমকের ব্যবস্থা পর্যন্ত করেছিলেন।

বায়ে: উজবেকিস্তানের উলুগ বেগ মানমন্দিরের অভ্যন্তরে থাকা মার্বেলে তৈরি বিশাল এক সেক্সট্যান্ট যন্ত্র। ডানে: উলুগ বেগ মানমন্দিরের মাধ্যাহ্নিক চাপের ব্যাস ইস্তাম্বুলের হাগিয়া সোফিয়া মসজিদের গম্বুজের উচ্চতার সমান।

তাকিউদ্দীনের মানমন্দির

আসমানি পরিমণ্ডল

প্রাচ্য ও পশ্চিমের সমৃদ্ধ জ্যোতিষশাস্ত্রীয় ঐতিহ্যের সম্মিলিত প্রয়াস

উল্লেখযোগ্য পরম্পরা: জ্যোতিষশাস্ত্রীয় তথ্যের এক সমৃদ্ধ ভাণ্ডার, ছয়-সিলিন্ডারের পাম্প এবং যান্ত্রিক ঘড়ি

অবস্থান: ইস্তাম্বুল, তুরস্ক
তারিখ: ১৬শ শতাব্দি
প্রধান ব্যক্তিত্ব: তাকিউদ্দীন

রাতের তারায় শোভিত আকাশের বিস্ময় ও মহিমা মুসলিম সভ্যতার পণ্ডিতদের কেবল মুনোমুগ্ধই করেনি – বরং এটা তাদেরকে এক ধাপ এগিয়ে তাদের দেখা জিনিসে বিন্যাস ও যৌক্তিকতার অন্বেষণে ধাবিত করেছিল। অত্যাধুনিক যন্ত্র এবং নতুন গাণিতিক কৌশলের মাধ্যমে জ্যোতির্বিদগণ মহাবিশ্ব উপলব্ধিতে এক নব দুয়ারের উন্মোচন করেছিল। গ্রিকদের রেখে যাওয়া তত্ত্বগুলোকে সমৃদ্ধ করে যৌথ জ্যোতিষশাস্ত্রীয় ঐতিহ্যের এক সুবিশাল ইমারত নির্মাণ করে, যার নিদর্শন আমরা বহু তারকার আরবী ও গ্রিক নামে খুঁজে পাই।

বাগদাদ এবং কাসিউন মানমন্দির প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ৯ম শতাব্দিতে খলীফা আল-মামুন মানমন্দির প্রতিষ্ঠার ইসলামী ঐতিহ্য চালু করেছিলেন। ১১শ শতাব্দির শেষার্ধে সুলতান মালিক শাহ ইস্পাহানে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মুসলিম বিশ্বের প্রথম বৃহৎ পরিসরের মানমন্দির।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইসলামী মানমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৩শ শতাব্দির জ্যোতির্বিদ নাসিরউদ্দীন আত-তুসী কর্তৃক ইরানের মারাগাতে। এক সময় বিশ্বের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ মানমন্দিরের তালিকায় থাকা এ মানমন্দিরের ভিত্তি আজও দৃশ্যমান। ঐতিহাসিক চীনা নথি আমাদেরকে জানাচ্ছে, ১৩শ শতাব্দির মারাগা মানমন্দিরের সাথে জড়িত জামালুদ্দীন নামের এক জ্যোতির্বিদ ১২৬৭ খ্রিস্টাব্দে বেইজিং রাজ দরবার সফর করেছিলেন এবং তিনি তার সাথে করে একাধিক জ্যোতিষশাস্ত্রীয় যন্ত্র চীনে এনেছিলেন। বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠা এ জ্যোতির্বিদ চীনের মানুষদের নিকট চা-মা-লু-তিং নামে পরিচিত হয়ে উঠেন।

কোয়াডর‍্যান্ট এবং সেক্সট্যান্ট হচ্ছে মুসলিম সভ্যতার দুটো প্রধান জ্যোতিষশাস্ত্রীয় যন্ত্র, পণ্ডিতরা এগুলো দিয়ে মহাকাশীয় বস্তুসমূহের দূরত্ব পরিমাপ করতেন। দূরত্ব একবার নিশ্চিত হয়ে গেলে আল-বাত্তানীর নির্মিত যন্ত্রসমূহ দ্বারা মহাকাশীয় গোলকে ওই নক্ষত্রের বিস্তারিত নাক্ষত্রিক স্থানাংক নির্ণয় করা যায়। তার ১০ম শতাব্দির একটি রচনায় তিনি 'আল-বায়দাতু' বা 'ডিম' নামে বিশেষ এক যন্ত্রের বিবরণ দিয়েছেন, যা মূলত ভারী মাহাকাশীয় গোলকের সাথে অন্যান্য সাধারণ আর্মিলারি গোলকের সম্মিলনে তৈরি এবং এ যন্ত্রের সাহায্যে তিনি বিপুল সংখ্যক তারকার অবস্থান নির্ণয়ে সফল হয়েছিলেন। যেকোন মানমন্দিরের সুনাম ধরে রাখার জন্য নির্ভুল পরিমাপ বজায় রাখা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য জ্যোতির্বিদগণ ভুলের মাত্রা হ্রাসে বৃহৎ জ্যোতিষশাস্ত্রীয় যন্ত্র নির্মাণে মনোযোগী হয়েছিলেন। ১৪২০ খ্রিস্টাব্দে উলুগ বেগ উজবেকিস্তানে নির্মাণ করেছিলেন বিখ্যাত এক মানমন্দির, যেখানে তিনতলার অধিক গভীরতায় একটি সেক্সট্যান্ট যন্ত্র প্রোথিত ছিল। মূলত ভূমিকম্প থেকে রক্ষার জন্যই এমনটি করা হয়েছিল।

১৬শ শতাব্দির জ্যোতির্বিদ তাকিউদ্দীন ইস্তাম্বুলে এক জাঁকজমকপূর্ণ মানমন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যেখানে পর্যবেক্ষণ কর্মযজ্ঞ পরিচালনা এবং জ্যোতিষশাস্ত্রীয় ছক হালনাগাদের জন্য ছিল অত্যাধুনিক ও দৃষ্টিনন্দন যন্ত্রের সারি। সেক্সট্যান্ট যন্ত্রসহ বেশ কিছু যন্ত্রের বৃহৎ সংস্করণও সেখানে ছিল।

প্রাচীন গ্রিক পণ্ডিতদের থেকে পাওয়া বেশ কিছু তত্ত্বকে মুসলিম সভ্যতার জ্যোতির্বিদগণ চ্যালেঞ্জ করেছিলেন। তাদের পর্যবেক্ষণ এবং গাণিতিক গবেষণা তাদেরকে নতুন মডেল উদ্ভাবনে সক্ষম করেছিল, যা অনুবাদের মাধ্যমে পৌঁছে যায় পশ্চিমা জ্যোতির্বিদদের নিকট। বৈজ্ঞানিক পাঠ্যপুস্তক, তথ্য ছক এবং যন্ত্রের বিবরণ আরবী থেকে লাতিন ভাষায় অনূদিত হয়ে তা ভিত গড়ে দেয় পশ্চিমাদের আধুনিক পূর্ব এবং গোড়ার দিকের আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের, আর এসবের বদৌলতে নিকোলাস কপার্নিকাস সক্ষম হয়েছিলেন ১৫৪৩ খ্রিস্টাব্দে তার সূর্যকেন্দ্রীক সৌর মডেল তত্ত্ব প্রকাশ করে।

১৬শ শতাব্দির "কিতাবুল মালুক" (বাদশাহ) গ্রন্থের তুর্কি পাণ্ডুলিপিতে দেখা যাচ্ছে, তাকিউদ্দীন ও অন্যান্য জ্যোতির্বিদেরা তাদের অত্যাধুনিক যন্ত্র নিয়ে ইস্তাম্বুল মানমন্দিরে গবেষণায় মত্ত আছেন।

০৩ জ্যোতিষশাস্ত্রীয় যন্ত্র

মহাকাশ গবেষণায় নিবেদিত বৃহদাকার যন্ত্রের নকশা তৈরিতে মুসলিমদের তুলনা কেবল তারাই ছিল এবং অতিকায় এসব যন্ত্র ব্যবহারের সুবাদে তারা তাদের পরিমাপে ভুলের শতকরা হার কমাতে দারুণভাবে সফল হয়। দামেস্কের মানমন্দিরে একটি ৬ মিটার (২০ ফুট) কোয়াডর‍্যান্ট এবং একটি ১৭ মিটার (৫৬ ফুট) সেক্সট্যান্ট যন্ত্র ছিল, যা এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত একটি সাধারণ আকৃতির গাড়ির সমান। কোয়াডর‍্যান্ট, আর্মিলারি গোলক ও আস্তুর্লাবসহ মারাগা মানমন্দিরে ছিল বহু বৃহদাকার যন্ত্র।

অন্যান্য যন্ত্রের মাঝে মহাকাশীয় গোলক, কোয়াডর‍্যান্ট এবং সেক্সট্যান্ট বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য [আস্তুর্লাব ও আর্মিলারি গোলক সম্পর্কে আপনি বিশদ তথ্য এই বিভাগের স্বতন্ত্র অধ্যায়ে পাবেন]। নির্ভুল পরিমাপ নিশ্চিতের জন্য মানমন্দিরে এসব যন্ত্র ব্যবহার করা হতো, কেননা মানবমন্দিরের সুখ্যাতি তাদের প্রকাশিত প্রতিবেদনের উপর নির্ভরশীল ছিল।

১১৪৫ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণকারী স্পেন নিবাসী জাবির ইবনে আফলাহ মহাকাশীয় স্থানাংক পরিমাপের জন্য (*টরকুয়েটাম* নামে পরিচিত) প্রথম বহনযোগ্য মহাকাশীয় গোলকের নকশা প্রস্তুত করলেও ইরাকে কর্মরত ১০ম শতাব্দির জ্যোতির্বিদ আল-বাত্তানী মহাকাশীয় গোলক নিয়ে বিস্তর লিখেছিলেন। তিনি তার গোলককে কেবল পর্যবেক্ষণ উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করেননি, বরং তিনি এটার সাহায্যে নির্ভুল মহাকাশীয় তথ্য নথিবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। পাঁচটি বৃত্তাকার অবয়ব থেকে ঝুলন্ত '*আল-বায়দাতু*' বা 'ডিম' নামে পরিচিত একটি যন্ত্রের বিস্তারিত বিবরণের পাশাপাশি এটা দিয়ে কীভাবে ১০২২ তারকার স্থানাংক নির্ণয় করতে হয়, তাও তিনি সবিস্তারে তুলে ধরেছেন। তার প্রবন্ধ বেশ গুরুত্বপূর্ণ, যেহেতু গোলকে তারকা চিহ্নিতকরণের কায়দা-কানুন এতে বর্ণিত হয়েছে। এর মানে দাঁড়াচ্ছেঃ ওই সময়ের যন্ত্র নির্মাতাগণ এই গোলকের কাঠামোকে আর্দশ ধরে যন্ত্র প্রস্তুত করতো।

পাঁচটি সমান্তরাল নিরক্ষরেখা এবং নক্ষত্রপুঞ্জের রূপরেখা-সমৃদ্ধ টলেমি পূর্ব নকশা থেকে আল-বাত্তানীর প্রবন্ধ বেশ ভিন্ন। টলেমি পূর্ব মডেলের পরিবর্তে গ্রহণরেখা ও নিরক্ষ রেখার প্রয়োগ এবং সেগুলোকে ছোট ছোট ভাগে বিভক্ত করে আল-বাত্তানী তারকারাজির তালিকা প্রস্তুতের অধিকতর নিখুঁত কৌশলের প্রয়োগ ঘটান। এই পদ্ধতির সাহায্যে তারকার স্থানাংক অত্যধিক নির্ভুলভাবে নির্ণয় করা সম্ভব।

জ্যোতিষশাস্ত্রীয় যন্ত্র ও উপকরণ নির্মাণে মুসলিমগণ বেশ পারদর্শী ছিল। ৯০৩ খ্রিস্টাব্দে জন্ম নেয়া আব্দুর রহমান সূফী ছিলেন তেমনই এক গুরুত্বপূর্ণ মহাকাশীয় গোলক নির্মাতা। মহাকাশীয় গোলক নির্মাতাদের জন্য নক্ষত্রপুঞ্জের প্রতিচ্ছবির নকশা সমৃদ্ধ একটি প্রবন্ধ লেখেন, যা মুসলিম বিশ্বের পাশাপাশি ইউরোপেও ব্যাপক প্রভাব রেখেছিল। তার লিখিত অন্যান্য প্রবন্ধের মাঝেঃ আস্তুর্লাব এবং মহাকাশীয় গোলক ব্যবহারের নিয়ম উল্লেখযোগ্য।

১৬শ শতাব্দি পর্যন্ত বহু গোলক নির্মিত হয়েছে, যার অনেকগুলোই এখনো টিকে আছে, তবে ১১শ শতাব্দির পূর্বের কোনো গোলকই আজ আর টিকে নেই।

জ্যোতিষশাস্ত্রীয় যন্ত্র নিয়ে লিখেছেন, এমন লেখকদের মাঝে ১৩২৯ খ্রিস্টাব্দে সিরিয়ার সিরকাতে মৃত্যুবরণকারী আবু বকর ইবনুল সার্‌রায আল-হামাবী অন্যতম।

মুহাম্মদ ইবনে হিলাল ১৩শ শতাব্দিতে ইরানের মারাগাতে পিতলের এই মহাকাশীয় গোলক নির্মাণ করেছিলেন।
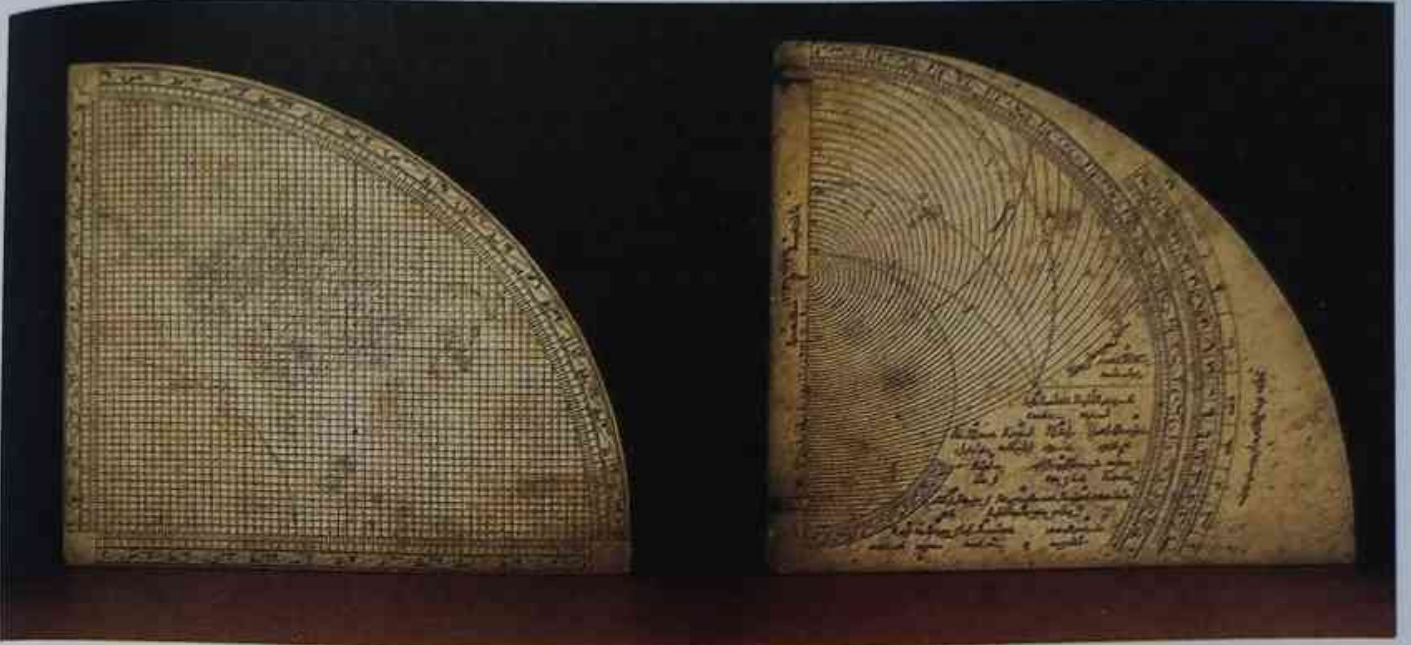
বা থেকে: সিরিয়ার দামেস্কের উমাইয়া জামে মসজিদে সরকারি সময় গণনাকারী আহমাদ আল মিযৃযী কর্তৃক নির্মিত ১৪শ শতাব্দির আস্তূর্লাব কোয়াডর‍্যান্টের বিপরীত পাশ এবং সামনের অংশ।

বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি ও জ্যামিতিক সমস্যা নিয়ে গ্রন্থ রচনার পাশাপাশি তিনি "*আল-মুকান্তারাতুল ইউসরা*" নামে নতুন আরেকটি কোয়াডর‍্যান্ট উদ্ভাবন করেছিলেন (*Almucantar* – মহাকাশীয় গোলকে থাকা দিগন্তের সমান্তরাল বৃত্ত)। তার অধিকাংশ সময় কোয়াডর‍্যান্ট নিয়ে লেখাতে ব্যয় হয়েছিল এবং "*মাকালাতু ফী আমালিয়াত মাআ' রবিয়াতিল খফিয়া*" (লুকানো কোয়াডর‍্যান্টের ক্রিয়া বিষয়ক প্রবন্ধ) ও "*আদ-দুররুল গারিব ফী আমালি বি-দায়িরাতিত তীব*" (সাইন [*Sine*] নির্ণয়ে বৃত্তের ক্রিয়া বিষয়ক দুর্লভ মুক্তা)-এর ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ তার এ গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত ছিল। বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি প্রস্তুতে তার এত অর্জন থাকলেও তাকে এবং তার কাজ নিয়ে এ পর্যন্ত কোনো গবেষণা হয়নি।

১৪৫৫ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণকারী সিরিয়ার আলেপ্পোর জ্যোতির্বিদ আহমাদ আল-হালাবী এমন আরেক ব্যক্তিত্ব। "*বি-গায়াতিত তুল্লাব ফী আমালি বি-রবিয়িল আস্তূর্লাব*" (আস্তুলাব কোয়াডর‍্যান্টের ক্রিয়া নির্ণয়ে শিক্ষার্থীদের লক্ষ্য) শীর্ষক গ্রন্থে তিনি জ্যোতিষশাস্ত্রীয় যন্ত্র নিয়ে বিস্তর আলোচনা করেছেন।

তার সমসাময়িক ইযযুদ্দীন আল-ওফায়ী ছিলেন একেধারে গণিতজ্ঞ, মুয়াযযিন এবং কায়রোর উমাইয়া মসজিদের সময় গণনাকারী। পাটিগণিত, ষষ্ঠিক অনুপাতের সাথে ক্রিয়াসহ গণিত বিষয়ে ৪০-টি দুর্দান্ত প্রবন্ধ লিখার পাশাপাশি তিনি বিভিন্ন যন্ত্র নির্মাণে বেশ শ্রম দিয়েছিলেন। "*আন-নুজুময যাহিরাত ফী আমালি বি-রবিয়িল মুকান্তারাত*" (আলমুকান্তার কোয়াডর‍্যান্টের ক্রিয়া) তার উল্লেখযোগ্য কর্ম।

দিগন্তের উপরে থাকা মহাকাশীয় বস্তুসমূহের দূরত্ব নির্ণয়ে সেক্সট্যান্ট এবং কোয়াডর‍্যান্ট ব্যবহৃত হতো। মুসলিম জ্যোতির্বিদগণ বিশেষভাবে কোয়াডর‍্যান্ট ব্যবহারে আগ্রহী ছিল এবং তারা এ যন্ত্রের প্রভূত উন্নয়নে অংশও নিয়েছিল।

মুসলিম জ্যোতির্বিদগণ বেশ কিছু কোয়াডর‍্যান্ট উদ্ভাবনও করেছিল। ত্রিকোণমিতিক সমস্যা সমাধানে ব্যবহৃত সাইন [*Sine*] কোয়াডর‍্যান্টের বিকাশ ঘটেছিল ৯ম শতাব্দি বাগদাদে; যেকোন অক্ষাংশের জ্যোতিষশাস্ত্রীয় সমস্যা সমাধানে ব্যবহৃত সার্বজনীন কোয়াডর‍্যান্টের বিকাশ ১৪শ শতাব্দির সিরিয়াতে হয়েছিল। সূর্যের সাথে সম্পৃক্ত সময় নির্ণায়ক হোরারে কোয়াডর‍্যান্ট এবং আস্তূর্লাব/আলমুকান্তার কোয়াডর‍্যান্টও মুসলিমদের উদ্ভাবন। এসবের অধিকাংশই আস্তূর্লাবের সাথে মিলিয়ে ব্যবহৃত হতো।

গ্রহণরেখার বক্রতা, পৃথিবীর বিষুবরেখার সমতল ও সূর্যের গ্রহণরেখার সমতলের মধ্যস্থ কোণ পরিমাপে ৯৯৪ খ্রিস্টাব্দে আল-খুজান্দী একটি যন্ত্র ব্যবহার করেছিলেন, যেটা সম্পর্কে তার দাবী যে, তিনিই সেটার উদ্ভাবক। এটা ফাখরী সেক্সট্যান্ট নামে পরিচিত ছিল, যেহেতু ইস্পাহানের ভূইয়া রাজবংশের শাসক ফাখর আদ-দৌলা ছিল তার পৃষ্ঠপোষক। খুজান্দী দাবী করেন যে, তিনি এ ধরনের পূর্ববর্তী যন্ত্রগুলোর প্রভূত উন্নয়ন সাধন করেছেন। আগের যন্ত্রগুলো দিয়ে যেখানে ডিগ্রি ও মিনিট পাঠ করা যেত, সেখানে তার যন্ত্র দিয়ে সেকেন্ড পাঠ করা যায়।

এই যন্ত্রে মধ্যরেখা ও উত্তর-দক্ষিণ রেখা অভিমুখী দেয়ালে একটি ৬০ ডিগ্রি চাপ সংযুক্ত রয়েছে। আল-খুজান্দী নির্মিত ২০ মিটার (৬৫.৬ ফুট) ব্যাসের এ যন্ত্র এ ধরনের পূর্ববর্তী যন্ত্রগুলো থেকে বেশ বড়।

আল-খুজান্দীর ফাখরী সেক্সট্যান্ট ব্যবহারের চেয়ে দেয়ালস্থ কোয়াডর‍্যান্ট নামে পঞ্চম আরেক কোয়াডর‍্যান্ট ব্যবহারে তাকিউদ্দীন বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন। এই দেয়ালস্থ কোয়াডর‍্যান্টে দুটো ক্রমবিভক্ত পিতলের চাপ ছিল, যেগুলোর মোট ব্যাস ৬ মিটার (১৯.৭ ফুট), যা আল-খুজান্দীর যন্ত্রের চেয়ে ২০ মিটার (৬৫.৬ ফুট) ছোট। এই চাপগুলো মধ্যরেখা বরাবর একটি দেয়ালে স্থাপিত ছিল। পাঠ নেয়ার জন্য জ্যোতির্বিদগণ কোয়াডর‍্যান্টে থাকা রড বা দণ্ডকে মহাকাশীয় বস্তু – যেমন: চাঁদ বা সূর্য – বরাবর তাক করতো এবং দেয়ালস্থ কোয়াডর‍্যান্ট থেকে কোণের পরিমাপ নিতো।

নৌচালনের জন্য ব্যবহৃত হলেও সেক্সট্যান্ট যন্ত্র দিয়ে প্রধানত তারকা ও দিগন্তের মধ্যস্থ কোণ পরিমাপ করা হতো।

এ ধরনের অতিকায় জ্যোতিষশাস্ত্রীয় যন্ত্রসমূহের আকার আধুনিক সময়ে উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেলেও এসব যন্ত্রের প্রযুক্তি সহজে বহনযোগ্য আধুনিক সেক্সট্যান্ট যন্ত্রের ভিত রচনাতে ব্যাপক অবদান রেখেছিল এবং জিপিএস ব্যবস্থা উদ্ভাবনের আগ পর্যন্ত এগুলোই ছিল প্রধান নৌচালন যন্ত্র।

উদ্ভাবনী যন্ত্র

ট্যাকো ব্রাহে কর্তৃক ১৫৯৮ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত একটি দেয়ালস্থ কোয়াডর‍্যান্ট।

১৬শ শতাব্দির দু'জন প্রভাবশালী জ্যোতির্বিদের একজন ইস্তাম্বুলের তাকিউদ্দীন এবং অপরজন ট্যাকো ব্রাহে, যিনি ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দে ডেনমার্কের রাজা দ্বিতীয় ফ্রেডরিকের পৃষ্ঠাপোষকতায় একটি মানমন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তৎকালের শ্রেষ্ঠ ও নিখুঁত যন্ত্রাদি দিয়ে সজ্জিত এই মানমন্দির ত্রুটিহীন পর্যবেক্ষণে বেশ সহায়ক ছিল এবং ট্যাকো ব্রাহের সহযোগী ইয়োহান কেপলারের আবিষ্কারে এটার উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল।

তাকিউদ্দীন এবং ট্যাকো ব্রাহের মানমন্দিরের অধিকাংশ যন্ত্রে যে অদ্ভুত সাদৃশ্য ছিল, তা সাম্প্রতিক গবেষণায় উঠে এসেছে (মানমন্দির অধ্যায়ে আপনি এ ব্যাপারে আরও তথ্য পাবেন)। মজার ব্যাপার হলো: উভয়েই প্রাচীন জ্যোতিষশাস্ত্রীয় যন্ত্রে তেমন একটা সন্তুষ্ট ছিলেন না। সেক্সট্যান্ট, কাঠের কোয়াডর‍্যান্ট ও জ্যোতিষশাস্ত্রীয় ঘড়ির ন্যায় নব আবিষ্কৃত যন্ত্রগুলো ব্যবহারে তারা বেশি স্বাচ্ছন্দ পেতেন।

তাকিউদ্দীনের সেক্সট্যান্টটি '*মুশাব্বাহ বিল মানাতিক*' (ক্ষেত্রফলের প্রতিলিপি) নামের তিনটি স্কেল বা মাপনী দিয়ে নির্মিত ছিল। দুটো স্কেল তিনপ্রান্ত বিশিষ্ট সেক্সট্যান্টের প্রান্ত গঠন করতো। শেষপ্রান্তে ছিল একটি চাপ, যা একটি স্কেলের সাথে সংযুক্ত ছিল এবং তা দিয়ে তারকাদের মধ্যবর্তী দূরত্ব মাপা হতো। বস্তুত এই দুই সৃজনশীল প্রতিভার উদ্ভাবিত সেক্সট্যান্ট যন্ত্রগুলোকে ১৬শ শতাব্দির অন্যতম শ্রেষ্ঠ অর্জন হিসেবে বিবেচনা করা উচিত।
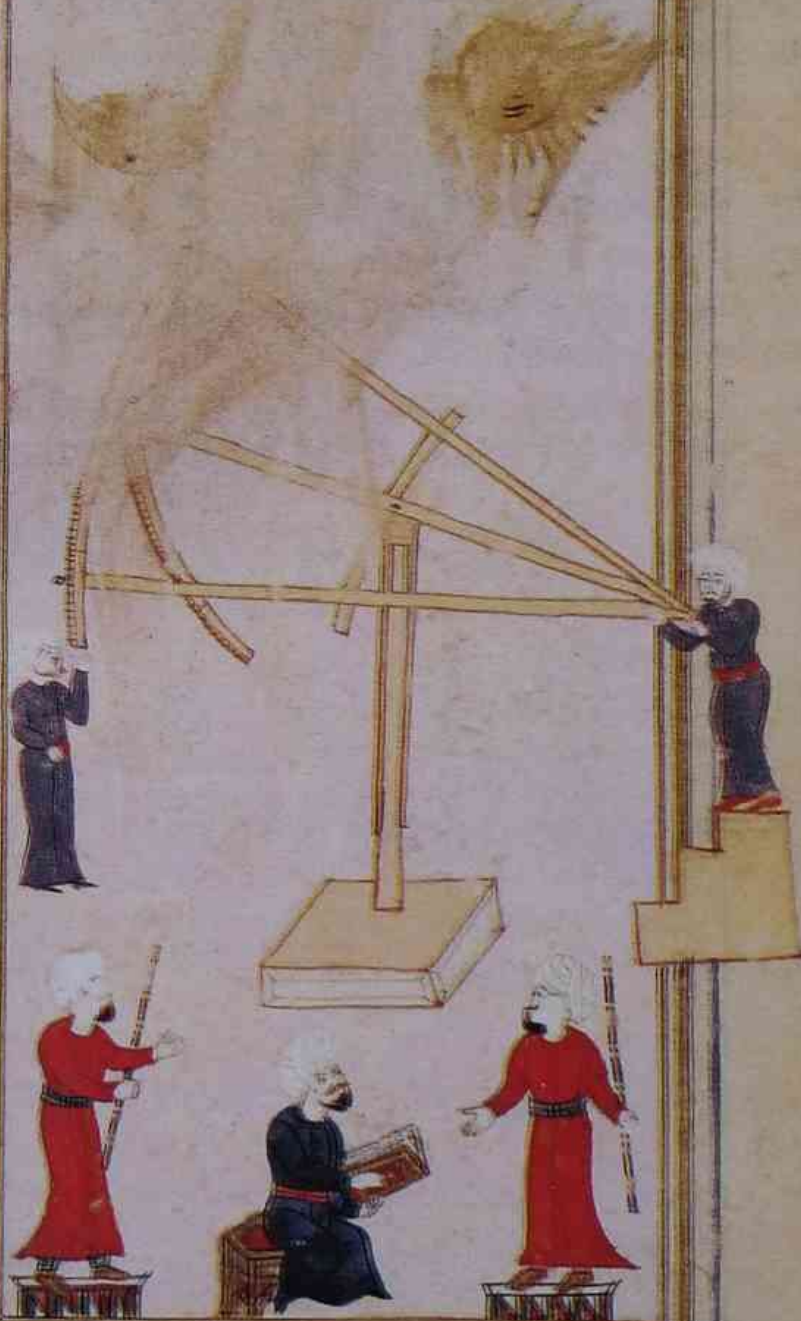
শিল্পীর তুলিতে ফুটে উঠেছে: ১৫৮০ খ্রিস্টাব্দে ইস্তাম্বুলে প্রতিষ্ঠিত নিজের মানমন্দিরে তাকিউদ্দীন তার 'মুশাব্বাহ বিল মানাতিক' নামের সেক্সট্যান্ট নিয়ে পর্যবেক্ষণে রত থাকার দৃশ্য। "আলাত-ই-রাসাদিয়া লি যিজ-ই শাহেনশাহিয়া" (জ্যোতিষশাস্ত্রীয় পর্যবেক্ষণ যন্ত্র) নামের পাণ্ডুলিপি থেকে ছবিটি নেয়া।

০৪ আস্তুর্লাব

ইসলামের সূচনা থেকেই দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের জন্য মুয়াযযিন আযান দিতো। সালাতের এই সময়গুলো দিন ও রাতের পরিবর্তনের আলোকে নির্ধারিত হতো, তাই এগুলোর সঠিক সময় জানা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আধুনিক প্রযুক্তির আগমনের বহু পূর্বে এ কাজে সহায়তার জন্য মুসলিমরা আস্তুর্লাব নামের এক নিখুঁত ও অসাধারণ যন্ত্রের সমৃদ্ধি সাধনে অসামান্য ভূমিকা রেখেছিল।

মার্কিন জ্যোতিঃপদার্থবিদ (*astrophysicist*) ড. হারওল্ড উইলিয়ামস আস্তুর্লাবের বিবরণ দিয়ে বলেন, "ডিজিটাল কম্পিউটার উদ্ভাবনের পূর্ব পর্যন্ত আস্তুর্লাব ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জ্যোতিষশাস্ত্রীয় গণনা যন্ত্র এবং টেলিস্কোপের উদ্ভাবনের আগ পর্যন্ত আস্তুর্লাব ছিল সবচেয়ে মূল্যবান জ্যোতিষশাস্ত্রীয় পর্যবেক্ষণ যন্ত্র।"

আস্তুর্লাবের আদি উৎস অজানা। তবে আলেকজান্দ্রিয়ার থিওন খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দিতে আস্তুর্লাব নিয়ে লিখেছিলেন এবং এ বিষয়ে টিকে থাকা সর্বাধিক প্রাচীন গ্রিক নথি ষষ্ঠ শতাব্দির। ইংরেজি *astrolabe* শব্দটি আরবী আস্তুর্লাব থেকে উৎসারিত এবং বলা হয়, এটা গ্রিক শব্দের আরবী প্রতিবর্ণায়ন। এর আদি উৎস যাইহোক না কেন, দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের সময়সূচি নির্ধারণ এবং মক্কার অবস্থান নির্ণয়ের মতো অপরিহার্য প্রয়োজন মেটানোর তাকিদে মুসলিম জ্যোতির্বিদগণ এই যন্ত্রের পূর্ণাঙ্গ বিকাশ ঘটানোর পাশাপাশি এটার ব্যবহারকে আরও বিস্তৃত করেছিল। ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ অবধি ইসলামী বিশ্বে আস্তুর্লাব বেশ জনপ্রিয় ছিল।

আস্তুর্লাব নিয়ে নতুন নতুন প্রবন্ধ রচনার রেওয়াজ চালু হয় এবং ৯ম শতাব্দির শুরুর দিকে মাশাআল্লাহ আলী ইবনে ঈসা এবং আল-খাওয়ারিযমী এ ব্যাপারে প্রথম কলম ধরার খ্যাতি লাভ করেছিলেন। এ পর্যন্ত টিকে থাকা এ যন্ত্রের ইসলামী সংস্করণের সময়কাল ১০ম শতাব্দির মাঝামাঝি, যা আলী ইবনে ঈসা নামের এক বাগদাদ নিবাসী শিক্ষানবিশের তৈরি। অষ্টম শতাব্দি থেকে স্পেনে মুসলিম উপস্থিতির সুবাদে আস্তুর্লাবসহ ইসলামী জ্ঞানধারা পশ্চিমা ইউরোপে এমনভাবে প্রবেশ করেছিল যে, এ যন্ত্রের টিকে থাকা খ্রিস্টান বা পশ্চিমা সংস্করণ খুঁজতে গেলে আমাদেরকে ১৩শ শতাব্দির পর থেকে যাত্রা শুরু করতে হয়।

যন্ত্রটির বেশ কিছু ধরনেরও বিকাশ ঘটেছিল, যেগুলোর মধ্যে *Planisphere* (মেরু অভিক্ষেপ-বিশিষ্ট) আস্তুর্লাব সর্বাধিক জনপ্রিয় ছিল, যেটাতে বিষুবরেখা পৃষ্ঠে মহাকাশীয় গোলককে প্রক্ষিপ্ত করা হতো।

আস্তুর্লাব মূলত আসমানের দ্বিমাত্রিক মডেল, যা কোনো একটি নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট স্থানের আকাশ কেমন দেখাবে, তা নিরূপণ করে। আস্তুর্লাবের পৃষ্ঠতলে আসমান এঁকে এবং সহজে খুঁজে পাবার জন্য সেটাকে চিহ্নিত করে এ কাজ সম্পন্ন করা হতো। কিছু আস্তুর্লাব ছিল ছোট, কিছু ছিল হাতের তালুর সমান এবং বহনযোগ্য; আবার কিছু ছিল কয়েক মিটার ব্যাসের বিশাল এক যন্ত্র।

> "ডিজিটাল কম্পিউটার উদ্ভাবনের পূর্ব পর্যন্ত আস্তুর্লাব ছিল সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ জ্যোতিষশাস্ত্রীয় গণনা যন্ত্র এবং টেলিস্কোপের উদ্ভাবনের আগ পর্যন্ত এটা ছিল সবচেয়ে মূল্যবান জ্যোতিষশাস্ত্রীয় পর্যবেক্ষণ যন্ত্র।"
>
> – মার্কিন জ্যোতিঃপদার্থবিদ ড. হারওল্ড উইলিয়ামস

চন্দ্র ও সূর্যের ন্যায় মহাকাশীয় বস্তুগুলোর অবস্থান সংশ্লিষ্ট সমস্যা সমাধান এবং সময় নির্ণয়ে পারদর্শী এসব আস্তুর্লাব ছিল সে আমলের জ্যোতিষশাস্ত্রীয় গণনাযন্ত্র ও এনালগ কম্পিউটার। প্রকৃতপক্ষে, এগুলো ছিল মধ্যযুগীয় জ্যোতির্বিদদের পকেট ঘড়ি। দিগন্তরেখার উপরে সূর্যের কৌণিক দূরত্বের পরিমাপ, দিনে বা রাতে সময় বলে দেয়া, এমনকি সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের মতো মহাকাশীয় ঘটনাগুলোর সময় নির্ণয় কিংবা যেকোন তারার শীর্ষবিন্দু নির্ণয়ে এগুলো বেশ কার্যকর ছিল। সুনিপুণ কর্মদক্ষতার ছোঁয়ায় বানানো ছকগুলো আস্তুর্লাবের বিপরীত পার্শ্বে ছাপানো থাকতো, যার সাহায্যে এতসব গণনার কাজ সম্পাদন করা হতো।

এসব ছকে অন্তর্ভুক্ত থাকতো – সময় পরিবর্তনের বক্রতা, যেকোন মাসের দিনকে গ্রহণরেখায় সূর্যের অবস্থানের সাপেক্ষে রূপান্তর করে – এমন বর্ষপঞ্জি, ত্রিকোণমিতিক স্কেল এবং ৩৬০ ডিগ্রির ক্রমবিন্যাস বিষয়ক তথ্যাদি।

গোলাকার মহাবিশ্বের কেন্দ্রে আছে পৃথিবী এবং নির্দিষ্ট দূরত্ব ও সময়ে থেকে একজন কাল্পনিক পর্যবেক্ষক এই গোলাকার মহাবিশ্ব মডেলের দিকে তাকিয়ে আছেন, এমনটি বিবেচনায় নিয়ে আস্তুর্লাব বানানো হতো। আকাশের প্রধান তারকাসমূহকে একটি ধাতব থালায় বিদ্ধ করা হতো, যেন তা সকলের দৃষ্টিগোচর হয়। এরপর এই থালাকে 'মাতির' নামে পরিচিত একটি বৃহৎ সমতল ও বৃত্তাকার ধারকে রাখা হয়। থালায় তারকাগুলো বিদ্ধ থাকায় জ্যোতির্বিদগণ এর নিচে থাকা আরেকটি ধাতব থালা অনায়াসে দেখতে পেতেন। নিচে থাকা অপর ধাতব থালায় নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অবস্থান নির্ণায়ক রেখা আঁকা থাকতো। একটি আস্তুর্লাবে একাধিক ধাতব থালা অন্তর্ভুক্ত থাকে, যেন জ্যোতির্বিদ এক অক্ষাংশ থেকে আরেক অংক্ষাংশে সহজে যেতে পারেন। দিগন্তরেখার উপরে কোনো তারকা বা সূর্যের কৌণিক দূরত্বের পরিমাপে থালার পিছনে থাকা দৃষ্টিসহায়ক যন্ত্র ব্যবহারের পর জ্যোতির্বিদ থালায় বিদ্ধ 'তারকা-মানচিত্র' নিজের অবস্থান অনুযায়ী ঘোরাতেন এবং এভাবে তিনি সময় হিসেব করে ফেলেন। বস্তুত, এটা দিয়ে সব ধরনের হিসাব-নিকাশই সম্ভব। মহাকাশীয় বস্তুর স্থানাংক আরও নিখুঁতভাবে নির্ণয়ে প্রয়োজন বিস্তারিত জ্যোতিষশাস্ত্রীয় ছকের এবং এ কাজে আস্তুর্লাবের সাথে আরও প্রয়োজন বৃহদাকার কোয়াডর‍্যান্ট ও পর্যবেক্ষণধর্মী আর্মিলারি গোলকের ন্যায় অন্যান্য যন্ত্রের।

আস্তুর্লাবের দুটো স্থির ও আবর্তনশীল অংশ ছিল। রিতি (থালায় বিদ্ধ তারকা মানচিত্র)-কে ধারণকারী 'মাতির' মূলত ফাঁপা চাকতি এবং আবর্তনশীল থালাগুলো একে অপরের উপরে স্থাপন করা হয়। মাতিরের উল্টো পাশে থাকে

মুহাম্মদ যাকারিয়া কর্তৃক বানানো এমন একটি কার্যক্ষম আস্তুর্লাব বানাতে প্রয়োজন বিপুল জ্ঞান ভাণ্ডারের। প্রাচীন পদ্ধতি অবলম্বন করে এমন একটি আস্তুর্লাব বানাতে তিন থেকে ছয় মাস সময় লাগে; নির্ভুল কাজ করে এমন আস্তুর্লাব বানাতে প্রয়োজন: বিস্তৃত পরিসরের জ্যামিতিক হিসেব এবং নিখুঁত খোদাইকার্য।

অ্যালিড্যাড (দৃষ্টিসহায়ক যন্ত্র) এবং বিভিন্ন ত্রিকোণমিতিক ছক। এ হিসেবে, আস্তুর্লাবকে এক ধরনের চিত্রময় বা গ্রাফিক কম্পিউটার বলা যায়।

ইসলামী নির্মাতাগণ বিভিন্ন ধরনের আস্তুর্লাবের প্রস্তুতে অবদান রেখেছিলেন, যেমন: গোলীয় আস্তুর্লাব এবং রৈখিক আস্তুর্লাব, কিন্তু এগুলোর কোনটাই বিস্তৃতভাবে প্রচলিত হয়নি। নাবিক আস্তুর্লাব (*Mariner's astrolabe*) ১৫শ শতাব্দির শেষার্ধে এবং ১৬শ শতাব্দির দিকে পর্তুগিজ কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল।

১১শ শতাব্দিতে টলেডোতে নির্মিত হয় অত্যাধুনিক ও জটিল কলাকৌশলে সমৃদ্ধ বৈশ্বিক আস্তুর্লাব, যা তারকামণ্ডলীর মানচিত্রায়নে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছিল। ঔষধবিক্রেতা বা ভেষজজীবী আলী ইবনে খালাফ আল-শাক্কায় এবং জ্যোতির্বিদ আয-যারকালী ছিলেন এই নয়া পরিবর্তনের দু'জন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। আস্তুর্লাবের ইতিহাসে বৈশ্বিক আস্তুর্লাব নবযুগের সূচনা ঘটিয়েছিল, যেহেতু যেকোন অবস্থানে এটা কার্যক্ষম। নির্দিষ্ট স্থানের ভিত্তিতে নকশাকৃত অক্ষাংশ নির্ভর সাধারণ আস্তুর্লাবে স্থান পরিবর্তনে ভিন্ন অক্ষাংশের থালা ব্যবহার জরুরী হয়ে পড়ে।

বৈশ্বিক আস্তুর্লাবের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে: এটার *Stereographic projection* (সমতল পৃষ্ঠে গোলকের অভিক্ষেপণ) বাসন্তী কিংবা শারদীয় বিষুবকে অয়নতলে অভিক্ষেপণের কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করে।

বার্সেলোনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. জুলিও সামসো বিবিসি প্রামাণ্যচিত্র *An Islamic History of Europe*-এ রাগেহ উমরের সাথে আলোচনাকালে বলেন যে, মুসলিমগণ নতুন ধরনের বিভিন্ন গণনা যন্ত্র ব্যবহার করতো এবং "তাদের নকশাকৃত বৈশ্বিক আস্তুর্লাবের এমনকিছু প্রয়োগ ছিল, যা সাধারণ আস্তুর্লাব দিয়ে সম্পন্ন করা অসম্ভব ছিল।"

আস্তুর্লাব নিয়ে যেকোন আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে, যদি তাতে তরুণ নারী প্রকৌশলী এবং জ্যোতির্বিদ মারইয়াম আল-ই'জলিয়া আল-আস্তুর্লাবীর উল্লেখ না থাকে। ৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে সিরিয়ার আলেপ্পোতে জন্ম নেয়া এ মহিয়সী নারী জ্যোতির্বিদ ও যন্ত্র নির্মাতাদের পরিবারেই বেড়ে উঠেন। আস্তুর্লাব নির্মাণে অত্যন্ত পারদর্শী মারইয়াম শাসক সাইফুদৌলার পৃষ্ঠপোষকতায় বিখ্যাত আলেপ্পো দুর্গে কর্মরত ছিলেন। ৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে বেশ অল্প বয়সে মৃত্যুবরণ করেন এই নারী প্রতিভা।

আস্তুর্লাব বিশেষভাবে বৈশ্বিক আস্তুর্লাবের বিকাশ ও বহুল ব্যবহার ছিল তৎকালের সর্বাধুনিক প্রযুক্তির অন্যতম নিদর্শন, যা আসমান নিয়ে বিমোহিত এবং সেটার রহস্য উন্মোচনে নিদারুণ আগ্রহী মুসলিম জ্যোতির্বিদদের সৃজনশীলতা ও উদ্যমের ফসল। নিদারুণ পরিশ্রমী এসব জ্যোতির্বিদের কল্যাণেই আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের আঁতুড়ঘর ইউরোপে আস্তুর্লাবের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল।

"আস্তুর্লাব বিষয়ক প্রবন্ধ"

Canterbury Tales-এর রচয়িতা চসার তার ১০ বছরের পুত্র লুইসের জন্য ১৩৮৭ খ্রিস্টাব্দে আস্তুর্লাব নিয়ে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তিনি যা বলেছেন, তার খানিকটা এখানে তুলে ধরা হলো:

"ছোট্ট লুইস, পুত্র আমার, আমি তোমার উদ্বিগ্নতা এবং আস্তুর্লাব সম্পর্কে জানার বিশেষ অনুরোধ আমলে নিয়েছি ... আর তাই আমি তোমাকে আমাদের দিগন্তের জন্য কার্যকর একটি আস্তুর্লাব দিচ্ছি, যা অক্সফোর্ডের অক্ষাংশের জন্য বানানো। এই ছোট প্রবন্ধে আমি তোমাকে এ জাতীয় যন্ত্রের কিছু সিদ্ধান্ত শিক্ষা দেবো। আমি কিছু সিদ্ধান্তের কথা বলছি – তিনটি কারণে। প্রথমটি হচ্ছে: বিস্ময়কর এই যন্ত্র আস্তুর্লাব নিয়ে এ পর্যন্ত যত সিদ্ধান্ত পাওয়া গেছে বা পাওয়া যাবে, তার কিছুই এই অঞ্চলের লোকেরা পূর্ণাঙ্গভাবে জানে না, যেমনটি আমি মনে করি।"

জেফারি চসার

মুহম্মদ যাকরিয়া কর্তৃক নির্মিত আস্তার্লাবের দুটো নিকটদৃশ্য
এটার জটিল নির্মাণশৈলী তুলে ধরেছে।

আস্তুর্লাব

জাদুর কলকব্জা

সময় ও মহাকাশকে হাতের তালুতে এনে দেয়া বিস্ময় জাগানিয়া এক যন্ত্র

উল্লেখযোগ্য পরম্পরা: ১৭শ শতাব্দিতে সেক্সট্যান্টের আবিষ্কারের আগ পর্যন্ত আস্তুর্লাব ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক ডিভাইস (যন্ত্র)

অবস্থান: বাগদাদ, ইরাক
তারিখ: ১৩শ শতাব্দির শেষার্ধ
নির্মাতা: ইবনে শাওখা আল-বাগদাদী

আলো জ্বলজ্বল পিতলে তৈরি এবং তাতে তারকার নাম খোদাই করে বসানো আস্তুর্লাব দেখলেই মনে হতো এটা কোনো জাদুকরের জাদুর চাকতি। বস্তুত এটা একভাবে জাদুর চাকতির মতোই। ঘড়ি ও হাতঘড়ির ব্যাপক প্রচলনের বহু পূর্বেই মুসলিম প্রকৌশলী ও জ্যোতির্বিদগণ আস্তুর্লাব নির্মাণ করেছিলেন, যার সুবাদে সময় ও মহাকাশ একত্র হয়েছিল হাতের তালুতে রাখা যায় এমন যন্ত্রে।

আলেকজান্দ্রিয়ার থিওন খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দিতে আস্তুর্লাব নিয়ে লিখেছিলেন এবং এ বিষয়ে প্রাচীন গ্রিকদের লেখাও রয়েছে। দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের সময়সূচি নির্ধারণ এবং মক্কার অবস্থান নির্ণয়ের মতো অপরিহার্য প্রয়োজন মেটানোর তাকিদ মুসলিম সভ্যতাকে আরও কার্যক্ষম ও অত্যাধুনিক যন্ত্র নির্মাণে বাধ্য করেছিল। মুসলিম বিশ্বে এ পর্যন্ত টিকে থাকা আস্তুর্লাবের সময়কাল ১০ম শতাব্দি এবং তা নির্মাণস্থল বাগদাদ।

দিন ও রাতের সময় বলে দেয়া, জমিনে চলতে সহায়তার পাশাপাশি সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় নিরূপণে আস্তুর্লাবের জুড়ি মেলা ভার।

গুরুত্বপূর্ণ তারকাগুলোকে ধাতব থালায় বিদ্ধ করে বসানো, এরপর যেকোন তারকা বা সূর্যের কোণ নির্ণায়ক দৃষ্টিসহায়ক যন্ত্র অন্তর্ভুক্ত এবং নির্ভুল জ্যোতিষশাস্ত্রীয় হিসাবের জন্য তথ্য ছক থাকা – সবকিছু মিলিয়ে আস্তুর্লাব ছিল কম্পিউটারের শতাব্দিকাল পূর্বের অত্যাধুনিক গণনা যন্ত্র। ১০ম শতাব্দির জ্যোতির্বিদ আস-সূফীর মতে, জ্যোতির্বিদ্যা, নৌচালন এবং জরিপ কাজসহ হাজারো কাজ আস্তুর্লাব দিয়ে করা সম্ভব।

আস্তুর্লাবের আগের সংস্করণ তথা সাধারণ আস্তুর্লাবে পৃথিবীর নির্দিষ্ট স্থানের অক্ষাংশ জানা আবশ্যক, কিন্তু ১১শ শতাব্দির পণ্ডিত আয-যারকালী এ সমস্যা সমাধানে উদ্ভাবন করেছিলেন বৈশ্বিক আস্তুর্লাবের। আরবী 'সাফিহা' (থালা) থেকে এটা পরিচিত হয়ে উঠে *saphea arzachelis* হিসেবে এবং এটা পৃথিবীর যেকোন স্থান থেকেই কার্যক্ষম ছিল।

বৈশ্বিক আস্তুর্লাব ১৭শ শতাব্দিতে সেক্সট্যান্ট উদ্ভাবনের আগ পর্যন্ত নৌচালনার জন্য অপরিহার্য একটি উপকরণ ছিল। যান্ত্রিক ঘড়ি এবং জটিল গাণিতিক কৌশল আস্তুর্লাবের জায়গা দখল করে নিলেও জ্যোতির্বিদদের জন্য সাধারণ আস্তুর্লাব আজও বানানো হয়।

ইবনে শাওখা আল-বাগদাদী ১৩শ শতাব্দিতে এই আস্তুর্লাব নির্মাণ করেছিলেন। প্রতিটি আস্তুর্লাবে অদলবদলযোগ্য একাধিক থালা থাকে। থালাগুলো মাঝে অবস্থান করে, যা মাতির নামে পরিচিত। ভিন্ন ভিন্ন থালা ভিন্ন ভিন্ন ভৌগোলিক অবস্থানের সাথে সম্পৃক্ত।

আস্তর্লাবে খোদাই করা তথ্য-ছক আপনাকে বিভিন্ন ধরনের হিসাব-নিকাশে সহায়তা করে। উদাহরণস্বরূপ, রাত্রিকালীন সময় বের করতে আপনাকে যেকোন একটি তারকা বরাবর আস্তর্লাবের পিঠে একটি রেখা টানতে হবে এবং এতে করে দিগন্তরেখার উপরে সে তারকার কৌণিক দূরত্ব বের হবে। এরপর রিতিকে ঘোরাতে থাকবেন যতক্ষণ না তারকা নির্দেশক-টি সঠিক কৌণিক দূরত্ব রেখা বরবার থালায় বসছে। এবার আপনি সময় জেনে নিতে পারেন।

বায়ে, উপরে এবং ডানেঃ প্রতিটি থালায় খোদাই করা রেখাগুলো মাথার উপরে থাকা আকাশ গোলকের অভিক্ষেপণ। প্রতিটি থালাতে খুব সীমিত অক্ষাংশ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে (পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ অবস্থান)।

কেন্দ্রেঃ কয়েকটি থালাকে ধারণ করতে সক্ষম আস্তর্লাবের ফাঁপা চাকতি, যা মাতির নামে পরিচিত।

নিচেঃ রিতিতে রয়েছে – আকাশ জুড়ে সূর্যের গমনপথ নির্ণায়ক চক্র এবং উজ্জ্বল নক্ষত্র নির্দেশক। ছোরা বা খঞ্জর আকৃতির নির্দেশক ছিল প্রথম দিককার ইসলামী আস্তর্লাবের বৈশিষ্ট্য।

০৫ আর্মিলারি গোলক

মহাকাশীয় বস্তুসমূহের আবর্তনের পূর্বাভাষ দেয়াকে সহজতর করার লক্ষ্যে বহু উন্নত সভ্যতা আমাদের দেখা আকাশের বিভিন্ন মডেল প্রস্তুতের চেষ্টা চালিয়েছে। কেন্দ্রে পৃথিবী এবং তারকারাজি এটাকে ঘিরে সাজিয়েছে বৃত্তাকার পরিমণ্ডল – এই ধারণার ভিত্তিতে এসব মডেল বানানো হতো। তেমনি একটি মডেল: আর্মিলারি গোলক।

আকাশ এবং গ্রহমণ্ডলীর আবর্তনের প্রতিরূপ আর্মিলারি গোলককে প্রদর্শন করে মুসলিম জ্যোতির্বিদগণ মহাবিশ্ব কীভাবে কাজ করে, তার ত্রিমাত্রিক প্রতিরূপ সৃষ্টিতে প্রয়াস পেয়েছিলেন এবং তাদের এ প্রচেষ্টা আমাদের বর্তমান মডেলের বেশ নিকটতর ছিল। এগুলো কোনো কঠিন ভূ-গোলক ছিল না, বরং এককেন্দ্রিক বৃত্ত ছিল, যেখানে পৃথিবী কেন্দ্রে এবং বাদবাকি মহাকাশীয় বস্তুগুলো ছিল পৃথিবীকে ঘিরে।

আর্মিলারি গোলকের নির্মাণ এবং ব্যবহার ৮ম শতাব্দি থেকে বিস্তৃতি লাভ করে, যখন আল-ফারাজী কর্তৃক বাগদাদে এ নিয়ে প্রথম রচিত হয়: *"আল-আমালু বিল-আস্তুর্লাবাত যাতিল হালকি"* (গোলীয় অবয়ব সম্বলিত যন্ত্র) শীর্ষক প্রবন্ধ। কিন্তু ১০ম শতাব্দিতে এগুলো সমৃদ্ধির উচ্চতম পর্যায়ে পৌঁছে এবং তখন থেকে এগুলো দুটো প্রধান মডেলে প্রস্তুত হতে থাকে।

প্রথম ধরনের প্রদর্শনী আর্মিলারি গোলকগুলোতে পৃথিবী ছিল প্রধান এবং বেশ ছোট মডেলের এই ভূ-গোলককে ঘিরে থাকতো গ্রহণরেখা চক্র [পৃথিবীর চারপাশে সূর্যের পরিভ্রমণ পথ], বিষুবরেখা, ক্রান্তিরেখা ও মেরুবৃত্ত। একটি ক্রমবিভক্ত মাধ্যাহ্নিক চক্রে এগুলো স্থাপন করা হতো এবং বিষুবরেখা সংলগ্ন অক্ষ বরাবর গোলকটি ঘুরতো। এসব মডেলে চাঁদ, গ্রহ ও তারকারাজি অন্তর্ভূত না থাকলেও এরা পৃথিবীর চারপাশে থাকা মহাকাশীয় বস্তুসমূহের আপেক্ষিক গতি প্রদর্শন করতো।
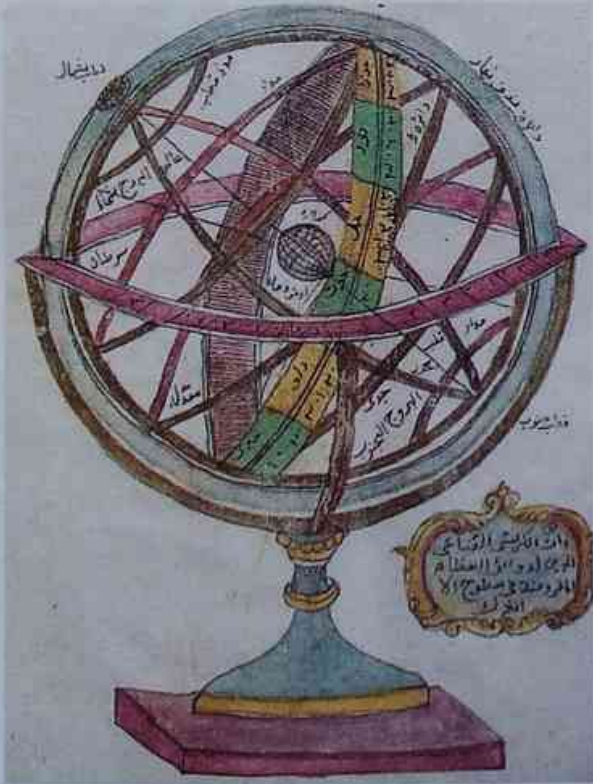
১৭৩২ খ্রিস্টাব্দে ইস্তাম্বুলে পুনর্মুদ্রিত "জিহাননুমা" (বৈশ্বিক ভূগোল) গ্রন্থ থেকে নেয়া একটি খোদাইকর্মে চিত্রিত আর্মিলারি গোলক। মূল "জিহাননুমা" গ্রন্থটি ১৭শ শতাব্দির পণ্ডিত কাতিব চেলেবী (হাজী খলীফা) কর্তৃক রচিত।

দ্বিতীয় ধরনের পর্যবেক্ষণধর্মী আর্মিলারি গোলক বেশ ভিন্নধর্মী ছিল, যেহেতু পৃথিবীকে কেন্দ্রে না রেখে দৃষ্টিসহায়ক যন্ত্র সেখানে রাখা হয়েছিল। এই গোলকগুলো বেশ বড় ছিল এবং স্থানাংকসহ অন্যান্য মান বের করতে এগুলো ব্যবহৃত হতো।

পর্যবেক্ষণধর্মী আর্মিলারি গোলক নিয়ে বহু মুসলিম জ্যোতির্বিজ্ঞানী কলম ধরেছিলেন, যাদের মাঝে সেভিলের জাবির ইবনে আফলাহ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১২শ শতাব্দির মধ্যভাগের এই মনীষী পশ্চিমে *জিবার* নামে পরিচিত ছিলেন (রসায়বিদ *জিবারের* সাথে গুলিয়ে ফেলা যাবে না)।

আকাশ ও পৃথিবী অধ্যয়নে বিভিন্ন মানমন্দিরে আর্মিলারি গোলক ব্যবহৃত হতো, এদের মাঝে ১৩শ শতাব্দির মারাগা মানমন্দির, ১৫শ শতাব্দির সমরকন্দ মানমন্দির এবং ১৬শ শতাব্দির ইস্তাম্বুল মানমন্দিরের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।
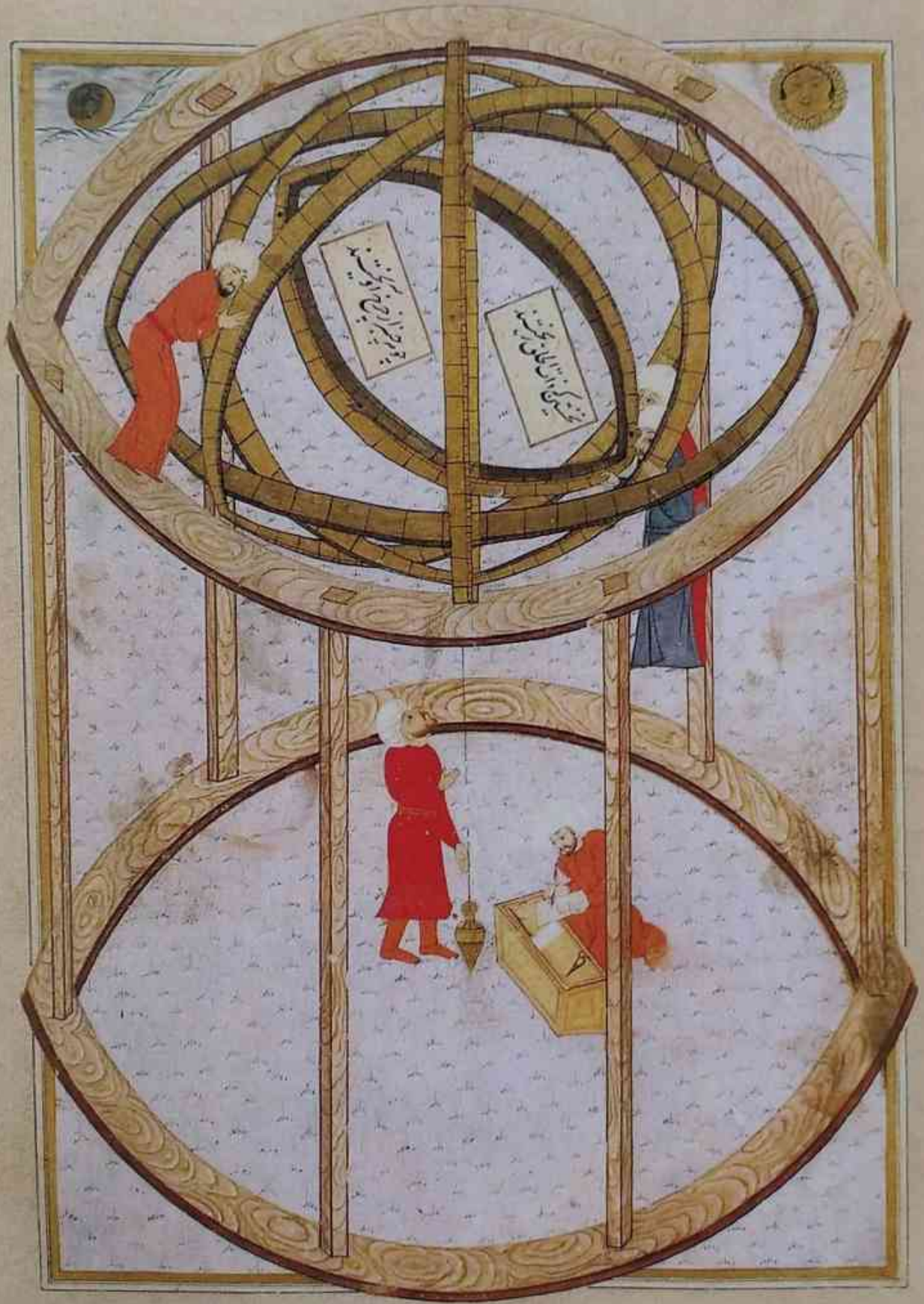
১৬শ শতাব্দির পাণ্ডুলিপিতে দেখা যাচ্ছে, আসমানের সমতল ছক তৈরির জন্য জ্যোতির্বিদগণ নির্দিষ্ট তারকার সাথে আর্মিলারি গোলকের বিভিন্ন অংশ সারিবদ্ধ করে সাজাচ্ছেন। তারকা ব্যবহার করে পথ চলতে এগুলো বেশ সহায়ক। কেন্দ্রীয় দোলক বা পেন্ডুলাম দিয়ে সমতল পৃষ্ঠে তারকা ও গ্রহসমূহের বক্র পথ আঁকা হতো।

০৬ জ্ঞানীদের জন্য নিদর্শন

বেশ অনুপ্রেরণামূলক ভঙ্গিতে কুরআন বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনার উল্লেখ করেছে এবং মানবজাতি যেন মেধার প্রয়োগ ঘটিয়ে এসব প্রাকৃতিক ঘটনার গভীরে প্রবেশ করে, সেদিকে আহ্বান জানিয়েছে।

উদাহরণস্বরূপ,

২:১৬৪ – "এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, আসমান ও জমিন সৃষ্টিতে, দিন ও রাতের পরিবর্তনে, মানুষের জন্য উপকারী সামগ্রী বয়ে আনা সমুদ্রে চলা জাহাজে, ওই পানিতে – যা আল্লাহ আসমান থেকে বর্ষণ করেন, আর তা দিয়ে মৃত জমিনকে তিনি আবার নয়া জীবন দেন এবং তাতে ছড়িয়ে দেন সব ধরনের জীবজন্তু; বাতাসের প্রবাহে, আসমান ও জমিনের মধ্যস্থ হুকুমের অনুগত মেঘে – বস্তুত আক্ল বা চিন্তার মাধ্যমে কাজ করা লোকদের জন্য এসবে রয়েছে বহু নিদর্শন।"

কুরআনে জ্যোতির্মণ্ডলীয় ঘটনাসমূহ বারবার উদ্ধৃত করা হয়েছে এবং সময় গণনা ও নৌচালন প্রসঙ্গে এই ঘটনাগুলো জুড়ে দেয়া হয়েছে। কুরআন নিখুঁত অক্ষ ও গতিপথ নিয়ে কথা বলেছে এবং এসব প্রাকৃতিক ঘটনার পিছনে থাকা সুবিন্যস্ত ব্যবস্থা প্রতি মনোযোগ আকর্ষণের পাশাপাশি এসব নিয়ে চিন্তা করতে মানুষদের উৎসাহিত করেছে। এখানে কিছু নমুনা তুলে ধরা হলো:

৬:৯৭ – "তিনিই সে জন, যিনি তোমাদের জন্য তারকা বানিয়েছেন, যেন তোমরা স্থল ও সমুদ্রের অন্ধকারে পথ চলতে পারো। যারা জানতে চায়, আমরা তাদের জন্য আমাদের নিদর্শন খুলে খুলে বর্ণনা করি।"

১৬:১২ – "রাত ও দিন, সূর্য ও চাঁদকে তিনিই তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন এবং তাঁরই আদেশে তারকারাজি তোমাদের সেবায় নিয়োজিত। নিশ্চিতভবে, আকল বা চিন্তার মাধ্যমে কাজ করা লোকদের জন্য এতে নিদর্শন রয়েছে।"

২১:৩৩ – "হাকিকত হচ্ছে: তিনিই সে জন, যিনি রাত ও দিন, সূর্য ও চন্দ্র সৃষ্টি করেছেন; এদের সকলে (নিজ নিজ) কক্ষপথে ঘূর্ণনরত।"

৫৫:৫ – "(তোমরা নিদর্শন চাচ্ছো, তাহলে দেখো) সূর্য ও চাঁদ এক সুনির্দিষ্ট হিসেব মোতাবেক আবর্তন রত।"

বস্তুত, উপরে উদ্ধৃত আয়াতের ন্যায় অন্যান্য আয়াত মানুষদের উদ্দেশ্যে এক বুদ্ধিবৃত্তিক চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেয়, যেন তারা আল্লাহর বিস্ময়কর নিদর্শনে সমৃদ্ধ মহাবিশ্ব অনুসন্ধানের প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করে।

শুধু এটাই নয়, বরং একটি আয়াতে তো *আল্লাহ সুবাহানাহু ওয়া তাআ'লা* মানবজাতিকে পৃথিবীর গণ্ডি পাড়ি দিয়ে মহাশূন্যে অনুসন্ধান চালাতে উৎসাহিত করেছেন, তবে সাথে সাথে এই সতর্কবাতা পেশ করেছেন যে, উপযুক্ত শক্তি ও নিয়ন্ত্রণ হাসিল হলেই এটা সম্ভব হবে।

৫৫:৩৩ – "হে জিন ও মানব সম্প্রদায়, জমিন ও আসমানের সীমা অতিক্রম করে বেরিয়ে যেতে চাও, তবে বেরিয়ে যাও; তবে পরোয়ানা তথা শক্তি ছাড়া বের হতে পারবে না।"
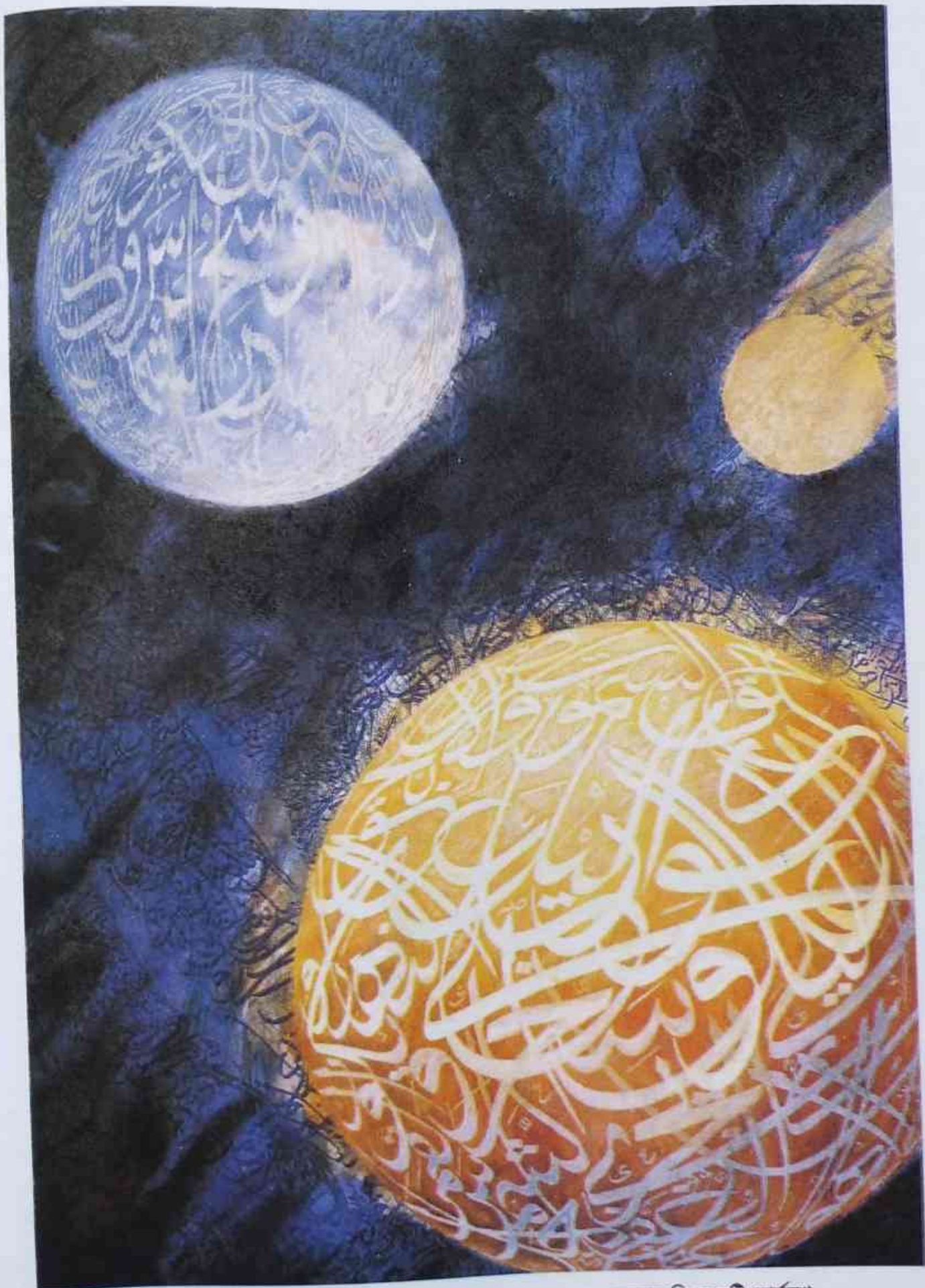
কুরআনের আয়াতে জ্যোতির্মণ্ডলীয় ঘটনার পিছনে থাকা সুসংহত ব্যবস্থার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। ড. আহমাদ মুস্তফা অঙ্কিত "দিন ও রাতের কুণ্ডলী"।

০৭ চাঁদ

১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দের ২০ জুলাই – এপোলো ১১ চাঁদের বুকে পা রাখে এবং নেইল আর্মস্ট্রং পরিণত হন চাঁদে পা রাখা প্রথম ব্যক্তিতে। কিন্তু চাঁদের বুকে তার প্রথম পা রাখা এবং বিখ্যাত উক্তি উচ্চারণের বহু পূর্বেই প্রতিভাধর মুসলিম পণ্ডিতদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ পৃথিবীর নিকটতম এই জ্যোতির্মণ্ডলীয় প্রতিবেশী নিয়ে বিস্তর গবেষণায় জড়িত ছিলেন।

মুসলিমদের জন্য চাঁদ অত্যধিক তাৎপর্যপূর্ণ, যেহেতু হিজরী বর্ষপঞ্জি চাঁদের আবর্তন চক্র দ্বারা নির্ধারিত। এক্ষেত্রে সমস্যা হচ্ছে: একটি চন্দ্রমাস প্রায় ২৯.৫ দিনের সমান, যা ৩৬৫ দিনের সৌর বছরের সাথে সামঞ্জস্যশীল নয়; ১২-টি চন্দ্রমাস মিলে কেবল ৩৫৪ দিন গঠন করে।

খ্রিস্টান ও ইহুদিরাও একই সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিল, কিন্তু এথেন্সের জ্যোতির্বিদ মেটন কর্তৃক খ্রিস্টপূর্ব ৪৩০ -এ আবিষ্কৃত একটি পদ্ধতির প্রয়োগ ঘটিয়ে তারা এটার একটা সুরাহা করেছিল। তিনি ১৯ বছরের একটি মেটনীয় চক্র উদ্ভাবন করেছিলেন। এটা ১২ চন্দ্রমাসের ১২ বছর এবং ১৩ চন্দ্রমাসের ৭ বছর দিয়ে গঠিত ছিল। ঋতুর সাথে সামঞ্জস্য বজায় রাখতে বর্ষপঞ্জিতে পর্যায়ক্রমে ১৩-তম মাস যুক্ত করা হতো।

মুসলিমরাও এ চক্রের অনুসরণ করতো, কিন্তু বিবেকবর্জিত (ইসলাম পূর্ব) কিছু শাসক নিজেদের সুবিধা মতো এতে ১৩-তম মাসের সংযোগ ঘটিয়ে বিষয়টি জটিল বানায়। তাই ৬৩৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১০ বছর শাসনকার্য চালানো ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা উমর ইবনে খাত্তাব হিজরী বর্ষপঞ্জির সূচনা ঘটান, যা ইসলামী দেশগুলোতে আজও ব্যবহৃত হচ্ছে।

এই বর্ষপঞ্জি কঠোরভাবে চাঁদের আবর্তন চক্র মেনে চলে। সৌর বছর থেকে চন্দ্র বছর ১১ দিন কম; তাই রমযানের মতো পবিত্র মাস সারা ঋতু জুড়েই দুনিয়ার সর্বত্র আবর্তিত হয়। তাই প্রতিটি রমযান আগের রমযানের চেয়ে ১১ দিন আগে শুরু হয় এবং প্রতি ৩৩ সৌর বছরে রমযান মাস আবার ঠিক একই তারিখে ফিরে যায়।

নবচন্দ্র দর্শনের মাধ্যমে রমযান এবং অন্যান্য ইসলামী মাস শুরু হয়, তাই রমযান ঠিক কবে নাগাদ আরম্ভ হবে, রাতের আকাশে নবচন্দ্রের আগমনের আগ পর্যন্ত তা কেউই নিশ্চিতভাবে অবগত থাকে না।

ঠিক কখন নবচন্দ্র দৃশ্যমান হবে, তা আগাম বলে দেয়াটা মুসলিম গণিতজ্ঞ জ্যোতির্বিদদের সামনে বিশেষ চ্যালেঞ্জ হিসেবে উপস্থিত হয়েছিল। নতুন চাঁদ উদয়ের পর থেকে চাঁদের চলাচল নিয়ে টলেমির তত্ত্ব বেশ নির্ভুল হলেও এই পর্যবেক্ষণ কেবল গ্রহণের অংশ হিসেবে চন্দ্রপথ বা চাঁদের সাপেক্ষে সূর্যের গমনপথের উপর নিবদ্ধ ছিল।

মুসলিমরা উপলব্ধি করতে সমর্থ হয়ে যে, নবচন্দ্র দর্শনের আগাম সংবাদ দিতে গেলে, দিগন্তের সাপেক্ষে চাঁদের চলাচল নিয়ে গবেষণা আবশ্যক। এ সমস্যা সমাধানে বেশ জটিল প্রকৃতির গোলীয় জ্যামিতির প্রয়োজনীয়তা তখন ভীষণভাবে অনুভূত হচ্ছিল।

চাঁদের বিভিন্ন দশা মুসলিম বর্ষপঞ্জি বা হিজরী বর্ষপঞ্জি গঠনে ব্যবহৃত হয়।

বাগদাদে কর্মরত আল-কিন্দী ছিলেন প্রথম ব্যক্তি, যার হাতে গোলীয় জ্যামিতির বিকাশ ঘটেছিল এবং তিনি তার জ্যোতিষশাস্ত্রীয় কাজে এগুলোর প্রয়োগ ঘটিয়েছিলেন।

দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাতে কিবলা নির্ধারণ এবং কোন দিকে মসজিদের মুখ থাকবে, তা নির্ণয়েও গোলীয় জ্যামিতির অপরিসীম প্রয়োজনীয়তা ছিল এবং পৃথিবীর যেকোন প্রান্ত থেকে সঠিকভাবে কিবলা ঠিক করার সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসেন যুগের অতুলনীয় প্রতিভা আল-বিরুনী। বলতে গেলে আল-বিরুনী যেন আক্ষরিকভাবে সবকিছুতেই আগ্রহী ছিলেন এবং কখনো কখনো তাকে আখ্যায়িত করা হয়ঃ তার যুগের লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি হিসেবে। বর্তমান উজবেকিস্তানের 'কাছ' নগরে অবস্থানকালে

আল-কাযবিনীর লেখা "আজায়িব আল-মাখলুকাত" (বিস্ময়কর সৃষ্টিকুল) শীর্ষক গ্রন্থের ১৬শ শতাব্দির শুরুর দিকের ফারসি অনুবাদ থেকে নেয়া একটি ডায়াগ্রাম।

তিনি ২৪শে মে, ৯৯৭ খ্রিস্টাব্দে ঘটা চন্দ্রগ্রহণ প্রত্যক্ষ করেছিলেন। বাগদাদেও এটা দেখা গিয়েছিল এবং এ বিষয়ে তিনি তার সহকর্মী জ্যোতির্বিদ আবুল ওফা আল-বুযানীর সাথে তথ্যের আদান-প্রদান করেন। চন্দ্রগ্রহণ সংঘটনের সময় হিসেবে করে তারা দুটো শহরের দ্রাঘিমারেখার পার্থক্য নিরূপণে সমর্থ হয়েছিলেন।

চাঁদ পর্যবেক্ষণ ও প্রাপ্ত তথ্যাদি লিখে রাখাটা বেশ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল। এখনকার ন্যায় তখনও চাঁদ ছিল আকর্ষণ ও মন্ত্রমুগ্ধ হওয়ার অন্যতম উৎস। চাঁদের এ দশা এটা প্রতিষ্ঠিত করে যে, আসমানেও সুবিন্যস্ত একটি ব্যবস্থা বিদ্যমান। এসব পর্যবেক্ষণ হিজরী বর্ষপঞ্জির কাঠামো নির্ধারণে ব্যবহৃত হয়ে আসছে ১৪০০ বছরেরও বেশি সময় যাবৎ।

চাঁদের তারতম্য

কায়রোর এক মুসলিম জ্যোতির্বিদ ৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে বাগদাদে চাঁদের গতির তৃতীয় অসমতা বা চাঁদের তারতম্য নামে বিষয়টি আবিষ্কার করেন। টলেমি প্রথম ও দ্বিতীয় অসমতা সম্পর্কে অবগত ছিলেন। চাঁদের গতির এই তৃতীয় তারতম্যের আবিষ্কারক হলেনঃ আবুল ওফা আল-বুযানী।

নতুন চাঁদের উদয়কাল বা পূর্ণিমার সময় চাঁদ দ্রুত চলে এবং চন্দ্রমাসের প্রথম ও তৃতীয়-চতুর্থাংশে ধীর গতিতে চলে – চাঁদের গতির এই তৃতীয় তারতম্য হয় শতাব্দি পরে ইউরোপে ট্যাকো ব্রাহে কর্তৃক ১৫৮০ খ্রিস্টাব্দে পুনরাবিষ্কৃত হয়।

০৮ চাঁদের কলঙ্ক

খালি চোখে চাঁদের দিকে তাকালে আমরা এটাকে কালো ও হালকা দাগসহ অসম উজ্জ্বলভাবে উপস্থিত হতে দেখি। চাঁদের এই বৈশিষ্ট্য চাঁদের কলঙ্ক বা দাগ (*lunar formations*) নামে পরিচিত।

১৬৫১ খ্রিস্টাব্দে ইয়োহান ব্যাপটিস্টা রিকিউলি নামের এক ইতালীয় জ্যোতিষ ও দর্শনশাস্ত্রীয় অধ্যাপক চাঁদের পূর্ণাঙ্গ মানচিত্র সম্বলিত *Almagestum Novum* নামে একটি জ্যোতিষশাস্ত্রীয় গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। ওই গ্রন্থে তিনি মধ্যযুগের প্রখ্যাত জ্যোতির্বিদদের নামে চাঁদের কলঙ্কের নাম রেখেছিলেন, যেখানে দশজন মুসলিম জ্যোতির্বিদ ও গণিতজ্ঞের নাম ছিল।

১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে আন্তর্জাতিক জ্যোতিষশাস্ত্রীয় সংঘ (*International Astronomical Union*) কর্তৃক আয়োজিত মতবিনিময় সভায় এ নামগুলোর ব্যাপারে ঐক্যমতে পৌঁছানো হয়। ৬৭২-টি চাঁদের কলঙ্কের ১৩-টির নামকরণ করা হয় মুসলিম জ্যোতির্বিদদের নামে এবং এরপর থেকে আরও বহু নাম এতে সংযুক্ত হয়েছে। এসব নামের মধ্যে উল্লেখযোগ্য:

- **Messala** – চাঁদের ১৩-তম বিভাগের সমভূমি, যা ৮১৫ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণকারী মাশাআল্লাহের নামে নামকৃত। মিশরীয় এই ইহুদি ব্যক্তি আব্বাসী খলীফা আল-মানসূরের আমলে ইসলামে দীক্ষিত হয়েছিলেন। ১৬শ শতাব্দিতে *De Scientia Matus Orbis* এবং *De compositione et utilitate astrolabii* শিরোনামে তার দুটো গ্রন্থ লাতিন ভাষায় অনূদিত হয়।

- **Almanon** – চাঁদের নবম বিভাগের একটি আগ্নেয় জ্বালামুখ, *আলিফ লায়লা* (আরব্য রজনী) খ্যাত খলীফা হারুন উর-রশিদের পুত্র আল-মামুনের নামে এটার নাম রাখা হয়। ৮২৯ খ্রিস্টাব্দে বাগদাদে তিনি প্রথম মানমন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তার বায়তুল হিকমা মুখরিত ছিল তার যুগের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী ও দার্শনিকদের পদচারণায়।

- **Alfraganus** – চাঁদের দ্বিতীয় বিভাগে অবস্থিত আগ্নেয় জ্বালামুখ, ৮৬১ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণকারী আল-ফারগানীর নামে এটা নামকৃত। আল-মামুনের জ্যোতিষশাস্ত্রীয় গবেষণা দলের একজন তিনি। "*জাওয়ামি ইলম আন-নুজুম ওয়াল হারাকাতিস সামাইয়্যা*" (সৌরগতি এবং নক্ষত্রবিজ্ঞানের বিশ্বকোষ) তার বিখ্যাত গ্রন্থ, যা ইতালীয় কবি দান্তের উপর সরাসরি প্রভাব রেখেছিল।

- **Albategnius** – চাঁদের প্রথম বিভাগের সমভূমি, যা ৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণকারী আল-বাত্তানীর নামে নামকৃত। জ্যোতিষশাস্ত্রীয় বহু পরিমাপ তিনি অত্যন্ত নির্ভুলভাবে সম্পন্ন করেছিলেন।

- **Thabit** – চাঁদের অষ্টম বিভাগের বড় একটি সমভূমি, ৯০১ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণকারী ছাবিত ইবনে কুররার নামে এটার নাম রাখা হয়। গ্রিক ও সিরীয় ভাষার রচিত বিজ্ঞান বিষয়ক বহু রচনার আরবী অনুবাদক এই ছাবিত। বিশুদ্ধ গণিতে তার বড় ধরনের অবদান ছিল।

- **Azophi** – চাঁদের নবম বিভাগের পর্বত-সদৃশ্য বৃত্ত, যা ১০ম শতাব্দির আব্দুর রহমান আস-সূফীর নামে নামকৃত। মধ্যযুগের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় ব্যবহারিক জ্যোতির্বিদ। তার লেখা "*সুয়ারুল কাওয়াকিব আছ-ছামানিয়া ওয়াল আলবায়ি'ন*" (স্থির তারকা) শীর্ষক গ্রন্থটি নাক্ষত্রিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠকীর্তি।

- **Alhazen** – চাঁদের দ্বাদশ বিভাগের বৃত্তাকার সমভূমি, যা আবু আলী আল-হাসান ইবনুল হাইছামের নামে নামকৃত, – ইবনুল হাইছাম হিসেবেই তিনি সমধিক পরিচিত। ৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে বসরায় জন্ম নেয়া এ মনীষীর কর্ম জীবনের অধিকাংশ সময় মিশরেই কাটে এবং ১০৩৯ খ্রিস্টাব্দে এখানেই তার জীবনাবসান ঘটে। তার একশ'র অধিক গ্রন্থের মাঝে আজ কেবল ৫৫-টি টিকে আছে, যার সবগুলোই গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান ও আলোকবিজ্ঞান নিয়ে লেখা। তিনি ছিলেন আলোকবিজ্ঞানের প্রধান অনুসন্ধানী পথিকৃৎ এবং তার লেখা "*কিতাব আল-মানাযির*" ইউরোপীয় বিজ্ঞানের উপর অপরিসীম প্রভাব রেখেছিল।

■ **Arzachel** – চাঁদের অষ্টম বিভাগের সমভূমি, যা ১১০০ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণকারী আয-যারকালীর নামে নামকৃত। আন্দালুসে তিনি মুসলিম ও ইহুদি জ্যোতির্বিদদের সাথে মিলে প্রস্তুত করেছিলেন বিখ্যাত টলেডীয় ছক। তার কাজ খুব সম্ভবত কপার্নিকাসের উপর প্রভাব রেখেছিল।

■ **Geber** – চাঁদের নবম বিভাগের বৃত্তাকার, মসৃণ সমভূমি, যা ১১৪৫ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণকারী জাবির ইবনে আফলাহের নামে নামকৃত। স্পেনীয় এ আরব মহাকাশীয় বস্তুসমূহের স্থানাংক নির্ণয়ে প্রথম বহনযোগ্য মহাকাশীয় গোলক প্রস্তুত করেছিরেন, যা *টরকুয়েটাম* নামে পরিচিত।

■ **Nasireddin** – ৩০ মাইল ব্যাসের আগ্নেয় জ্বালামুখ, যা ১২০১ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণকারী নাসিরউদ্দীন আত-তুসীর নামে নামকৃত। ১২৫৬ থেকে ১২৬৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি পারস্যের ইলখানাত সাম্রাজ্যের শাসক হালাকু খানের একজন মন্ত্রী ছিলেন। হালাকু খান কর্তৃক মারাগাতে প্রতিষ্ঠিত মানমন্দিরের দায়িত্ব তাকে দেয়া হয় এবং সেখানে ইলখানত ছক প্রস্তুতের পাশাপাশি তিনি কিছু স্থির নক্ষত্র নথিভুক্ত করেছিলেন। এগুলো চীন থেকে পশ্চিম ইউরোপ পর্যন্ত কয়েক শতাব্দি যাবৎ ব্যবহৃত হয়।

■ **Alpetragius** – চাঁদের অষ্টম বিভাগের একটি আগ্নেয় জ্বালামুখ, মরক্কোতে জন্ম নেয়া নূরুদ্দীন ইবনে ইসহাক আল-বিতরুযির নামে এটার নাম রাখা হয়। মরক্কোতে জন্ম হলেও সেভিল নিবাসী আল-বিতরুযি ১২০৪ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। টলেমির গ্রহমণ্ডলীয় ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনতে তিনি কঠোর শ্রম দিয়েও ব্যর্থ হয়েছিলেন। জ্যোতিষশাস্ত্র নিয়ে আল-বিতরুযির লেখা "*কিতাবুল হিয়াতু*" লাতিন অনুবাদের মাধ্যমে ১৩শ শতাব্দির ইউরোপে বেশ জনপ্রিয়তা পায়।

■ **Abulfeda** – চাঁদের নবম বিভাগের বৃত্তকার সমভূমি, ১২৭৩ খ্রিস্টাব্দে সিরিয়ায় জন্ম নেয়া আবুল ফিদার নামে নামকৃত। খলীফা আল-মামুনের প্রতিষ্ঠিত ধারায় দীক্ষিত তিনিই ছিলেন সর্বশেষ ভূগোল ও জ্যোতির্বিদ। ইতিহাসবেত্তা হিসেবে যথেষ্ট খ্যাতি কুড়ানো এ মনীষীর সর্বাধিক বিখ্যাত কর্ম: "*তাকয়ীমুল বুলদান*" (দেশসমূহের সমীক্ষা)।

■ **Ulugh Beigh** – ডিম্বাকৃতি বিশিষ্ট চাঁদের ১৮-তম বিভাগের এ অংশের নাম ১৩৯৪ খ্রিস্টাব্দে জন্ম নেয়া উলুগ বেগের নামে রাখা হয়। ১৪২০ খ্রিস্টাব্দে তিনি সমরকন্দে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সুবিশাল মানমন্দির, যা ছিল অত্যন্ত উন্নত ও নির্ভুল জ্যোতিষশাস্ত্রীয় যন্ত্রে সজ্জিত। তারকারাজির নতুন তালিকা প্রণয়ন তার সর্বাধিক প্রশংসনীয় ও চিরস্মরণীয় কাজ।

আজ রাতে যখনই চাঁদের দিকে তাকাবেন, তখন চাঁদের বিভিন্ন আগ্নেয় জ্বালামুখ, ডিম্বাকৃতি অংশ এবং সমভূমিতে যেসব ব্যক্তি অমর হয়ে আছেন, তাদের স্মরণ করবেন। এই ব্যক্তিরাই আমাদের জীবনে উপহার দিয়েছেন জ্ঞান ও আলোর এক বিরাট অংশ।

নিচে: প্রখ্যাত মুসলিম পণ্ডিতদের নামে নামকৃত চাঁদের কলঙ্কের একটি মানচিত্র। পূর্বের পৃষ্ঠার শীর্ষে: চাঁদের পূর্ণাঙ্গ মানচিত্র সম্বলিত Almagestum Novum গ্রন্থটি। বিশেষ খ্রিস্টীয় ধর্মীয় সংঘ জেসুইটের সদস্য ইতালীয় পণ্ডিত ইয়োহান ব্যাপটিস্টা রিকিউলি ১৬৫১ খ্রিস্টাব্দে এটা সংকলন করেছিলেন।

০৯ নক্ষত্রপুঞ্জ

মানমন্দিরের উত্থান এবং রাতের আকাশের প্রতি সীমাহীন আগ্রহের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে ৯ম শতাব্দি থেকে মুসলিম জ্যোতির্বিদদের মনোযোগের প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয় রাতের আকাশ এবং একে একে তারা উপহার দিতে থাকে তারকা ও নক্ষত্রপুঞ্জ নিয়ে নানা টেকসই কর্ম। ১০ম শতাব্দির পারসীয় জ্যোতির্বিদ আব্দুর রহমান আস-সূফী ছিলেন সত্যিকার নক্ষত্র-পর্যবেক্ষক। ৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী অ্যানড্রোমিডা গ্যালাক্সির বিবরণ দিতে গিয়ে এটাকে তিনি 'ছোট মেঘ' বলে আখ্যায়িত করেন।

এটাই ছিল আমাদের নিজস্ব গ্যালাক্সি বহির্ভূত কোনো তারকা ব্যবস্থার প্রথম লিখিত নথি। প্রতিটি নক্ষত্রপুঞ্জ ধরে ধরে তিনি তার ফলাফল লিপিবদ্ধ করতে থাকেন। তারকারাজির বিবরণ, আকার, রঙ এবং প্রতিটি নক্ষত্রপুঞ্জের জন্য তিনি দুটো অঙ্কিত চিত্র প্রদান করতেন, যার একটিঃ মহাকাশীয় গোলকের বহির্ভাগ থেকে এবং অপরটিঃ অভ্যন্তর থেকে। তিনি আস্তর্লাব নিয়েও লিখেছেন এবং এটার হাজারো ব্যবহারের ফিরিস্তি দিয়েছে।

তার এই কঠোর শ্রমের ফলে বহু তারকা ও নক্ষত্রপুঞ্জের বিবরণ সংরক্ষিত হয়, যেগুলো আজও তাদের আরবী নামেই পরিচিত। প্রকৃতপক্ষে, জ্যোতির্বিদগণ প্রায় ১০২২-টি তারকার নাম ও তাদের তুলনামূলক উজ্জ্বলতা নির্ধারণ করেছেন। বর্তমানে ১৬৫-টিরও বেশি তারকার নামে আরবী চিহ্ন স্পষ্টত দৃশ্যমান, যেমনঃ '*Aldebaran*' (الدبران), যার অর্থঃ সুরিয়া তারকার 'অনুগামী' এবং '*Altair*' (نسر طائر) শব্দের অর্থঃ 'উড়ন্ত ঈগল'।

মুসলিমগণ তারকা মানচিত্র এবং জ্যোতিষশাস্ত্রীয় ছকও প্রস্তুত করেছিল, যেগুলো কয়েক শতাব্দি ধরে ইউরোপ ও দূর-প্রাচ্যে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। মহাজগতের মানচিত্র বিভিন্ন শৈল্পিক কাজেও দেখা যেত, যেমনঃ ৮ম শতাব্দিতে নির্মিত জর্ডানের কুসাইর আমরায় অবস্থিত হাম্মামখানা বা স্নানাগারের গম্বুজে বিশাল অর্ধমণ্ডলীয় মহাকাশীয় মানচিত্র আঁকা ছিল। এই দেয়ালচিত্রের টিকে থাকা খণ্ডিত অংশে ৩৭-টি নক্ষত্রপুঞ্জ ও ৪০০-টি তারকা দৃশ্যমান।

উপরেঃ ড্রাগন নক্ষত্রপুঞ্জ বা আরবীতে আত-তানীন। নিচে থেকে বামেঃ সিফিয়াস নক্ষত্রপুঞ্জ (Constellation Cepheus) বা আরবীতে কিফাউ'স। নিচে থেকে ডানেঃ মুস্তাফা ইবনে আবদুল্লাহ কর্তৃক তুর্কি ভাষায় রচিত মহাবিশ্বের বৈশিষ্ট্য বিষয়ক ম্যানুয়েল।
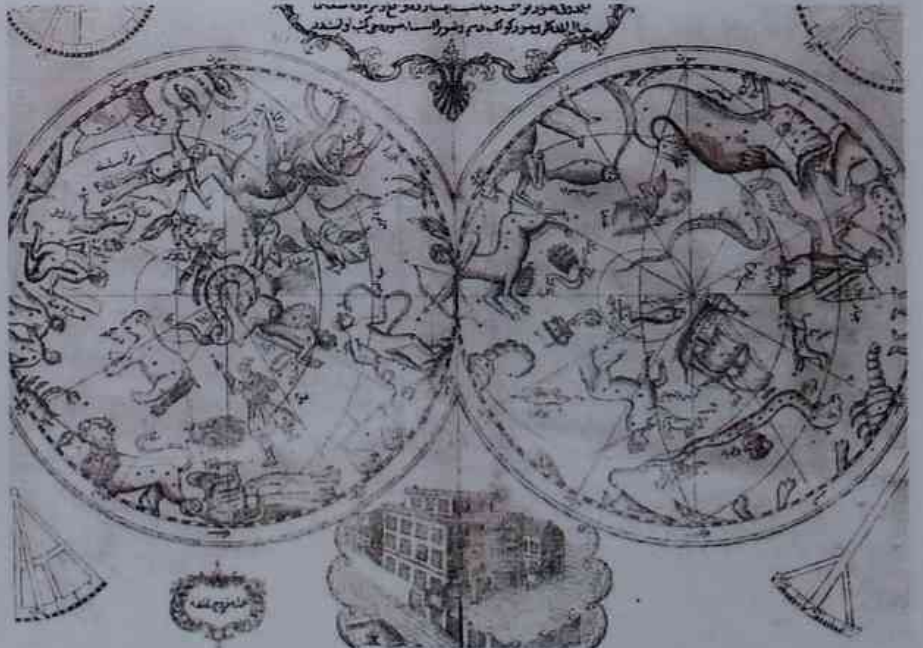
আরবীতে আছ-ছুরিয়া নামে পরিচিত প্লাইয়েডস (*Pleiades*) নক্ষত্রমালা।

১০ উড্ডয়ন

উড্ডয়নের ধারণা হাজার বছর ধরে মানবজাতিকে মোহমুগ্ধ করে রাখার পাশাপাশি তাদের প্রতি পাল্টা চ্যালেঞ্জও ছুড়ে দিয়েছে। ফারাও রাজাদের পাখনায় ভর দিয়ে আকাশে উড়বার বহু চিত্র মিশরীয়রা রেখে গেছে, যা উড়বার প্রতি অসীম বাসনারই বহিঃপ্রকাশ। চীন ও গ্রিকদের যেমন রয়েছে উড্ডয়ন নিয়ে নানা রূপকথা ও কিংবদন্তী, ঠিক তেমনটি আরবদেরও ছিল।

এ ব্যাপারে সবচেয়ে জনপ্রিয় রূপকথাটি ১০০০ খ্রিস্টাব্দের দিকে রচিত আল-ফিরদাউসীর "শাহনামা"-তে বর্ণিত হয়েছে। গল্পটি এরূপ: কায় কাউস নামের এক রাজা দুষ্ট আত্মাদের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে উড়াল সিংহাসনের সহায়তায় স্বর্গ দখল নিতে বেরিয়ে পড়ে। উড়াল এ সিংহাসনের সাথে উপরমুখী চারটি লম্বা দণ্ড বাঁধা ছিল। প্রতিটি দণ্ডের মাথায় মাংস রাখা ছিল এবং নিচে রাক্ষুসে ঈগল শিকল শৃঙ্খলিত ছিল। ঈগলগুলো মাংসের লোভে উপরে উড়াল দিতো এবং এভাবে সিংহাসনটি উড়তো। কিন্তু দীর্ঘযাত্রার পর ঈগলরা ক্লান্ত হয়ে গেলে পুরো সিংহাসনটি বিধ্বস্ত হয়।

ইসলামপূর্ব আরবে উড়াল জাদুকর, অতিপ্রাকৃত শক্তি, পাখি কিংবা শুধু পালক নিয়ে বহু রূপকথা প্রচলিত থাকলেও মুসলিমদের জন্য উড্ডয়ন বহন করতো বিশেষ আধ্যাত্মিক তাৎপর্য। ভালো কাজের মাধ্যমে নিষ্ঠাবান মুসলিমের আত্মা একটা স্তরে পৌঁছে সেখান থেকে একের পর এক রূহানী মনযিল পাড়ি দিয়ে আরও উচ্চে আরোহণ করে।

৯ম শতাব্দি কর্ডোবা নিবাসী আব্বাস ইবনে ফিরনাসই প্রথম মুসলিম এবং খুব সম্ভবত প্রথম ব্যক্তি, যিনি উড়ালযান নির্মাণ এবং উড়বার চেষ্টা করেছিলেন। বহুবিদ্যায় পারদর্শী এ মনীষী ছিলেন একাধারে ছিলেন তৎকালের অপ্রতিদ্বন্দ্বি জ্যোতির্বিদ, সঙ্গীতজ্ঞ, প্রকৌশলী এবং প্রখ্যাত কবি। কিন্তু তার খ্যাতি ছুঁয়ে আছে উড়ালযান নির্মাণের সাথে – যা প্রথমবারের মতো কোনো মানুষ নিয়ে আকাশে উড্ডয়ন করেছিল। স্পেনের কর্ডোবায় নেয়া তার দুটো বিখ্যাত উড্ডয়নের পূর্বে মরু এলাকায় তিনি বেশ কয়েকটি সফল উড্ডয়ন সম্পন্ন করেছিলেন, যেন এতে তার উড়ালযানের ডিজাইন কাঠামো যথাসম্ভব নিখুঁত করা যায়।

আল-ফিরদাউসীর শাহনামায় এক রাজার উড্ডয়ন চেষ্টার জনপ্রিয় একটি কাহিনী কবিতার ছন্দে বিবৃত হয়েছে। এখানে শাহনামার প্রচ্ছদ পাতা দৃশ্যমান।

ঢিলেঢালা আলখাল্লায় ভারসাম্য কাঠের সাথে নিজেকে শক্তভাবে আটকে ৮৫২ খ্রিস্টাব্দে কর্ডোবা জামে মসজিদের মিনার থেকে তিনি প্রথমবারের মতো ঝাঁপ দিয়েছিলেন, কিন্তু তার এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। তার এ পতন পর্যাপ্ত ধীরগতির হওয়ায় এ যাত্রায় তিনি সামান্য কিছু আঘাত পেয়েছিলেন। তার এ উড্ডয়ন ব্যর্থ হলেও এটা ছিল প্যারাসুট জাম্প বা অবতরণের অন্যতম প্রাচীন উদাহরণ। পশ্চিমা উৎসগুলো তাকে আব্বাস ইবনে ফিরনাসের বদলে ভুলভাবে আরমান ফিরমান নামে অবহিত করে।

অভিজ্ঞতা থেকে শেখার মানসিকতাসম্পন্ন ইবনে ফিরনাস তার পরবর্তী ডিজাইনের জন্য বেশ পরিশ্রম করেন। বিভিন্ন প্রত্যক্ষদর্শী ও মধ্যযুগীয় পাণ্ডুলিপির বিবরণ থেকে আমরা ওই উড়ালযান সম্পর্কে জানি যে, এটার বেশ

রাজহাঁস পানির উপরে অবতরণ করছে। পাখিদের অবতরণ কৌশল পর্যবেক্ষণ করে আব্বাস ইবনে ফিরনাস নিরাপদে এবং নিখুঁতভাবে অবতরণে লেজের গুরুত্ব উপলব্ধি করেন। মাটিতে বিধ্বস্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তিনি এ বিষয়ে অবহিত ছিলেন না।

বড় বড় ডানা ছিল। আজ থেকে ১২০০ বছর পূর্বে প্রায় ৭০ বছরের বৃদ্ধ আব্বাস ইবনে ফিরনাস রেশম ও ঈগলের পাখনা দিয়ে বানিয়ে ফেলেন তার পরবর্তী উড়ালযান।

কর্ডোবার উপকণ্ঠের রুসাফা এলাকার পর্বতে চড়ে ইবনে ফিরনাস জনতার সামনে উপস্থিত হন রেশম ও ঈগলের পাখনা দিয়ে বানানো পাখির বেশে। নিজের বাহুতে বসানো ডানায় ভর দিয়ে কীভাবে আকাশে উড়বেন, সেটা তিনি ছোট একটি কাগজ টুকরোতে তুলে ধরেছেন, তার ভাষ্য অনুযায়ী, "এখন আমি তোমাদের ছেড়ে উড়াল দেবো। উপর-নিচ ডানা ঝাপটিয়ে আমি উড়বো আর উড়বো – যেন আমি পাখি। যদি সব ঠিক থাকে, তবে কিছু সময় উড়ার পর আমি তোমাদের মাঝে নিরাপদে নেমে আসবো।"

তিনি উল্লেখযোগ্য উচ্চতায় আরোহণ করেন এবং মাটিতে পড়ে ডানা ও নিজের মেরুদণ্ডের কশেরুকা ভাঙার পূর্ব পর্যন্ত তিনি ১০ মিনিটেরও বেশি সময় আকাশে ভেসে ছিলেন। এই ঘটনার পর ইবনে ফিরনাস লেজের ভূমিকা উপলব্ধি করেন; এবং *মাটিতে নামার সময় পাখি যে লেজের ডগাতে ভর দিয়ে অবতরণ করে* – এ বিষয় তিনি তার ঘনিষ্ঠজনদের অবহিত করেন। কিন্তু হায়, লেজ না থাকায় তিনি ঠিকভাবে অবতরণ করতে পারেননি।

বর্তমানের সমস্ত উড়োজাহাজ পিছনের চাকায় ভর দিয়ে অবতরণ করে, যা ইবনে ফিরনাসের ভাবনাকে তার যুগের চেয়েও অগ্রগামী প্রমাণ করে। ইবনে ফিরনাসের উড্ডয়নকে প্রত্যক্ষ করে একজন লিখেছেন, "তিনি বেশ ভালো দূরত্বেই উড়ছিলেন, মনে হচ্ছিল পাখি উড়ছে। কিন্তু তিনি যেখান থেকে শুরু করেছিলেন সেখানে অবতরণ করতে গিয়েই বিপত্তি ঘটে এবং তিনি তার পিছনে ভীষণ বাজেভাবে আঘাত পান। পাখিরা যে তাদের লেজে ভর দিয়ে অবতরণ করে, এটা না জানার কারণেই তিনি নিজের জন্য লেজ বানাতে ভুলে গিয়েছিলেন।"

এ ঘটনা লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির উড়ালযানের নকশা অঙ্কন এবং রাইট ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রথম উড্ডয়নের বহু বহু শতাব্দি পূর্বেকার। দুর্ভাগ্যজনকভাবে ইবনে ফিরনাসের গুরুতর আঘাত তাকে পরবর্তী কোনো উড্ডয়ন পরীক্ষণে নামতে দেয়নি। যাইহোক উদ্যোমী এই মনীষী হয়তো তার কোনো শিক্ষানবিশকে উড়ালযানের নয়া কোনো সংস্করণ নির্মাণে দিক-নির্দেশনা দিয়ে গেছেন।

প্রথম মানব হিসেবে আব্বাস ইবনে ফিরনাসের সফল উড্ডয়নের এক শৈল্পিক প্রকাশ।

এ ধরনের উড়ানযানের বিবরণ রজার বেকনের পাণ্ডুলিপিতে পাওয়া যায়, যিনি এটাকে *ornithopter* (উড়ালপঙ্খী) হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। ১২৬০ খ্রিস্টাব্দে রচিত *On the Marvelous Powers of Art and Nature* (শিল্প ও প্রকৃতির অনুপম ক্ষমতা) শীর্ষক গ্রন্থে বেকন উল্লেখ করেন যে, দুটো উপায়ে মানুষ উড়তে পারে। প্রথম উপায়টির সাদামাটা বিবরণ পরবর্তীতে *ornithopter* (উড়ালপঙ্খী) হিসেবে পরিচিতি পায়। অন্যটি ছিল 'স্বর্গীয় বায়ুতে' সমৃদ্ধ একটি ভূ-গোলকের বিস্তারিত বিবরণ। বেকন দাবী করেন যে, "উড়বার একটি যন্ত্র রয়েছে, যা না আমি দেখেছি আর আমার জানা মতে কেউ দেখেছে, কিন্তু আমি ওই বিজ্ঞ মানুষের নাম ভাল করেই জানি, যিনি এটা উদ্ভাবন করেছেন।" এটা সুবিদিত যে, বেকন অধ্যয়ন করেছেন ইবনে ফিরনাসের আবাসভূমি কর্ডোবায়। এটা খুবই সম্ভব যে বেকনের দেয়া *ornithopter*-এর বিবরণটি তার সময়ের স্পেনের মুসলিম পাণ্ডুলিপি থেকে নেয়া, যেগুলোর হদিস ওই সময়ের পর থেকে আর পাওয়া যায় না।

ইবনে ফিরনাস ৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন এবং তার কোনো কর্মই আজকের দিন পর্যন্ত টিকে নেই। তার সময়কার বিভিন্ন ধারাবিবরণীকারের যৎ-সামান্য বর্ণনা থেকে তার জীবনী পুনর্গঠন করা হয়েছে।

ইবনে ফিরনাসের পর বহু মুসলিম ও অমুসলিম উড্ডয়নের চেষ্টায় নিজেদের সম্পৃক্ত করেছিল এবং বেশ কিছু উড্ডয়ন প্রচেষ্টাও নেয়া হয়েছিল। কাঠ ও দড়ির সাহায্যে নির্মিত ডানায় করে আল-জুহারী নামের এক শিক্ষক ১০০২ খ্রিস্টাব্দে উলু মসজিদের মিনার থেকে উড্ডয়নের উদ্দেশ্যে ঝাঁপ দিয়ে ঘটনাস্থলেই আঘাত পেয়ে মারা যান। ১১শ শতাব্দির ভেনেডিক্ট তরিকার ইংরেজ সন্নাসী ইলমার মালমেসবুরিও লেজের ব্যবহার করতে ভুলে গিয়েছিলেন এবং ১০১০ খ্রিস্টাব্দে উড্ডয়নের উদ্দেশ্যে ১৮৩ মিটার (৬০০ ফুট) উঁচু টাওয়ার থেকে ঝাঁপ দিয়ে দু'পা হারান।

> "উপর-নিচ ডানা ঝাপটিয়ে আমি উড়বো আর উড়বো – যেন আমি পাখি। যদি সব ঠিক থাকে, তবে কিছু সময় উড়ার পর আমি তোমাদের মাঝে নিরাপদে নেমে আসবো।"
>
> – আব্বাস ইবনে ফিরনাস, উড্ডয়নের পথিকৃৎ

উড্ডয়নের যথাযথ বৈজ্ঞানিক ভাবনা নির্মাণে লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি অগ্রগামী ভূমিকা পালন করেছিলেন। ভিঞ্চি নিজে কখনো উড়বার চেষ্টা না করলেও পাখির ডানাবিশিষ্ট উড়ালপঙ্খী (*ornithopter*)-সহ উড্ডয়নের সাথে সম্পৃক্ত বহু নকশা তিনি কাগজে অঙ্কন করেছিলেন। উড়ালপঙ্খীটির নকশা এমনভাবে করা হয়েছিল, যেন তা কারো পিঠে বেঁধে ব্যবহার করা যায়। অন্যান্য নকশার মাঝে ইঞ্জিনবিহীন বিমান অন্যতম এবং কিছু ব্যাখ্যা মোতাবেক তিনি হেলিকপ্টারের নকশা পর্যন্ত এঁকেছিলেন।

১৬৩৩ খ্রিস্টাব্দে লাগারী হাসান চেলেবী নামের এক তুর্ক প্রথম মনুষ্যবাহী রকেট উদ্ভাবন করেছিলেন, যা ৩০০ পাউন্ড ওজনের গানপাউডার দিয়ে উৎক্ষেপণ করা হয়েছিল। এই ঘটনা এক শিল্পীর রঙ তুলিতে আশ্রয় করে সংরক্ষিত হয়ে আছে। উইলিয়াম-ই-বারোস তার *This New Ocean: The Story of the First Space Age* (এই নয়া সমুদ্রঃ প্রথম মহাকাশ যুগের গল্প) শীর্ষক গ্রন্থে বলেন, "সুলতান চতুর্থ মুরাদের কন্যা কায়া সুলতানের জন্মদিন উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে লাগারী হাসান চেলেবী নামের এক তুর্ককে রকেট ভরে আকাশে নিক্ষেপ করা হয়, ওই রকেটে চুয়ান্ন পাউন্ডের গানপাউডার ছিল। রকেটটি চেলেবীকে নিয়ে বেশ উচ্চতায় পৌঁছায়, যেখানে তিনি তার ডানাগুলো মেলে ধরেন এবং অত্যন্ত দক্ষতার সাথে ডানা ঝাপটিয়ে রাজকীয় প্রাসাদের সামনে নিরাপদে অবতরণ করেন। পুরস্কারস্বরূপ এক থলে স্বর্ণমুদ্রার পাশাপাশি চেলেবীর ভাগ্যে জুটে চৌকষ সরকারি চাকরি। বলা হয় যে, ক্রিমিয়ার যুদ্ধে তিনি নিহত হয়েছিলেন।"

হাযারফেন আহমদ চেলেবী নামের ১৭শ শতাব্দির আরেক তুর্ক নিজের উড্ডয়ন ডানার সাথে ঈগলের পাখনাযুক্ত করে উড়বার চেষ্টা করেছিলেন। ৯-বারের পরীক্ষামূলক উড্ডয়নের পর তিনি তার ডানার আকৃতি ও ভারসাম্য উন্নয়নে আরও মনোযোগ দেন এবং ফলশ্রুতিতে ১৬৩৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি তার বিখ্যাত উড্ডয়ন অভিযানে সফল হন। ইস্তাম্বুলের বসফরাসের নিকটবর্তী গালাতা টাওয়ার থেকে তিনি উড্ডয়নের উদ্দেশ্যে ঝাঁপ দেন এবং বসফরাস প্রণালীর অপর পাশে সফলভাবে অবতরণ করেন। এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী তুর্কি ঐতিহাসিক ইভলিয়া চেলেবী তার *"সিয়াহেতনামা"* (সফরনামা) গ্রন্থে বিষয়টি এভাবে উল্লেখ করেছেনঃ তুর্কির এই বিখ্যাত উড়াল মানব কিছু সংশোধনীসহ আল-জুহারীর গণনা পদ্ধতি এবং ঈগলের উড্ডয়ন কৌশল গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে সফলভাবে উড়তে পেরেছিলেন। হাযারফেন এ অবদানস্বরূপ জিতে নিয়েছিলেন এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা এবং এই ঐতিহাসিক উড্ডয়নকে সম্মান জানিয়ে তুর্কি ডাকবিভাগ স্মারক ডাকটিকেট প্রকাশ করেছিল।

বামেঃ ১৬৩৮ খ্রিস্টাব্দে ইস্তাম্বুলের বসফরাসের নিকটবর্তী গালাতা টাওয়ার থেকে নেয়া হাযারফেন আহমদ চেলেবীর উড্ডয়নের চিত্রায়ন। ডানেঃ প্রথম মনুষ্যবাহী রকেট উৎক্ষেপণের শৈল্পিক চিত্রায়ন, ১৬৩৩ খ্রিস্টাব্দের এ উৎক্ষেপণে রকেটে ছিলেন লাগারী হাসান। সাতটি ডানাবাহী রকেটে করে লাগারী হাসানকে আকাশে ছোঁড়া হয়; এই রকেটের জ্বালানী ছিল গানপাউডারের মিশ্রণ।

বসফরাসের উপর দিয়ে মন্টগলফিয়ার ভাইদের সফল উড্ডয়নের পর তারা জনসম্মুখে একটি ভেড়া, হাঁস ও মোরগকে যাত্রী বানিয়ে উষ্ণ বায়ুর বেলুন উৎক্ষেপণ করে। এর কয়েক সপ্তাহ পর বিজ্ঞান শিক্ষক জিন ফ্রাসেয়ো পিলাত্রে ডি রেজিয়ের এবং পদাতিক কর্মকর্তা মারকুইস ডি-আরলান্দেজ উষ্ণ বায়ুর বেলুন করে প্রথম মানব হিসেবে প্যারিসের উপর দিয়ে ৯ কিলোমিটার (৫.৬ মাইল) পাড়ি দিয়েছিলেন।

উনবিংশ শতাব্দির বিমান চালনাবিদ্যায় জার্মানির অটো লিলিয়েনথাল অসমান্য ভূমিকা রেখেছিলেন; বস্তুত তিনি ভূপৃষ্ঠের উত্তোলন ক্ষমতা, ডানার বক্রতার সর্বোত্তম গঠন এবং উড়োজাহাজের ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণের গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক তথা বিভিন্ন ডানার কোণের সাপেক্ষে কেন্দ্রীভূত চাপের পরিবর্তন নিয়ে বেশ বুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন। ইঞ্জিনবিহীন বিমানে করে তিনি বেশ দক্ষতার সাথে উড়তে পারতেন, কিন্তু ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে বার্লিন পর্বত থেকে উড্ডয়নকালে আচমকা ঝড়ো বাতাস তার উড়ালযানকে আঘাত করে, আর এতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তিনি মৃত্যু মুখে পতিত হন।

১৯০৩ খ্রিস্টাব্দের পহেলা ডিসেম্বর রাইট ভ্রাতৃদ্বয়ের উড্ডয়ন ছিল বিমানচালনার ইতিহাসের সবচেয়ে স্মরণীয় ঘটনা। ইবনে ফিরনাসের মতো উইলবুর রাইট পাখিদের উড্ডয়ন কৌশলে ব্যাপক মনোযোগী ছিলেন। উইলবুর এটা উপলব্ধিতে সক্ষম হন যে, ডানাকে নিয়ন্ত্রণ করে পাখি প্বার্শীয় ভারসাম্য বজায় রাখে। এই প্রভাবকে কাজে লাগিয়ে তিনি একটি ঘুড়ি নির্মাণ করেন, যা ইচ্ছে মতো দোলানো যেত।

শক্তিচালিত উড়োজাহাজের বিকাশের পূর্ব পর্যন্ত রাইট ভ্রাতৃদ্বয় ইঞ্জিনবিহীন উড়ালযান ব্যবহার করতো, যেন "দুর্ঘটনা প্রতিরোধে উপযুক্ত দক্ষতা অর্জনের আগ পর্যন্ত দুর্ঘটনা এড়িয়ে যাওয়া যায়।" রাডার নিয়ন্ত্রণ এবং স্বচ্ছন্দে মোড় নেয়ার গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতিগুলো তাদের দৃষ্টি এড়ায়নি। উইলবুর রাইট ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সে তার বিমান উড়ান এবং এর এক বছর পার না হতেই হেনরি ফারম্যান ও লুইস ব্লেরিয়ট চালু করেন ব্যাপকভিত্তিক ফ্লাইট বা বিমান-ভ্রমণ সেবা।

বিমানচালনা – এমনকি মহাকাশ ভ্রমণের এ সমস্ত ইতিহাসের বিনম্র সূচনাটা হয়েছিল আব্বাস ইবনে ফিরনাসের হাত ধরে – যে মানুষটি ঈগলের পাখনা ও রেশমে নির্মিত ডানায় ভর দিয়ে উড়বার চেষ্টা করেছিলেন; চেয়েছিলেন নিজের কল্পনাকে বাস্তবে রূপ দিতে।

১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে রাইট ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রথম উড্ডয়নের একটি আলোকচিত্র।

১৯শে জানুয়ারি, ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সের লিওনের উপর দিয়ে বয়ে চলা 'Le Flesselles' বেলুনের একটি চিত্রায়ন। জোসেফ মন্টগলফিয়ার এবং জিন ফ্রাসেয়ো পিলাত্রে ডি রেজিয়েরসহ এই বেলুনে সাতজন যাত্রী ছিল।

بفرخ ترین ساعت آمد بتخت
خدیو جهانگیر فیروز بخت
آمد شه کامران بر سریر
چو بر آسمان آفتاب

তথ্য-নির্দেশিকা

"বাস্তবতা বা ফ্যাক্টের সামনে শিশুর মতো বসে যাও এবং প্রতিটি ধারণা ও কল্পনাপ্রসূত চিন্তা পরিত্যাগের জন্য প্রস্তুত হও এবং প্রকৃতি তোমায় যে পাতালেই নিয়ে যাক না কেন, তা বিনয়ে সাথে অনুসরণ করে যাও, অন্যথায় তুমি কিছুই শিখতে পারবে না।"

– থমাস হ্যাক্সলি, ইংরেজ জীববিজ্ঞানী
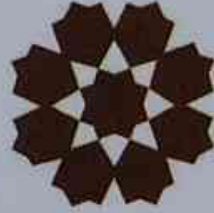
জ্ঞানের ঐশ্বর্য

অতীতের ব্যক্তিবর্গ • ইউরোপের শীর্ষস্থানীয় প্রতিভা
এক হাজার বছরের পাণ্ডিত্য • লেখক ও প্রবন্ধ • আরও জানতে পড়ুন

১০০০ বছরের হারানো ইতিহাসে বিচরণ এবং স্বতন্ত্রভাবে স্বনামধন্য পণ্ডিতদের সাথে পরিচিত হওয়ার পর্বটি যেন আরও সহজ ও তথ্যবহুল হয়, সেজন্যই এই বিভাগের অবতারণা। পুরো গ্রন্থজুড়ে আলোচিত হয়েছে সৃজনশীল ও মেধাবী পণ্ডিতদের নানা কীর্তি। মুসলিম বিশ্বের এই তারকারাজির মধ্য থেকে আমরা ১১-জন অপ্রতিদ্বন্দ্বি পণ্ডিত সম্পর্কে একটু বিস্তারিত জানবো এবং বাদবাকিদের সংক্ষিপ্ত তথ্যাদি আমরা এক হাজার বছরের পাণ্ডিত্য অধ্যায়ে উপস্থাপন করবো। আর তাই কে কেমন ছিল, কোথায় বেড়ে উঠেছিল এবং কোথায় ছিল তার কর্মক্ষেত্র, তা উদ্ঘাটনে মনোযোগের সাথে পৃষ্ঠা উল্টাতে থাকুন।

মুসলিম পণ্ডিতদের কীর্তি, সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনসমূহ ইউরোপীয় চিন্তাজগত এবং রেনেসাঁর উপর কী ধরনের প্রভাব ফেলেছিল, সে সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট ধারণা পাবেন ইউরোপের শীর্ষস্থানীয় প্রতিভা নামের অধ্যয়ে। সেখানে আপনি রজার বেকনের আরবী বলার দক্ষতা: আরবী ভাষাজ্ঞান ও আরবীয় বিজ্ঞান যে তৎকালে সত্যিকার জ্ঞানরাজ্যে প্রবেশের একমাত্র দরজা, সে ব্যাপারে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণে তার অবিরাম ভূমিকাকে দেখতে পাবেন। যারা এ ব্যাপারে আরও জানতে আগ্রহী, তাদের জন্য রয়েছেঃ আরও জানতে পড়ুন অধ্যায়টি।

আর যদি এই গ্রন্থে উল্লেখ করা পণ্ডিতদের রচিত পুস্তকগুলোর আসল পাণ্ডুলিপি সম্পর্কে জানতে চান, তবে লেখক ও প্রবন্ধ অধ্যায়টি আপনার জন্য।

উল্টো পৃষ্ঠার চিত্রঃ পারসীয় পাণ্ডুলিপিতে শিল্পীর তুলিতে চিত্রায়িত হয়েছে বালখের প্রাচীন শহরে নিজ সিংহাসনে বসে থাকা তৈমুর লং।

০১ অতীতের ব্যক্তিবর্গ

মুসলিম সভ্যতার পুরুষ ও নারীদের অবদান কীভাবে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, সেটা আপনি পুরো গ্রন্থজুড়ে দেখতে পেয়েছেন। এখানে এক হাজার বছর পূর্বের কিছু বড়মাপের মনীষীর নাম এবং তাদের অবদানের কিছু খণ্ডচিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

আব্বাস ইবনে ফিরনাস

পুরো নাম: আব্বাস আবুল ক্বাসিম ইবনে ফিরনাস ইবনে ফিরদাস আল-তাকিরিনী

জন্ম: ৯ম শতাব্দি: তাকোরনা (বর্তমান রোন্ডা)-র এক বার্বার পরিবার থেকে আসা আন্দালুসীয় বংশোদ্ভূত এই ব্যক্তি

মৃত্যু: ৮৮৭ খ্রিস্টাব্দ

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কীর্তি: উড়বার যন্ত্র, স্ফটিক এবং নক্ষত্রশালা তৈরি

দ্রষ্টব্য: গৃহ বিভাগের অনন্য ভোজনরীতি; বাজার বিভাগের কাচশিল্প এবং মহাবিশ্ব বিভাগের পর্যবেক্ষণ ও উড্ডয়ন অধ্যায়

কর্ডোবার আব্বাস ইবনে ফিরনাসকে একটি পেশায় আবদ্ধ করা বেশ কঠিন, যেহেতু তিনি একাধারে কবিতা, সঙ্গীত ও জ্যোতির্বিদ্যাসহ বহুশাস্ত্রে পারদর্শী। গ্রিক ভাষায় দক্ষ হওয়ায় তিনি দর্শন ও সঙ্গীতশাস্ত্রীয় পাণ্ডুলিপিগুলো অনুবাদ করেছিলেন।

মূল্যবান স্ফটিক পাথর কাটার প্রক্রিয়া ও কাচ উৎপাদন কৌশলে পূর্ণতা আনয়নের পাশাপাশি কৃত্রিম বজ্রপাত ও বিজলিচমকসহ কাচ দিয়ে তিনি এক ধরনের নক্ষত্রশালা তৈরি করেছিলেন।

তার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অর্জন হচ্ছে: উড়ন্ত পাখা তৈরি, যা মানুষকে প্রথমবারের মতো বাতাস ভেদ করে উড়বার ক্ষমতা প্রদান করেছিল।

দুর্ভাগ্যজনকভাবে, তিনি তার মূল কাজগুলোর কোনো নিদর্শন রেখে যাননি এবং তার সম্পর্কে আমরা যতটুকু জানি, তা বিভিন্ন নথিতে থাকা প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা ও যৎসামান্য বিবরণের সমষ্ঠি মাত্র।

আব্বাস ইবনে ফিরনাস

আল-জাযারী

পুরো নামঃ বাদিউয যামান আবুল ইয ইসমাঈল ইবনে রায্যায আল-জাযারী

জন্মঃ জন্মকাল অজ্ঞাত; ১১৭৪ থেকে ১২০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি দিয়ারবাকির (বর্তমান দক্ষিণ-পূর্ব তুরস্কের) আরটুক রাজাদের অধীনে কাজ করেছিলেন

মৃত্যুঃ তারিখ অজ্ঞাত

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কীর্তিঃ "*আল-জামি বাইনাল ইলম ওয়াল আমাল আন-নাফি' ফী সান'আতিল হিয়াল*" তথা সুনিপুণ যান্ত্রিক ডিভাইসের জ্ঞান বিষয়ক পুস্তক

দ্রষ্টব্যঃ গৃহ বিভাগের পরিচ্ছন্নতা ও ঘড়ি অধ্যায় এবং বাজার বিভাগের পানি সরবরাহ অধ্যায়

আল-জাযারী

বর্তমান হিসেবে আমরা আল-জাযারীকে যন্ত্র প্রকৌশলী বলতে পারি এবং এ বিষয়ে তিনি ছিলেন সে যুগের অপ্রতিদ্বন্দ্বি একজন। তার জীবন নিয়ে তেমন একটা না জানলেও আমরা এটা জানি যে, তিনি আরটুক বংশোদ্ভূত দিয়ারবাকিরের রাজা নাসিরুদ্দীনের অধীনে কর্মরত ছিলেন। রাজা তাকে তার উদ্ভাবনগুলো নথিবদ্ধ করে একটি ম্যানুয়েল গ্রন্থ প্রণয়ন করতে বলেন এবং এর বদৌলতে অস্তিত্বে আসেঃ "*সুনিপুণ যান্ত্রিক ডিভাইসের জ্ঞান বিষয়ক পুস্তক*", যা তিনি ১২০৬ খ্রিস্টাব্দে সমাপ্ত করেন।

এর পূর্বে তিনি ঘড়ি ও জলউত্তোলকসহ বেশ কিছু যন্ত্র ও যান্ত্রিক ডিভাইস নির্মাণ করেন, যা প্রকৌশলবিদ্যায় বৈপ্লবিক আলোড়ন নিয়ে আসে, যেমনঃ ক্র্যাংক-চালিত সঞ্চালন দণ্ড (*crankshaft*)। তিনিই সম্ভবত প্রথম ব্যক্তি, যিনি রোবটের ব্যবহার করেছিলেন, যেহেতু তার বেশিরভাগ যন্ত্রেই নড়তে সক্ষম অবয়বের উপস্থিতি ছিল।

আল-কিন্দী

পুরো নামঃ আবু ইউসুফ ইয়াকুব ইবনে ইসহাক আল-সাবাহ আল-কিন্দী

জন্মঃ আনুমানিক ৮০১ খ্রিস্টাব্দ, ইরাকের কুফা

মৃত্যুঃ ৮৭৩ খ্রিস্টাব্দ

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কীর্তিঃ "*কিতাবুল কিমিয়া আল-আতরি ওয়াল তাসয়িঁদাত*" (সুগন্ধি ও পাতনের রসায়ন)-সহ ৩৬১-টি বিষয়ে পুস্তক রচনা

দ্রষ্টব্যঃ গৃহ বিভাগের সঙ্গীত, পরিচ্ছন্নতা, দৃষ্টিশক্তি এবং ক্যামেরাঃ বিদ্যালয় বিভাগের জ্ঞানের অনুবাদ; হাসপাতাল বিভাগের ফার্মাসি এবং বিশ্ব বিভাগের ভূ-বিজ্ঞান ও প্রাকৃতিক ঘটনা অধ্যায়

আল-কিন্দী

বিশ্বকোষতুল্য জ্ঞানের বাহক আল-কিন্দী কাজ করেছেন চিকিৎসক, দার্শনিক, গণিতবিদ, জ্যামিতি বিশেষজ্ঞ, যুক্তিবিদ, সঙ্গীত বিশেষজ্ঞ ও জ্যোতির্বিদ হিসেবে। কুফার গভর্নরের পুত্র এই মনীষী কুফাতেই শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং বাগদাদের বায়তুল হিকমাতে কর্মরত থাকাকালে বিজ্ঞান ও দর্শনের গ্রন্থাদি অনুবাদের বদৌলতে তার চরম সুখ্যাতি খলীফার দরবার পর্যন্ত পৌঁছে যায়। খলীফা আল-মু'তাসিম তার পুত্র আহমাদের শিক্ষক হিসেবে আল-কিন্দীকে পছন্দ করেন।

তার অনন্য অবদানের মাঝে রয়েছেঃ পাটিগণিতের ভূমিকা, সংখ্যাতত্ত্বের উপর আটটি পাণ্ডুলিপি, অনুপাত ও সময় পরিমাপ নিয়ে দুটো পাণ্ডুলিপি। তিনিই প্রথম গোলীয় জ্যামিতির উদ্ভাবন করেন এবং এটার প্রয়োগ তিনি তার জ্যোতিষশাস্ত্রীয় কাজগুলোতে করেন। বিভিন্ন ধরনের গোলক, গোলকের উপর দিগংশ (*azimuth* – মধ্য থেকে দিগন্ত পর্যন্ত কৌণিক দূরত্ব) তৈরি এবং কীভাবে গোলককে সমতল করতে হয়, এসব বিষয়েও তিনি লিখেছিলেন। সঙ্গীত বিশেষজ্ঞ হিসেবে সঙ্গীতের স্বরলিপির ব্যবহারের পাশাপাশি বীণা বা লুটের বিকাশে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন।

আয-যাহরাবী

পুরো নামঃ আবুল ক্বাসিম খালাফ ইবনে আল-আব্বাস আয-যাহরাবী, পশ্চিমে *আবুলকাসিস* নামে সমধিক পরিচিত

জন্মঃ ৯৩৬ খ্রিস্টাব্দ, স্পেনের কর্ডোবার নিকটস্থ মদীনাতুয যাহরা

মৃত্যুঃ ১০১৩ খ্রিস্টাব্দ

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কীর্তিঃ "*আত-তাসরীফ লিমান আজযা আনিল তালীফ*" সংক্ষেপে *আত-তাসরীফ*। গ্রন্থটি চিকিৎসা কৌশল হিসেবে অনুদিত হয় এবং তা কয়েক শতাব্দি জুড়ে ইউরোপের দেশগুলোর চিকিৎসা পাঠ্যক্রমের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত ছিল

দ্রষ্টব্যঃ গৃহ বিভাগের পরিচ্ছন্নতা; বিদ্যালয় বিভাগের জ্ঞানের অনুবাদ; হাসপাতাল বিভাগের চিকিৎসা জ্ঞান, পূর্ণতার উপকরণ, ফার্মাসি এবং সার্জারি অধ্যায়

আয-যাহরাবী

আয-যাহরাবী ছিলেন উমাইয়া স্পেনের এক বিপ্লবী চিকিৎসক ও সার্জন। দন্ত্য চিকিৎসা, ঔষধ প্রস্তুতবিদ্যা এবং সার্জারি অপারেশনের বিস্তারিত বিবরণে সমৃদ্ধ তার লেখা ৩০-খণ্ডের "*আত-তাসরীফ*" ছিল ওই সময়ের অন্যতম প্রভাবশালী চিকিৎসা বিশ্বকোষ।

সার্জারিতে তার যুগান্তকারী আবিষ্কারের মাঝে রয়েছেঃ অভ্যন্তরীণ সেলাইয়ে ক্যাটগাটের ব্যবহার এবং গিলে খাওয়ার উপযোগী করে ক্যাটগাটের খোলসে ঔষধ জমা করে তা প্রয়োগের কৌশল উদ্ভাবন, যা বর্তমানে ক্যাপসুল হিসেবে পরিচিত।

সিরিঞ্জ (*syringe* –পিচকারি), ড্রপার, *Scalpels* (হালকা ছুরি), চিমটার মতো দু'শরও অধিক সার্জারি উপকরণ উদ্ভাবন এবং সেগুলোর সচিত্র বিবরণ প্রদান করেছিলেন। তার আঁকা এসব যন্ত্রের ডায়াগ্রাম ও বিস্তারিত বিবরণ কয়েক শতাব্দি ধরে মুসলিম বিশ্ব ও ইউরোপের চিকিৎসা পাঠ্যপুস্তক ও সাময়িকীতে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে রেখেছিল। এক হাজার বছর পর, তার দেয়া আসল নকশার সাপেক্ষে আধুনিক বহু সার্জারি যন্ত্রের পরিবর্তন খুবই সামান্য।

ফাতিমা আল-ফিহরী

পুরো নাম: ফাতিমা আল-ফিহরী

জন্ম: ৯ম শতাব্দি

মৃত্যু: ৮৮০ খ্রিস্টাব্দ

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কীর্তি: ৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে ফেযের আল-কায়রাওয়ান বিশ্ববিদ্যালয় কমপ্লেক্স প্রতিষ্ঠা

দ্রষ্টব্য: বিদ্যালয় বিভাগের বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যায়

উচ্চ শিক্ষিতা যুবতী ফাতিমা আল-ফিহরী তার সফল ব্যবসায়ী পিতা থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে বিপুল পরিমাণ সম্পদ লাভ করেছিলেন এবং তিনি তার কায়রাওয়ান জনগোষ্ঠীর জন্য একটি যুগপৎ মসজিদ ও শিক্ষাকেন্দ্র নির্মাণে পুরো সম্পত্তি ব্যয়ের প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। ৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে তার এই মহান স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয় এবং তা মরক্কোর সেরা বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত হয়।

এই বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্যোতির্বিদ্যা, কুরআন ও ধর্মতত্ত্ব, আইন, ভাষা অলংকার, গদ্য ও পদ্য রচনা, যুক্তিবিদ্যা, পাটিগণিত, ভূগোল, চিকিৎসাবিদ্যা, ব্যাকরণ, মুসলিম ইতিহাস এবং রসায়ন ও গণিতের প্রাথমিক বিষয়াদি পড়ানো হতো। বিষয়ের এমন বৈচিত্র এবং শিক্ষাদানের উচ্চমান গোটা দুনিয়ার পণ্ডিত ও শিক্ষার্থীদের এ বিশ্ববিদ্যালয় অভিমুখী করেছিল।

ফাতিমার বোন মারইয়াম একই সময়ে কায়রাওয়ানের নিকটে নির্মাণ করেন আল-আন্দালুস মসজিদ। এই দুটো প্রতিবেশী স্থাপনা পরিণত হয় ফেয শহরের নিউক্লিয়াস বা কেন্দ্রবিন্দুতে।

ফাতিমা আল-ফিহরী

ইবনুল হাইছাম

পুরো নামঃ আবু আলী আল-হাসান ইবনুল হাইছাম, পশ্চিমে আলহাজেন নামে পরিচিত

জন্মঃ ৯৬৫ খ্রিস্টাব্দ, ইরাকের বসরা

মৃত্যুঃ ১০৩৯ খ্রিস্টাব্দ, মিশরের কায়রো

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কীর্তিঃ "*কিতাব আল-মানাযির*"; পুস্তকটি আলোকবিজ্ঞানের মূলভিত্তি দাঁড় করায়। এই গ্রন্থের লাতিন অনুবাদ কয়েক শতাব্দি পরবর্তী রজার বেকন, ভিটেলো, লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি, ডেকার্ট, ইয়োহান কেপলারের ন্যায় মনীষীদের চিন্তারাজ্যে সীমাহীন প্রভাব রেখেছিল

দ্রষ্টব্যঃ গৃহ বিভাগের দৃষ্টিশক্তি এবং ক্যামেরা; বিদ্যালয় বিভাগের জ্ঞানের অনুবাদ; বিশ্ব বিভাগের প্রাকৃতিক ঘটনা এবং মহাবিশ্ব বিভাগের চাঁদ অধ্যায়

ইবনুল হাইছাম

ইবনুল হাইছাম আলোকবিজ্ঞানে নিয়ে আসেন বৈপ্লবিক পরিবর্তন এবং দার্শনিক আলোচনা নির্ভর শাস্ত্র থেকে এটাকে তিনি রূপান্তরিত করেন পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ নির্ভর বিজ্ঞানে। চোখ থেকে অদৃশ্য আলো নির্গত হওয়ার ফলে আমরা দেখি, এই গ্রিক ধারণা তিনি প্রত্যাখ্যান করেন এবং সঠিকভাবে এই মত দেন যে, বস্তুর উপর আলো প্রতিফলিত হয়ে আমাদের চোখে প্রবেশ করলেই আমরা ওই বস্তু দেখতে পাই।

অন্ধকার কক্ষের একদিকে পিনহোল বা ছোট ফুটো রেখে তার বিপরীতে সাদা পাত রেখে তিনি এই তত্ত্ব প্রমাণ করেছিলেন। আলো ওই ফুটো দিয়ে প্রবেশ করে বিপরীত দিকে রাখা সাদা পাতে বাহিরের দুনিয়ার উল্টো ছবির বিচ্ছুরণ ঘটায়। তিনি এটাকে বলেছিলেনঃ *কামারা* এবং এটাই ছিল দুনিয়ার প্রথম ক্যামেরা অবস্কিউরা।

ইবনে বতুতা

পুরো নাম: আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে বতুতা

জন্ম: ১৩০৪ খ্রিস্টাব্দ, তানজাহ, মরক্কো

মৃত্যু: ১৩৬৮ বা ১৩৭০ খ্রিস্টাব্দ

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কীর্তি: "*কিতাব আর-রিহলা*" বা সফরনামা। ফেয ও মরক্কোর সুলতান আবু ইনানের পৃষ্ঠপোষকতায় রাজ দরবারের অনুলেখক ইবনে জুযাঈ এই সফরনামা ইবনে বতুতার ধারাবিবরণী থেকে লিপিবদ্ধ করেছিলেন

দ্রষ্টব্য: বাজার বিভাগের বাণিজ্য, অলংকার ও মুদ্রা; নগর বিভাগের স্নানাগার এবং বিশ্ব বিভাগের পর্যটক ও অভিযাত্রী অধ্যায়

ইবনে বতুতা

প্রায় ৬৮০ বছর পূর্বে ২১ বছর বয়সী ইবনে বতুতা নিজ শহর মরক্কোর তানজাহ ত্যাগ করে একাকি হজ্জের উদ্দেশ্যে রওনা দেন এবং দীর্ঘ ২৯ বছর পর নিজ শহরে ফিরে আসেন। সুদীর্ঘ এই সময়ে তিনি ঘোড়া, ঘোড়ার গাড়ি, উট, নৌকা এবং পায়ে হেঁটে আধুনিক হিসেবে ৪৪-টি দেশ ঘুরে পাড়ি দিয়েছিলেন ৭৫,০০০ মাইল। এই ভ্রমণ তাকে নিয়ে গিয়েছিল উত্তর, পশ্চিম ও পূর্ব আফ্রিকা, মিশর, সিরিয়া, পারস্য, আরব উপসাগর, আনাতোলিয়া, মধ্য এশিয়ার প্রান্তর, তুর্কিস্তান, আফগানিস্তান, ভারত, মালদ্বীপ, শ্রীলংকা, বাংলা, সুমাত্রা, চীন, সারদিনিয়া এবং স্পেনের দূরবর্তী প্রান্তর পর্যন্ত। চারবার মক্কা ভ্রমণসহ এই পুরো সফরে তিনি ৬০-জন রাষ্ট্রনায়কসহ ১৫০০-এরও অধিক লোকের নাম স্মরণে রেখেছিলেন, যাদের সাথে তার সাক্ষাত হয়েছিল।

ফেয ও মরক্কোর সুলতান তার এই পুরো সফরনামা লিপিবদ্ধ করতে বলেন এবং ১৪শ শতাব্দির দুনিয়া কেমন ছিল, এই *রিহলা* বা সফরনামা তা জানার অন্যতম একটি উৎস। যেহেতু এই সফরনামা কর্ডোবা থেকে চীনের ক্যান্টন (বর্তমান গোয়াংজু) পর্যন্ত বিস্তৃত মধ্যযুগীয় দুনিয়ার সমাজ-সংস্কৃতি, মানুষ, জীবজন্তু এবং উদ্ভিদরাজির অন্যতম নির্ভরযোগ্য চাক্ষুষ বিবরণী।

ই'জলিয়া আল-আস্তুর্লাবী

পুরো নামঃ মারইয়াম আল-ই'জলিয়া আল-আস্তুর্লাবী

জন্মঃ ৯৪৪ খ্রিস্টাব্দ, সাইফুদৌল্লা আমলের আলেপ্পো, সিরিয়া

মৃত্যুঃ ৯৬৭ খ্রিস্টাব্দ

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কীর্তিঃ পিতা ই'জলিঈ আল-আস্তুর্লাবীর আস্তুর্লাব তৈরির কাজের ধারা অব্যাহত রাখা

দ্রষ্টব্যঃ মহাবিশ্ব বিভাগের আস্তুর্লাব অধ্যায়

সিরিয়ার আলেপ্পোতে জন্ম নেয়া এ মহিয়সী নারীর পরিবার ছিল দক্ষ জ্যোতির্বিদ ও যন্ত্র নির্মাতাদের মিলনমেলা।

আস্তুর্লাব নির্মাণে অত্যন্ত পারদর্শী মারইয়াম শাসক সাইফুদৌলার পৃষ্ঠপোষকতায় বিখ্যাত আলেপ্পো দুর্গে কর্মরত ছিলেন।

৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে বেশ অল্প বয়সে মৃত্যুবরণ করেন এই নারী প্রতিভা।

ই'জলিয়া আল-আস্তুর্লাবী

জাবির ইবনে হাইয়ান

পুরো নাম: আবু মূসা জাবির ইবনে হাইয়ান, পশ্চিমে *জিবার* নামে পরিচিত

জন্ম: ৭২২ খ্রিস্টাব্দ, তুস, ইরান

মৃত্যু: ৮১৫ খ্রিস্টাব্দ, কুফা, ইরাক

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কীর্তি: ঊর্ধ্বপাতন, তরলীকরণ, স্ফটিকীকরণ, পাতন, শোধন, সংযুক্তিকরণ, অক্সিডেশন, বাষ্পীকরণ ও পরিস্রাবন পদ্ধতিগুলোর উদ্ভাবন ও এগুলোর পূর্ণতা দান এবং পাতনের মাধ্যমে ফিটকিরি থেকে সালফিউরিক এসিডের উৎপাদন

দ্রষ্টব্য: বিদ্যালয় বিভাগের রসায়ন ও বাণিজ্যিক রসায়ন অধ্যায়

রসায়নের জনক হিসেবে সমধিক পরিচিত এবং ঔষধ ও সুগন্ধি-বিক্রেতার এই পুত্র আব্বাসী খলীফা হারুন উর-রশিদের সময় বারমাকী উজিরের পৃষ্ঠপোষকতায় কাজ করতেন। বারমাকীদের সাথে সম্পর্ক থাকায় তাদের পতনের সাথে তারও ভাগ্য খারাপ হয় এবং গৃহবন্দী অবস্থায় কুফাতে তার মৃত্যু হয়।

ল্যাবরেটরিতে কাজের পাশাপাশি ইস্পাত প্রস্তুত প্রক্রিয়া, চুলে রঙ, ধাতব শোধন, বস্ত্র ও চামড়া রঙকরণ, বস্ত্রকে পানি নিরোধক করতে বার্নিশ বানানো এবং পাণ্ডুলিপিতে ব্যবহার্য উজ্জ্বল কালির ন্যায় ব্যবহারিক প্রয়োগসমৃদ্ধ কাজেও তিনি পারদর্শী ছিলেন।

তার যুগান্তকারী অবদানের আরেকটি ক্ষেত্র ছিল এসিড নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং সালফিউরিক ও হাইড্রোক্লোরিক এসিডের আবিষ্কারের মাধ্যমে তিনি তার চূড়ায় পৌঁছে ছিলেন।

জাবির ইবনে হাইয়ান

সিনান

পুরো নাম: খাজা মা'মার সিনান

জন্ম: ১৪৮৯ খ্রিস্টাব্দ

মৃত্যু: ১৫৮৮ খ্রিস্টাব্দ

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কীর্তি: তুরস্কের সবচেয়ে ভূমিকম্প সহনশীল মিনার এড্রিনের সালিমিয়া মসজিদসহ ৪৭৭-টিরও অধিক স্থাপনা নির্মাণ ও নকশা অঙ্কন

দ্রষ্টব্য: নগর বিভাগের স্থাপত্য অধ্যায়

সিনান

গ্রিক অর্থোডক্স খ্রিস্টান পিতামাতার সন্তান সিনান ইসলামে দীক্ষিত হয়েছিলেন। তার পিতা পাথর দিয়ে ভবন নির্মাণে অভিজ্ঞ হওয়ার পাশাপাশি ছিলেন দক্ষ রাজমিস্ত্রী। ছোটবেলা থেকেই সিনান তার পিতার পথে হাঁটতে শুরু করেন এবং অত্যন্ত মনোযোগের সাথে পিতার গুণগুলো রপ্ত করতে থাকেন।

২১ বছর বয়সে তাকে জানেসারি সৈন্যদলে অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং জোরপূর্বক এ সৈন্যদলে অন্তর্ভূত হওয়ায় তিনি জানান যে, তিনি রাজমিস্ত্রীর কাজ শিখতে চান। আর এটা তাকে দিয়েছিল জাহাজ, কাঠের সেতু এবং বিভিন্ন ধরনের অস্থায়ী কাঠের স্থাপনা নির্মাণের অভিজ্ঞতা।

সামরিক কাজের অংশ হিসেবে তিনি বেশ কিছু অটোমান অভিযানে শামিল ছিলেন এবং এতে করে তিনি সেতু, প্রতিরক্ষা দেয়াল এবং দুর্গ নির্মাণ ও পুনর্নির্মাণের অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন। তার এই অনন্য সাধারণ প্রতিভা অটোমান সুলতানদের নজরে আসে এবং অটোমান সাম্রাজ্যের প্রধান স্থপতি হওয়ার সুবাদে তুরস্ক থেকে দামেস্ক, মক্কা ও বসনিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত অটোমান এলাকাগুলোতে মসজিদ, বিদ্যালয়সহ বিভিন্ন পৌর-স্থাপনা নির্মাণ করে তিনি তার স্থাপত্য নৈপুণ্যের চরম শিখরে আরোহণ করেছিলেন।

ঝেং হো

পুরো নাম: মা হো নামে জন্মেছিলেন এবং পরবর্তীতে চীনা সাম্রাজ্যের সামরিক মহাঅধিনায়ক খেতাব পাওয়ায় তিনি তার নাম পাল্টে ঝেং হো রাখেন

জন্ম: ১৩৭১ খ্রিস্টাব্দ, খুনমিং, চীন

মৃত্যু: ১৪৩৩ খ্রিস্টাব্দ, ভারত

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কীর্তি: সাতটি মহাকাব্যিক সমুদ্রযাত্রার মাধ্যমে ১৫শ শতাব্দির চীনকে আঞ্চলিক ও খুব সম্ভবত বৈশ্বিক পরাশক্তিতে রূপান্তর

দ্রষ্টব্য: বিশ্ব বিভাগের নৌ অভিযান অধ্যায়

ঝেং হো

ঝেং হো ছিলেন চীনা নৌবহরের সেনাপতি এবং ২৮ বছরের ভ্রমণকালে তিনি বাণিজ্য ও কূটনীতির নামে প্রায় ৩৭-টি দেশ সফর করেছিলেন। এই অভিযানগুলো ৫০,০০০ কিলোমিটারেরও অধিক দূরত্ব পাড়ি দিয়েছিল। তার প্রথম নৌবহরে ৩১৭-টি জাহাজ অন্তর্ভূক্ত ছিল এবং এতে ছিল ২৭,৮৭০ জন পুরুষ। কোনো ধাতু ছাড়াই ৪০০ ফুটের অধিক দৈর্ঘ্যের এসব জাহাজ কীভাবে নির্মিত হয়েছিল, সেটা আমাদের নিকট আজও অজানা। প্রকাণ্ড এসব জাহাজ ভাস্কো দ্য গামার মতো ইউরোপীয় অনুসন্ধানীদের ব্যবহৃত জাহাজের তুলনায় ছিল পাঁচগুণ বড় এবং 'দেখা'-র সুবিধার জন্য এসব জাহাজের সামনের অংশ ড্রাগনের চোখের ন্যায় বিন্দুযুক্ত হওয়ায় এগুলো 'সাঁতারু ড্রাগন' নামে পরিচিত ছিল।

প্রকাণ্ড এই নৌবহরের অভিযানসমূহে জাভা, সুমাত্রা, সিলন, সিয়াম, পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, বাংলা, মালদ্বীপ, হরমুজের পারস্য সাম্রাজ্য, রিউকু দ্বীপপুঞ্জ, ব্রুনাই, বোর্নিও, মোগাদিসু, মোম্বাসা এবং পূর্ব আফ্রিকার বিভিন্ন বন্দর পর্যন্ত ভ্রমণ করা হয়েছিল। এমনকি তারা উত্তমাশা অন্তরীপ চক্কর দিয়েছিল বলেও অনুমান করা হয়।

বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এবং মুক্তা, খনিজ পদার্থ, উদ্ভিদ, লতা-গুল্ম, জীবজন্তু, ঔষধ ও বিভিন্ন চিকিৎসা কৌশল অনুসন্ধানে বের হওয়ার ধারণাকে লালন করেই এই সমুদ্রযাত্রাগুলোর আয়োজন হয়েছিল। নৌ-চালনা ও মানচিত্রাঙ্কন বিদ্যাকে সমৃদ্ধ করার পাশাপাশি এসব অভিযান আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিকাশে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছিল। এছাড়া রেশমি ও সুতি বস্ত্র, চীনামাটির বাসনকোসন, স্বর্ণ ও রৌপ্য সামগ্রী, তামার গৃহস্থালী সরঞ্জাম এবং লোহার অস্ত্রসহ বিপুল পরিমাণ মালের বাণিজ্যও এসব জাহাজ করেছিল। জিরাফ ও উটপাখির মতো জীবন্ত প্রাণী বহনের পাশাপাশি জীবন্ত মাছ রাখা ও গোসলের জন্য জাহাজে জলরোধী বেষ্টনীরও ব্যবস্থা ছিল।

০২ ইউরোপের শীর্ষস্থানীয় প্রতিভা

বহু ইউরোপীয় পণ্ডিত রয়েছেন, যুগান্তকারী কীর্তি এবং আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে অসামান্য অবদানের জন্য যারা চিরস্মরণীয়। কালানুক্রমে আমরা ওইসব পণ্ডিতের একটি তালিকা নিচে দিয়েছি, যারা তাদের সময়ের জ্ঞানকে ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন – বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে যাদের প্রভাব সুদূরপ্রসারী– এবং যারা প্রভাবিত হয়েছেন মুসলিম মনীষীদের দ্বারা।

রজার বেকন (১২১৪ - ১২৯২)

পশ্চিমা ইউরোপে পরীক্ষামূলক পদ্ধতির প্রবর্তক এই অক্সফোর্ড পণ্ডিত স্পেনের মুরদের থেকে শিক্ষা লাভ করা ছাত্রদের থেকে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ লাভ করেছিলেন। তিনি আরবীতে অনর্গল কথা বলতে পারতেন এবং আরবী ভাষাজ্ঞান ও আরবীয় বিজ্ঞান যে তৎকালে সত্যিকার জ্ঞানরাজ্যে প্রবেশের একমাত্র দরজা, সে ব্যাপারে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণে কখনোই ক্লান্তি বোধ করেননি।

বেকন তার রচিত *Opus Maius* গ্রন্থের আলোকবিজ্ঞান বা অপটিক্স অধ্যায়ের প্রায় প্রতি পদে হয় ইবনুল হাইছামের উদ্ধৃতি উল্লেখ করেছেন, না হয় তাকে ইশারা করেছেন। উক্ত গ্রন্থের চতুর্থ অংশের ভিত্তি, বিশেষভাবে দৃষ্টিশক্তির অনুপ্রবেশ তত্ত্বের সাথে সম্পৃক্ত অংশটুকু ইবনুল হাইছামের প্রাপ্ত অনুসন্ধানের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি তথা পরীক্ষা বা গবেষণা নির্ভর পদ্ধতির উদ্ভাবক ছিলেন ইবনুল হাইছাম, আর বেকন এটাকেই লুফে নিয়েছিলেন।

আল-কিন্দী ছিলেন বেকনের অনুপ্রেরণার আরেকটি উৎস। রশ্মিবিজ্ঞান ও তাত্ত্বিক আলোকবিজ্ঞানের উপর আল-কিন্দীর লেখা দুটো প্রবন্ধ এই ইংরেজ ব্যক্তি ব্যবহার করেছিলেন।

ইবনে ফিরনাসের উড্ডয়ন যন্ত্র দ্বারা অনুপাণিত হয়েই বেকন তার *ornithopter* বা উড্ডয়ন যন্ত্র নির্মাণ করেছিলেন, যার বিবরণ ১২৬০ খ্রিস্টাব্দের দিকে তার লেখা *De Mirabili Potestate Artis et Naturae* (শিল্প ও প্রকৃতির বিস্ময়কর ক্ষমতা) নামক পাণ্ডুলিপিতে রয়েছে। এটা সুবিদিত যে, বেকন তার শিক্ষা জীবন পার করেছেন আব্বাস ইবনে ফিরনাসের জন্মভূমি কর্ডোবায়।

গানপাউডার বা বারুদ নিয়ে বেকনের লেখাগুলো মুসলিম উৎস এবং *Liber lgnium of Marcus Graecus* নামক লাতিন গ্রন্থের উপর ভিত্তিশীল। পরবর্তীতে স্প্যানীয় ভাষায় অনুবাদ হওয়া এসব আরবী গ্রন্থের সাহায্যে তিনি বারুদের বিভিন্ন রেসেপি উন্নয়নে দারুণভাবে সফল হন।

আরবী গ্রন্থগুলোর লাতিন অনুবাদের মাধ্যমে রজার বেকন মুসলিম রসায়নের সাথে পরিচিত হন এবং তিনি আলকেমির গুরুত্ব ও তার রূপান্তরে বিশ্বাসী হয়ে উঠেন।

চিকিৎসাবিজ্ঞানে তার প্রধান পথপ্রদর্শক ছিল ইবনে সীনার আল-কানুন, যার নমুনা আমরা তার গ্রন্থে এটার অসংখ্য উদ্ধৃতি ও উল্লেখ থেকে দেখতে পাই।

বেকনের চিন্তা জগতে যা ব্যাপক প্রভাব রেখেছিল এবং যা তাকে তার পশ্চিমা সমসাময়িকদের থেকে আলাদা করেছিল, তা হচ্ছে: পশ্চিমে রাযিস নামে পরিচিত ৯ম শতাব্দির যাকারিয়া আর-রাযীর লেখা "*সিররুল আসরার*" (রহস্যের রহস্য) নামের গ্রন্থ। লাতিন ভাষায় এটা *Secretum Secretorum* নামে পরিচিত।

লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি (১৪৫২ - ১৫১৯)

ইতালীয় চিত্রশিল্পী, ভাস্কর, স্থপতি, সঙ্গীতজ্ঞ, প্রকৌশলী, গণিতজ্ঞ এবং বিজ্ঞানী লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি ছিলেন রেনেসাঁ পরবর্তী ইউরোপের অন্যতম প্রভাবশালী ব্যক্তি। সাম্প্রতিককালের গবেষণা এটা দেখাচ্ছে যে, তার মা ছিলেন উত্তর আফ্রিকীয় বংশোদ্ভূত।

দ্য ভিঞ্চির আঁকা 'ভিটরুভিয়াস মানব' (একটি বৃত্ত ও বর্গে দৃশ্যমান এবং দু'বাহু দু'দিকে ছড়ানো অবস্থায় নিখুঁতভাবে দুটো সমান অনুপাতে বিন্যস্ত মানবচিত্র) *Roman Canon of Vitruvius*-এ সংযুক্ত রয়েছে। দ্য ভিঞ্চির এই চিত্রকর্ম এজন্য সৃজনশীল যে, বর্গক্ষেত্রে মানবদেহ অঙ্কন করলে তার কেন্দ্র নাভি নয়, বরং কানুনের ভাষ্য মোতাবেক তা: নিম্নাংশ। কিন্তু পাঁচ শতাব্দি পূর্বে ১০ম শতাব্দির *ইখওয়ানুস সাফা* বা পবিত্রতার ভ্রাতৃসংঘ নামে পণ্ডিতদের একটি সংগঠন একই উপসংহারে উপনীত হয়েছিল। তারা বলেছিল যে, সাত বছরের কম বয়সী শিশুদের বেলায় নাভি দেহের কেন্দ্র এবং সাত বছর পরবর্তী মানুষের জন্য এই কেন্দ্র নাভি থেকে কুঁচকি বা ত্রিকাস্থিতে স্থানান্তরিত হয়।

লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চিসহ ইউরোপের জ্যামিতি বিষয়ক চিন্তার অন্যতম উৎস ইবনে সীনার *"কিতাব আশ-শিফা"* (আরোগ্য বা অজ্ঞতার অবসান) নামক গ্রন্থটি, ইতিহাসবেত্তাগণ সেটা স্বীকার করে নিয়েছেন।

লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি কর্তৃক ক্যামেরার পূর্ণাঙ্গ ও সমৃদ্ধ নকশা তৈরির বহু পূর্বেই ইবনুল হাইছাম ক্যামেরা অবস্কিউরা উদ্ভাবন করেছিলেন।

দ্য ভিঞ্চি কারুকার্যময় আরবীয় নকশা দ্বারা বেশ বিমোহিত হন এবং তিনি নিজেই তৈরি করে নেন তার নিজস্ব জটিল কারুকার্যময় নকশা। বিশেষভাবে মুসলিম গিঁটুযুক্ত নকশা তাকে এটাই উৎসাহী করেছিল যে, তিনি ছয়গিঁটের দুটো ফলক তৈরি করে বসেন। পরবর্তীতে ১৪৮৩ এবং ১৪৯৯ খ্রিস্টাব্দের দিকে মিলান শহরে তার এক অনুসারী বৃত্তাকার কপারের খোদাই-কার্যে তার অনুলিপি তৈরি করেছিল।

নিকোলাস কপার্নিকাস (১৪৭৩ - ১৫৪৩)

পোল্যান্ডের বিজ্ঞানী নিকোলাস কপার্নিকাস সম্পর্কে বলা হয় যে, তিনি আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের জনক।

কিন্তু তার অধিকাংশ তত্ত্বই নাসিরউদ্দীন আত-তুসী এবং ইবনে আশ-শাতিরের দেয়া তত্ত্বের উপর ভিত্তিশীল। এক শতাব্দি পরে কপার্নিকাস গ্রহমণ্ডলের যে মডেল দিয়েছেন, তা তাত্ত্বিক ও গাণিতিকভাবে ইবনে আশ-শাতিরের দেয়া মডেলের সাথে হুবহু মিলে যায়। কপার্নিকাস তার অধ্যয়নস্থল ইতালিতে এসব গ্রন্থের সাথে পরিচিত হন, এটা তাই নির্দেশ করছে।

এমনটি ধারণা করা হয় যে, ১০২৮ খ্রিস্টাব্দে জন্ম নেয়া আয-যারকালী রচিত বিখ্যাত টলেডীয় সারণী কপার্নিকাসের উপর সীমাহীন প্রভাব রেখেছে।

তারকারাজির তালিকা এবং গ্রহমণ্ডলের সারণীসহ আল-বাত্তানী সামগ্রিক জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়ে যেসব প্রবন্ধ রচনা করেছেন, কপার্নিকাস সেগুলোর উপর ভীষণভাবে নির্ভরশীল ছিলেন, এটা বেশ সুবিদিত একটি বিষয়। তিনি তার *De Revolutionibus* গ্রন্থ রচনায় আয-যারকালী ও আল-বাত্তানীর উপর অতিমাত্রায় নির্ভর করেছিলেন।

ট্যাকো ব্রাহে (১৫৪৬ - ১৬০১)

রেনেসাঁ যুগের এই ডেনিশ জ্যোতির্বিদ কোয়াডর‍্যান্ট (কৌণিক পরিমাপের সাহায্যে উচ্চতা মাপার যন্ত্র) তৈরি এবং ইউরোপের অন্যতম প্রধান মানমন্দির প্রতিষ্ঠাসহ বহু গুরুত্বপূর্ণ কীর্তির কারিগর।

চাঁদের গতির তারতম্য পুনরাবিষ্কারের জন্য তিনি সুবিখ্যাত, যা ৬০০ বছর পূর্বে মুসলিম জ্যোতির্বিদ মুহাম্মদ আবুল ওফা আল-বুযানী প্রথম আবিষ্কার করেছিলেন।

ট্যাকোর বিখ্যাত দেয়ালস্থ কোয়াডর‍্যান্ট যন্ত্রটি ছিল মুসলিম বিশ্বের পূর্বাঞ্চল বিশেষভাবে জ্যোতির্বিদ তাকিউদ্দীনের নির্মিত যন্ত্রগুলোর অনুরূপ।

ইয়োহান কেপলার (১৫৭১ - ১৬৩০)

গ্রহমণ্ডলের গতির নিয়মনীতি আবিষ্কার এবং আলোকবিজ্ঞানের উপর কাজের জন্য পশ্চিমে ইয়োহান কেপলার বেশ পরিচিত। ক্যামেরা অবস্কিউরার প্রথম সঠিক গাণিতিক তত্ত্বের প্রবর্তক এবং রেটিনাতে সৃষ্ট উল্টানো ছবিসহ মানবচক্ষুর কার্যক্রমের প্রথম সঠিক ব্যাখ্যা প্রদানকারী হিসেবে তিনি পশ্চিমে বিপুলভাবে সমাদৃত।

কেপলারের কাজে সহজেই ইবনুল হাইছামের ছাপ সনাক্ত করা যাবে, কেননা ৬০০ বছর পূর্বে আলোকবিজ্ঞানে তিনিই বিপ্লব এনেছিলেন। তার রচিত *"কিতাব আল-মানাযির"* ক্রিমোনার জেরার্ড কর্তৃক লাতিন ভাষায় অনূদিত হয়, যা *Perspectiva* বা *De aspectibus* নামে পরিচিত।

আলোর প্রতিসরণ বিষয়ে কেপলার এবং ডেকার্ত উভয়েই ইবনুল হাইছামের গবেষণার উপর নির্ভর করেছিলেন। ইবনুল হাইছাম যেখানে শেষ করেছিলেন কেপলার ঠিক সেখান থেকেই আরম্ভ করেছিলেন।

ক্যামেরা অবস্কিউরার প্রথম আবিষ্কারের পর কেপলার এটার প্রভূত উন্নয়ন ঘটান। প্রজেক্টেড ইমেজ বা অভিক্ষিপ্ত ছবিকে বড় করতে পজিটিভ লেন্সের পিছনে নেগেটিভ লেন্স স্থাপন করে তিনি এটার সমৃদ্ধি ঘটান। অভিক্ষিপ্ত ছবি বড় করার এই কৌশল আধুনিক টেলিফটো লেন্সে ব্যবহৃত হয়।

রবার্ট বয়েল (১৬২৭ - ১৬৯১)

আধুনিক রসায়নের জনক হিসেবে রবার্ট বয়েলের সুখ্যাতি থাকলেও বদ্ধ অবস্থায় গ্যাসের চাপ ও আয়তনের সাথে সম্পৃক্ত গ্যাস-সূত্রের জন্য তিনি সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। প্রাকৃতিক দর্শনের পাণ্ডুলিপিগুলো আরবী ও সিরীয় ভাষায় লিখিত হওয়ায় তিনি পূর্বাঞ্চলীয় এসব ভাষা অধ্যয়ন করেছিলেন। ১৩শ শতাব্দি মুসলিম রসায়নবিদ আল-ইরাকী এবং ১৪শ শতাব্দির সিরীয় ভূগোলবিদ আবুল ফিদা কর্তৃক সংকলিত দ্রাঘিমারেখা ও অক্ষাংশের সারণীগুলো পর্যন্ত এই পণ্ডিতের অধ্যয়নে ছিল। প্রায়শই তিনি জাবির ইবনে হাইয়ানের ন্যায় মুসলিম রসায়নবিদদের চর্চায় মগ্ন হয়ে যেতেন। রসায়নে পরীক্ষামূলক পদ্ধতির প্রয়োগে বয়েল ও *জিবার* (জাবির ইবনে হাইয়ান) উভয়েই চ্যাম্পিয়ন ছিলেন, যদিও এদের মাঝে রয়েছে নয় শতাব্দির ব্যবধান।

০৩ এক হাজার বছরের পাণ্ডিত্য

আপনার রেফারেন্স বা তথ্য-নির্দেশের জন্য এই গ্রন্থে যাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তাদের নাম, জন্ম ও মৃত্যু তারিখ, জন্মস্থান-কর্ম এবং পেশার বিবরণ নিম্নে তুলে ধরা হলো। সম্ভ্রান্ত পরিবার থেকে আসা এসব বিদ্বানের নাম বেশ লম্বা হলেও মোটা অক্ষরের নামগুলো দিয়েই তারা সমধিক পরিচিত।

আ

আবু আবদুল্লাহ আল-বাকরী (১০১৪-১০৯৪): হুয়েলবা, স্পেন; ভূবিজ্ঞানী এবং ইতিহাসবেত্তা।

আবুল ফিদা (১২৭৩-১৩৩১): সিরিয়ার হামা; ভূবিজ্ঞানী এবং জ্যোতির্বিদ।

আবুল ওফা, মুহাম্মদ আল-বুযানী (৯৪০-৯৯৮): বুযানী, বাগদাদ, ইরাক; গণিতজ্ঞ, জ্যোতির্বিদ এবং জ্যামিতি বিশেষজ্ঞ।

আদ-দাখওয়ার (১৩শ শতাব্দির শুরুর দিক): আলেপ্পো, সিরিয়া; আন-নূরী হাসপাতালের চিকিৎসক।

আলবার্তোস ম্যাগনাস, যিনি আলবার্ট দ্য গ্রেট নামেও পরিচিত (১২০৬-১২৮০): বায়ার্ন; বিজ্ঞানী, দার্শনিক এবং ধর্মতত্ত্ববিদ।

আলফোনসো এক্স, আলফোনসো দ্য ওয়াইজ (জ্ঞানী আলফোনসো) নামেও পরিচিত (১২২১-১২৮৪): কাস্তাল এবং লেওনের স্পেনীয় রাজা (১২৫২-১২৮০); তৃতীয় ফার্দিনান্দের পুত্র ও উত্তরাধিকার।

আল-বাগদাদী, আসল নাম আবু মানসূর আবদুল কাহির ইবনে তাহির ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ আত-তামিমী আশ-শাফী, ইবনে তাহির নামেও পরিচিত (৯৮০-১০৩৭): বাগদাদ, ইরাক; গণিতজ্ঞ।

আর্কিমিডিস (খ্রিস্টপূর্ব ২৮৭-২১২): সিরাকাস, সিসিলি; জ্যোতির্বিদ।

আল-বিরুনী, মুহাম্মদ ইবনে আহমাদ আবুল রায়হান (৯৭৩-১০৫০): খাওয়ারিযমে জন্মগ্রহণ নেন এবং গজনীতে মৃত্যুবরণ করেন; গণিতজ্ঞ, ভূবিজ্ঞানী, ফার্মাসিস্ট, চিকিৎসক, পদার্থবিদ এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বিশেষজ্ঞ।

আল-বিতরুযি, নূরুদ্দীন ইবনে ইসহাক (মৃ. ১২০৪), আলপেট্রাগিয়াস নামেও পরিচিত: মরক্কো এবং সেভিল; জ্যোতির্বিদ।

আল-বাত্তানী, আবু আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে জাবির, *আলবাটেগনিয়াস* নামেও পরিচিত (৮৫৮-৯২৯): তুরস্কের হাররানে জন্ম এবং ইরাকের বাগদাদ তার কর্মস্থল; জ্যোতির্বিদ এবং গণিতজ্ঞ।

আদ-দিমাস্কী (১২৫৬-১৩২৭); দামেস্ক, সিরিয়া; পর্যটক এবং অনুসন্ধানী।

আদ-দিনাওয়ারী, আবু হানিফা (মৃ. ৮৯৫); আন্দালুস, স্পেন; উদ্ভিদবিজ্ঞানী।

আল-ফারাজী, আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইব্রাহীম (মৃ. আনুমানিক ৭৭৭) কুন্দুয, আফগানিস্তান; গণিতজ্ঞ, দার্শনিক, কবি এবং জ্যোতির্বিদ। আস্তর্লাব নির্মাণকারী প্রথম মুসলিম জ্যোতির্বিদ।

আল-গাফিক্বী, মুহাম্মদ ইবনে ক্বাসূম ইবনে আসলাম (মৃ. ১১৬৫); চিকিৎসক, চক্ষু সার্জন এবং ভেষজ ঔষধ বিক্রেতা।

আল-গাযালী, আবু হামিদ, পশ্চিমে আলগাজেল নামে পরিচিত (১০৫৮-১১২৮); খোরাসান, ইরান; দার্শনিক এবং ধর্মতত্ত্ববিদ।

আবু বকর ইবনে আল-সাররায আল-হামাবী (মৃ. ১৩২৮/৯); হামা, সিরিয়া; জ্যামিতিবেত্তা, জ্যোতির্বিদ এবং প্রকৌশলী।

আল-ফারাবী, আবু নসর (৮৭০-৯৫৯), আলফারাবিয়াস নামেও পরিচিত; কাজাখস্তানের নিকটবর্তী ফারাবে জন্ম হলেও তিনি মূলত ইরাকেই বিপুল সমৃদ্ধি অর্জন করেন; দার্শনিক এবং সঙ্গীত তত্ত্ববিদ।

আল-ফারগানী, আবুল আব্বাস আহমাদ ইবনে কাছীর, আলফারাগনাস হিসেবে পরিচিত (মৃ. ৮৬১); ফারগানা, মধ্য

এশিয়া; জ্যোতির্বিদ এবং সার্জন।

আল-জাহিয, আবু উছমান আমর ইবনে বাহর (আনুমানিক ৭৭৬-৮৬৮); বসারা, ইরাক; দার্শনিক এবং প্রাণিবিজ্ঞানী।

আল-জাযারী, বাদিউয যামান আবুল ইয ইসমাঈল ইবনে রায্যায আল-জাযারী (১৩শ শতাব্দির শুরুর দিক); দিয়ারবাকির, তুরস্ক; প্রকৌশলী।

আল-জুরজানী, আবু রুহ মুহাম্মদ ইবনে মানসূর ইবনে আবদুল্লাহ (আনুমানিক ১০৮৮); আস্তরাবাদ, ইরান; চক্ষু বিশেষজ্ঞ এবং সার্জন।

আল-মামুন, আবু জাফর আল-মামুন ইবনে হারুন (৭৮৬-৮৩৩); আব্বাসী খলীফাদের মাঝে সবচেয়ে প্রগতিশীল ও আলোকিত চিন্তার অধিকারী খলীফা – যিনি ৮১৩ থেকে ৮৩৩ খ্রিস্টাব্দ রাজ্য শাসন করেন; বায়তুল হিকমাকে তিনি আরও সম্প্রসারিত করেছিলেন।

আল-মানসূর, আবু জাফর আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ আল-মানসূর (৭১২-৭৭৫); ৭৫৪-৭৭৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাগদাদ শাসন করা এই ব্যক্তি ৭৬২ খ্রিস্টাব্দে বাগদাদ শহরের গোড়াপত্তন করেছিলেন।

আল-মানসূর, ইয়াকুব (১১৬০-১১৯৯); মারাকেশ, মরক্কো; আল-মোহাদের এই সুলতান ১১৮৪ থেকে ১১৯৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মারাকেশ শাসন করেন।

আল-মাক্বরিযী, তাকিউদ্দীন আহমাদ ইবনে আলী ইবনে আবদুল কাদির ইবনে মুহাম্মদ (১৩৬৪-১৪৪২); কায়রো, মিশর; ইতিহাসবেত্তা।

আল-খুজান্দী, আবু মাহমূদ হামিদ ইবনুল খিযির (৯৪০-১০০০); খুজান্দ, তাজিকিস্তান; জ্যোতির্বিদ, ইরানের রাঈ-এ তিনি মানমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেইসাথে নির্মাণ করেন সেক্সট্যান্ট যন্ত্র।

আল-খাওয়ারিযমী, মুহাম্মদ ইবনে মূসা (৭৮০-৮৫০); খাওয়ারিযম, ইরান; গণিতজ্ঞ, জ্যোতির্বিদ এবং ভূগোলবিদ – যার নাম থেকে 'এলগরিদম' শব্দের উৎপত্তি।

আল-কিন্দী, আবু ইউসূফ ইয়াকুব ইবনে ইসহাক আল-সাবাহ (৮০১-৮৭৩); কুফা, ইরাক; সাংকেতিক বার্তা উদ্ধারকারী (*cryptanalyst*), গণিতজ্ঞ, জ্যোতির্বিদ, চিকিৎসক, ভূগোলবিদ এবং প্রতিভাবান সঙ্গীত বিশেষজ্ঞ।

আল-কূহী, আবু সাহল বিযান ইবনে রুস্তম (১০শ শতাব্দি); তাবারিস্তানের কুহে জন্ম নিলেও বাগদাদ পরিণত হয় তার কর্ম ও সমৃদ্ধিস্থলে; গণিতজ্ঞ এবং জ্যোতির্বিদ।

আল-কারাজী, আবু বকর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আল-হুসাইন, আল-কারখী নামেও তিনি পরিচিত (৯৫৩-১০২৯); বাগদাদ, ইরাক; গণিতজ্ঞ এবং প্রকৌশলী। তিনিই "*আল-ফাখরী*" গ্রন্থের রচয়িতা।

আল-কাশগরী, মাহমূদ (১০৭৩); তুরস্ক; ভূগোলবিদ এবং অভিধানপ্রণেতা।

আল-কাশী, গিয়াসউদ্দীন (১৩৮০-১৪২৯); কাশান, ইরান; গণিতজ্ঞ এবং জ্যোতির্বিদ।

আল-মাজূসী, আলী ইবনে আব্বাস (১০ম শতাব্দি); আহওয়ায, ইরান; ভূগোলবিদ।

আল-মাসউদী, আবুল হাসান আলী ইবনে আল-হুসাইন (৮৭১-৯৫৭); বাগদাদ, ইরাক; অনুসন্ধানী, ভূগোলবিদ এবং ইতিহাসবেত্তা।

আল-মাওসিলী, আম্মার ইবনে আলী (১০শ শতাব্দি); মাওসুল, ইরাক; চক্ষু সার্জন এবং চক্ষু বিশেষজ্ঞ।

আল-মুয়িজ্জ, লিদ্দীনিল্লাহ (৯৩০-৯৭৫); শক্তিশালী ফাতিমী খলীফা, যিনি ফাতিমী শাসনকে উত্তর আফ্রিকা থেকে মিশর পর্যন্ত বিস্তৃত করেন; ৯৭২/৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি ইসলামী কায়রো – আল-কাহিরাহ – শহর এবং আল-আযহার মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন।

আল-মুকতাফী (মৃ. ৯০৮); ৯০২-৯০৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাগদাদ শাসন করেছিলেন এই আব্বাসী খলীফা।

আল-মুকাদ্দিসী, মুহাম্মদ ইবনে আহমাদ শামসুদ্দীন (আনুমানিক ৯৪৫-১০০০); জেরুজালেম; ইতিহাসবেত্তা এবং ভূগোলবিদ।

আল-মুতাওয়াক্কিল: ৮৪৭-৮৬১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সামার্‌রা, ইরাক থেকে আব্বাসী খিলাফতের শাসনকার্য পরিচালন করেন। তার পিতা আল-মু'তাসিমের প্রতিষ্ঠিত এই সামার্‌রা শহর অল্প সময়ের জন্য খিলাফতের রাজধানী ছিল।

আন-নুয়াইরী, আবুল আব্বাস আহমাদ (১২৭৮-১৩৩২); কায়রো, মিশর; ইতিহাসবেত্তা।

আল-কাজবিনী, যাকারিয়া ইবনে মুহাম্মদ (১২০৩-১২৮৩); কাজবিন, ইরান, পর্যটক, অনুসন্ধানী এবং বিচারক (কাযী)

আর-রাম্মাহ, আল-হাসান নাজমুদ্দীন (আনুমানিক ১২৮৫); সিরিয়া; প্রকৌশলী এবং সামরিক ইতিহাসবেত্তা।

আর-রাযী, আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে যাকারিয়া (৮৬৫-৯২৫); রাঈ, ইরান; চিকিৎসক এবং পশ্চিমে রাযিস নামে পরিচিত রসায়নবিদ।

আস-সামাওয়াল, ইবনে ইয়াহইয়া আল-মাগরিবী (মৃ. ১১৮০); বাগদাদ, ইরাক; গণিতজ্ঞ এবং জ্যোতির্বিদ।

আত-তুসী, নাসিরুদ্দীন (১২০১-১২৭৪); মারাগা (তুস), খোরাসান, ইরান; জ্যোতির্বিদ, গণিতজ্ঞ এবং

দার্শনিক।

আয-যাহরাবী, আবুল ক্বাসিম খালাফ ইবনে আল-আব্বাস আয-যাহরাবী, পশ্চিমে আবুলকাসিস নামে পরিচিত (৯৩৬-১০১৩); কর্ডোবা, স্পেন; চিকিৎসক এবং সার্জন।

আয-যারকালী, আবু ইসহাক ইব্রাহীম ইবনে ইয়াহইয়া, *আরযাকেল* নামেও যিনি পরিচিত (১০২৯-১০৮৭); টলেডো, স্পেন; জ্যোতির্বিদ – টলেডো সারণীসমূহ তারই সংকলন।

আস-সূফী, আবদুর রহমান (৯০৩-৯৮৬); ইস্পাহান, ইরান; জ্যোতির্বিদ।

আস-সুলী, আবু বকর মুহাম্মদ (১০শ শতাব্দি); তুখোড় দাবারু।

আল-ওয়ালিদ ইবনে আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ান (৬৬৮-৭১৫); দামেস্ক, সিরিয়া থেকে শাসনকার্য পরিচালনাকারী উমাইয়া খলীফা। দামেস্কের সুবিশাল উমাইয়া মসজিদ তারই অনন্য কীর্তি।

আলী ইবনে খালাফ আশ-শাক্কায (১১শ শতাব্দি); টলেডো, স্পেন; ভেষজ ঔষধ বিক্রেতা এবং জ্যোতির্বিদ।

আল-ইদরিসী (১০৯৯-১১৬৬); সিউটা (মরক্কো) এবং পালেরমো, সিসিলি; ভূগোলিবিদ এবং রাজমিস্ত্রী।

আল-ফিরদাউসী, আবুল ক্বাসিম মানসূর (৯৪০-১০২০); খোরাসান, ইরান; ইতিহাসবেত্তা এবং কাহিনীকার।

আহমাদ আল-হালাবী (মৃ. ১৪৫৫); আলেপ্পো, সিরিয়া; জ্যোতির্বিদ।

ই

ইবনে আবী উসাইবিয়াহ (মৃ. ১২৭০); দামেস্ক, সিরিয়া, মিশরে চিকিৎসা অনুশীলন করেন, চিকিৎসক ও ফার্মাসিস্টদের বিভিন্ন ঘটনা লিপিবদ্ধ করতেন; চিকিৎসক এবং চক্ষু বিশেষজ্ঞ।

ইবনে আক্বীল, আবুল ওফা আলী (১০৪০-১১১৯); বাগদাদ, ইরাক; ধর্মতত্ত্ববিদ ও মানবতাবাদী।

ইবনে আল-আওয়াম (১২শ শতাব্দি); সেভিল, স্পেন; কৃষিবিদ।

ইবনুল বাইতার, আবু মুহাম্মদ দ্বীয়া আল-দ্বীন আবদুল্লাহ ইবনে আহমাদ (১১৯৭-১২৪৮); মালাগা, স্পেন; চিকিৎসক, ভেষজ ঔষধ বিক্রেতা, ফার্মাসিস্ট এবং উদ্ভিদ বিশেষজ্ঞ।

ইবনুল ফাকীহ, আল-হামাদানী (১০ম শতাব্দি); বাগদাদ, ইরাক; ভূগোলবিদ এবং পর্যটক।

ইবনুল হাইছাম, আবু আলী আল-হাসান (৯৬৫-১০৩৯), আলহাজেন নামেও পরিচিত; সিরিয়া, মিশর; পদার্থবিদ এবং গণিত বিশেষজ্ঞ।

ইবনুল হাজ্জ, মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ, আবু আবদুল্লাহ (১২৫৮-১৩৩৬); ফেয, মরক্কো; শিক্ষাবিদ এবং ধর্মতত্ত্ববিদ।

ইবনুল জাযার, আবু জাফর আহমাদ ইবনে আবী খালিদ (আনুমানিক ৮৫৫-৯৫৫); আল-কায়রাওয়ান, তিউনিস; চিকিৎসক।

ইবনে নাদিম, আবুল ফারাজ মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (১০ম শতাব্দি); বাগদাদ, ইরাক; জীবনীকার এবং "*কিতাব আল-ফিহিরিস্ত*" নামক গ্রন্থের রচয়িতা; বই বিক্রেতা এবং ক্যালিগ্রাফি অঙ্কনশিল্পী।

ইবনে আন-নাফীস, আবুল হাসান আলাউদ্দীন আলী ইবনে আবী হাযম আল-কুরাইশী (১২১০-১২৮৮); দামেস্ক, সিরিয়া, মিশরের কায়রো তার কর্মক্ষেত্র – এখানেই তিনি ব্যাপক সাফল্য লাভ করেন; চিকিৎসক এবং তিনিই রক্ত সঞ্চালনের আবিষ্কারক।

ইবনুল কুফ, আবুল ফারাজ ইবনে ইয়াকুব ইবনে ইসহাক আমীন আদ-দৌলা আল-ফারাকী (১২৩৩-১২৮৬); দামেস্ক, সিরিয়া; চিকিৎসক।

ইবনুল সাফ্ফার, আবুল কাসিম আহমাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমর আল-গাফিকী, ইবনুস সাফ্ফার নামেরই তিনি সমধিক পরিচিত –এর অর্থ: 'তাম্রকারের পুত্র' (মৃ. ১০৩৫); কর্ডোবা, স্পেন; গণিতজ্ঞ এবং জ্যোতির্বিদ।

ইবনে আশ-শাতির আল-মাওয়াকীত (১৩০৪-১৩৭৫): দামেস্ক, সিরিয়া; জ্যোতির্বিদ এবং দামেস্কের সুবিশাল উমাইয়া মসজিদের সময়ের হিসেব রাখতেন।

ইবনে আত-তাহাবী, আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ আল-আযাদী (মৃ. ১০৩৩); সুহার, ওমান; চিকিৎসক এবং বিশ্বকোষ সংকলক।

ইবনুল ওয়াফিদ, আবুল মুতারি্রফ আব্দুর রহমান (১০০৮-১০৭৪); আবেংগুফিট নামেও যিনি পরিচিত; টলেডো, স্পেন; চিকিৎক এবং ঔষধ প্রস্তুতকারক।

ইবনে বাদিস, আল-মুয়িজ্জ (১০০৭-১০৬১); তিউনিস; ইতিহাসবেত্তা, বিজ্ঞানী, রসায়নবিদ এবং উত্তর আফ্রিকার শাসক।

ইবনে বাজ্জাহ, আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে আস-সায়িগ, আবিমপিস নামে যিনি পশ্চিমে পরিচিত (মৃ. ১১৩৮), সারাগোসা, স্পেন; দার্শনিক এবং চিকিৎসক।

ইবনে বাস্সাল, আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইব্রাহীম আত-তুলায়তুলী (১০৮৫); টলেডো, স্পেন; উদ্ভিদবিদ, কৃষিবিদ এবং বাগান বা উদ্যান পালক।

ইবনে বতুতা, আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ (১৩০৪-১৩৬৮/৭০); তানজাহ, মরক্কো; পর্যটক, অনুসন্ধানী এবং কাহিনীকার।

ইবনে ফালদান, আহমাদ (১০ম শতাব্দি); বাগদাদ, ইরাক; পর্যটক, অনুসন্ধানী এবং কাহিনীকার।

ইবনে ফিরনাস, আব্বাস (মৃ. ৮৮৭), কোরাহ, তাকার্না, স্পেন; মানবতাবাদী, প্রযুক্তিবিদ এবং রসায়নবিদ।

ইবনে হাওক্বাল, আবুল কাসিম মুহাম্মদ (৯২৯-৯৯০); নিসিবিন, ইরাক; পর্যটক, অনুসন্ধানী এবং কাহিনীকার।

ইবনে হাযম, আবু মুহাম্মদ আলী ইবনে আহমাদ ইবনে সাঈদ (৯৯৪-১০৬৪); কর্ডোবা, স্পেন; ধর্মতত্ত্ববিদ এবং উঁচু মাপের বিদ্বান ও পণ্ডিত।

ইবনে ঈসা, আলী (১০ম শতাব্দি); যিশু হালী নামেও তিনি পরিচিত; বাগদাদ, ইরাক; চিকিৎসক এবং চক্ষু বিশেষজ্ঞ।

ইবনে জুবায়ের, আবুল হাসান মুহাম্মদ ইবনে আহমাদ ইবনে জুবায়ের (১২শ শতাব্দি); গ্রানাডা, স্পেন; পর্যটক, অনুসন্ধানী এবং কাহিনীকার।

ইবনে জুলজুল আল-আন্দালুসী (আনুমানিক ৯৪৩); কর্ডোবা, স্পেন; চিকিৎসক, ভেষজ ঔষধ বিক্রেতা এবং ফার্মাসিস্ট।

ইবনে খালদুন, আব্দুর রহমান ইবনে মুহাম্মদ (১৩৩২-১৪০৬); তিউনিস; সমাজবিজ্ঞানী, ইতিহাসবেত্তা, দার্শনিক এবং অর্থনীতিবিদ।

ইবনে খুররাদাযবিহ (৮২০-৯১২) বাগদাদ, ইরাক; ভূগোলবিদ এবং বাগদাদের সরকারি ডাকবিভাগের পরিচালক ছিলেন।

ইবনে মাজিদ, শিহাবুদ্দীন আহমাদ আন-নাজদী (১৪৩২-১৫০০); নাজদ, সৌদি আরব; অভিজ্ঞ নাবিক।

ইবনে মুকলা, আবু আলী মুহাম্মদ (৮৬৬-৯৪০); বাগদাদ, ইরাক; আব্বাসী উজির, ক্যালিগ্রাফি শিল্পী এবং *নাসখ্‌* লিপির অন্যতম উদ্ভাবক।

ইবনে রুশদ, আবুল ওয়ালিদ মুহাম্মদ আল-কুরতুবী, *অ্যাভেরস* নামেও তিনি পরিচিত (১১২৬-১১৯৮); কর্ডোবা, স্পেন; দার্শনিক, চিকিৎসক, মানবতাবাদী এবং বিচারক।

ইবনে রুশতাহ, আহমাদ (১০ম শতাব্দি), ইস্পাহান, ইরান; অনুসন্ধানী এবং ভূগোলিবিদ।

ইবনে সাঈদ আল-মাগরিবী (১২১৪-১২৭৪); গ্রানাডা, স্পেন; ইতিহাসবেত্তা, কবি, পর্যটক এবং ভূগোলবিদ।

ইবনে সামাজুন (মৃ. ১০০২); আন্দালুস, স্পেন; ভেষজ ঔষধ বিক্রেতা, উদ্ভিদ বিশেষজ্ঞ এবং ফার্মাসিস্ট।

ইবনে সারাবিউন, ইউহান্না, সেরাপিওন নামেও তিনি পরিচিত (৯ম শতাব্দি); সিরিয়া; চিকিৎসক, গণিতজ্ঞ এবং জ্যোতির্বিদ।

ইবনে সীনা, আবিসিনা নামে যিনি সমধিক পরিচিত (৯৮০-১০৩৭); বুখারা, উজবেকিস্তান; চিকিৎসক, দার্শনিক, গণিতজ্ঞ এবং জ্যোতির্বিদ।

ইবনে তুলুন, আহমাদ (৮৩৫-৮৮৪); মূলত তিনি আব্বাসী খলীফার অধীনে কর্মরত ছিলেন, পরবর্তীতে তিনি আব্বাসী খিলাফতের আরেক অংশ মিশরে গভর্নর হিসেবে নিয়োগ পান। কায়রোতে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন বিখ্যাত ইবনে তুলুন মসজিদ।

ইবনে তুফায়েল, আবু বকর আবদুল মালিক ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে তুফায়েল আল-কায়সী, যিনি আবুবাকের নামে পরিচিত (মৃ. ১১৮৫); গ্রানাডা, স্পেন; দার্শনিক, চিকিৎসক এবং রাজনীতিবিদ।

ইবনে ইউনুস, আবুল হাসান আলী ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আহমাদ আস-সাদাফী (৯৫০-১০০৯); ফুসতাত, কায়রো; গণিতজ্ঞ এবং জ্যোতির্বিদ – হাকিমী টেবিল বা সারণীসমূহের সংকলক।

ইবনে যুহর, আবু মারওয়ান (১০৯১-১১৬১), এভেনযোয়ার নামে পরিচিত; সেভিল, স্পেন; চিকিৎসক এবং সার্জন।

ইখওয়ানুস সাফা, পবিত্রতার ভ্রাতৃসংঘ নামেও পরিচিত (আনুমানিক ৯৮৩); বসরা, ইরাক; একদল দার্শনিক।

ইয্‌যুদ্দীন আল-ওফাঈ (মৃ. ১৪৬৯); কায়রো, মিশর; জ্যোতির্বিদ এবং গণিতজ্ঞ।

ইউক্লিড (খ্রিস্টপূর্ব ৩২৫-খ্রিস্টপূর্ব ২৬৫); আলেকজান্দ্রিয়া, মিশর; গ্রিক গণিতজ্ঞ।

ইয়োহান কেপলার (১৫৭১-১৬৩০); স্টুটগার্টের নিকট এলাকা, জার্মানি; গণিতজ্ঞ এবং জ্যোতির্বিদ।

ইয়াহইয়া ইবনে মাসায়্যাহ, আবু যাকারিয়া (৭৭৬-৮৫৭); বাগদাদ, ইরাক; চিকিৎসক, ঔষধ প্রস্তুতকারক, প্রকৃতি বিজ্ঞানী এবং অনুবাদক।

ইয়াহইয়া ইবনে আবী মানসুর (৯ম শতাব্দি): বাগদাদ, ইরাক; খলীফা আল-মামুনের দরবারের জ্যোতির্বিদ। কথিত

"*আল-যিজ আল-মুমতাহান*" (সত্যায়িত সারণী) নামক গ্রন্থটি তারই সংকলন।

ইব্রাহীম ইবনে সিনান ইবনে সাবিত ইবনে কুররা (৯০৮-৯৪৬); হাররান, তুরস্ক; জ্যামিতিবেত্তা, জ্যোতির্বিদ এবং গণিতজ্ঞ।

ইয়াকুত, ইবনে আবদুল্লাহ রুমী আল-হামাবী (১১৭৯-১২২৯); আরব জীবনীকার, ইতিহাসবেত্তা এবং ভূগোলবিদ।

উ

উছমান ইবনে আফ্ফান, ইবনে আবিল আস ইবনে উমাইয়া (৫৭৭-৬৫৬); নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর সাহাবী এবং ইসলামের তৃতীয় মহান খলীফা। ৬৪৪-৬৫৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি খিলাফত কার্য চালান।

উমর আল-খাইয়্যাম, গিয়াসউদ্দীন আবুল ফাতাহ উমর ইবনে ইব্রাহীম আন-নিশাপুরী (১০৪৮-১১২২); নিশাপুর, ইরান; জ্যোতির্বিদ এবং গণিতজ্ঞ।

উমর ইবনে খাত্তাব, ইবনে নুফায়েল ইবনে আবদুল উয্যা ইবনে রায়্যাহ (আনুমানিক ৫৮১-৬৪৪); নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর সাহাবী এবং ইসলামের দ্বিতীয় মহান খলীফা। ৬৩৪-৬৪৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি খিলাফতের দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

উমর ইবনে ফাররুখান আত-তাবারী, উমর আলফ্রাগানুস নামেও পরিচিত (৯ম শতাব্দি); তাবারিস্তান, ইরান; জ্যোতির্বিদ; *Liber universus* গ্রন্থটি তারই সংকলন।

উলুগ বেগ, মুহাম্মদ তারাগাঈ (১৩৯৪-১৪৪৯); সামারকান্দ, উজবেকিস্তান; জ্যোতির্বিদ।

এ

এডেলার্ড বাথ (আনুমানিক ১০৮০-আনুমানিক ১১৬০): বাথ, ইংল্যান্ড; গণিতজ্ঞ এবং দার্শনিক।

এরিস্টটল (খ্রিস্টপূর্ব ৩৮৩-৩২২): স্টাগিরাস, গ্রিস; দার্শনিক।

ক

কুতুবুদ্দীন আস-সিরাজী (১২৩৬-১৩১১); সিরাজ, ইরান; জ্যোতির্বিদ।

কামালউদ্দীন, আবুল হাসান মুহাম্মদ আল-ফারিসী (আনুমানিক ১২৬০-১৩১৯); তাবরিজ, ইরান; গণিতজ্ঞ এবং পদার্থবিদ।

ক্লাডিয়াস টলেমিয়াস, যিনি **টলেমি** নামে পরিচিত (৮৫-১৬৫ খ্রিস্টাব্দ); আলেকজান্দ্রিয়া, মিশর; ভূগোলবিদ এবং জ্যোতির্বিদ।

কালাউন, সাইফুদ্দীন আল-আফিফী আল-মানসূও (১২২২-১২৯০); মামলুক সুলতান; ১২৮৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি প্রসিদ্ধ আল-মানসূরী হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

ক্রিমোনার জেরার্ড (আনুমানিক ১১১৪-১১৮৭); লোম্বার্ডি, ইতালি; অনুবাদক।

গ

গ্যালেন, ক্লাডিয়াস (আনুমানিক ১৩১-২০৬); পারগামাম/বার্গামা, তুরস্ক; চিকিৎসক।

জ

জাবির ইবনে আফলাহ (১১০০-১১৪৫); সেভিল, স্পেন; গণিতজ্ঞ এবং জ্যোতির্বিদ।

জাবির ইবনে হাইয়ান, আবু মূসা, জিবার নামে সমধিক পরিচিত (৭২২-৮১৫); তুস, ইরান – ইরাকের কুফাই ছিল তার নিবাস ও কর্মস্থল; রসায়নবিদ, ঔষধ বিশেষজ্ঞ এবং চিকিৎসক।

ট

ট্যাকো ব্রাহে (১৫৪৬-১৬০১): স্ক্যান, ডেনমার্ক; জ্যোতির্বিদ এবং প্রকৌশলী।

ত

তাকিউদ্দীন আর-রাশিদ, মুহাম্মদ ইবনে মারুফ আশ-শামী আল-আসাদী (আনমুনিক ১৫২৬-১৫৮৫); দামেস্ক, সিরিয়া; জ্যোতির্বিদ, প্রকৌশলী এবং যন্ত্র কারিগর।

তৃতীয় আবদুর রহমান, (৮৯১-৯৬১): স্পেনের কর্ডোবার খলীফা (৯১২-৯৬১); বিদ্বান ও শিল্পের পৃষ্ঠপোষক; কর্ডোবার উপকণ্ঠে তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন *মদীনাতুয যাহরা* (বর্তমানে ধ্বংসপ্রাপ্ত)।

দ

দ্বিতীয় আল-হাকাম (৯১৫-৯৭৮); কর্ডোবা, স্পেন; তৃতীয় আব্দুর রহমানের পুত্র; ৯৬১ থেকে ৯৭৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত আল-আন্দালুসের শাসক ছিলেন; গ্রন্থাগারের জন্য ছিলেন সুবিখ্যাত।

দ্বিতীয় ফ্রেডরিক (১১৯৪-১২৫০); সিসিলির রাজা; হোলি রোমান সম্রাট (১২২০-১২৫০)।

দ্বিতীয় রজার (১০৯৩-১১৫৪); পালেরমো, সিসিলি; সিসিলির নরম্যান রাজা। ভূগোলে প্রভূত আগ্রহ এবং মুসলিম ভূগোলবিদ আল-ইদরিসীকে সহায়তার জন্য সমধিক পরিচিত তিনি।

ন

নিকোলাস কপার্নিকাস, মিকোলায কপার্নিক বা নিকোলাস কপার্নিগ (১৪৭৩-১৫৪৩); টরুন, পোল্যান্ড; জ্যোতির্বিদ এবং গণিতজ্ঞ।

নূরুদ্দীন যঙ্গি (১১১৮-১১৭৪); সিরিয়ার আলেপ্পো ও দামেস্কের সুলতান; প্রথম হাসপাতালগুলোর মাঝে অন্যতম আন-নূরী হাসপাতাল তারই হাত ধরে প্রতিষ্ঠিত হয়।

প

প্রথম এডওয়ার্ড (১২৩৯-১৩০৭); ইংল্যান্ডের রাজা; ১২৭১-১২৭২ খ্রিস্টাব্দের দিকে আক্কায় ক্রুসেড অভিযানে যোগ দেন এবং ফেরার পর তিনি মুসলিম পরিকল্পনা মোতাবেক দুর্গ নির্মাণ করেন।

প্রথম আল-হাকাম (৭৯৬-৮২৩); কর্ডোবার শাসক।

পোপ দ্বিতীয় সিলভেস্টার (৯৪০/৯৫০-১০০৩); ওভেয়ানিয়া, ফ্রান্স; ৯৯৯-১০০৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত পোপের দায়িত্ব পালন করেন, দার্শনিক, গণিতজ্ঞ এবং অনুবাদক – তিনিই ইউরোপে আরবী সংখ্যা নিয়ে আসেন।

পালাদিও, আন্দ্রেয়া (১৫০৫-১৫৮০); পাদোভা, ইতালি; স্থপতি এবং চিত্রকর।

প্লেটো (খ্রিস্টপূর্ব ৪২৭-খ্রিস্টপূর্ব ৩৪৭); এথেন্স, গ্রিস; দার্শনিক।

পিরি রেইস, ইবনে হাজ্জ মুহাম্মদ (১৪৬৫-১৫৫৪); গ্যালিপলি, তুরস্ক; নৌ-সেনাপতি, ভূগোলবিদ, অনুসন্ধানী এবং মানচিত্রাকার।

ফ

ফাতিমা আল-ফিহরী (৯ম শতাব্দি); উম্মুল বানীন বা 'সন্তানদের জননী' তার ডাকনাম; ফেয, মরক্কো; শিল্প ও স্থাপত্য পৃষ্ঠপোষক, ফেযের আল-কায়রাওয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা।

ব

বাইবারস, আল-মালিক আয-যাহির রুকনুদ্দীন বাইবারস আল-বুনদুকদারী (১২২৩-১২৭৭): সুলহাট, তুরস্ক; দাস হওয়ার সত্ত্বেও মামলুক সুলতান হিসেবে তিনি ক্ষমতাসীন হন, ১২৬০-১২৭৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মিসর ও সিরিয়া শাসন করেন; আইনে-জালুত যুদ্ধে মঙ্গোলদের পরাস্ত করেন।

বাইলাক আল-কিবযাকী (আনুমানিক ১২৮২); ইস্তাম্বুল, তুরস্ক; অনুসন্ধানী, নাবিক এবং ভূগোলবিদ।

বনী মূসা ভ্রাতা (৯ম শতাব্দি): বাগদাদ, ইরাক; (১) ইবনে মূসা, জাফর মুহাম্মদ ইবনে শাকির (৮০০-৮৭৩): জ্যামিতি এবং জ্যোতির্বিদ্যা; (২) ইবনে মূসা, আহমাদ ইবনে শাকির (৮০৫-৮৭৩): গণিতজ্ঞ; (৩) ইবনে মূসা, আল-হাসান ইবনে শাকির (৮১০-৮৭৩): জ্যামিতি বিশেষজ্ঞ।

ভ

ভিটরুভিয়াস, মার্কাস পোলিও (আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৭০-আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ২৫) রোম, ইতালি; স্থপতি এবং প্রকৌশলী।

ম

মাইকেলেঞ্জেলো ডি লুদোভিকো বুওনারোত্তি (১৪৭৫-১৫৬৪); তুসকানি, ইতালি; ইতালীয় রেনেসাঁর ভাস্কর, চিত্রকর, স্থপতি এবং কবি।

মাইকেল স্কট (আনুমানিক ১১৭৫-আনুমানিক ১২৩৬), স্কটল্যান্ড; চিকিৎসক, জ্যোতির্বিদ এবং অনুবাদক।

মুওয়াফ্ফাক, আবুল মানসূর (১০ম শতাব্দি); হেরাত, আফগানিস্তান; ফার্মাসিস্ট।

মাশাআল্লাহ আলী ইবনে ঈসা (মৃ. ৮১৫); কায়রো, মিশর; জ্যোতির্বিদ এবং গণিতজ্ঞ।

মাসলামা ইবনে আহমাদ আল-মাযরিতী (মৃ. ১০০৭); মাদ্রিদ, স্পেন; জ্যোতির্বিদ এবং গণিতজ্ঞ।

মুহাম্মদ আল-ফাতেহ, দ্বিতীয় মেহমেত বা আল-ফাতেহ নামে পরিচিত (১৪৩২-১৪৮১); এড্রিনোপল, থ্রেস, তুরস্ক; কন্সট্যানটিনোপল বিজয়ী অটোমান সুলতান (১৪৫১-১৪৮১)।

র

রজার বেকন (১২১৪-১২৯২): ইলচেস্টার, ইংল্যান্ড; চিকিৎসক, রসায়নবিদ এবং গণিতজ্ঞ।

রাফায়েল, রাফায়েলো (১৪৮৩-১৫২০); আরবিনো, ইতালি; চিত্রকর এবং স্থপতি।

রবার্ট বয়েল (১৬২৭-১৬৯১): ইংল্যান্ড; প্রাকৃতিক দর্শন বিশেষজ্ঞ এবং রসায়নবিদ। আধুনিক রসায়নের অন্যতম প্রবর্তক এবং আধুনিক পরীক্ষামূলক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির অন্যতম অগ্রদূত।

ল

লিওনার্দো ফিবোনাচ্চি (১১৭০-১২৫৯); পিসা, ইতালি; গণিতজ্ঞ।

লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি (১৪৫২-১৫১৯); ভেনিস, ইতালি; চিত্রকর, নকশাকার, ভাস্কর, স্থপতি এবং প্রকৌশলী।

লেডি মেরি ওয়ার্টলে মন্টাগু (১৬৮৯-১৭৬২); লন্ডন, ইংল্যান্ড; অটোমান সাম্রাজ্যে নিয়োজিত ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত স্ত্রী এবং সামজসেবী। তুরস্ক থেকে গুটিবসন্তের ভ্যাকসিন ইংল্যান্ডে এনেছিলেন।

য

যিরইয়াব, আবুল হাসান আলী ইবনে নাফী (৭৮৯-৮৫৭); বাগদাদ, ইরাক; সঙ্গীত বিশেষজ্ঞ, ফ্যাশন ডিজাইনার এবং ভোজনবিশারদ।

যেং হো (১৩৭১-১৪৩৩), খুমিং, চীন; নাবিক এবং নৌ-সেনাপতি।

স

সাইফুদ্দৌলা, আবুল হাসান ইবনে হামাদান (৯১৬-৯৬৭); আলেপ্পোর শাসক এবং আলেপ্পোর হামাদানী রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। পণ্ডিতদের পৃষ্ঠপোষকতার জন্য তিনি বিখ্যাত ছিলেন।

সিনান, খাজা মা'মার সিনান (১৪৮৯-১৫৮৮); ইস্তাম্বুল, তুরস্ক; স্থপতি এবং নকশাবিদ।

সানাদ ইবনে আলী আল-ইয়াহুদী (৯ম শতাব্দি); বাগদাদ, ইরাক; ইসলামে ধর্মান্তরিত ইহুদী, আল-মামুনের প্রধান জ্যোতির্বিদ এবং বায়তুল হিকমার বিশিষ্ট সদস্য।

সাবুর ইবনে সাহল (মৃ. ৮৬৯); জুনদিশাপুর, ইরান; চিকিৎসক এবং ফার্মাসিস্ট।

সিবওয়াইহ (৭৬০-৭৯৩); বায়যা কিংবা বায়দা, ইরান; ব্যাকরণবিদ, আরবী ব্যাকরণের তার অবদান ছিল অসামান্য এবং বলা হয়, আরবী ব্যাকরণে তার পরবর্তীতে যত কাজ হয়েছে, তার সবই সিবওয়াইহের কাজের উপর নির্ভরশীল।

স্যার ক্রিস্টোফার রেন (১৬৩২-১৭২৩); লন্ডন, যুক্তরাজ্য; স্থপতি, জ্যোতির্বিদ এবং গণিতজ্ঞ।

সাবিত ইবনে কুর্‌রা (আনুমানিক ৮৩৬-৯০১); হার্‌রান, তুরস্ক; জ্যামিতিবেত্তা, গণিতজ্ঞ, জ্যোতির্বিদ এবং গ্রিক গ্রন্থসমূহের আরবী অনুবাদক।

হ

হুনাইন ইবনে ইসহাক, আল-ইবাদী (৮০৮-৮৭৩); বাগদাদ, ইরাক; বায়তুল হিকমার একজন সদস্য; গ্রিক কাজগুলোর আরবী অনুবাদক; চিকিৎসক।

হিপোক্রেটাস (আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৪৬০-খ্রিস্টপূর্ব ৩৭৭); কোস দ্বীপ, গ্রিস; চিকিৎসক।

হারুন উর-রশিদ (৭৬৬-৮০৯); পঞ্চম আব্বাসী খলীফা, যিনি ৭৮৬ থেকে ৮০৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাগদাদ থেকে আব্বাসী সাম্রাজ্য শাসন করেন; রাজা শার্লামেইনের সাথে ভাল সম্পর্কের জন্য তিনি বেশ প্রসিদ্ধ এবং তিনি তার নিকট জলচালিত ঘড়িসজ বহু উপহার পাঠিয়েছিলেন।

হাযারফেন আহমাদ চেলেবী (১৭শ শতাব্দি); ইস্তাম্বুল, তুরস্ক; ইস্তাম্বুলের বসফরাসের নিকটবর্তী গালাটা টাওয়ার থেকে ১৬৩৮ খ্রিস্টাব্দে উড্ডয়ন শুরু করে বসফরাসের অপর প্রান্তে সফলভাবে অবতরণ করেন।

০৪ লেখক ও প্রবন্ধ

এই গ্রন্থে যেসব মুসলিম মনীষীর উল্লেখ রয়েছে, তাদের ব্যাপারে বিস্তারিত তথ্যাদি যেসব পাণ্ডুলিপি, প্রবন্ধ এবং গ্রন্থে পাওয়া যাবে, তার একটা তালিকা নিম্নে প্রদান করা হলো।

আসল পাণ্ডুলিপির খোঁজ পাওয়া বেশ দুরূহ। এক হাজারের বেশি সময় পার হওয়ার কারণে এসব পাণ্ডুলিপির অধিকাংশই এখন আর টিকে নেই। এছাড়া মধ্যযুগের যুদ্ধবিগ্রহ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দলীয়-উপদলীয় কোন্দল এবং যথাযথ সংরক্ষণের অভাবে বহু পাণ্ডুলিপিই কালের গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। তথাপি হাজার হাজার পাণ্ডুলিপি বিভিন্ন লাইব্রেরিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, যাদের অধিকাংশই এখনো তালিকাভুক্ত পর্যন্ত হয়নি। বিশেষজ্ঞদের মতে, ৫০ লাখ পাণ্ডুলিপির মাঝে কেবল ৬০,০০০ পাণ্ডুলিপি সম্পাদনার মুখ দেখেছে।

সৌভাগ্যবশত, লন্ডনের ব্রিটিশ লাইব্রেরি, তুরস্কের তোপকাপি প্যালেস মিউজিয়াম লাইব্রেরি, সুলেমানিয়া লাইব্রেরি, যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল লাইব্রেরি, প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরি, ভেটিক্যান লাইব্রেরি, হল্যান্ডের লেইডেন লাইব্রেরি ও যুক্তরাজ্যের কেমব্রিজ এব অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরিতে অসংখ্য পাণ্ডুলিপির অনুবাদ সংরক্ষিত রয়েছে।

[রেফারেন্সগুলো ইংরেজি গ্রন্থরাজি থেকে নেয়া, তাই এখানে বিভাগ ও অধ্যায়ের নামের অনুবাদ ছাড়া বাকি জিনিসগুলো ইংরেজিতেই রেখে দেয়া হলো]

গৃহ

■ কফি পানের দীর্ঘযাত্রা

'Abd al-Kadir ibn Muhammad al-Ansari al-Djaziri. *Umdat al-Safwa fi hill al-qahwa.* Partly edited in De Sacy, *Chrestomathie Arabe*, 2nd edition. Imprimerie royale, Paris, 1826.

'Abd al-Kadir ibn Shaykh ibn al-'Aydarus. *Safwat al-Safwa fi bayan hukm al-qahwa.* Ahlwardt, Verzeichnis, Bibliothek Berlin, MS 5479, 23 volumes, Berlin, Germany, 1853-1914.

Hattox, R. S. *Coffee and Coffeehouses: The Origins of a Social Beverage in the Medieval Near East.* University of Washington Press, Seattle and London, 1988.

■ অনন্য ভোজনরীতি

Al-Jazari. *Al-Jami' Bayn al-'Ilm al-Nafi' wa Sina'at al-Hiyal*, or *The Book of Knowledge of Ingenious Mechanical*

Al-Jazari. *Texts and Studies.* Collected and reprinted by Fuat Sezgin in collaboration with Farid Benfeghoul, Carl Ehrig-Eggert, and Eckhard Neubauer. Institute for the History of Arabic-Islamic Science at the Johann Wolfgang Goethe University, Frankfurt, 2001.

Hill, Donald R. *On the Construction of Water Clocks*, or *Kitab Arshimidas fi 'amal al-binkamat.* Turner and Devereaux, London, 1976.

Hill, Donald R. *Arabic Water-Clocks.* Institute for the History of Arabic Science, Aleppo, Syria, 1981.

Hill, Donald R. "Islamic Fine Technology and Its Influence on the Development of European Horology." in *Al-Abhath*, Vol. 35, pp. 8-28. American University of Beirut, Beirut, 1987.

Taqi al-Din. *Al-Kawakib al-durriyya fi al-binqamat al-dawriyya*, or *Pearl Stars on Cyclic Water Clocks.* Dar al-Kutub, MS Miqat 557/1, Cairo.

Taqi al-Din. *Alat al-rasadiya li-Zij al-shahinshahiyya.* Library of the Topkapi Palace Museum, MS Hazine 452, Istanbul.

Taqi al-Din. *Rayhanat al-ruh fi rasm al-sa'at 'ala mustawi'l-sutuh.* Vatican Library, MS 1424, Vatican City.

Tekeli, Sevim. *The Clocks in the Ottoman Empire in the 16th Century and Taqi al-Din's The Brightest Stars for the Construction of the Mechanical Clocks.* Ankara University Basimevi, Ankara, Turkey, 1966.

■ দাবা

Al-Hanbali. *Kitab namudhaj al-qital fi naql al-'awal*, or *The Book of the Examples of Warfare in the Game of Chess.* Zuhayr Ahmad al-Qisi (editor). Dar-al-rashid, Baghdad, 1980.

Al-Suli. *Kitab al-shatranj*, or *Muntahab Kitab al-shatranj.* Suleymaniye Library, Lala Ismail Collection, MS 560, Istanbul.

Al-Suli. *Kitab al-shatranj.* Fuat Sezgin (publisher). Institut für Geschichte der Arabisch-Islamischen Wissenschaften, Frankfurt, 1986.

Murray, H. J. R. *A History of Chess.* Oxford University Press,

London, 1913; reprinted Benjamin Press, Northampton, Mass., 1985.

■ সঙ্গীত

Al-Farabi. *Kitab al-Musiqi al-Kabir*, or *The Great Book of Music*. Koprulu Library, MS 953, Istanbul.

Al-Farabi. *Kitab al-Musiqi al-Kabir*, or *The Great Book of Music*. Eckhard Neubauer (editor). Institut für Geschichte der Arabisch-Islamischen Wissenschaften, Frankfurt, 1998.

Safi al-Din al-Baghdadi al-Urmuwi. *Kitab al-Adwar*. Vatican Library, MS 319/3, Vatican City.

Chabrier, J. C. "Musical Science," in *Encyclopedia of the History of Arabic Science*. Roshdi Rashed (editor) with the collaboration of Régis Morelon. 3 volumes. Routledge, London/New York, 1996.

Farmer, Henry George. *Studies in Oriental Music*. Eckhard Neubauer (editor). 2 volumes. IGAIW, Frankfurt, 1997.

Maalouf, Shireen. *History of Arabic Music Theory: Change and Continuity in the Tone Systems, Genres, and Scales*. Université Saint-Esprit, Kaslik, Lebanon, 2002.

Neubauer, Eckhard. *Arabische Musiktheorie von den Anfangen bis zum 6/12. Jahrhundert*. The Science of Music in Islam, Vol. 3. IGAIW, Frankfurt, 1998.

Shiloah, Amnon. *The Theory of Music in Arabic Writings (ca 900-1900)*. Henle, München, 1979.

Shiloah, Amnon. *Music in the World of Islam: A Socio-Cultural Study*. Wayne State University Press, Detroit, 1995.

Touma, Habib Hassan. *The Music of the Arabs*. Laurie Schwartz (translator). Amadeus Press, Portland, Ore., 1996.

■ পরিচ্ছন্নতা

Al-Kindi. *Kitab Kimiya' al-'itr wa't-tas'idat*, or *Book of the Chemistry of Perfume and Distillations*. K. Garbers (German translation), *Buch uber die Chemie des Parfums und die Distillationen*, Leipzig, Germany, 1948.

Al-Zahrawi. *Kitab al-Tasrif Liman 'Ajaz An al-Ta'lif* or *Al-Tasrif*, or *The Method of Medicine*. Suleymaniye Library, Bashir Agha Collection, MS 502, Istanbul, Turkey; and Al-Khizana al-Hasaniyya, MS 134, Rabat, Morocco.

Al-Zahrawi. *Texts and Studies I*. Fuat Sezgin (editor); Mazen Amawi, Carl Ehrig-Eggert, and Eckhard Neubauer (publishers). IGAIW, Frankfurt, 1996.

■ ট্রিক ডিভাইস

Banu Musa Brothers. *Kitab al-hiyal al-Handasiyah*, or *The Book of Ingenious Mechanical Devices*. Vatican Library, MS 317/1, Vatican City; and Dar al-Kutub, MS Taymur Sina'a 69, Cairo.

Bir, Atilla. *Kitab al-hiyal of Banu Musa bin Shakir Interpreted in the Sense of Modern System and Control Engineering*. Preface and edition by Ekmeleddin Ihsanoglu (Studies and Sources on the History of Science, 4). Research Centre for Islamic History, Art, and Culture IRCICA, Istanbul, 1990.

Al-Hassan, Ahmad Y., and **Hill, Donald R.** *Islamic Technology. An Illustrated History*. UNESCO/Cambridge University Press, Paris/Cambridge, 1986.

Hill, Donald R. *The Book of Knowledge of Ingenious Mechanical Devices*. Reidel, Dordrecht, Netherlands, 1974.

Hill, Donald R. *Islamic Science and Engineering*. Edinburgh University Press, Edinburgh, 1993.

Al-Jazari. *Al-Jami' bayna al-ilm wa-al-amal al-naf fi sinaat al-hiyal*, or *The Book of Ingenious Devices*. Institute for the History of Arabic Science, Aleppo, Syria, 1979.

Taqi Al-Din. *Sublime Methods of Spiritual Machines*, in A. Y. Al-Hasan, *Taqi al-Din wa-'l-handasa al-mikanikiya al-'arabiya. Ma'a Kitab al-Turuq al-saniya fi-'l-alat al-ruhaniya min al-qarn al-sadis 'ashar*. Institute for the History of Arabic Science, Aleppo, Syria, 1976.

■ দৃষ্টিশক্তি এবং ক্যামেরা

Ibn al-Haytham. *Kitab al-Manazir*, or *Book of Optics*, known in Latin as *De aspectibus*, or *Perspective*. Suleymaniye Library, MS Ayasofya Collection, 2448, Istanbul.

Ibn al-Haytham. *Opticae Thesaurus Alhazeni Arabis libri septem, nunc primum editi. Eiusdem liber de crepusculis et nubium ascensionibus*. David C. Lindberg (editor). Johnson Reprint, New York/London, 1972

Ibn al-Haytham. *Kitab Al Manazir*. A. I. Sabra (editor), Books I-III. The Cultural Council, Kuwait, 1983.

Sabra, A. I. *The Optics of Ibn al-Haytham*. Books I-III, *On Direct Vision*. The Warburg Institute/University of London, London, 1989.

Ibn al-Haytham. *Kitab Al Manazir*. A. I Sabra (editor), Books IV-V. The Cultural Council, Kuwait, 2002.

Kamal al-Din al-Farisi. *Tanqih al-Manazir li-Zawi'l-absar wa'l-Basair*. Suleymaniye Library, Ayasofya Collection, MS 2598, Istanbul.

Kheirandish, Elaheh. *The Arabic Version of Euclid's Optics: Kitab Uqlidis fi ikhtilaf al-manazir*. Springer Verlag, Berlin, 1999.

Kheirandish, Elaheh. "Optics: Highlights from Islamic Lands," in *The Different Aspects of Islamic Culture*. Vol. IV: *Science and Technology in Islam*, Part 1, pp. 337-357. UNESCO, Paris, 2001.

Lindberg, David C. *Theories of Vision from Al-Kindi to Kepler*. University of Chicago Press, Chicago/London, 1976. Reprinted 1996.

Megri, Kheira. *L'Optique de Kamal al-Din al-Farisi*. Presses Universitaires du Septentrion, Villeneuve-d'Ascq, France, 1999.

Rashed, Roshdi. *Géométrie et dioptrique au Xème siècle: Ibn Sahl, al-Quhi et Ibn al-Haytham.* Les Belles Lettres, Paris, 1993.

Schramm, Matthias. "Zur Entwicklung der physiologischen Optik in der arabischen Literatur," in *Sudhoffs Archiv für Geschichte der Medizin und der Naturwissenschaften.* Vol. 43, pp. 289-316. 1959.

Sezgin, Fuat, et al. (editors). *Optics: Texts and Studies.* Natural Sciences in Islam, Vols. 32-34. IGAIW, Frankfurt, 2001.

Smith, A. M. *Alhacen's Theory of Visual Perception: A Critical Edition, with English Translation and Commentary of the First Three Books of Alhacen's De Aspectibus, the Medieval Latin Version of Ibn al-Haytham's Kitab al-Manazir.* 2 volumes. American Philosophical Society, Philadelphia, 2001.

■ কার্পেট

Aslanapa, Oktay (editor). *One Thousand Years of Turkish Carpets.* Eren, Istanbul, 1988.

Blair, S., and Bloom J. "Islamic Carpets," in *Islam: Art and Architecture*, M. Hattstein and P. Delius (editors), pp. 530-533. Konemann, Köln, Germany, 2000.

Rabah Saoud. "*The Muslim Carpet and the Origin of Carpeting.*" www.MuslimHeritage.com.

Sardar, Marika. "Carpets from the Islamic World, 1600-1800," in Heilbrunn Timeline of Art History. The Metropolitan Museum of Art, New York, 2000.

বিদ্যালয়

■ বিদ্যালয়

Al-Ghazzali. *Ihya Ulum al-Din*, or *The Revival of Religious Sciences.* Badwi Tabana (editor). Nusrat Ali Nasri for Kitab Bhavan, New Delhi, 1982.

Gibb, H. A. R. "The University in the Arab-Moslem World," in *The University Outside Europe: Essays on the Development of University Institutions in Fourteen Countries*, pp. 281-298. Edward Bradby (editor). Ayer Publishing, New Hampshire, 1970.

"Al-Madrasa al-Nizāmiyya," in *Encyclopaedia of Islam*, 2nd edition. P. Bearman, Th. Bianquis , C. E. Bosworth, E. van Donzel, and W. P. Heinrichs (editors). E. J. Brill, Leiden, 2010.

Makdisi, George. "Madrasa and University in the Middle Ages," in *Studia Islamica*, No. 32, pp. 255-264. 1970.

Makdisi, George. "Muslim Institutions of Learning in Eleventh-Century Baghdad," in *Bulletin of the School of Oriental and African Studies.* Vol. 24, pp. 1-56. London, 1961.

Makdisi, George. *The Rise of Colleges: Institutions of Learning in Islam and the West.* Edinburgh University Press, Edinburgh, 1981.

Pedersen, J., Rahman, Munibur, and **Hillenbrand, R.** "Madrasa," in *Encyclopaedia of Islam*, 2nd edition. P. Bearman, Th. Bianquis , C. E. Bosworth, E. van Donzel, and W. P. Heinrichs (editors). E. J. Brill, Leiden, 2010.

■ গ্রন্থাগার ও বই বিপণন

Atiyeh, George N. (editor). *The Book in the Islamic World: The Written Word and Communication in the Middle East.* State University of New York Press, Albany, 1995.

Al-Jahiz. *Al-Bayan wa'l-tabyin*, or *Eloquence and Elucidation.* Hasan Sandubi and Adab al-Jahiz (editors). Yale University Library, New Haven, Conn.

Al-Jahiz. *Al-Bayan wa'l-tabyin*, or *Eloquence and Elucidation*, Hasan al-Sandubi (editor). Ma tba'at al-istiqama, Cairo, 1947; 2nd edition, 1956.

Kohleberg, Etan. *A Medieval Muslim Scholar at Work. Ibn Tawus and His Library.* E. J. Brill, Leiden, 1992.

Al-Muqaddasi. *Ahsan al-Taqasim fi Ma'rifat al-Aqalim*, or *The Best Divisions for Knowledge of the Regions.* G. S. A. Ranking and Rizkallah F. Azoo (translators to English). Bombay, 1897-1910. Reprinted by Fuat Sezgin, Frankfurt, 1989.

Ibn al-Nadim. *Fihrist'al-Ulum*, or *The Catalogue or Index of the Sciences.* Suleymaniye Library, Sehid Ali Pasa 1934, Istanbul.

Ibn al-Nadim. *Kitab al-Fihrist*, mit Anmerkungen hrsg. von Gustav Flügel. 2 volumes. F. C. W. Vogel, Leipzig, Germany, 1871-72.

■ গণিত, ত্রিকোণমিতি এবং জ্যামিতি

Abgrall, Philippe. *Le développement de la géométrie aux IXe-XIe siècles: Abu Sahl al-Quhi.* Blanchard, Paris, 2004.

Ab' Kamil, Shuja Ibn Aslam. *The Algebra of Ab' Kamil: Kitab fi al-jabrwa 'l-muqabala.* Martin Levey (translator); foreword by Marshall Clagett; commentaries by Mordecai Finzi. The University of Wisconsin Press, Madison, Wisconsin, 1966.

Abu al-Wafa'. *Kitab al-Handasa*, or *Book of Geometry.* Cambridge University Library, MS Persian 169, Cambridge, U.K.

Abu al-Wafa'. *Kitab fima yahtaju ilayhi al-sani najara fi amal al-handasiyya*, or *On Those Parts of Geometry Needed by Craftsmen.* Suleymaniye Library, Ayasofya Collection, MS 2753, Istanbul.

Abu Bakr Muhamad ben al-Hasan al-Karaji. *Al-Kafi fi 'l-hisab (Genügendes über Arithmetik) von (4.-5. Jhd/10-11.Jhd.u.).* Ediert und kommentiert von Sami Chalhoub. IHAS, Aleppo, Syria, 1986.

Abu al-Hasan Ahmad b. Ibrahim al-Uqlidisi. *The Arithmetic of al-Uqlidisi. The Story of Hindu-Arabic Arithmetic as Told in 'Kitab al-fusul fi al-hisab al-hindi.* Translated and

annotated by Ahmad Salim Saidan. Reidel, Dordrecht, Netherlands, 1978.

Al-Baghdadi. *Kitab al-takmila fi 'ilm al-Hisab*, or *Book of Completion on the Science of Arithmetic*. Suleymaniye Library, Laleli MS 2708/1, Istanbul.

Al-Khwarizmi. *Kitab al Mukhtasar fi'l Hisab al-Jabr wal-Muqabala*, or *Compendious Book of Calculation by Completion and Balancing*. Medina, MS Hikmat jabr 4, 6, Medina, Saudi Arabia.

Banu Musa Brothers. *Tahriru Kitabi Ma'rifat Misahat al-ashkal al-Basitat al-Kuriyya*. Koprulu Library, I. Kisim MS 930/14, Istanbul.

Berggren, Lennart J. "History of Mathematics in the Islamic World: The Present State of the Art," in *Bulletin of the Middle East Studies Association*, Vol. 19, pp. 9-33. 1985.

Berggren, Lennart. *Episodes in the Mathematics of Medieval Islam*. Springer Verlag, Berlin, 1986.

Al-Biruni. *Kitab al-Athar al-Baqiyya 'an al-Qurun al-Khaliyya*, or *Chronology of Ancient Nations*, or *Vestiges of the Past*. Suleymaniye Library, Ayasofya Collection, MS 2947, Istanbul.

Al Biruni. *Kitab al-Athar al-Baqiyya 'an al-Qurun al-Khaliyya*, or *Chronologie orientalischer völker*. Fuat Sezgin (editor); C. Eduard Sachau (publisher). IGAIW, Frankfurt, 1998.

Al-Biruni. *Kitâb Maqalid ilm al-hay'a la triqonometrie spherique chez les arabes de l'est a la fin du X siecle*, or *Kitâb maqalid ilm al-hay'a*. Marie Thérèse Debarnot (editor). Institut Français de Damas, Paris, 1985.

Djebbar, Ahmed. *L'algèbre arabe: Genèse d'un art*. Adapt-Vuibert, Paris, France, 2005.

Al-Farabi. *Maqala fi Ihsa al-Ulum*, or *The Book of the Enumeration of the Sciences*. Koprulu Library, MS 1604/1, Istanbul.

Al-Farabi. *Maqala fi Ihsa al-Ulum*, or *Catálogo de las ciencias*. Imp. de Estanislao Maestre, Madrid, 1932.

Folkerts, M., and **Kunitsch, Paul.** *Die älteste lateinische Schrift über das indische Rechnen nach al-Hwarizmi. Edition, Übersetzung und Kommentar*. Bayerische Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-historische Klasse, Abhandlungen, Neue Folge, Heft 113, München, 1997.

Jaouiche, Khalil. *La théorie des parallèles en pays d'Islam. Contribution à la préhistoire des géométries non-euclidiennes*. Vrin, Paris, 1986.

Al-Karaji. *Al-Fahri fi'l-Jabr wa'l-Muqabala*. Suleymaniye Library, Husrev Pasa, MS 257/7, Istanbul.

Al-Khayyam, Umar. *Risala fi'l-barahin 'ala masa'il al-jabr wa'l-muqabala*, or *Treatise on Proofs of Problems of Algebra and Balancing*. Riyada, MS 898/3, Cairo.

Ben Miled, Marouane. *Opérer sur le Continu. Traditions arabes du Livre X des Eléments d'Euclide, avec l'édition et la traduction du commentaire d'al-Mahani*. Beit al-Hikma, Carthage, Tunisia, 2005.

"Mathematics and Her Sisters in Medieval Islam: A Selective Review of Work Done from 1985 to 1995," in *HM*, Vol. 24, pp. 407-440. 1997.

Muhammad Ibn Musa al-Khwarizmi. *Le Calcul Indien "Algorismus." Histoire des textes, édition critique, traduction et commentaire des plus anciennes versions latines remaniées du XIIᵉ siècle*. André Allard (editor). Blanchard/Peeters, Paris/Namur, 1992.

Al-Khawarizmi. *Muhammad Ibn Musa al-Khwarizmi (fl.c. 200-815). Texts and Studies*. Collected and reprinted by F. Sezgin et al. 4 volumes. Islamic Mathematics and Astronomy, Vols. 3-6. IGAIW, Frankfurt, 1997.

Lorch, Richard. *Thabit Ibn Qurra: On the Sector-Figure and Related Texts. Edited with translation and commentary*. IGAIW, Frankfurt, 2001.

Rashed, Roshdi. *Entre arithmétique et algèbre. Recherches sur l'histoire des mathématiques arabes*. Les Belles Lettres, Paris, 1984. Traduction anglaise: *The Development of Arabic Mathematics. Between Arithmetic and Algebra*. Kluwer, Dordrecht, Netherlands, 1994.

Rashed, Roshdi, and **Vahabzadeh, Bijan.** *Al-Khayyam mathématicien*. Blanchard, Paris, 1999.

Rosen, Frederick. *The Algebra of Mohammed ben Musa*. Frederick Rosen (editor and translator). Olms Verlag, Hildesheim, Germany, 1986. Reprint of the first edition, Oriental Translation Fund, London, 1831.

Al-Siddiqi. *Risala fi'l-handasa*, or *Treatise of Geometry*. Suleymaniye Library, Ayasofya Collection, MS 2736, Istanbul.

Al-Tusi. *Al-Jabr wa'l-Muqabala*. Vatican Library MS 317/2, Vatican City.

Les Mathématiques Infinitésimales du IXᵉ au XIᵉ siècles. Vol. II: *Ibn al-Haytham*. Al-Furqan Islamic Heritage Foundation, London, 1993.

Les Mathématiques infinitésimales du IXᵉ au XIᵉ siècles. Vol. I: *Fondateurs et commentateurs*. Al-Furqan Islamic Heritage Foundation, London, 1996.

Les Mathématiques infinitésimales du IXᵉ au XIᵉ siècles. Vol. III: *Ibn al-Haytham. Théorie des coniques, constructions géométriques et géométrie pratique*. Al-Furqan Islamic Heritage Foundation, London, 2000.

Les Mathématiques infinitésimales du IXᵉ au XIᵉ siècles. Vol. IV: *Méthodes géométriques, transformations ponctuelles et philosophie des mathématiques*. Al-Furqan Islamic Heritage Foundation, London, 2002.

Oeuvre Mathématique d'al-Sijzi: Géométrie des coniques et

théorie des nombres au X[e] siècle. Les Cahiers du Mideo, 3 Peeters, Louvain/Paris, 2004.

■ রসায়ন

Jabir ibn Hayyan. *Kitab al-Sab'in*, or *Book of Seventy Treatises on Alchemy*. Istanbul University Library, MS AY 6314, Istanbul.

Jabir ibn Hayyan. *Kitab fi al- Kimiya'*. Vatican Library MS 1485/1, Vatican City.

Jabir Ibn Hayyan. *The Arabic Works of Jabir Ibn Hayyan*. Arabic texts edited by Eric John Holmyard. Paul Geuthner, Paris, 1928.

Jabir ibn Hayyan. *Jabir Ibn Hayyan. Texts and Studies*. Collected and reprinted by Fuat Sezgin et al. 3 volumes. IGAIW, Frankfurt, 2002.

Jabir ibn Hayyan. *Dix traités d'alchimie: les dix premiers traités du livre des soixante-dix*. Sindbad, Paris, 1983.

Jabir ibn Hayyan. *Kitab al-Sab'in*, or *The Book of Seventy*. F. Sezgin (editor). IGAIW, Frankfurt, 1986.

Al-Kindi. *Kitab Kimiya' al-'itr wa't-tas'idat*. See Cleanliness section.

Nomanul Haq, Syed. *Names, Natures and Things: The Alchemist Jabir Ibn Hayyan and His Kitab-al-Ahjar*, or *Book of Stones*. Foreword by David E. Pingree. Kluwer, Dordrecht, Netherlands, 1994.

Al-Razi. *Kitab al Asrar*, or *The Book of the Secret of the Secrets*. Istanbul University Library, Sarkiyat E., MS 77, Istanbul; and the National Library of Medicine, MS A 33 item 9, Bethesda, Md.

Al-Samawi, al-'Iraqi, Abu Al-Qasim Muhammad b. Ahmad. *Kitab Nihayat al-talab fi sharh kitab [al-'ilm] al-muktasab fi zira'at-i al-dhahab*. Paul Geuthner, Paris, France, 1923. Collected and reprinted by F. Sezgin et al. Natural Sciences in *Islam*, Vol. 61. IGAIW, Frankfurt, 2001.

■ বাণিজ্যিক রসায়ন

Al-Kindi. *Kitab Kimiya' al-'itr wa't-tas'idat*. See Cleanliness section.

■ লিপিকার

Abu Jaafar ibn Tophail. *The Improvement of Human Reason, Exhibited in the Life of Hai ebn Yokdhan*, written in Arabic about 500 years ago. Translated from the original Arabic by Simon Ockley. E. Powell, London, 1708.

Abu Bakr Ibn Tufail. *The History of Hayy Ibn Yaqzan*, translated from the Arabic by Simon Ockley, revised with an introduction by A. S. Fulton. Chapman and Hall, London, 1929.

Conradi, L. I. (editor). *The World of Ibn Tufayl: Interdisciplinary Perspectives on Hayy Ibn Yaczan*. Islamic Philosophy, Theology and Sciences Series, Vol. 24. E. J. Brill, Leiden, 1996.

Goodman, L. "Ibn Tufayl." in *History of Islamic Philosophy*. Chapter 22. pp. 313-29. S. H. Nasr and O. Leaman (editors). Routledge, London, 1996.

Hawi, S. "Ibn Tufayl's Hayy Ibn Yaqzan. Its Structure, Literary Aspects and Methods." *Islamic Culture, Hyderabad Quarterly Review*, Vol. 47. 191-211. 1973.

Hawi, S. *Islamic Naturalism and Mysticism: A Philosophical Study of Ibn Tufayl's Hayy Yaqzan*. E. J. Brill, Leiden, 1974.

Hawi, S. "Beyond Naturalism: A Brief Study of Ibn Tufayl's Hayy Ibn Yaqzan." in *Journal of the Pakistan Historical Society*, Vol. 22, pp. 249-67. 1974.

Hawi, S. "Ibn Tufayl's Appraisal of His Predecessors and Their Influence on His Thought." in *International Journal of Middle East Studies*, Vol. 7, pp. 89-121. 1976.

Hourani, G. "The Principal Subject of Ibn Tufayl's Hayy Ibn Yaqzan." in *Journal of Near Eastern Studies* 15 (1), pp. 40-46. 1956.

Ibn Tufayl. *Ibn Tufayl's Hayy ibn Yaqzān: A Philosophical Tale*, translated with introduction and notes by Lenn Evan Goodman. Twayne, New York, 1972.

Ibn Yaqzan. *The Journey of the Soul: The Story of Hai bin Yaqzan*, as told by Abu Bakr Muhammad bin Tufail, a translation by Riad Kocache. Octagon, London, 1982.

বাজার

■ কৃষি বিপ্লব

Ibn al-Awwam. *Kitab al-Filaha*, or *Book of Agriculture*. Istanbul University Library, MS 5823, Istanbul, Turkey; and Library of the Topkapi Palace Museum, Hazine MS 429, Istanbul.

Ibn al-Awwam. *Kitab al-Filaha* or *Le livre de l'agriculture*. Fuat Sezgin (editor); J. J. Clement-Mullet (translator from Arabic). Institute for the History of Arabic-Islamic Science at the Johann Wolfgang Goethe University, Frankfurt, 2001.

Ibn Vahshiyya. *El-Filahatü'n-nebatiyye*, or *L'agriculture nabateenne*. Tavfik Fahd (editor). Institut Français de Damas, Damascus, Syria, 1995.

Kusami. *Filahatü'n-Nabatiyye*, or *The Book of Nabatean Agriculture*, Vols. I-VII. Fuat Sezgin (editor). IGAIW, Frankfurt, 1984.

Abu 'l-Jayr al-Ishbili. *Kitab al-filaha, tratado de agricultura*. Instituto de Cooperación con el Mundo Arabe, Madrid, 1991.

Eguaras Ibáñez, Joaquina. *Ibn Luyun: tratado de agricultura*. Patronato de la Alhambra y Generalife, Granada, Spain, 1988.

García Sánchez, Expiración. "El Tratado agrícola del

granadino Al-Tignari," in *Quaderni di studi arabi*, pp. 279-291. Casa editrice Armena, Venezia, Italy, 1988.

García Sánchez, Expiración. "Agriculture in Muslim Spain," in *The Legacy of Muslim Spain*, pp. 987-999. E. J. Brill, Leiden, 1992.

García Sánchez, Expiración, and **Alvarez de Morales, Camilo**, et al. (editors) *Ciencias de la naturaleza en al-Andalus: textos y estudios*. 7 volumes. C.S.I.C./Escuela de Estudios Arabes, Madrid/Granada, 1990-2004.

Guzmán Alvarez, José Ramón. "El compendio de agricultura atribuido a Ibn Wafid al-Nahrawi: nuevas perspectivas sobre su autoría," in *Anaquel de estudios arabes*, No. 16, pp. 83-124, Madrid, 2005.

Abu 'Abd Allah Muhammad b. Ibrahim Ibn Bassal. *Libro de agricultura*. Estudio preliminar por Expiración García Sánchez y J. Esteban Hernández Bermejo. Sierra Nevada, Granada, Spain, 1995.

Al-Masudi. *Muruj al-dhahab wa Ma'adin al-Jawhar*, or *The Meadows of Gold and Quarries of Jewels*. Sakarya University, Ilahiyat Faculty Library, MS 193, Sakarya, Turkey.

Al-Masudi. *Muruj al-dhahab wa Ma'adin al-Jawhar*, 4 volumes. Muhammad Muhyiddin Abdulhamid (editor). Al-Maktaba al-Tijariya al-Kubra, Cairo, 1964.

Ibn Wahshiya, *al-Filahah an-Nabatiyyah*, or *The Book of Nabatean Agriculture*. 7 volumes. Introduction in Arabic and English by Fuat Sezgin. IGAIW, Frankfurt, 1993-98.

Varisco, Daniel Martin. *Medieval Agriculture and Islamic Science: The Almanac of a Yemeni Sultan*. The University of Washington Press, Seattle, 1994.

■ কৃষি ম্যানুয়েল

Ibn al-Awwam. *Kitab al-Filaha*. See Agricultural Revolution section.

■ পানি ব্যবস্থাপনা

Al-Karaji. *Kitab Intibat al-miyah al-khafiyyat*, or *Extraction of Underground Waters*. Oriental Public Library at Bankipore, MS 2468/32, Patna, India.

Al-Karaji. *Kitab inbat al-miyah al-khafiya*. Baghdad Abdul-Mun'im (editor and analysis). Institute of Arabic Manuscripts, Cairo, 1997.

Al-Karaji. *L'Estrazione delle acque nascoste: Trattato tecnico-scientifico di Karaji Matematico-ingegnere persiano vissuto nel Mille* by Giuseppina Ferriello. Kim Williams Books, Turin, Italy, 2007.

Lightfoot, Dale R. "The Origin and Diffusion of Qanats in Arabia: New Evidence from the Northern and Southern Peninsula," in *Geographical Journal*, Vol. 166, No. 3, pp. 215-226, Royal Geographical Society, London, July 2005.

Al-Maqrizi. *Kitab al-Suluk li Ma'rifat Duwal al-Muluk*, or *Book of Entrance to the Knowledge of the Dynasties of the Kings*. Said A. F. Ashour (publisher). Matba'at Dar al-Kutub, Cairo, 1970.

Al-Nuwayri. *Nihayat al-Arab fi Funun al-Adab*, or *The Arab Art of Manners*. Dar al-Kutub al-Misriyah, Cairo, 1923.

■ পানি সরবরাহ

Al-Jazari. *Al-Jami' bayn al-'Ilm al-Nafi' wa sina'at al-Hiyal*. See Clocks section.

Taqi al-Din. *Turuq al-Saniyya fi al-Alat al-Ruhaniyya*, or *The Sublime Methods of Spiritual Machines*. Dar al-Kutub, Miqat MS 4, Cairo.

Water-Lifting Devices in the Islamic World. Texts and Studies. Natural Sciences in Islam, Vol. 43. Collected and reprinted by F. Sezgin et al. IGAIW, Frankfurt, 2001.

Krenkow, F. "The Construction of Subterranean Water Supplies During the Abbaside [sic] Caliphate," in *Transactions of the Glasgow University Oriental Society*, Vol. 13, pp. 23-32. 1947-49.

Wiedemann, Eilhard, and **Hauser, Franz.** "Über Vorrichtungen zum Heben von Wasser in der Islamischen Welt," in *Beitrage zür Geschichte der Tecknik und Industrie*, Vol. 8, pp. 121-154. 1921.

■ বাঁধ

Al-Idrisi. *Nuzhat al-Mushtaq fi 'khtirak al-Afaq* or *Al-Kitab al-Rujari*, or *A Recreation for the Person Who Longs to Traverse the Horizons* or *Book of Roger*. Suleymaniye Library, Husrev Pasa MS 318, Istanbul.

Smith, N. A. F. *A History of Dams*. London, 1971.

■ বায়ুকল (উইন্ডমিল)

Al-Masudi. *Muruj al-dhahab wa Ma'adin al-Jawhar*. See Agricultural Revolution section.

Hassan, Ahmad Y., and **Hill, Donald Routledge.** *Islamic Technology: An Illustrated History*, p. 54. Cambridge University Press, Cambridge, U.K., 1986.

Lohrmann, Dietrich. "Von der östlichen zur westlichen Windmühle," in *Archiv für Kulturgeschichte*, Vol. 77, No. 1, pp. 1-30 (8). 1995.

Hill, Donald Routledge. "Mechanical Engineering in the Medieval Near East," in *Scientific American*, pp. 64-69. May 1991.

Lucas, Adam. *Wind, Water, Work: Ancient and Medieval Milling Technology*, E. J. Brill, Leiden, 2006.

■ বাণিজ্য

Abulafia, David. "The Role of Trade in Muslim-Christian Contacts During the Middle Ages," in *The Arab Influence in Medieval Europe*, Dionisius A. Agius and Richard Hitchcock (editors). Ithaca Press, Berkshire, U.K., 1994.

Chaudhuri, K. N. *Trade and Civilisation in the Indian Ocean: An Economic History from the Rise of Islam to 1750*. Cambridge University Press, Cambridge, U.K., 1985.

Fischel, Walter. "The Origins of Banking in Medieval Islam: A Contribution to the Economic History of Jews in Baghdad in the Tenth Century," in *Journal of Royal Asiatic Society*, pp. 339-352. 1933.

Fleet, Kate. *European and Islamic Trade in the Early Ottoman State: The Merchants of Genoa and Turkey.* Cambridge University Press, Cambridge, U.K., 1999.

Ghazanfar, S. M. "Scholastic Economics and Arab Scholars: The 'Great Gap' Thesis Reconsidered," in *Diogenese: International Review of Humane Sciences*, No. 154, pp. 117-33. April-June 1991.

Ghazanfar, S. M. "Post-Greek/Pre-Renaissance Economic Thought: Contributions of Arab-Islamic Scholastics During the 'Great Gap' Centuries," in *Research in History of Economic Thought and Methodology*, Vol. 16, pp. 65-90. 1998.

Ghazanfar, S. M. "The Economic Thought of Abu Hamid Al-Ghazali and St. Thomas Aquinas: Some Comparative Parallels and Links," in *History of Political Economy*, Vol. 32, No. 4, pp. 857-888, Fall 2000.

Ghazanfar, S. M., and **A. Azim Islahi.** "Economic Thought of an Arab Scholastic: Abu Hamid Al-Ghazali (AH450-505/AD1058-1111)," in *History of Political Economy*, Vol. 22, No. 2, pp. 381-401, Spring 1990.

Ghazanfar, S. M. (editor). *Medieval Islamic Economic Thought: Filling the "Great Gap" in European Economics*, RoutledgeCurzon Publishers, London, 2003.

Ibn Hawqal. *Kitab al-Masalik wa-al-Mamalik*, or *The Book of the Routes of the Kingdoms*, edited in *Opus geographicum auctore Ibn Haukal (Surat al-ard).* J. H. Kramers (editor). E. J. Brill, Leiden, 1967.

Labib, Subhi. *Handelsgeschichte Agyptens im Spatmittelalter*, or *History of Trade of Egypt in the Late Middle Ages.* Franz Steiner Verlag, Wiesbaden, Germany, 1965.

Labib, Subhi. "Capitalism in Medieval Islam," in *Journal of Economic History*, Vol. 29, pp. 79-96. 1969.

Ritter, Helmut. "Ein Arabisches Handbuch der Handelswissenschaft," or "Handbook of Business Practices, 12th century A.D." in *Der Islam*, Vol. 17, pp.1-97. 1917.

Udovitch, Abraham. "Labor Partnerships in Early Islamic Law," in *Journal of Economic and Social History of the Orient*, Vol. 10, No. 2, pp. 64-80, June 1967.

Udovitch, Abraham. *Partnership and Profit in Medieval Islam*, Princeton University Press, Princeton, N.J., 1970.

Udovitch, Abraham. "Credit as a Means of Investment in Medieval Islam," in *Journal of American Oriental Studies*, Vol. 87. 1967.

Weiss, Walter M., and **Westermann, Kurt-Michael.** *The Bazaar: Markets and Merchants of the Islamic World.* Thames and Hudson, London, 1998.

■ কাগজ

Bloom, Jonathan M. *Paper Before Print: The History and Impact of Paper in the Islamic World*, pp. 203-213. Yale University Press, New Haven, Conn., 2001.

Burns, Robert I. "Paper Comes to the West, 800-1400," in *Lindgren, Uta, Europäische Technik im Mittelalter. 800 bis 1400. Tradition und Innovation* (4th edition), pp. 413-42. Gebr. Mann Verlag, Berlin, 1996.

Hunter, Dard. *Papermaking: The History and Technique of an Ancient Craft.* Courier Dover Publications, New York, 1978.

Ibn Hawqal. *Kitab al-Masalik wa-al-Mamalik.* See Trade section.

Levey, Martin. *Mediaeval Arabic Bookmaking and Its Relation to Early Chemistry and Pharmacology.* American Philosophical Society, Vol. 52, Part 4. Philadelphia, 1962.

Loveday, Helen. *Islamic Paper: A Study of the Ancient Craft.* Archetype Publications, Don Baker Memorial Fund, London, 2001.

Quraishi, Silim. "A Survey of the Development of Papermaking in Islamic Countries," in *Bookbinder*, Vol. 3, pp. 29-36. 1989.

■ মৃৎশিল্প

Al-Maqrizi. *Kitab al-Suluk li Ma'rifat Duwal al-Muluk.* See Water Management section.

Baramki, D. C. "The Pottery from Khirbet El-Mefjer," in *The Quarterly of the Department of Antiquities in Palestine* (QDAP 1942), Vol. 10, pp. 65-103. 1942.

Bernsted, A. K. *Early Islamic Pottery: Materials and Techniques*, Archetype Publications Ltd., London, 2003.

Caiger-Smith, Alan. *Lustre Pottery: Technique, Tradition and Innovation in Islam and the Western World*, Chapters 6 and 7. Faber and Faber, London, 1985.

Cooper, Emmanuel. *Ten Thousand Years of Pottery*, 4th edition. University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 2000.

Mason, Robert B. "New Looks at Old Pots: Results of Recent Multidisciplinary Studies of Glazed Ceramics from the Islamic World," in *Muqarnas: Annual on Islamic Art and Architecture*, Vol. 12. E. J. Brill, Leiden, 1995.

Sauer, J. A. "Umayyad Pottery from Sites in East Jordan," in *Jordan*, Vol. 4, pp. 25-32. 1975.

হাসপাতাল

■ হাসপাতালের ক্রমবিকাশ

Al-Khujandi. *Al-Talwih li-Asrar al-Tanqih*, or *Tanqih al-Maknun*. Vatican Library, MS 305. Vatican City.

Ibn Abi-Usaybia. *Uyunul-Anba Fi-Tabaqat Al-Atibaa*, or

The Sources of the Knowledge of Classes of Doctors. N. Reda (editor). Dar Maktabat al Hayat, Beirut, 1965.

Ibn Al-Nadim. *Al-Fihrist*. I. Ramadan (editor), 2nd edition. Dar El-Mareefah, Beirut, 1997.

Ibn Jubayr. *Rihlat Ibn Jubayr*, or *The Travels of Ibn Jubayr*. Goodword Books, New Delhi, 2001.

Ibn Juljul. *Tabaqat Al-Atiba' wa-'l-Hukama'.* Sayed Fouad, (editor). French Bureau Publications, Cairo, 1955.

Ibn Sina. *Al-Qanun fi al-Tibb*, or *Canon of Medicine*. Suleymaniye Library, Hekimoglu MS 580, Istanbul.

Ibn Sina. *Al-Qanun fi al-Tibb*, or *Canon of Medicine*. Dar Sadir reprint of Bulaq edition. Cairo, 1877.

Saed Ibn Saed, Al-Andalusi. "Book of the Categories of Nations," in *Science in the Medieval World*. S. I. Salem and A. and Kumar (translators and editors). History of Science Series No. 5. University of Texas Press, Austin, 1996.

■ পূর্ণতার উপকরণ

Al-Baghdadi, Muhadhdhab Al-Deen. *Kitab Al-Mukhtarat Fi Al Tibb*, 1st edition. Osmania University, The Bureau, Osmania Oriental Publications, Hyderabad, India, 1942.

Al-Baladi Ahmad ibn Muhammad ibn Yahya. *Kitab tadbeer al habala wa al-atfal wa hifz sehhatihim wa mudawat al amradd al aariddah lahum*. Mahmood Al Hajj Qasim Muhammad (editor), 2nd edition. Dar Al Shueoon Al-Thaqafeyyah Al Aaamah, Baghdad, 1987.

Al-Razi. *Kitab al-Hawi fit-tibb*, or *Liber continens*, 1st edition. Osmania University, The Bureau, Osmania Oriental Publications, Hyderabad, India, 1961.

Ibn al-Jazzar al-Qairawani. *Kitab siasat al-sibiaan wa tadbeeruhum*, or *The Book for Bringing Up and Care for Children*. M. A. Al-Hailah (editor). Al-Dar Al-Tunisiyyah Lil Nashr, Tunis, Tunisia, 1968.

Ibn al-Quff. *Al-Umdah Fi Al-Jiraha*. 2 volumes. Osmania University, The Bureau, Osmania Oriental Publication, 1356 H Hyderabad, India.

Ibn Sina. *Kitab al-Qanun fit-tibb*, or Avicenna's *Canon of Medicine*. Dar Sadir reprint of Bulaq edition. Cairo, 1877.

Ibn Zuhr (Avenzoar). *Kitab al-Taisir fi al-Mudawat wa al-Tadbir*, or *Book of Simplification Concerning Therapeutics and Diet*. M. Al-Khoori (editor), 1st edition. Vols. 1 and 2. Darul Fikr Press for the Arab Educational Scientific and Cultural Organization, Damascus, Syria, 1983.

Spink, M. S., and **Lewis, I. L.** (editors and translators). *Albucassis on Surgery and Instruments*. Wellcome Institute of the History of Medicine, London, 973.

■ সার্জারি

Al-Razi. *Kitab al-Hawi*, or *Liber continens*. See Intruments of Perfection section.

Al-Razi. *Ma al-fariq aw al furooq aw kalamun fi al furuuq bain al amradd*, or *What Are the Clues to Differentiate Between Diseases [of Similar Symptoms]*. Qattaya Salman (editor). Institute for Arabic Scientific Heritage, Aleppo, Syria, 1978.

Ibn al-Nafis. *Risalat Al-Aadaa*, or *A Treatise in Physiology*. Y. Ziedan (editor). Al Dar Al-Masreyya Al Lubnaneyyah, Cairo, 1991.

Ibn al-Quff. *Kitab al-'Umda fi sina'at al-jiraha*, or *The Foundation*. Suleymaniye Library, Hekimoglu MS 579, Istanbul.

Ibn al-Quff. *Al-Umdah Fi Al-Jiraha*. 2 volumes. Osmania University, The Bureau, Osmania Oriental Publications, 1356 H Hyderabad, India.

Ibn al-Quff. *Al-Shafi fi al-Tibb*. Vatican Library, Appendice 183. Vatican City.

Ibn Rushd. *Al-Kulliyyat Fi Al-Tibb*, or *The Basic Principles of Medicine*. M. A. Al-Jabiry (editor). Arabian Philosophy Heritage Series-Ibn Rushd Works, No. 5. The Institute for Arabic Unity Studies, Beirut, 1999.

Ibn Sina. *Al-Qanun fi al-Tibb*. See Hospital Development section.

Ibn Zuhr. *Kitab al-Taisir fi al-Mudawat wa al-Tadbir*, or *Book of Simplification Concerning Therapeutics and Diet*. M. Al-Khoori (editor). 1st edition, Vols. 1-2. Darul Fikr Press for the Arab Educational Scientific and Cultural Organization, Damascus, Syria, 1983.

Spink M. S., and **Lewis, I. L.** (editors and translators). *Albucassis on Surgery and Instruments*. See Instruments of Perfection section.

■ রক্ত সঞ্চালন

Abdel-Halim, Rabie E. "Contributions of Ibn Al-Nafis to the Progress of Medicine and Urology: A Study and Translations from His Medical Works," in *Saudi Medical Journal*, pp. 13-22. 2008.

Ibn al-Nafis. *Sharh Tashrih al-Qanun*, or *Commentary on the Anatomy of the Canon of Avicenna*. Suleymaniye Library, Fatih 3626, MS A 21 and MS A 56, Istanbul.

Ibn al-Nafis. *Kitab Sharh Tashreeh Al-Qanun*. Qattaya S. (editor). The Egyyptian Manuscript Editing Bureau, Cairo, 1988.

Iskandar, Albert Z. "Ibn al-Nafis," in *Dictionary of Scientific Biography*, Vol. 9, pp. 602-606, New York, 1974.

■ ইবনে সীনার হাড়ের জখম চিকিৎসা

Al-Majusi. *Kamil al-Sina'a al-Tibbiyya*. Library of Topkapi Palace Museum, Ahmed III nr. 2060. Vatican Library MS 314, Vatican City.

Ibn Sina. *Kitab al-Shifa'*, or *The Book of Cure, Healing or Remedy from Ignorance*. Library of the Topkapi Palace Museum, Ahmed III MS 3261, Istanbul.

Ibn Sina. *Avicenna's De Anima: Being the Psychological Part of Kitab al-Shifa*, or *Kitab al-Shifa: al-fann al-sadis min al-tabiiyyat wa huwa kitab al-nafs*. Fazlurrahman (editor). 3rd edition. University of Durham, Durham, U.K., 1970.

■ চক্ষুরোগ বিশেষজ্ঞের নোটবই

Abu al-Farag. *The Abridged Version of The Book of Simple Drugs of Ahmad Ibn Muhammad Al-Ghafiqi*. M. Meyerhof and G. P. Sobhy (translators and editors); Fuat Sezgin (re-editor). IGAIW, Frankfurt, 1996.

Al-Ghafiqi. *Al-Murshid fil al-kuhl*, or *The Right Guide in Ophthalmic Drug*. Laboratoires du Nord de l'Espagne, Barcelona, 1933.

Al-Ghafiqi. *Texts and Studies*. Fuat Sezgin (editor); Mazen Amawi, Carl Ehrig-Eggert, Eckhard Neubauer (publishers). IGAIW, Frankfurt, 1996.

Ibn al-Nafis. *Al-Muhadhab fi tibb al-'Ayn*. Vatican Library MS 307, Vatican City.

Ibn al-Nafis. *Al-Muhadhdhab fi al-Kuhl al-Mujarrab*. M. Z. Wafai andM. R. Qalaji (editors). 2nd edition. Safir Press, Riyadh, Saudi Arabia, 1994.

Ibn Isa. *Tadhkirat al-Kahhalin*, or *Memorandum Book for Ophthalmologists* or *Notebook of the Oculist*. Vatican Library MS 313, Vatican City.

Ali ibn 'Isa. *Memorandum Book of a Tenth-Century Oculist for the Use of Modern Ophthalmologists*. Casey A. Wood (translator), Book I, Chapter 20. Northwestern University Press, Chicago, 1936.

Khalifa ibn Abi Al Mahasin Al Halaby. *Al Kafi Fi Al-Kuhl*, or *The Book of Sufficient Knowledge in Ophthalmology*. Dar al-Fikr, Beirut, 2000.

■ ভেষজ চিকিৎসা

Al-Dinawari. *Kitab al-Nabat*, or *The Book of Plants*. Bernhard Lewin (editor). A. B. Lundeguistska Bokhandeln, Uppsala-Wiesbaden, Germany, 1953.

Al-Ghafiqi. *Kitab al-adwiya al-Mufrada*, or *The Book of Simple Drugs*. Egyptian University, Cairo, 1932-40.

Al-Ghafiqi. *Kitab jami' al-Mufradat*, or *Materia Medica*. Max Meyerhof and George P. G. Sobhy (editors). Cairo Medical Faculty, Cairo, 1937-38.

Ibn al-Baytar. *Kitab-al-Jami fil Adwiya al-Mufrada*, or *Dictionary of Simples, Remedies and Food*. Suleymaniye Library, Damad Ibrahim, MS 929, Istanbul.

Ibn Samajun. *Jami al-adwiya al-Mufrada*, or *Collection of Simples, Medicinal Plants and Resulting Medicines*. Fuat Sezgin (publisher). Institute for the History of Arabic-Islamic Science at the Johann Wolfgang Goethe University, Frankfurt, 1992.

■ ফার্মাসি

Al-Biruni. *Kitab al Saydana fi't-tib*, or *Book of Medicines* or *Book of Pharmacology*. Hakim Mohammad Said (publisher and translator into English). Suleymaniye Library, Izmirli I. 4175, Istanbul, 1973.

Al-Baghdadi. *Al Mukhtarat Fi Al-Tibb*. Vols. 1-4, 1362-1364 H. 1941-1944. Osmania University, The Bureau, Osmania Oriental Publications, Hyderabad, India.

Al-Harawi. *Kitab al-Abniya 'an haqa'iq al-Adwiya*, or *The Foundations of the True Properties of Remedies*. Fuat Sezgin (publisher). Institute for the History of Arabic-Islamic Science at the Johann Wolfgang Goethe University, Frankfurt.

Al-Kindi. *Aqrabadhin*, or *Medical Formulary*. Suleymaniye Library, Ayasofya Collection, Turkey.

Al-Razi. *Kitab al-Mansuri*, or *Liber almansoris*. The National Library of Medicine, MS A 28, Bethesda, Md.

Al-Zahrawi. *Al-Tasrif li-man 'ajiza 'an al-taalif*. See Cleanliness section.

Ibn Al-Baitar. *Al-Jamie Limufradat Al-Adwiya Wal-Aghdiya*, or *Materia Medica*. Al-Muthana Bookshop, Baghdad, undated.

Ibn al-Wafid. *Kitab al-Adwiya*, or *The Book of Simple Drugs*. Ahmad Hasan Basaj (publisher). Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, Beirut, 2000.

Ibn Sina. *Al-Qanun fi al-Tibb*. See Hospital Development section.

■ চিকিৎসা জ্ঞান

Al-Majusi. *Al-Kihalah (tibb al-'uyun) fi Kitab Kamil al-sina'ah al-tibbiyah al-ma'ruf bi-al-Malaki*, or *The Royal Book*, also known as the *Pantegni*. Muhammad Zafir Wafa'i and Muhammad Rawwas Qal'ah'ji (publishers). Wizarat al-Thaqafah, Damascus, Syria, 1997.

Al-Zahrawi. *Al-Tasrif li-man 'ajiza 'an al-taalif*. See Cleanliness section.

Arabic Science and Medicine: A Collection of Manuscripts and Early Printed Books Illustrating the Spread and Influence of Arabic Learning in the Middle Ages and the Renaissance. Bernard Quaritch catalogue 1186. Introduction by Professor Charles Burnett. Bernard Quaritch, London, 1993.

Ben Miled, Ahmed. *Ibn Al Jazzar. Constantin l'Africain*, Salambô, Tunis, Tunisia, 1987.

Ben Miled, Ahmed. *Histoire de la médecine arabe en Tunisie*. Dar al-Gharb al-Islami, Beirut, 1999.

Ben Miled, Ahmed. *Ibn Al Jazzar. Médecin à Kairouan*. Al Maktaba Al Tounisia, Tunis, Tunisia, 1936.

Ibn al-Dhahabi. *Kitab al-Ma'a*, or *The Book of Water*. Dr. Hadi Hamoudi (editor). Ministry of National Heritage and Culture, Oman, 1996.

Ibn al-Jazzar. *Zad al-Musafir*, or *The Guide for the Traveler Going to Distant Countries*, or *Traveler's Provision*,

known in Latin as the *Viaticum*. Gerrit Bos (editor and translator). Kegan Paul International, London and New York, 2000.

Ibn al-Nafis. *Al-Shamil fi al-Tibb*, or *Comprehensive Book on the Art of Medicine*. Koprulu Library, I. kisim, nr. 987/1, Istanbul; and Vatican Library MS 306, Vatican City.

Ibn al-Nafis. *Al-Mujaz Fi Al-Tibb*. Al-Ezbawy A. (editor). 4th edition. Islamic Heritage Revival Committee, Supreme Council for Islamic Affairs, Ministry of Endowments, Cairo, 2004.

Ibn al-Nafis. *Al-Shamil Fi Al-Sinaa Al-Tibbiyyah*. Y. Ziedan (editor). Al-Mujammaa Al-Thaaqfi, Abu Dhabi, 2000.

নগর

■ নগর পরিকল্পনা

Dunn, Ross E. *The Adventures of Ibn Battuta—A Muslim Traveler of the 14th Century*. University of California, Berkeley, 2004. Ibn Battuta. *Al-Rihla*, or *The Journey*. Public Library of Cambridge, Library No. 890.8 O7p no., Cambridge, Mass.

■ ঝরনা

Banu Musa Brothers. *Kitab al-hiyal al-Handasiyah*. See Trick Devices section.

বিশ্ব

■ পৃথিবী

Al-Battani. *Kitab al-Zij al-Sabi'*, or *De scientia stellarum -De numeris stellarum et motibus*, or *The Sabian Tables*. Zaytuna, MS 2843, Tunis, Tunisia.

Al-Biruni. *Kitab fi ifrad al-Maqal fi amr al-azlal*, or *Shadows or Gnomonics*. Oriental Public Library at Bankipore, 2468/36, Patna, India.

Al-Biruni. *Al-Qanun al-Mas'udi fi'l-hay'a wa'l-nujum*, or *Mas'udic Canon on Astronomy and Astrology*. Suleymaniye Library, Carullah, MS 1498, Istanbul.

Al-Khujandi. *Risala fi tashih al-mayl wa 'ard al-balad*, or *Treatise on Determining the Declination and Latitude of Cities with More Accuracy*. Greek Orthodox School Library, 364/1. Beirut.

Ibn Hazm. *Al-Fasl fil-Millal wa al-ahwa wa'n-nihal*, or *Conclusion on the Nations*. Cambridge University Library, Library/Call No. Moh.121.b.50, Cambridge, U.K.

Ibn Yunus. *Al-Zij al-Hakimi*, or *The Hakemite Tables*. In C. Caussin. "Le livre de la grande table hakemite," in *Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque Nationale* Vol. 7, 1804, pp. 16-240.

Nallino, C.A. *Al-Battani sive Albatenii, Opus Astronomicum*. 3 volumes. Osservatorio astronomico di Breva, Milan, Italy, 1899, 1903, 1907.

■ প্রাকৃতিক বিজ্ঞান

Abu Ridah, M. A. H. (editor). *The Letters (Rasa'il) of al-Kindi al-falsafiyya*. Matbaatu Hassan, Cairo, 1978.

Al-Biruni. *Kitab Al-Jamahir fi Ma'rifat al-Jawahir*, or *Treatises on How to Recognize Gems*. Library of the Topkapi Palace Museum, Ahmed III 2047. Fuat Sezgin (editor). Institute for the History of Arabic-Islamic Science at the Johann Wolfgang Goethe University, Frankfurt, 2001.

Al-Biruni. *Al-Qanun al-Mas'udi fi'l-hay'a wa'l-nujum*. See Planet Earth section.

Al-Kindi. *Risala fi anwa al-jawahir al-thaminah wa ghayriha*, or *Treatise on Various Types of Precious Stones and Other Kinds of Stones*.

Ibn Sina. *Kitab al-Shifa'*. See Ibn Sina's Bone Fractures section.

Ikhwan al-Safa'. *Rasa'il*, or *Epistles*. Vatican Library 1608/1, Vatican City, Italy; and Princeton University Library, Library No. 1129 (Garrett Collection), Princeton, N.J.

Masawayh. *Kitab al-Jawahir wa-Sifatiha wa-fi ayyi Baladin Hiya, wa-Sifat al-Ghawwasin wa-al-Tujjar*, or *Gems and Their Properties*. The Wellcome Trust Library, Library Number Wellcome MS Arabic 468 (Haddad Collection), London.

■ প্রাকৃতিক ঘটনা

Al-Biruni. *Al-Qanun al-Mas'udi fi'l-hay'a wa'l-nujum*. See Planet Earth section.

Al-Kindi. *Risala fi'l-illa al-fa'ila li'l-madd wa'l-jazr*, or *Treatise on the Efficient Cause of the Tidal Flow and Ebb*. Bodleian Library, I 877/12, Oxford, U.K.

Al-Kindi. *Risala fi 'illat al-lawn al-azraq alladhhi yura fi'l-jaww fi jihat al-sama*, or *Treatise on the Azure Colour Which Is Seen in the Air in the Direction of the Heavens and Is Thought to Be the Colour of the Heavens*. Suleymaniye Library, Ayasofya 4832/2, Istanbul.

Ibn al-Haytham. *Kitab al-Manazir*, or *Book of Optics*. See Vision and Cameras section.

Ibn Hazm. *Al-Fasl fil-Millal*. See Planet Earth section.

■ ভূগোল

Al-Bakri. *Kitab al-Masalik wa'l-Mamalik*, or *Book of Highways and of Kingdoms*. Cambridge University Library, Library/Call No. 590:01.b.17.1, Cambridge, U.K.

Al-Biruni. *Alberuni's India: An Account of the Religion, Philosophy, Literature, Geography, Chronology, Astronomy, Customs, Laws, and Astrology of India About A.D. 1030, Vols. I-II*. Edward C. Sachau (translator). Fuat Sezgin (editor). IGAIW, Frankfurt, 1993.

Al-Biruni. *The Determination of the Coordinates of Positions for the Correction of Distances Between Cities*,

or *Kitab Tahdid nihayat al-amakin li-tashih masafat al-masakin*. Fuat Sezgin (editor); in collaboration with Mazen Amawi, Carl Ehrig-Eggert, and Eckhard Neubauer. IGAIW, Frankfurt, 1992.

Al-Idrisi. *Nuzhat al-Mushtaq fi 'khtirak al-Afaq*. See Dams section.

Al-Jahiz. *Kitab al-Buldan*. Matbaat al-Hukumah, Baghdad, 1970.

Al-Khwarizmi. *Kitab Surat al-Ardh min al-mudun wa'l-jibal wa'l-bihar wa'l-jaza'ir wa'l-anha*, or *Book of Geography: A Picture Book of the Earth, Cities, Mountains, Seas, Islands, and Rivers*, or *The Form of the Earth*. German translation titled *Das Kitab Surat al-ard, des Abu Ga'far Muhammad ibn Musa al-Khuwarizmi, herausg*. Unikum des Bibliotheque de l'Universite et Regionale in Strasbourg, Austria, 1926.

Hill, Donald R. *Islamic Science and Engineering*. Edinburgh University Press, Edinburgh, 1993.

Ibn al-Nadim. *Fihrist'al-Ulum*. See Libraries and Bookshops section.

Ibn Jubayr. *Rihlat Ibn Jubayr*. See Hospital Development section.

Mahmud Kashghari. *Divanu Lugat-it-Turk*, or *Compendium of Turkish Dialects*. Istanbul, 1915-17.

Maslama al-Majriti. *Rutbat Al-Hakim*, or *The Rank of the Wise*. Ali Emiri-Arabi, 2836/2, Istanbul.

Al-Muqaddasi. *Ahsan al-Taqasim fi Ma'rifat al-Aqalim*. See Libraries and Bookshops section.

Al-Ya'qubi. *Kitab al-Buldan*, or *Book of Countries*. Istanbul University, Islam Arastirmalari Library, 1262, Istanbul, Turkey; and Yale University Library, Library/Call No. Geography. Folio B4737, New Haven, Conn.

Yaqut. *Mu'jam al-Buldan*, or *Dictionary of Countries*. Cambridge University Library, Library/Class No. Moh. 280.b.1, Cambridge, U.K.

■ মানচিত্র

Al-Idrisi. *Nuzhat al-Mushtaq fi 'khtirak al-Afaq*. See Dams section.

King, David A. *World-Maps for Finding the Direction and Distance to Mecca: Innovation and Tradition in Islamic Science*. Al-Furqan Islamic Heritage Foundation, E. J. Brill, Leiden, 1999.

King, D. A. "Two Iranian World Maps for Finding the Direction and Distance to Mecca," in *Imago Mundi. The International Journal for the History of Cartography*, Vol. 49, pp. 62-82. 1997.

King, D. A., and Lorch, R. "Qibla Charts, Qibla Maps, and Related Instruments," in *The History of Cartography*, Vol. 2, Book 1: *Cartography in the Traditional Islamic and South Asian Societies*, pp. 189-205. J. B. Harley and D. Woodward (editors). University of Chicago Press, Chicago, 1992.

Piri Reis. *Kitab i-Bahriye*, or *The Book of Sea Lore*, or *The Book of the Mariner*; or *The Naval Handbook*. Ertugrul Zekai Okte (editor); Vahit Cabuk (transcription); Vahit Cabuk and Tulay Duran (Turkish text); Robert Bragner (English text). Culture and Tourism Ministry, Ankara, Turkey, 1988.

■ পর্যটক এবং অভিযাত্রী

Abu al-Fida'. *Taqwim al-Buldan*, or *Survey of Countries*. Library of the Topkapi Palace Museum, Ahmed III 2855, Istanbul.

Al-Biruni. *Tahdidu nihayat al-amakin li't-tashihi masafat al-masakin*. Fuat Sezgin (editor); Mazen Amawi, Carl Ehrig-Eggert, Eckhard Neubauer (publishers). IGAIW, Frankfurt, 1992.

Flowers, Stephen E. *Ibn Fadlan's Travel-Report: As It Concerns the Scandinavian Rūs*. Rūna-Raven, Smithville, Texas, 1998.

Frähn, Christian Martin, *Die ältesten arabischen Nachrichten über die Wolga-Bulgaren aus Ibn-Foszlan's Reiseberichte*. Mémoires de L'Académie Impériale des Sciences de St. Petersbourg, VIème série, 1823.

Frye, Richard N. (editor). *Ibn Fadlan's Journey to Russia: A Tenth Century Traveler from Baghdad to the Volga River*. Markus Wiener Publishers, Princeton, N.J., 2005.

Ibn Battuta. *Al-Rihla*. See Public Baths section.

Ibn Fadlan. *Voyage chez les Bulgares de la Volga*. Marius Canard (French translation), Sinbad, Paris, 1988.

Ibn Fadlan. *Collection of Geographical Works by Ibn al-Faqih, Ibn Fadlan, Abu Dulaf Al-Khazraji*. Fuat Sezgin (editor), IGAIW, Frankfurt, Germany, 1987.

Ibn Fadhlan, Ahmad b. al-'Abbas b. Rashid b. Hammad. *Reisebericht. Rihlat Ibn Fadlan*. Ahmed Zeki Validi Togan (editor and translator into German). Deutsche Morgenländische Gesellschaft, Abhandlungen für die Kunde des Morgendlandes. XXIV, 3. F. A. Brockhaus, Leipzig, Germany, 1939. Reprinted Institute for the History of Arabic-Islamic Science, Frankfurt, 1994.

Ibn Jubayr. *Rihlat Ibn Jubayr*. See Hospital Development section.

Ibn Khurradadhbih. *Al-Masalik wal Mamalik*, or *Book of Roads and Provinces*, or *Le livre des routes et des provinces*. Casimir Barbier de Meynard (editor). Cambridge University Library, Library/Class No. Moh.280.c.28, Cambridge, U.K.

Magmu' fi 'l-gughrafiya: tubi'a bi-'t-taswir 'an makhtut al-Maktaba ar-Radawiya fi Mahhad 5229. Mimma allafahu

Ibn-al-Faqih wa Ibn Fadhlan wa Abu Dulaf al-Khazraji. F. Sezgin et al. (editors). Institute for the History of Arabic-Islamic Science, Frankfurt, 1987.

Al-Muqaddasi. *Ahsan al-Taqasim fi Ma'rifat al-Aqalim.* See Libraries and Bookshops section.

Al-Ya'qubi. *Kitab al-Buldan.* See Geography section.

Yaqut. *Mu'jam al-Buldan.* See Geography section.

নৌ-চালনা

Al-Masudi. *Muruj al-dhahab wa Ma'adin al-Jawhar.* See Agricultural Revolution section.

Al-Qibjaqi. *Kitab Kanz al-Tujjār fi ma'rifat al-Ahjar,* or *The Book of Treasure for Merchants Who Seek Knowledge of Stones.* B. A. Rosenfeld and E. Ihsanoglu, No. 649, IRCICA, Istanbul, 2003.

Homsi, H. "Navigation and Ship-building," in *The Different Aspects of Islamic Culture,* Vol. IV: *Science and Technology in Islam,* Parts I-II. Ahmad Y. Al-Hassan, Yusuf Iskandar, Albert Zaki, and Ahmad Maqbul (editors). UNESCO, Paris, 2001.

Ibn Majid, Shihabal-Dein. *Arab Navigation in the Indian Ocean Before the Coming of the Portuguese,* or *Kitab al-Fawa'id fi usul al-bahr wa'l-qawa'id.* G. R. Tibbets (translator). The Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland, London, 1981.

Nadwi, Allama Syed Sulaiman. *The Arab Navigation.* Syed Sabahuddin Abdurahman (translator). Sh. Muhammad Ashraf, Lahore, Pakistan, 1966.

Piri Reis. *Kitab-i-bahriyye.* See Maps section.

বৈশ্বিক যোগাযোগ

Al-Nuwayri. *Nihayat al-Arab fi Funun al-Adab.* See Water Management section.

যুদ্ধ এবং যুদ্ধাস্ত্র

Ibn Aranbugha al-Zardkash. *Armoury Manual.* Fuat Sezgin (editor). Institute for History of Arabic-Islamic Science at the Johann Wolfgang Goethe University, Frankfurt, 2004.

Al-Rammah. *Kitab Al-Furusiyya wa Al-Manasib Al-Harbiyya,* or *The Book of Horsemanship and Ingenious War Devices.* Suleymaniye Library, Ayasofya 3799, and Nurosmaniye Library 2294, Istanbul.

Omeri. *A Muslim Manual of War,* or *Tafrij al-kurub fi tadbir al-hurub.* George T. Scanlon (editor and translator). The American University at Cairo, Cairo, 1961.

সমাজ বিজ্ঞান এবং অর্থনীতি

Ibn Khaldun. *Muqaddimah,* or *The Introduction to History.* Istanbul University Library, Arabic, 2743, 835, Istanbul, Turkey; and The Library of Congress, Library/Call No. D.16.7.123.1879, Washington, D.C.

Ibn Khaldun. *The Muqaddimah: An Introduction to History.* N. J. Dawood (editor). Franz Rosenthal (translator). Routledge and Kegan Paul, London, 1978.

মহাবিশ্ব

জ্যোতির্বিদ্যা

Al-Battani. *Al-Zij al-Sabi.* See Planet Earth section.

Al-Biruni. *Kitab al-Tafhim li-awa'il sina'at al-tanjim,* or *The Book of Instruction in the Elements of the Art of Astrology.* R. Ramsay Wright (translator); reprinted by Fuat Sezgin. IGAIW, Frankfurt, 1998.

Carmody, Francis J. *Alfragani differentie in quibusdam collectis scientie astrorum.* Berkeley, California, 1943.

Al-Farghani. *Kitab fi Harakat al-Samawiyah wa Jawami Ilm al Nujum,* or *Compendium of Astronomy.* Suleymaniye Library, Ayasofya 2843/2, Istanbul.

Al-Farghani and **Al-Battani.** *Texts and Studies.* Collected and reprinted by Fuat Sezgin in collaboration with Mazen Amawi, Carl Ehrig-Eggert, and Eckhard Neubauer. IGAIW, Frankfurt, 1998.

Goldstein, Bernard R. *Al-Bitrūjī: On the Principles of Astronomy.* 2 volumes. Yale University Press, New Haven, Conn., 1971.

Ibn al-Shatir al-Muwaqqit. *Kitab Nihayat al-sul fi Tashih al-Usul,* or *Limit of Desire in Correcting Principles.* Teymur riyada 154, Cairo.

Ibn Rushd. *Tahafut al-Tahafut,* or *The Incoherence of the Incoherence.* Translated from the Arabic with introduction and notes by Simon van den Bergh, 2 volumes, pp. 311–316. Luzac & Co., London, 1954.

Ibn Yunus. *Al-Zij al-Kabir al-Hakimi, or the Hakemite Tables.* See Planet Earth section.

King, David A. "The Astronomical Works of Ibn Yūnus." Ph.D. dissertation, Yale University, New Haven, Conn., 1972.

King, David A. "Ibn Yūnus' Very Useful Tables for Reckoning Time by the Sun," in *Archive for History of Exact Sciences* 10, pp. 342–394. 1973.

Puig, Roser. *Al-Šakkāziyya: Ibn al-Naqqāš al-Zarqālluh. Edición, traducción y estudio.* Instituto Millas Vallicrosa de Historia de la Ciencia Araba, Barcelona, 1986.

Al-Zarqali. *Kitab al-a'mal bi'l-safiha al-Zijiyya,* or *Book of Operations by Means of Tympanum of Zijes.* Suleymaniye Library, Esad Efendi 2671/1, Istanbul.

মানমন্দির

Abu Mansur. *Al-Zij al Mumtahan,* or *The Verified Tables.* Library of the St. Laurentius Monastery, II. 927, Escorial, Spain.

Dizer, M. (editor). *Proceedings of the International Symposium on the Observatories in Islam* (September 19-23, 1977). Millî Egitim Basımevi, Istanbul, 1980.

Sayili, Aydin. *The Observatory in Islam.* Türk Tarih Kurumu Basimevi, Publications of the Turkish Historical Society, Ankara. Réimpression Arno Press, New York, 1981.

■ জ্যোতিষশাস্ত্রীয় যন্ত্র

Al-Battani. *Al-Zij al-Sabi.* See Planet Earth section.

Al-Halabi. *Bughyat al-Tulab fil'amal bi'l rub al-astrulab,* or *Aims of Pupils on Operations with the Quadrant of Astrolabe.* University Library 1001/8, Leiden.

Al-Hamawi. *Ad Durr al-Gharib fil amal bi dairat al-tayyib,* or *Rare Pearls on Operations with the Circle for Finding Sines.* University Library 187b/4, Leiden.

'Izz al-Din al-Wafa'i. *Al-Nujum al-Zahirat fi amal bi'l rub al-Muqantarat,* or *Brilliant Stars on Operations with the Almucantar Quadrant.* Suleymaniye Library, Fatih 3448, Istanbul.

Jabir ibn Aflah. *Kitab al-Hai'a,* or *Book of Cosmology.* Berlin MS 5653, No. 5479, catalogue Die Handschriften-Verzeichnisse der Königlichen Bibliothek zu Berlin, 23 volumes, 1853-1914.

Jabir ibn Aflah. *Islah al Majisti,* or *Correction of the Almagest of Ptolemy.* Berlin, Staatsbibliothek-State Library, 5653, Berlin.

Al-Khujandi. *Al-Talwih li-Asrar al-Tanqih.* See Hospital Development section.

Shihab al-Din al-Hamawi. *Masail Handasya,* or *Geometrical Problems.* Riyada 694, Cairo.

Al-Sufi. *Suwar al-Kawakib al-Thabit,* or *Book of Fixed Stars.* Suleymaniye Library, Fatih 3422, Istanbul.

Taqi al-Din. *Turuq al-Saniyya fi al-Alat al-Ruhaniyya.* See Water Supply section.

Ragep, F. J. (editor and translator). *Nasir al-Din al-Tusi's Memoir on Astronomy 'al-Tadhkira fi 'ilm al-hay'a'.* 2 volumes. Springer Verlag, Berlin, 1993.

■ আস্তর্লাব

Al-Biruni. *Al-Isti'ab fi San'at al-Usturlabe.* Diyarbakir Public Library, 403/3, Diyarbakir, Turkey.

Al-Bitruji. *Kitab-al-Hay'ah,* or *Kitab al-murta'ish fi'l-hay'a,* or *Book of Cosmology.* Library of the Topkapi Palace Museum, 3302/1, Istanbul.

Al-Farghani. *Kitab fi san'at al-astrolabe.* Kastamonu Public Library, 794-5, Kastamonu, Turkey.

Al-Farghani. *Kitab fi Harakat al-Samawiyah wa Jawami Ilm al Nujum.* See Astronomy section.

Ibn Isa. *Risala fi al-Usturlab.* Vatican Library, Codici Borgiani Arabi 217/3, Vatican City.

Jamal al-Din al-Tariqi. *Risala fi ma'rifat al-Taqwim wa ma'rifat al-usturlab wa mawaqit wa 'ilm ahkam al-Nujum.* Vatican Library 1398/3, Vatican City.

Masha'Allah. *Al-Kitab al-ma'ruf bi'l-sabi' wa-'l ishrin,* or *The Book Known as Twenty-seventh,* or *De scientia motus orbis, Massahalae de scientia motus orbis.* Nuremberg, 1504.

Masha'Allah. *Kitab san'at al-asturlabat wa'l-'amal biha,* or *Book on the Construction of Astrolabes and Their Operations,* or *De compositione et utilitate astrolabii.*

Al-Zarqali. *Kitab al-a'mal bi'l-safiha al-Zijiyya.* See Astronomy section.

■ আর্মিলারি গোলক

Dawud ibn Sulayman. *Kitab dhat al-halaq,* or *Book on the Armillary Sphere.* Miqat 969/1a, Cairo.

Jabir ibn Aflah. *Islah al-Majisti.* See Astronomical Instruments section.

■ চাঁদের কলঙ্ক

Abu al-Fida'. *Mukhtasar Tarikh Al-Bashar,* or *Concise History of Humans.* Corum Hasan Pasa Public Library, 1178, Corum, Turkey.

Abu al-Fida'. *Taqwim al-Buldan.* See Travelers and Explorers section.

Masha'Allah. *Al-Kitab al-ma'ruf bi'l-sabi' wa-'l ishrin.* See Astrolabe section.

Masha'Allah. *Kitab san'at al-asturlabat wa'l-'amal biha.* See Astrolabe section.

Al-Sufi. *Suwar al-Kawakib al-Thabit.* See Astronomical Instruments section.

Al-Tusi. *Tarcama-i Kitab-i Suwar al-kawakib.* Suleymaniye Library, Ayasofya Collection, 2595, Istanbul.

Al-Tusi. *Al-Tadhkira fi al-Hay'a.* Vatican Library 319/1, Vatican City.

Ulugh Beg. *Al-Zij,* or *Astronomical Tables.* Suleymaniye Library, Ayasofya Collection, MS 2692, Istanbul.

■ নক্ষত্রপুঞ্জ

Al-Sufi. *Suwar al-Kawakib al-Thabit.* See Astronomical Instruments section.

■ উড্ডয়ন

Al-Firdawsi. *Shahnameh,* or *Book of Kings.* Ankara National Library, B 530, Ankara, Turkey.

Ibn Jubayr. *Rihlat Ibn Jubayr.* See Hospital Development section.

০৫ আরও জানতে পড়ুন

সাধারণ

Abattouy, Mohammed. *L'Histoire des sciences arabes classiques: une bibliographie sélective commentée.* Foundation of King Abdulaziz, Casablanca, 2007.

Abattouy, Mohammed (editor). *La science dans les sociétés islamiques: approches historiques et perspectives d'avenir.* Foundation of King Abdulaziz, Casablanca, 2007.

Abattouy, Mohammed, Renn, Jürgen, and Weinig, Paul (editors). *Science in Context*, Vol. 14. Special double issue: *Intercultural Transmission of Scientific Knowledge in the Middle Ages: Graeco-Arabic-Latin.* Cambridge University Press, Cambridge, U.K., 2001.

Al-Khalili, Jim. *Pathfinders: The Golden Age of Arabic Science.* Allen Lane, London, 2010.

Al-Qurashi, Diya Al-Din Muhammad Ibn Muhammad Al-Shafii, known as Ibn Al-Ukhuwwa. *The Ma'alim Al-Qurba Fi Ahkam Al-Hisba.* Reuben Levy (editor). Abstract of contents, glossary, and indices. Cambridge University Press/Luzac and Co., Cambridge/London, 1938.

Arabick Roots. A catalogue of exhibition manuscripts and letters of early founders of the Royal Society revealing their connections with Arabic. The Royal Society, London, August-November 2011. The Royal Society, London, 2011.

Avicenne, Al-Husayn Ibn Abdullah Ibn Sina. *Poème de la médicine, Urguza fi al-tibb (Cantica Avicennae).* Texte Arabe, Traduction Française, Traduction Latine du XIII[e] siècle, avec Introduction, notes, et index, établi et présenté par Henri Jahier et Abdul-Kader Noureddine, Les Belles Lettres, Paris, 1956.

Berggren J. Lennart. "Historical Reflections on Scientific Knowledge: The Case of Medieval Islam," in *Knowledge Across Cultures: Universities East and West*, pp. 137-153. Ruth Hayhoe (editor). Hubei Educational Press/OISE Press, Toronto, 1993.

Brockelman, Carl. *Geschichte der arabischen Litteratur.* 3 volumes plus 2 supplements. 3rd edition, E. J. Brill, Leiden, 1943-49.

Carra de Vaux, Bernard. *Les penseurs de l'Islam.* 5 volumes. Geunther, Paris, 1921-26.

Casulleras, Josep, and Samsó, Julio (editors). *From Baghdad to Barcelona. Studies in the Islamic Exact Sciences in Honour of Professor Juan Vernet.* 2 volumes. Instituto Millás Vallicrosa de Historia de la Ciencia Arabe—Anuari de Filología, Universitat de Barcelona, XIX b-2, 1996.

Catalogue of Arabic Science and Medicine: A Collection of Manuscripts and Early Printed Books Illustrating the Spread and Influence of Arabic Learning in the Middle Ages and the Renaissance. Vol. 1186 de Bernard Quaritch catalogue. Introduction by Professor Charles Burnett. Bernard Quaritch Ltd., London, 1993.

Dallal, Ahmad. "Science, Medicine, and Technology: The Making of a Scientific Culture," in *The Oxford History of Islam*, pp. 155-213. Edited by John L. Esposito. Oxford University Press, Oxford, U.K., 1999.

Djebbar, Ahmed. *L'âge d'or des sciences arabes.* Editions Le Pommier/La Cité des sciences et de l'industrie, Paris, 2005.

——. *Une histoire de la science arabe.* Entretiens avec Jean Rosmorduc. Editions du Seuil, Paris, 2001.

Endress, Gerhard. "*Die wissenschaftliche Literatur,*" in *Grundriß der Arabischen Philologie*, pp. 399-506. Edité par Helmut Gätje. Band II: *Literaturwissenschaft.* Dr. Ludwig Reichert Verlag, Wiesbaden, 1987.

Gillispie, Charles (editor). *Dictionary of Scientific Biography.* 18 volumes. Charles Scribner's Sons, New York, 1970-90.

Hamilton, Michael M. "Lost History: The Enduring Legacy of Muslim Scientists, Thinkers, and Artists," in *National Geographic*, June 19, 2007.

Hartner, Willy. "La science dans le monde de l'islam après la chute du Califat." *Studia Islamica*, Vol. 31, pp. 135-151, 1970.

Hassan, al-, Ahmad Y., Iskandar, Yusuf, Zaki, Albert, and Maqbul, Ahmad (editors). *The Different Aspects of Islamic Culture.* Vol. IV: *Science and Technology in Islam*, Parts I-II. UNESCO, Paris, 2001.

Hayes John (editor). *The Genius of Arab Civilization: Source of Renaissance.* The MIT Press, Cambridge, Mass., 1983.

Hogendijk, J. P., and Sabra, A. I. [Abdelhamid Ibrahim] (editors). *The Enterprise of Science in Islam. New Perspectives.* The MIT Press, Cambridge, Mass., 2003.

[Ibn al-Haytham]. *Al-Hasan ibn al-Hasan ibn al-Haytham (d. 430-1039). Texts and Studies.* Collected and reprinted by F. Sezgin et al. 2 volumes. Institut für Geschicte der Arabisch-Islamischen Wissenschaften, Frankfurt, 1998.

Ibn al-Nadim. *The Fihrist of al-Nadim. A Tenth-Century Survey of Muslim Culture.* English translation by Bayard Dodge. 2 volumes. Columbia University Press, London/New York, 1970.

——. *Kitab al-Fihrist.* Mit Anmerkungen hrsg. von Gustav Flügel. 2 volumes. F. C. W. Vogel, Leipzig, 1871-72.

Ibn Khaldun. *The Muqaddimah. An Introduction to History.* English translation by F. Rosenthal. 3 volumes. Princeton University Press, Princeton, N.J., 1967.

Ihsanoglu, Ekmeleddin (editor). *Catalogue of Islamic Medical Manuscripts (in Arabic, Turkish, Persian) in the Libraries of Turkey.* Prepared by Ramazan Sesen, Cemil Akpinar, and Cevat Izgi. IRCICA, Istanbul, 1984.

——. *Osmanli Astronomi Literatürü Tarihi. History of Astronomy Literature During the Ottoman Period.* Prepared by Ekmeleddin Ihsanoglu, Ramazan Sesen, Cevat Izgi, Cemil Akpinar, and Ihsan Fazlioglu. 2 volumes. IRCICA, Istanbul, 1997.

——. *Osmanli Matematik Literatürü Tarihi. History of Mathematical Literature During the Ottoman Period.* Prepared by Ekmeleddin Ihsanoglu, Ramazan Sesen, and Cevat Izgi. 2 volumes. IRCICA, Istanbul, 1999.

Ihsanoglu, Ekmeleddin, and Günergun, Feza (editors). *Science in Islamic Civilization.* Proceedings of the Science Institutions in Islamic Civilization and International Symposia Science and Technology in the Turkish and Islamic World. IRCICA, Istanbul, 2000.

Kahn, A. S. *A Bibliography of the Works of Abu 'l-Rayhan al-Biruni.* New Delhi, 1982.

Kennedy, Edward Stewart. "The Arabic Heritage in the Exact Sciences," in *Al-Abhath*, Vol. 23, pp. 327-344. The American University of Beirut, Beirut, 1970.

Kennedy, E. S., Colleagues, and Former Students. *Studies in the Islamic Exact Sciences.* D. A. King and M. H. Kennedy (editors). The American University of Beirut, Beirut, 1983.

Makdisi, George. "Muslim Institutions of Learning in Islam and in the West," in *Bulletin of the School of Oriental and African Studies*, Vol. 24, pp. 1-56. Travail pionnier sur le système d'éducation développé dans la civilisation islamique. University of London, London, 1961.

——. *The Rise of Colleges: Institutions of Learning in Islam and in the West.* Edinburgh University Press, Edinburgh, 1981.

Matvievskaia, Galina P., and Rozenfeld, Boris A. *Matematiki i astronomi musulmanskogo srednevekovya i ikh trudi* (VII-XVII vv). 3 volumes. Nauka, Moscou, 1983.

Mieli, Aldo. *La Science arabe et son rôle dans l'évolution scientifique mondiale.* E. J. Brill, Leiden, 1st édition, 1938; 2nd édition, 1966.

Morelon, Régis, and Hasnawi, Ahmed (editors). *De Zénon d'Élée à Poincaré. Recueil d'études en hommage à Roshdi Rashed.* Peeters, Louvain/Paris, 2004.

Nasr, Seyyed Hosein. *Science and Civilization in Islam.* Harvard University Press, Cambridge, Mass., 1968. Reprints: New American Library, New York, 1968, 1970; The Islamic Texts Society, Cambridge, U.K., 1987.

Rashed, Roshdi (editor). *Encyclopedia of the History of Arabic Science.* Edited with the collaboration of Régis Morelon. 3 volumes. Vol. 1: Astronomy—Theoretical and Applied; Vol. 2: Mathematics and the Physical Sciences; Vol. 3: Technology, Alchemy, and Life Sciences. Routledge, London/New York, 1996.

Rosenfeld, Boris A., and Ihsanoglu, Ekmeleddin. *Mathematicians, Astronomers, and Other Scholars of Islamic Civilization and Their Works (7th-19th Centuries).* IRCICA, Istanbul, 2003.

Sabra, A. I. "Situating Arabic Science: Locality Versus Essence," in *Isis*, Vol. 87, pp. 654-670. Chicago University Press, Chicago, 1996.

Said, Hakim Mohammed. *Al-Biruni: Commemorative Volume.* Proceedings of the international congress held in Pakistan on the occasion of millenary of Ab´ RaiüŒn Muüamad Ibn Aúmad al-B¥r´n¥ (November 26, 1973-December 12, 1973). Times Press, Karachi, 1979.

Said, Hakim Mohammed (editor). *Ibn Al-Haitham.* Proceedings of the celebrations of 1,000th anniversary held under the auspices of Hamdard National Foundation, Pakistan. Times Press, Karachi, 1969.

Saliba, George. *Islamic Science and the Making of the European Renaissance.* The MIT Press, Cambridge, Mass., 2007.

Saliba, George. "Arabic Planetary Theories After the Eleventh Century A.D.," in *Encyclopedia of the History of Arabic Science*, pp. 58-127. Routledge, London, 1996.

——. *A History of Arabic Astronomy: Planetary Theories During the Golden Age of Islam.* New York University Press, 1994.

——. *Rethinking the Roots of Modern Science: Arabic Scientific Manuscripts in European Libraries.* Occasional Paper, Center for Contemporary Arabic Studies, Georgetown University, Washington, D.C., 1999.

——. "A Sixteeenth-Century Arabic Critique of Ptolemaic Astronomy: The Work of Shams al-Din al-Khafri," in *Journal for the History of Astronomy*, Vol. 25, pp. 15-38. 1994.

Samsó, Julio. *Las Ciencias de los antiguos en Al-Andalus.* Mapfre, Madrid, 1992.

Sarton, George. *Introduction to the History of Science.* 3 volumes: Vol. 1: *From Homer to Omar Khayyām*; Vol. 2: *From Rabbi Ben Ezra to Roger Bacon*; Vol. 3: *Science and Learning in the Fourteenth Century.* The Williams and Wilkins Company for the Carnegie Institution, Baltimore, 1927-48.

Savage-Smith, Emilie. "Gleanings from an Arabist's Workshop: Current Trends in the Study of Medieval Islamic Science and Medicine," in *Isis*, Vol. 79, pp. 246-72. 1988.

Schacht, J., and Bosworth, C. E. *The Legacy of Islam.* Oxford University Press, 1974; 2nd edition, 1979.

Selin, Helaine (editor). *Astronomy Across Cultures: The History of Non-Western Astronomy.* Kluwer, Dordrecht, 2000.

——. *Encyclopaedia of the History of Science, Technology, and Medicine in Non-Western Cultures.* Kluwer, Dordrecht, 1997.

——. *Mathematics Across Cultures: The History of Non-Western Mathematics.* Kluwer, Dordrecht, 2000.

Sezgin, Fuat. *Geschichte des Arabischen Schriftums.* 12 volumes. E.J. Brill, Leiden, 1967-2000.
Spink, M. S., and Lewis, I. L.((editors and translators). *Albucassis on Surgery and Instruments: A Definitive Edition of the Arabic Text with English Translation and Commentary.* Wellcome Institute of the History of Medicine, London, 1973.
Sûter, Heinrich. *Beiträge zur Geschichte der Mathematik und Astronomie im Islam.* Nachdruck seiner Schriften aus den Jahren 1892-1922. 2 volumes. Fuat Sezgin (editor). Institut für Geschicte der Arabisch-Islamischen Wissenschaften, Frankfurt, 1986.
[Thabit ibn Qurra]. *Thabit ibn Qurra. Texts and Studies.* Collected and reprinted by F. Sezgin et al. Frankfurt: Institut für Geschicte der Arabisch-Islamischen Wissenschaften, 1997.
Vernet, J., and Samsó, J., et al. *El Legado científico andalusi.* Ministerio de Cultura, Madrid, 1992.
Wiedemann, Eilhard. *Aufsätze zur Arabischen Wissenschaftsgeschichte.* 2 volumes. Hildesheim, New York: G. Olms, 1970.
——. *Gesammelte Schriften zur arabisch-islamischen Wissenschaftsgeschichte.* Gesammelt und bearb. Von Dorothea Girke. 3 volumes. IGAIW, Frankfurt, 1984.
Woepcke, Franz. *Etudes sur les mathématiques arabo-islamiques.* Nachdruck von Schriften aus den Jahren 1842-1874. 2 volumes. Institut für Geschicte der Arabisch-Islamischen Wissenschaften, Frankfurt, 1986.
Young, M. J. L., Latham, J. D., and Serejant, R. B. *Religion, Learning and Science in the Abbasid Period.* Cambridge University Press, Cambridge, 1990.

গৃহ

BBC 2. *What the Ancients Did for Us: The Islamic World.* February 16, 2004.
Channel 4 TV. *An Islamic History of Europe.* August 5-19, 2005.
Ellis, John. *An Historical Account of Coffee with an Engraving, and Botanical Description of the Tree: To Which Are Added Sundry Papers Relative to Its Culture and Use, as an Article of Diet and of Commerce.* Edward Dilly and Charles Dilly, London, 1774.
Friedman, D., and Cook, E. *A Miscellany.* www.daviddfriedman.com/Medieval/miscellany_pdf/Miscellany.htm.
Hart-Davies, Adam. *What the Past Did for Us: A Brief History of Ancient Inventions.* BBC Books, London, 2004.
Lindberg, D. C. *Studies in the History of Medieval Optics.* Varorium, London, 1983.
——. "The Western Reception of Arabic Optics," in *Encyclopaedia of History of Arabic Science.* R. Rashed (editor). Routledge, London, 1996.
Omar, S. B. *Ibn al-Haytham's Optics.* Bibliotheca Islamica, Chicago, 1977.
Ree, Hans. *The Human Comedy of Chess.* Russell Enterprises, Milford, Conn., 1999.
Sopieva, Natasha. *Ibn al-Haytham, the Muslim Physicist.* www.MuslimHeritage.com, 2001.

বিদ্যালয়

Al-Ghazali. *Dear Beloved Son.* Translated from Arabic by K. El-Helbawy, Awakening U.K., Swansea, 2000.
Burnett Charles. *Leonard of Pisa (Fibonacci) and Arabic Arithmetic.* www.MuslimHeritage.com, 2005.
Dodge, B. *Muslim Education in Medieval Times.* The Middle East Institute, Washington, D.C., 1962.
Haskins, C. H. *Studies in the History of Mediaeval Science.* Frederick Ungar Publishing Co., New York, 1967.
Ihsanoglu, Ekmeleddin. *Primary Schools Under the Ottomans.* www.MuslimHeritage.com, 2005.
Mackensen, R. "Moslem Libraries and Sectarian Propaganda," in *The American Journal of Semitic Languages,* 1934-35.
Makdisi, George. "On the Origin and Development of the College in Islam and the West," in *Islam and the Medieval West.* Khalil I. Semaan (editor). State University of New York Press, Albany, 1980.
Nakosteen, M. *History of Islamic Origins of Western Education AD 800-1350.* University of Colorado Press, Boulder, 1964.
Pedersen, J. *The Arabic Book,* Geoffrey French (translator). Princeton University Press, Princeton, N.J., 1984.
Pinto, O. "The Libraries of the Arabs During the Time of the Abbasids," in *Islamic Culture* 3. 1929.
Ribera, J. *Disertaciones y Opúsculos.* 2 volumes. Imprenta de Estanislao Maestre, Madrid, 1928.
Sardar, Z., and Davies, M. W. *Distorted Imagination.* Grey Seal Books, London, 1990.
Sarton, G. *Introduction to the History of Science.* 3 volumes. The Carnegie Institution, Washington, D.C., 1927.
Tibawi, A. *Islamic Education.* Luzac and Company Ltd., London, 1972.
Watt, W. M. *The Influence of Islam on Medieval Europe.* Edinburgh University Press, Edinburgh, 1972.
Wilds, E. H. *The Foundation of Modern Education.* Rinehart and Co., New York, 1959.
Zaimeche, Salah. *Education in Islam: The Role of the Mosque.* www.MuslimHeritage.com, 2002.

বাজার

Artz, F. B. *The Mind of the Middle Ages.* Revised third edition. University of Chicago Press, Chicago, 1980.
Bolens, L. "Agriculture," in *Encyclopedia of the History of Science, Technology, and Medicine in Non-Western*

Cultures. Helaine Selin (editor). Kluwer Academic Publishers, Dordrecht/Boston/London. 1997.

Channel 4 TV. *An Islamic History of Europe*. August 5-19, 2005.

De Vaux, Baron Carra. *Les Penseurs de l'Islam*. Vol. 2, Geuthner, Paris, 1921.

Hill, D. R. *Islamic Science and Engineering*. Edinburgh University Press, Edinburgh, 1993.

Idrisi, Zohor. *The Muslim Agricultural Revolution and Its Influence on Europe*. www.MuslimHeritage.com, 2005.

Le Bon, G. *La Civilisation des Arabes*. IMAG, Syracuse, Italy, 1884.

Scott, S. P. *History of the Moorish Empire in Europe*. 3 volumes. J. B. Lippincott Company, London. 1904.

Watson, A. M. *Agricultural Innovation in the Early Islamic World*. Cambridge University Press, Cambridge, U.K., 1983.

Zaimeche, Salah. *A Review on Muslim Contribution to Agriculture*. www.MuslimHeritage.com, 2002.

হাসপাতাল

Abdel-Halim, R. E. "Contributions of Ibn Al-Nafis (1210-1288 A.D.) to the Progress of Medicine and urology: A Study and Translations from His Medical Works," in *Saudi Medical Journal*, Vol. 29, pp. 13-22. 2008.

——. *Experimental Medicine 1,000 Years Ago*. Vol. 3, pp. 55-61. Urol Ann, Paris, 2011.

——. *Lithotripsy: A Historical Review*. Matouschek E., editor. Endo-urology—Proceedings of the Third Congress of the International Society of Urologic Endoscopy, Karlsruhe; August 26-30, 1984. Bau-Verlag Werner Steinbruck, Baden, Germany, 1985. (Also available at http://www.hektoeninternational.org/Lithotripsy.html.)

——. "Obesity: 1,000 Years Ago." *Lancet*, 366:204. 2005. (Also available at http://www.rabieabdelhalim.com/Obesity1000YsAgo.htm.)

Abdel-Halim, R. E., Altwaljiri, A. S., Elfaqih, S. R., and Mitwalli, A. H. "Extraction of Urinary Bladder Stone as Described by Abul-Qasim Khalaf Ibn Abbas," in *Saudi Medical Journal*, Vol. 24, pp. 1283-91. 2003. A translation of original text and a commentary.

Al-Mazroa, A. A., and Abdel-Halim, R. E. "Anaesthesia 1,000 Years Ago—I," in *The History of Anaesthesia*, pp. 46-8. R.S. Atkinson and T. B. Boulton (editors). Royal Society of Medicine Services and the Parthenon Publishing Group, London and New York, 1989. (Also available at http://rabieabdelhalim.com/anesthesia1.html.)

——. "Anesthesia 1,000 Years Ago—II," in *Middle East Journal Anesthesiology*, Vol. 15, pp. 383-92. 1991. 2000. (Also available at http://www.rabieabdelhalim.com/anaesthesia2.html.)

Burnett, Charles. *Arabic Medicine in the Mediterranean*. www.MuslimHeritage.com, 2004.

Campbell, D. *Arabian Medicine, and Its Influence on the Middle Ages*. Philo Press, Amsterdam, 1974.

Channel 4 TV. *An Islamic History of Europe*. August 5-19, 2005.

Cumston, C. G. "Islamic Medicine," in *An Introduction to the History of Medicine from the Time of the Pharaohs to the End of the XVIII Century*. Kegan Paul, Trench, Trubner, and Co. Ltd., London; and Alfred A. Knopf, New York, 1926.

FSTC. *Pharmacology in the Making*. www.MuslimHeritage.com, 2001.

Ghalioungui, Paul. "Ibn Nafis," in *Studies in the Arabic Heritage*. The Ministry of Information of Kuwait, Kuwait, 1970.

Hirschberg, J., Lippert, J., and Mittwoch, E. *Die arabischen Lehrbucher der Augenheilkunde*. Abhdl. Der Preussischen Akademie, Berlin, 1905.

Iskandar, A. Z. *A Catalogue of Arabic Manuscripts on Medicine and Science in the Wellcome Historical Medical Library*. The Wellcome Historical Medical Library, London, 1967.

Keys, T. E., and Wakim, K. G. *Contributions of the Arabs to Medicine*, Vol. 28. Proceedings of the Staff Meeting, Mayo Clinic, Rochester, Minn., 1953.

Kirkup, J. R. *The History and Evolution of Surgical Instruments*. I. Introduction. Annals of the Royal College of Surgeons of England, 1981.

Leclerc, L. *Histoire de la médecine arabe*. Ernest Ledaux, Paris, 1876.

Levey, M. *Early Arabic Pharmacology*. E. J. Brill, Leiden, 1973.

Lindberg, D. C. "The Western Reception of Arabic Optics," in *Encyclopedia of History of Arabic Science*. R. Rashed (editor). Routledge, London, 1996.

Meyerhof, M. "Ibn Nafis and His Theory of the Lesser Circulation," in *Isis*, Vol. 23. 1935.

Sarton, G. *Introduction to the History of Science*. Carnegie Institution, Washington, D.C., and Williams and Wilkins Company, Baltimore, 1927-31. Reprinted Robert E. Krieger Publishing Co. Inc., New York, 1975.

Shaikh, Ibrahim. *Who Discovered Pulmonary Circulation, Ibn al-Naphis or Harvey?* www.MuslimHeritage.com, 2001.

Ullmann, M. *Islamic Medicine*. Islamic surveys No. 11. Edinburgh University Press, Edinburgh, 1978.

নগর

Channel 4 TV. *An Islamic History of Europe*. August 5-19, 2005.

Forbes, R. J. *Studies in Ancient Technology*, Vol. 2. E. J. Brill, Leiden, 1965.

Frothingham, A. W. *Lustreware of Spain*. The Hispanic Society of America, New York, 1951.

Glick, T. *Islamic and Christian Spain in the Early Middle Ages*. Princeton University Press, Princeton, N.J. 1979.

Harvey, J. *The Master Builders*. Thames and Hudson, London, 1973.

Haskins, C. H. *Studies in the History of Mediaeval Science*. Frederick Ungar Publishing Co., New York, 1967.

Hobson, R. L. *A Guide to the Islamic Pottery of the Near East*. British Museum, London, 1932.

Lambert, E. *Art Musulman et Art Chrétien dans la Peninsul Iberique*. Editions Privat, Paris, 1958.

Lane, A. *Early Islamic Pottery*. Faber and Faber, London, 1947.

Male, E. *Art et Artistes du Moyen Age*. Librairie Armand Colin, Paris, 1928.

Saoud, R. *Introduction to the Islamic City*. www.MuslimHeritage.com, 2001.

Wren, Christopher. *Parentalia, or Memoirs of the Family of the Wrens*. Mathew Bishop, T. Osborn, and R. Dodsley, London, 1750.

বিশ্ব

Alhabshi, Syed Othman. *Mapping the World*. www.MuslimHeritage.com, 2001.

Briffault, R. *The Making of Humanity*. George Allen, London, 1928.

Channel 4 TV. *An Islamic History of Europe*. August 5-19, 2005.

Feber, S. (editor). *Islam and the Medieval West*. A loan exhibition at the University Art Gallery, State University of New York (April 6-May 4), 1975.

Fuat Sezgin in Zusammenarbeit mit Eckhard Neubauer. *Wissenschaft und Technik im Islam: Einführung in die geschihcte der Arabisch-Islamischen Wissenschaften*. Vols. I-V. Institut für Geschichte der Arabisch-Islamischen Wissenschaften, Frankfurt am Main, 2003.

Glick, T. *Islamic and Christian Spain in the Early Middle Ages*. Princeton University Press, Princeton, N.J., 1979.

Harley, J. B., and Woodward, D. (editors). *The History of Cartography*. Vol. 2, Book 1: *Cartography in the Traditional Islamic and South Asian Societies*. University of Chicago Press, Chicago, 1972.

Holt, P. M., Lambton, A. K. S., and Lewis, B. (editors). *The Cambridge History of Islam*. Vol. 2, Cambridge University Press, Cambridge, U.K., 1970.

Kimble, G. H. T. *Geography in the Middle Ages*. Methuen and Co. Ltd., London, 1983.

Roshdi, Rashed (editor). *Encyclopaedia of the History of Arabic Science*. Routledge, London, 1996.

Scott, S. P. *History of the Moorish Empire in Europe*. 3 volumes. J. B. Lippincott Company, London, 1904.

Watt, M. *The Influence of Islam on Medieval Europe*. Edinburgh University Press, Edinburgh, 1972.

Zaimeche, Salah. *A Review of Muslim Geography*. www.MuslimHeritage.com, 2002.

মহাবিশ্ব

Arnold, Sir Thomas, and Guillaume, Alfred. *The Legacy of Islam*. First edition. Oxford University Press, Oxford, U.K., 1931.

Artz, F. B. *The Mind of the Middle Ages*. Third revised edition. University of Chicago Press, Chicago, 1980.

BBC 4. *An Islamic History of Europe*. August 5-19, 2005.

Bedini, Silvio A. *The Pulse of Time*. Leo S. Olschki, publisher (found in the Biblioteca Di Nuncius), 1991.

Briffault, R. *The Making of Humanity*. George Allen, London, 1928.

De Vaux, Baron Carra. *Les Penseurs de l'Islam*. Vol. 2. Geuthner, Paris, 1921.

Glubb, John. *Short History of the Arab Peoples*. Hodder and Stoughton, London, 1969.

Hitti, P. K. *History of the Arabs*. Tenth edition, Macmillan and St. Martin's Press, London, 1970.

Hogendijk, Jan P., and Abdelhamid, I. Sabra. *The Enterprise of Science in Islam: New Perspectives*. The MIT Press, Cambridge, Mass., 2003.

Ronan, C. "The Arabian Science," in *The Cambridge Illustrated History of the World's Science*. Cambridge University Press, Cambridge, U.K., 1988.

Saliba G. *Islamic Science and the Making of the European Renaissance*. The MIT Press, Cambridge, Mass., 2007.

Savage-Smith, Emilie. "Celestial Mapping," in *The History of Cartography 2*, Book 1. J. B. Harvey and David Woodward (editors). University of Chicago Press, Chicago, 1992.

Savory, R. M. *Introduction to Islamic Civilization*. Cambridge University Press, Cambridge, U.K., 1976.

Sayili, Aydin. *Observatories in Islam*. Republished from Dizer, M. (editor), International Symposium on the Observatories in Islam (September 19-23, 1977), Istanbul. FSTC. www.MuslimHeritage.com, 2005.

Sedillot, L. A. *Memoire sur les instruments astronomiques des Arabes*. Imprimerie royale, Paris, 1841

Selin, Helaine. *Encyclopaedia of the History of Science, Technology and Medicine in Non-Western Cultures*. Kluwer Academic Publishers, London, 1997.

Smith. D. E. *History of Mathematics*, Vol. 2. Dover Publications, New York, 1953.

Zaimeche, Salah. *A Review on Missing Contribution to Astronomy*. www.MuslimHeritage.com, 2002.

দু'টি কথা

"এক হাজার এক আবিষ্কার" নামটা দেখে أَلْفُ لَيْلَةٍ وَلَيْلَةٌ (এক হাজার এক রাত্রি) বা أَلْفُ لَيْلَى (হাজার রাত্রি)-র মতো চটকদার কাহিনীর কথা মনে পড়ে যায়। আরবী ভাষায় রচিত কল্পকাহিনীর এই বিশাল সংগ্রহ প্রথমে ফারসি ভাষায় এবং পরে ফ্রেঞ্চ ভাষার হাত বেয়ে ইংরেজি ও অন্যান্য বহু ভাষায় অনুদিত হয়। এর ইংরেজি অনুবাদ করেছিলেন প্রসিদ্ধ প্রাচ্যবিদ স্যার রিচার্ড বার্টন (১৮২১-১৮৯০)। বাংলা ভাষায় সংকলনটি অনুবাদ করেছিলেন দেবাশিস সরকার, যা আরব্য রজনী নামে প্রসিদ্ধ।

মধ্যপ্রাচ্য সমাজের এই বহুল প্রচলিত (*বিলাসী তথা নোংরা কামাচারী*) কাহিনীগুলি যে নেতিবাচক চিত্র তুলে ধরে, সেটাকে অবলম্বন করে ঘরে বাইরে সকল ইসলাম-বিরোধী গোষ্ঠী, মুসলিম জীবন-বিধানকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে আনন্দ উপভোগ করে। তাদের এই বৈরী মনোভাবকে আরও বলিষ্ঠ করেছে বর্তমান যুগের প্রবল শক্তিশালী গণমাধ্যম ও রাজনীতি। ফলে, আজকের শিক্ষিত ও সজাগ মুসলমানের কাছে মাথা তুলে দাঁড়াবার মতো বা গর্ব করার মতো কোনো খোরাক আর বাকি নেই। একদিকে, শরিয়তের চুলচেরা বিশ্লেষণ তাদেরকে বহু আত্মঘাতী দলে বিভক্ত করে রেখেছে। নিজেদের মধ্যে পয়েন্ট স্কোর করার মধ্যেই রয়েছে তাদের প্রধান কৃতিত্ব। ঐতিহাসিক মহামনীষীরাও তাদের কটাক্ষ থেকে রেহাই পান না। মনীষীদের বেশীরভাগই একদলের কাছে সমাদৃত হলে, আরেকদলের কাছে চরম অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধার পাত্র। অপরদিকে, রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রেও বেশিরভাগ মুসলিম শাসকদের কীর্তিকলাপে অর্থাৎ ইতিহাসে জোর গলায় বলার মতো কোনো উদাহরণ পাওয়া যায় না। সর্বোপরি, ধর্ম আর রাজনীতিকে বাদ দিলে অতীতের আপামর মুসলিম জীবন সম্পর্কে সুখকর কিছুই জানা নেই, অতএব বলারও কিছুই নেই।

এই প্রেক্ষাপটে "*এক হাজার এক আবিষ্কার*" সংকলনটির অবদান অতুলনীয় এবং সাড়া জাগানো। যদি বলা হয় যে, আজ এক বিশাল সংখ্যায় মুসলমানদের এসব বিষয়ে একটা আবছা ধারণা পর্যন্ত নেই, তাহলে সেটা কোনো অত্যুক্তি হবে না। এই সংকলনের মাধ্যমে আমরা জানতে পারছি যে, কীভাবে সপ্তম শতাব্দি থেকে শুরু করে প্রায় সাতশ থেকে এক হাজার বৎসর মুসলিম উম্মত জ্ঞান-বিজ্ঞানের ছোটবড় সব ক্ষেত্রে এবং সেই সাথে সামাজিক ও নৈতিক ক্ষেত্রে উৎকর্ষ অর্জনে নেতৃত্ব দিয়েছিল। এটা সেই সময় ছিল যখন ইউরোপীয় সমাজ খ্রিস্টধর্মের গোঁড়ামীর চাপে আলোর পথ ত্যাগ করে অন্ধকারে নিমজ্জিত হওয়াকেই পারলৌকিক পরিত্রাণের রাজপথ হিসেবে বেছে নিয়েছিল। তারা ইনকুইযিশন (*Inquisition*) নামক এক কালো আইনের মাধ্যমে ধর্ম থেকে যেকোন বিচ্যুতিকে আগুনে পুড়িয়ে নিপাত করতো। মধ্যযুগে খ্রিস্টধর্মের উত্থানের পরে ইউরোপে বিজ্ঞান, দর্শন ইত্যাদি বিষয়ে গ্রিক, রোমান আর ভারতীয়দের অবদান আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। সংক্ষেপে বলতে হয়, পঞ্চম শতাব্দি থেকে পঞ্চদশ শতাব্দি পর্যন্ত প্রায় এক হাজার বছর ইউরোপ অন্ধকারে ডুবে ছিল, যা ইতিহাসে উধৎশ অমবং বা অন্ধকার যুগ নামে সুপরিচিত।

বিশ্বব্যাপী এমনই এক শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশে ইসলাম নিয়ে এলো তাওহিদের আলো, জ্ঞানের আলো, কুসংস্কার থেকে মুক্তির আলো। খ্রিস্টানদের *Separation of Church and State* অর্থাৎ চার্চ থেকে স্টেটকে আলাদা করে দেখানোর মন্ত্রকে অর্থাৎ ধর্মকে দুনিয়া থেকে আলাদা করে দেখানোর মন্ত্রকে ইসলাম বর্জন করলো। ইহকালের জীবনে অনেক দোষত্রুটি রয়েছে, তাই বলে সেগুলি থেকে পলায়ন করে পরকাল অর্জন করা ইসলামের শিক্ষা নয়। ইহকাল মহান আল্লাহরই দান; তিনি নিজেই সেই আশ্বাসবাণী দিয়েছেন – হোক না ইহকাল সংক্ষিপ্ত, ত্রুটিপূর্ণ। কুরআনে রয়েছে, এক *Cosmic Plan* বা মহাজাগতিক পরিকল্পনা অনুযায়ী মহান আল্লাহ বস্তুজগতকে মানুষের অধিকারভুক্ত করে

তৈরি করেছেন। এই পরিকল্পনার অংশবিশেষ মহান আল্লাহ কুরআনে বহুবার উল্লেখ করেছেন, যেমন:

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ • وَسَخَّرَ لَكُم
مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ

"তিনি তাঁর পক্ষ হতে তোমাদের জন্য নিয়োজিত করে দিয়েছেন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সব কিছুই • চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্যে এতে অবশ্যই রয়েছে নিদর্শনাবলী" – সূরা জাছিয়া, ৪৫:১৩।

মহান আল্লাহ আরও বলেছেন:

حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ • سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ

"আমি অচিরেই তাদেরকে দেখাবো আমাদের নিদর্শনাবলী, দিগদিগন্তে ও তাদের নিজেদের মধ্যেও • যে পর্যন্ত না স্পষ্ট হয়ে যায় যে এই (কুরআনের) বাণী নিঃসন্দেহে ধ্রুবসত্য" – সূরা ফুসসিলাত, ৪১:৫৩।

এই সকল বাণী মুসলিমদের মনে এক নতুন স্বপ্ন, এক নতুন কৌতূহল এবং এক নতুন সর্বজিৎ আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তুলেছিল। তারা অদম্য সাহস নিয়ে প্রকৃতির মধ্যে নিহিত হাজার রকম নিয়ম (*Laws of Nature*) উদ্ঘাটনের কাজে নেমে পড়ে, যা আমরা পদার্থ-বিজ্ঞান আর সমাজ-বিজ্ঞানের বহু শাখায় অধ্যয়ন করি – যার একদিকে রয়েছে: *Physics, Chemistry, Mathematics, Biology, Medicine, Botany, Zoology, Astronomy* ইত্যাদি; আর অপরদিকে রয়েছে: *Psychology, Philosophy, Theology, Economics, History, Sociology* ইত্যাদি।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের এসকল শাখার সাথে জড়িত বহু বহু নাম আমরা ভুলে গেছি, কিন্তু ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে এদেরকে পরম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করা হয়। ইউরোপীয় জাদুঘরগুলিতে এদের বহু কীর্তি যত্নসহকারে সংরক্ষিত রয়েছে। এখানে মাত্র একটি নাম উল্লেখ করাই যথেষ্ট হবে। তিনি হলেন ইবনে সীনা বা আবু আলী সীনা – ইউরোপে আরপবহহধ নামে পরিচিত। জ্ঞান-বিজ্ঞানের এমন কোনো শাখা নেই যার মধ্যে তার অবদান নেই। চিকিৎসা-বিদ্যায় তার কানুন ফীত তিব বা *The Canon of Medicine* ইউরোপে ৬০০ বছরেরও বেশী সময় পাঠ্য-পুস্তক হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। এটা জেনে অবাক হতে হয় যে, ১০৩৭ খ্রিস্টাব্দে মাত্র ৫৭ বৎসর বয়েসে তিনি মৃত্যুবরণ করেছিলেন। বাংলা উইকিপিডিয়ায় তাঁর সম্পর্কে রয়েছে: "*দর্শন এবং চিকিৎসাশাস্ত্র ছাড়াও ইবনে সীনার রচনা সংকলনে জ্যোতির্বিজ্ঞান, আলকেমি, ভূগোল এবং ভূতত্ত্ব, মনোবিজ্ঞান, ইসলামী ধর্মতত্ত্ব, যুক্তিবিদ্যা, গণিত, পদার্থবিজ্ঞান এবং কবিতা বিষয়ক লেখাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।*"

কুরআনের ইশারা অনুযায়ী, প্রকৃতির নির্মাণশৈলী ও তদীয় বিবরণ উদ্ঘাটনের পাশাপাশি, সেদিনের মুসলিম সমাজে আরও শুরু হয়েছিল পার্থিব জীবনকে সমৃদ্ধ করার জন্য হাজার রকমের উদ্ভাবনা বা *invention*। এসবেরই বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে আপনার হাতে এই "*এক হাজার এক বিস্ময়*" সংকলনের মধ্যে। রক্ষণশীল মনোভাব ত্যাগ করে, এই সংকলনের গভীর অধ্যয়ন আজকের মুসলমানকে দারুণভাবে অনুপ্রাণিত করবে। সে যুগের বিশ্বের পশ্চাদমুখী দুঃসহ অবস্থাকে অগ্রাহ্য করে মুসলমানদের অবদান যে কি পরিমাণে আধুনিক ছিল, সেটা অনুধাবন করে আজকের অনবহিত মুসলমান অবাক হতে বাধ্য। সংকলনটির সূচিপত্র দেখলেই এর পরিধির আন্দাজ করা যায়। এই সংকলনে আবিষ্কারগুলিকে যে সকল শিরোনামে বিভক্ত করা হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: সংসার জীবনে ব্যবহারিক সামগ্রী, শিক্ষা ব্যবস্থা, বাণিজ্য তথা উৎপাদন ব্যবস্থা, চিকিৎসা ব্যবস্থা, নগরায়ন ও নির্মাণ কৌশল, বিশ্ব ও মহাবিশ্ব পরিচিতি অর্জনে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি এবং আরও অনেক যুগান্তকারী বিষয়াদি।

সংকলনটি অনুবাদ করে জনাব *ইমদাদ হোসেন* এক অসামান্য কৃতিত্বের অধিকারী হয়েছেন। তার এই বলিষ্ঠ পদক্ষেপ পাঠককে তথা শিক্ষক ও ছাত্র সমাজকে নতুন করে 'স্বপ্ন' দেখতে শেখাবে। এটা কি ঠিক নয় যে, আমাদের বর্তমান প্রাণহীন শিক্ষাক্রম থেকে সৃজনশীল স্বপ্ন দেখার *culture* উধাও হয়ে গেছে? যে জাতির কোনো স্বপ্ন নেই, সে জাতি বিশ্ব-সমাজে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে না। ঠিক তেমনই, জ্ঞান-চর্চাকে পাঠ্যপুস্তকের গণ্ডির মধ্যে সীমিত রাখার ফলে শিক্ষার্থীর সাধনা থেকে ইতিবাচক 'কৌতূহল' বা *inquisitiveness* নামক চালিকা-শক্তিকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে। আর এসবের জায়গা দখল করে নিয়েছে 'ব্যর্থতার ভয়' বা জুজু (*fear of failure*)। আজকের মুসলিম সমাজে ব্যর্থতাকে জয় করার উদ্যোগ বা সৎসাহস সচরাচর দেখা যায় না। যেকোন কাজে নেমে ব্যর্থ হওয়াতে কোনো দোষ নেই। কিন্তু আগেভাগে ব্যর্থতার ভয়কে মনে স্থান দিলে যেকোন ব্যক্তির মানসিকতা পঙ্গু হয়ে যেতে পারে অর্থাৎ মানুষ উদ্যম হারিয়ে ফেলতে পারে। দুঃখের সাথে স্মরণ করতে হয়, বই মুখস্থ করে ভাল নম্বর পাবার উপর গুরুজনদের অবিশ্রান্ত পীড়াপীড়ি কীভাবে শিক্ষার্থীদের ক্লান্ত করে ফেলে, যে কারণে এক বিপুল সংখ্যায় শিক্ষার্থীরা জ্ঞান-চর্চা থেকে চিরতরে ছিটকে পড়ে; ফলে তাদের মেধার ভাণ্ডার সমাজের কোনো কাজে আসে না। বলা বাহুল্য, এই নেতিবাচক *culture*-এর সংক্রমণ গোটা সমাজকে অধপতনের দিকে ঠেলে দিয়েছে। যার পরিণতিতে আজ ঘরে বাইরে আমাদেরকে শুনতে হচ্ছে যে, ইসলাম নাকি একটা *spent force* অর্থাৎ নিঃশেষিত শক্তি।

তাদের একথা বলার যথেষ্ট কারণও রয়েছে। উৎপাদন শিল্প থেকে শুরু করে সব রকমের যুদ্ধাস্ত্র, শাসন ব্যবস্থা (রাজনীতি, অর্থনীতি, বিচার-ব্যবস্থা) ইত্যাদি কোনো ক্ষেত্র বাকি নেই, যেখানে মুসলমানকে অনুসরণ করা হয়। সম্মানের সেই স্থান আমরা অনেক আগেই হারিয়ে ফেলেছি। এই বেদনাকে অতিক্রম করে নতুন স্বপ্ন গড়ে তোলার সময় এসে গেছে।

আবারও বলতে হয়, জনাব *ইমদাদ হোসেনের* এই অনুবাদ যেমন সৃজনশীল, তেমনই গুরুত্বপূর্ণ, তেমনই কঠিন। তার ধৈর্যের প্রশংসা করতে হয়। পরিষ্কারভাবে বুঝা যায়, জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার *concept* বা মূল ধারণাগুলি উদ্ঘাটন করতে গিয়ে তাকে অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হয়েছে। একাজ করার স্বপ্নই তার আগ্রহকে সমুন্নত রেখেছে। তার এই পথ অনুসরণ করে যেকোন পাঠক তার জীবনে নতুন এক দিকের সন্ধান পাবে, অনুপ্রেরণা পাবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

মুহাম্মদ আলমগীর
সিডনী, অস্ট্রেলিয়া
নভেম্বর ৯, ২০২১

অনুবাদকের কথা

আবারও দেখা হলো।

আহলান-সাহলান।

এতক্ষণে নিশ্চয়ই আপনার রোমাঞ্চকর সোনালি যুগ ভ্রমণ শেষ হয়েছে, তাহলে চলুন "১০০১ মুসলিম বিস্ময়" বইটির অনুবাদ প্রসঙ্গে আরেকটি জগত ঘুরে আসি।

"*1001 Inventions* (*এক হাজার এক আবিষ্কার*)" গ্রন্থের সাথে আমার পরিচয় ২০১৫'র দিকে। ওই সময় অনলাইনে বিভিন্ন বই ডাউনলোডের এক হিরিকে ব্যস্ত ছিলাম। বিভিন্ন টপিক ধরে বই ডাউনলোড করতাম। বরাবরের মতো ইতিহাসের প্রতি আমার প্রচণ্ড ঝোঁক থাকায় মুসলিম ইতিহাস নিয়ে বই নামাতে গিয়ে এই বইয়ের সন্ধান পাই। প্রথম দেখাতেই বইটির প্রেমে পড়ি, আর পড়তে থাকি। কিন্তু পড়ার গতি যতই সামনে এগুতে থাকে, ততই আশ্চর্য ও অবাক হতে থাকি। একে তো আমি নিজেই এসব তথ্য সম্পর্কে বেখেয়াল, অন্যদিকে বইটির অনেক বিষয়ই আমার মাথার উপর দিয়ে যাচ্ছিল। আসলে বইটি এক টানে শেষ করার মতো কোনো বই নয়। সময় নিয়ে পড়তে হয় এবং বিষয়বস্তুও বুঝতে হয়। এভাবে বেশ কিছুটা পড়া হয়। যাকেই দেখাতাম, সেই বইটির ব্যাপক প্রশংসা করতো। তখন থেকেই বইটা অনুবাদ করবো বলে ঠিক করি।

বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ চুকাতে চলে যায় ২০১৭ অবধি। অতঃপর আয়-রোজগারের ব্যবস্থাসহ নানাভাবে সময় পার হয়ে চলে আসে ২০১৯-এর বিদায় বেলা। ঠিক শেষ বেলাতে এসে বইটি যে অনুবাদ করবো, তা ঠিক হয় এবং কাজ শুরু হয়। দু'মাস কাজ চলার পর কাজটি থেমে যায়। প্রতিদিন কিছু পৃষ্ঠা করে অনুবাদ এগিয়ে রাখবো, এই ভাবনা মোতাবেক কাজ আর সামনে বাড়েনি। বইটির বিষয়বস্তু অন্য দশটা সাধারণ বইয়ের মতো নয়। বইটিকে বাংলায় ঠিকভাবে ফুটিয়ে তুলতে প্রয়োজন প্রাসঙ্গিক বিষয়ের প্রাথমিক জ্ঞান ও ধৈর্যের।

আমার থেমে যাওয়ার সাথে সাথে গোটা দুনিয়াও থমকে দাঁড়ায়। কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে থেমে যায় সবকিছু। বিভিন্ন বই অনুবাদে কেটে যায় এ সময়। কিন্তু বইগুলোর অনুবাদে ব্যস্ত থাকলেও আমার মন পড়ে থাকতো "*1001 Inventions*"-এ। কারণ বইটির বিষয়বস্তু আমার পরম পছন্দের এবং আমার ভাবনা জগত এটার সাথে বেশ মানানসই।

অনুবাদের খাতিরে অনুবাদ করা এবং এমনসব বিষয়ে নিয়ে কাজ করা, যার সাথে মনের মিল হয় না, সেগুলো কিছু সময় ধরে করা গেলেও বেশিদিন চালিয়ে নেয়া সম্ভব হয় না। তবে এ জাতীয় কাজের সাথে লেগে থাকাটা এক দিকে দিয়ে আমার জন্য বেশ ফলপ্রসু হয়েছে। ভাষাজ্ঞান সমৃদ্ধ হওয়ার পাশাপাশি বেড়েছে অনুবাদ দক্ষতা এবং নিজের ঝুলিতে যোগ হয়েছে ১০-টির মতো বই। পরিচিত হয়েছি বেশ কিছু ভিন্নমত ও দৃষ্টিভঙ্গির সাথে। পেয়েছি গুরুত্বপূর্ণ এক সবক – অর্থাৎ যদি কারো মতের সাথে একমত নাও হই, তবে ওই মতকে সমালোচনার পূর্বে সেটাকে এমনভাবে বুঝে নেয়া আমার দায়িত্ব যে, ভিন্ন মতের ব্যক্তিও যেন এই সাক্ষ্য দেয় যে: আমার মত ও দৃষ্টিভঙ্গি তুমি ঠিকভাবে বুঝেছো এবং সেটা তুলে ধরায় কোনো পক্ষপাতিত্ব করোনি।

ভিন্নমত ও দৃষ্টিভঙ্গির সাথে একমত না হয়েও সেগুলো নিয়ে যে কাজ করা যায়, এমন ভাবনা আমাদের এখানে খুবই বিরল। সবকিছুকে *Black & White* দেখার প্রবণতা খুব বেশি। দলীয় ও গোষ্ঠীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সবকিছু বিচার

করা হয়। *You are either with us, or against us* মনোবৃত্তি সর্বত্র। হ্যাঁ, আপনার কাছে কোনো একটি দৃষ্টিভঙ্গি ও মত ভুল লাগতে পারে এবং একাডেমিক ও গঠনমূলক পন্থায় সেটার সমালোচনা করাই যেতে পারে। কিন্তু সে ধরনের বুদ্ধিবৃত্তিক কার্যক্রমে অংশ না নিয়ে যখন অন্য উপায় অবলম্বন করা হয়, তখন ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর দৈনতা স্পষ্ট হয়ে পড়ে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমাদের মুসলিম সমাজের বৃহত্তর অংশের অবস্থা আজ এমনই। একে তো বিশ্বমঞ্চ থেকে ক্ষমতা হারানো, তার সাথে যোগ হয়েছে অজ্ঞতাকে ভর করে সামনে এগিয়ে যাওয়ার বৃথা প্রয়াস। ফলশ্রুতিতে মুসলিম সমাজের না গুণগত কোনো পরিবর্তন হচ্ছে, আর সামনে যে হবে, তারও কোনো আলামত আপাত দৃশ্যমান নয়।

আমার বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যয়নকাল বিশেষভাবে বললে ২০১০/১১-এর দিক থেকে বাংলাদেশে নাস্তিকতার প্রবল জোয়ার বইতে শুরু করে এবং নানা কৌশলে ইসলামকে হেয় করা, ইসলাম একটি সেকেলে ধর্ম প্রমাণের প্রয়াস জোরেশোরে চালু হয়। নবী মুহাম্মদ (ﷺ)-এর চরিত্র হনন করা, নানাভাবে কুরআনকে প্রশ্নবিদ্ধ করাসহ নানা কার্যক্রম দ্রুত বেগে চলমান থাকলেও সেগুলো মুকাবিলায় মুসলিমদের প্রতিক্রিয়া তেমন পরিপক্ব মনে হয়নি। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই প্রতিক্রিয়া গোজামিল ধরনের। বস্তুত যখনই আপনি দলীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ইসলাম বা সত্যকে মূল্যায়ন করবেন এবং দলীয় দৃষ্টিভঙ্গির গণ্ডিতে থেকে ইসলামকে ডিফেন্ড (*defend*) করার চেষ্টা করবেন, তখন গোজামিল দেয়া ছাড়া আর উপায় থাকে না। কারণ, ইসলাম বা সত্য কারো দলীয় সম্পত্তি নয়, বরং তা এসেছে মানবজাতিকে মুক্তি দিতে।

ওই সময় থেকে আমার মনে এসব নিয়ে কাজ করার প্রবল ইচ্ছার উদয় হয় এবং আমার পরম আকাঙ্ক্ষা যে, বাংলা ভাষায় এমনকিছু রচনা উপহার দেয়া, যেখানে আমার মনের এই ইচ্ছেগুলো ডানা মেলে উড়ে। এখান থেকেই '১০০১ সিরিজ'-এর আবির্ভাব।

'১০০১ সিরিজ' আমার নিজস্ব চিন্তা ও সফরনামা বলা যায়, অর্থাৎ এখানে এমনসব বই অনুবাদ ও রচনা করা হবে, যা আমার পছন্দের। বস্তুত, ইসলাম নিয়ে কাজ করাটা প্রথমত আমার নিজের জন্য। কাউকে উপদেশ দেয়া নয়, বরং একাডেমিক পন্থায় ইসলামের উপর আরোপিত অভিযোগগুলো পর্যালোচনা করা, সেগুলোর আসল হাকিকত তালাশ ইত্যাদি বিষয় বেশ খোলা মন নিয়ে খতিয়ে দেখা এবং সেসবের উপর সৃজনশীল বই প্রকাশই হচ্ছে '১০০১ সিরিজ'-এর লক্ষ্য।

(সিরিজটি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন: *emdadhosien.com/1001-series*)।

"১০০১ মুসলিম আবিষ্কার" বইটি '১০০১ সিরিজ'-এর প্রথম বই। ভবিষ্যতে এই সিরিজ হতে সৃজনশীল বহু বই বের হবে – *ইনশাআল্লাহ*। আল্লাহ তাওফিক দান করুন। *আমিন*।

ওহ! প্রসঙ্গ থেকে বেরিয়ে গেলাম। আমরা ছিলাম কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে দুনিয়া থমকে যাওয়া এবং অন্যান্য কিছু বইয়ের অনুবাদ পর্যন্ত।

২০২১-এর সূচনা থেকে বইটির কাজ শেষ করার ব্যাপারে চূড়ান্ত মনস্থির করি এবং আল্লাহর অশেষ কৃপায় বইটির অনুবাদ শেষ হয় নভেম্বর মাসে।

চেষ্টা করেছি অনুবাদকে সর্বাত্মক সুন্দর ও বোধগম্য করার। কতটুকু পেরেছি, তা পাঠকগণই বলতে পারবেন। বইটি দেখে দেয়ার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি অস্ট্রেলিয়া নিবাসী শ্রদ্ধেয় চাচা জনাব আলমগীর-কে। ভুলভ্রান্তি হওয়াটাই স্বাভাবিক, তাই সেগুলো ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার অনুরোধ রইলো। এছাড়া বইটির ডিজাইনকে সর্বাত্মক সুন্দর করার জন্য সোহেল আরমান ভাইয়ের কথা না বললেই নয়। মহান আল্লাহ তাকে উত্তম জাযা দান করুন।

আল্লাহ তাআ'লা যেন বইটি কবুল করে নেন, এই দু'আ করি তাঁর নিকট।

বইটিতে অনুসৃত বানান রীতি

১. বইটির অনুবাদে বাংলা একাডেমি প্রণীত বাংলা বানান রীতি অনুসরণ করা হয়েছে।

২. আল্লাহ তাআ'লাকে বোঝানোর জন্য যেখানেই 'তার / তাকে' শব্দ এসেছে, সেখানেই আমরা 'তাঁর / তাঁকে' ব্যবহার করেছি এবং অন্য সকল ক্ষেত্রে 'তার / তাকে' ব্যবহার করা হয়েছে। উদ্দেশ্য চন্দ্রবিন্দু (ँ) যুক্ত তাঁর/ তাঁকে/ যাঁর-কে কেবল আল্লাহ তাআ'লার জন্য নির্দিষ্ট করা।

৩. যেসব শব্দ আরবী ও ফারসি ভাষার সাথে জড়িত যেগুলোর ক্ষেত্রে উচ্চারণ রীতিকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। যেমন: হাদিস না লিখে হাদিছ লিখা হয়েছে।

আরবী বর্ণসমূহ প্রতিবর্ণায়নে নিম্নের ছক ব্যবহার করা হয়েছে।

আরবি প্রতিবর্ণায়ন ছক:

ا	অ	د	দ	ض	দ	ك	ক
ب	ব	ذ	য	ط	ত	ل	ল
ت	ত	ر	র	ظ	য	م	ম
ث	ছ	ز	য	ع	আ'	ن	ন
ج	জ	س	স	غ	গ	ه	হ
ح	হ	ش	শ	ف	ফ	و	ও/ব
خ	খ	ص	স	ق	ক/ক্ব	ى	ই/য়

ইমদাদ হোসেন
অনুবাদক, সম্পাদক ও লেখক
emdadhosien.com
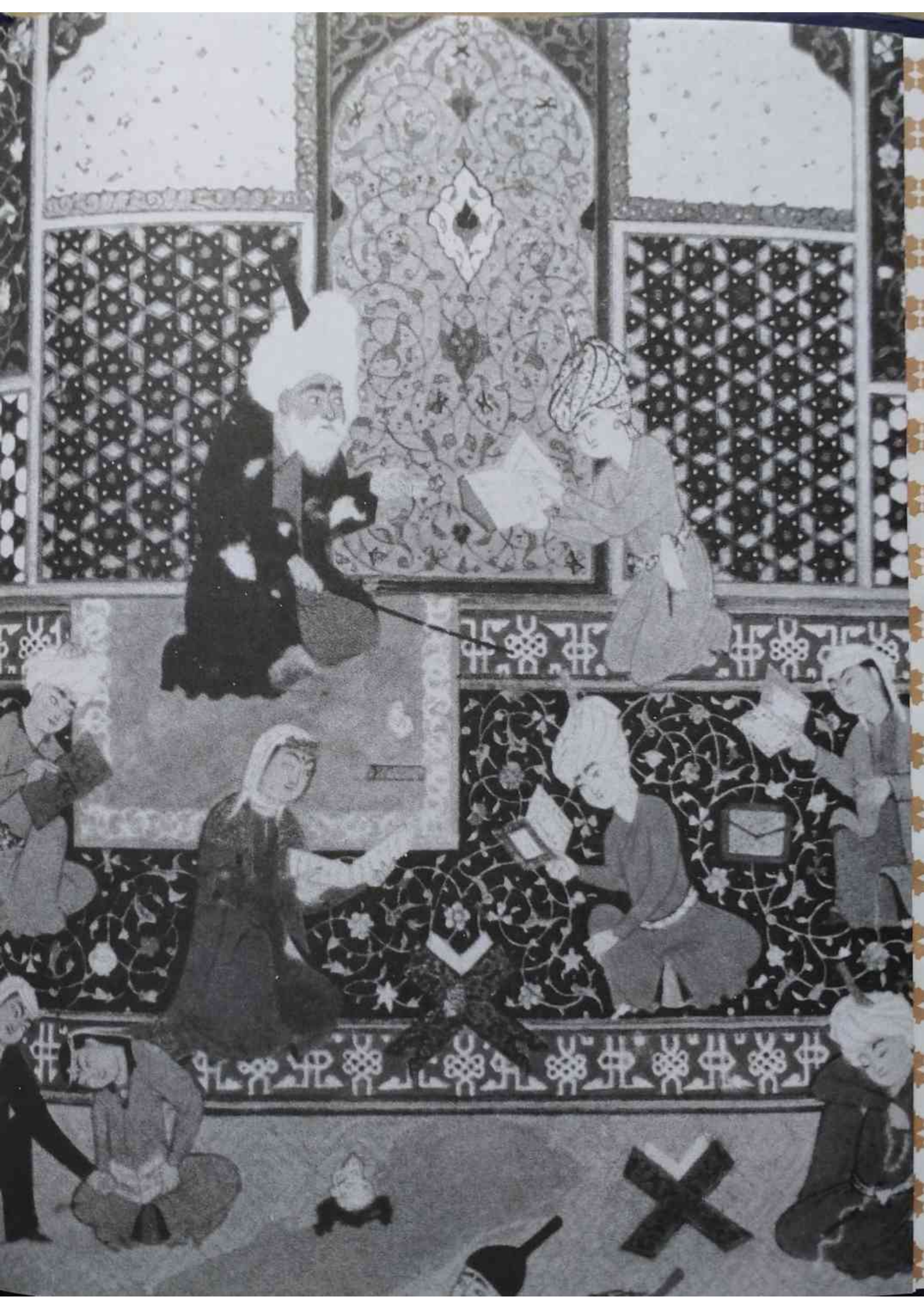
"সত্য গ্রহণ থেকে মানুষের দৃষ্টিকে অন্ধ বানায়, এমন যাবতীয় জিনিস (যেমন: প্রাচীন প্রথা, দলীয় স্পিরিট, ব্যক্তিগত প্রতিদ্বন্দ্বিতা, আবেগ, অপরকে প্রভাবিত করার বাসনা) থেকে আমাদের মন-মানসিকতাকে সম্পূর্ণ রূপে পাক-সাফ করতে হবে।"

– আল-বিরুনী, "আছারুল বাকিয়া আনিল কুরুনিল খালিয়া"
(বিগত শতাব্দির অবশিষ্ট স্মৃতি)

১২শ শতাব্দিতে আঁকা আল-ইদরিসীর মানচিত্র, যেখানে প্রথমবারের মতো অধিকাংশ ইউরোপ, এশিয়া এবং উত্তর আফ্রিকা চিত্রিত হয়েছে।

একবার কল্পনা করুন তো – টাইম ট্রাভেল করে আপনি পৌঁছে গেছেন ৭ম শতাব্দিতে। চ্যালেঞ্জিং এ যাত্রায় আপনি কুসংস্কার ও অন্ধ অনুসরণের কালো মেঘে আচ্ছন্ন একটি মহাদেশের দেখা পাবেন।

বিশ্বাস না হলেও এটাই – ইউরোপ। হতাশ না হয়ে স্পেন অভিমুখে যাত্রা করুন, হতাশা কেটে যাবে।

হ্যাঁ, যেমনটি বলেছি – হতাশা তো দূর হয়েছে উল্টো সৃজনশীলতা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, পর্যবেক্ষণ ও স্বাধীন চিন্তায় আলোকিত মানুষদের দেখে আপনি হয়তো ভাবছেন – এ আবার কোন জগৎ? কেউ আমাকে মায়ার জগতে নিয়ে আসেনি তো?

ঠিক ধরেছেন – এটা মুসলিম সভ্যতার সোনালি যুগ, যা ৭ম শতাব্দি থেকে ক্রমশ সামনে বেড়েছে এবং মানবজাতিকে দিয়েছে উদ্ভাবনের নয়া সম্ভার। আজ পর্যন্ত আধুনিক সভ্যতাতে যে উন্নতি হয়েছে, তার ভিত ও বৃহৎ প্রাসাদ নির্মাণে মুসলিম সোনালি যুগের ছিল প্রত্যক্ষ অবদান।

"১০০১ মুসলিম আবিষ্কার" নামের টাইম মেশিনে করে বেশ ভাল অভিজ্ঞতা জমা করেছেন, এবার আপনার তা ছড়িয়ে দেয়ার পালা; অর্জিত জ্ঞান বিতরণ করার পালা দূরের ও কাছের – সবার মাঝে।

- আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন একদল গবেষকের গবেষণার ফসল এ বই এবং বইটির প্রতিটি তথ্যই যাচাইকৃত।
- ৩০০-এর অধিক চোখধাঁধানো রঙিন চিত্র।
- মুসলিম মনীষীদের যুগান্তকারী অবদানের সমন্বয়ে বানানো চমৎকার মানচিত্র।
- ৭ম থেকে ১৮শ শতাব্দি পর্যন্ত মুসলিম সভ্যতার উল্লেখযোগ্য অবদানের সচিত্র সময়ক্রম।
- চমৎকার অলঙ্করণ ও প্রাঞ্জল অনুবাদ আপনাকে নিয়ে যাবে সৃজনশীলতার এক জগতে, যা আপনার মনোরাজ্যে নিয়ে আসবে নয়া আলো – *ইনশাআল্লাহ*।